ইসমাইল রেহান

আফগানিস্তানের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড



আফগানিস্তানের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল : ইসমাইল রেহান

অনুবাদক

যুবাঈর আহমাদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : মে ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬০০, US $ 25. UK £ 20

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-4-4

Afganistaner Etihas[2nd Part]
by **Ismail Rehan**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

১৬ তম অধ্যায়

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলন ৭

১৭ তম অধ্যায়

দোস্ত মুহাম্মাদ খান, শের আলি খান ও ইয়াকুব আলি খান ৪৩

১৮ তম অধ্যায়

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ৭৪

১৯ তম অধ্যায়

আমির আবদুর রাহমান খানের যুগ ১০৯

২০ তম অধ্যায়

হাবিবুল্লাহ খানের যুগে আফগানিস্তান ১৩১

২১ তম অধ্যায়

বারেকজাই পরিবারের শেষ শাসক ১৭৫

২২ তম অধ্যায়

বাচ্চা সাকা, নাদির খান এবং শেষ বাদশাহ জহির শাহ ২১৩

২৩ তম অধ্যায়

কমিউনিজমের ছায়া, গণতন্ত্র এবং সাওর বিপ্লব ২৩১

২৪ তম অধ্যায়

আফগান ভূমিতে সোভিয়েত আগ্রাসন ২৫৩

২৫ তম অধ্যায়
আফগান জিহাদের বিখ্যাত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ ২৮১

২৬ তম অধ্যায়
আগুন, ইবরাহিমের সন্তান ও নমরুদ ২৯৭

২৭ তম অধ্যায়
চূড়ান্ত যুদ্ধের কাল ৩২৫

২৮ তম অধ্যায়
লাল ভল্লুকের পরাজয় : নাজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৩৫৯

২৯ তম অধ্যায়
কাবুল বিজয় : মুজাহিদদের সরকার এবং গৃহযুদ্ধ ৩৮০

১৬ তম অধ্যায়

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলন

শাহ সুজা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আফগান জনগণের ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছিল। শাহ সুজা ও তার উজির-নাজিররা অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা মুলত নামকাওয়াস্তে শাসক হিসেবে মসনদে তাদের বসিয়ে রেখেছিল। সমগ্র হিন্দুস্থানের চিত্র ছিল প্রায় একই রকম। নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে ইংরেজরা কখনো গদিতে বসে ক্ষমতা চালানোর মতো অবস্থায় ছিল না। তা ছাড়া তখন পর্যন্ত একটি বৈদেশিক বাণিজ্যকোম্পানি হিসেবেই উপমহাদেশে অবস্থান করছিল ইংরেজরা। তাই হঠাৎ করে শাসক বনে যাওয়া তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, এটা ভেবে তারা তাদের গোলামি বরণ করা ব্যক্তিদের বড় বড় পদ প্রদান করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে রেখেছিল। জনগণ তো দূরের কথা, খোদ এই শাসক ও রাজা-বাদশাহরাও ইংরেজদের সামনে হয়ে পড়েছিলেন নখদন্তহীন বাঘ।

এ ছাড়া পুরো সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংরেজরা একটি জঘন্য নীতি গ্রহণ করে। সমাজের চিন্তাশীল, যোগ্য ও জনদরদি ব্যক্তিদের তারা বিদ্রোহী ও গাদ্দার আখ্যা দিয়ে বন্দি অথবা নির্বাসন দিতে থাকে। শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা হয় অথর্ব, অক্ষম, গুন্ডা স্বভাবের অযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে। ফলে পুরো সমাজ বিশৃঙ্খল পরিবেশে রূপ নেয়; আর এই সুযোগে ইংরেজরা তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার আরও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, পুরো সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার প্রতিষ্ঠার পেছনে রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের দায়ী করত ইংরেজরা। এতে করে জনগণ শাসকদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। একইসঙ্গে রাজনীতির ময়দানে শাসকদের প্রতিপক্ষ যারা, ইংরেজরা তাদের শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেয়। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়। জাতীয় ঐক্য গঠনে ব্যর্থ হতে থাকে হিন্দুস্থান-আফগানিস্তানের শাসকরা।

'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি হিন্দুস্থানে বহু আগে প্রয়োগ করেছিল ইংরেজরা। সেই একই নীতি এবার প্রয়োগ করা হয় আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক

মহলে। ফলে আফগান শাসকরা মোগল বাদশাহদের মতো প্রতীকী বাদশাহ হিসেবে আবির্ভূত হন। হয়ে পড়েন জনবিচ্ছিন্ন। আবদালি বংশের শৌর্যবীর্য ও গ্রহণযোগ্যতা ম্লান হয়ে পড়ে আফগান সমাজে।

কোম্পানির পাদুকাবাহী

শাহ সুজা ক্ষমতাগ্রহণের পর নতুন মুদ্রা চালু করেছিলেন। সে মুদ্রায় একটি কবিতা লেখা ছিল। যার মর্মার্থ হলো,

> *চাঁদ-সুরুজের মতো উজ্জ্বল, দুররানি বংশের আলো, ষষ্ঠ বাদশাহ শাহ সুজার পক্ষ থেকে এই চাঁদি জনগণের তরে ঢালা হলো।*

একজন আফগানি কবি এ সময় শাহ সুজার অক্ষমতা এবং জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিষয়টি প্রতীকী চিত্রে তুলে ধরেন। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার মর্মার্থ ছিল এমন,

> *শাহ সুজা ইউরোপে এই মুদ্রা ঢেলেছেন, যিনি ইংরেজ গভর্নর জেনারেল এবং ক্যাপ্টেন ব্রাঞ্চের একজন ঘনিষ্ঠ গোলাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে ভিক্ষা পাওয়া মুদ্রা এটি।*

গুলজাই গোত্রের বিদ্রোহ

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের নিয়মিত বিদ্রোহ ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল। প্রতিটি গোত্র বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত, ফলে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ও সম্মিলিত ঐক্য না থাকায় তেমন সুবিধা করতে পারত না তারা। প্রতিটি বিদ্রোহকে ইংরেজরা অত্যন্ত কঠিনভাবে দমন করত।

এ বছর গ্রীষ্মকালে ইংরেজদের ওপর মুজাহিদদের হামলা অত্যন্ত তীব্র হতে শুরু করে। কালাত অঞ্চলের গুলজাই গোত্রের সদস্যরা ইংরেজদের একটি রসদবাহী বিরাট কাফেলাকে কান্দাহার থেকে কাবুল যাওয়ার পথে ঘিরে ফেলেন। এই কাফেলায় ইংরেজদের রাজকোষের বিরাট একটি অংশ ছিল। মুজাহিদরা পুরো কাফেলা লুট করে নেন। এ ছাড়া কান্দাহারে অবস্থানরত ইংরেজ মেজর ক্লিব বোজনকে মুজাহিদরা হত্যা করে ফেলেন। এই সংবাদগুলো ইংরেজদের কানে পৌঁছলে তারা বিচলিত হয়ে ওঠে। গোত্রগুলোকে শায়েস্তা করতে কিছুদিন থেকেই গোত্রীয় সরদারদের ধরপাকড়ের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল। অত্যন্ত জোরেশোরে ধরপাকড় অব্যাহত থাকলেও স্থানীয় যুবকরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ চালাতে থাকে।

এদিকে গোত্রীয় অঞ্চলকে নেতৃত্বশূন্য করার পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংরেজরা বন্দি

নেতাদের দূরদূরান্তের এলাকায় নির্বাসন দেয়, যাতে করে তারা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজবিরোধী ষড়যন্ত্র করতে না পারেন। এরপরও মুজাহিদদের শক্তি খর্ব করা সম্ভব হয়নি। বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সবচেয়ে চৌকস অফিসার জেনারেল রবার্টস সেইল বিরাট একটি বাহিনী নিয়ে গুলজাই গোত্রের এলাকায় প্রবেশ করে। তখন গ্রীষ্মের দাবদাহে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বৃহত্তর কান্দাহার অঞ্চল। এই পরিস্থিতিতে দু-পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। তবে যুদ্ধে টিকতে না পেরে মেজর রবার্টসকে তার বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যেতে হয়।

নেতৃত্বের অপেক্ষায় জাতি

ইংরেজদের জুলুম-অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে সমগ্র আফগানিস্তান একটি বিরানভূমিতে পরিণত হতে চলছিল। দুঃখদুর্দশা ও অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দ্রব্যমূল্য উচ্চবিত্তদেরও নাগালের বাইরে চলে যায়। অবৈধ ট্যাক্স আদায় করতে করতে জনগণ হাপিত্যেশ করতে থাকে। কৃষক-মজুর ও নিম্নআয়ের মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। উচ্চবিত্তরাও এ সময় পথে বসার উপক্রম হয়।

জটিল এই মুহূর্তে পুরো জাতি এমন একজন নেতার অপেক্ষায় ছিল, যিনি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়াবেন। যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধীনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে পারবে।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের প্রত্যাবর্তন

আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি, উত্থান-পতন, নেতৃবৃন্দের নির্বাসন সবকিছুই সাবেক শাসক দোস্ত মুহাম্মাদ খানের দৃষ্টির অধীনে ছিল। তিনি রাজনৈতিক ময়দানে বিরাট শূন্যতা লক্ষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের শীতকালে তিনি উত্তর-আফগানিস্তানের পৌঁছান। তাখারের শাসক মির মুরাদ বেগ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য দোস্ত মুহাম্মাদকে ৫ হাজার অশ্বারোহী সেনা দিয়ে সহযোগিতা করেন। দোস্ত মুহাম্মাদ খান এই বাহিনীসহ বলখে পৌঁছান। আফগানিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলের সরদাররা তার প্রত্যাবর্তনে আনন্দ প্রকাশ করেন। আগের ভ্রান্তিগুলো ভুলে গিয়ে এই মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যের জন্য তার পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারা। খুললাম গিরিখাতে বসবাসকারী গোত্রীয় সরদার মির ওয়ালি বেগ এ সময় ৫ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধাসহ খানের দরবারে এসে উপস্থিত হন। এভাবে ধীরে ধীরে গোত্রীয় সরদারদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে।

আফজাল খানের পরাজয়

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের যুদ্ধপ্রস্তুতি ইংরেজদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে দেখা দেয়। তারা অনুভব করে, যদি দোস্ত মুহাম্মাদ খানের বাড়তে থাকা সামরিক শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা না যায়, তাহলে আফগানিস্তানের চতুষ্কোণ থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। তখন সামগ্রিক এই শক্তিকে রুখে দেওয়া ইংরেজদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই তারা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তর-আফগানিস্তানের দিকে যাত্রা করে। ওদিকে খানের বাহিনীর অগ্রগামী দলের দায়িত্ব ছিল তার পুত্র আফজাল খানের হাতে। খানের সামরিক শক্তির সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল আধুনিক সমরাস্ত্রের অভাব। এ সময় তার বাহিনীতে একটি কামানও ছিল না; অথচ ইংরেজদের অত্যাধুনিক কামান ছিল তাদের যুদ্ধকৌশলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। প্রাথমিক সংঘর্ষে ইংরেজরা আফজাল খানকে পরাজিত করে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

দোস্ত মুহাম্মাদ খান এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন; কিন্তু পরক্ষণেই সাহস সঞ্চার করে পরবর্তী মাসে বামিয়ানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তবে এবারও বিজয়ের স্বাদ ইংরেজরাই আস্বাদন করে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে পিছু হটতে হয়।

মুজাহিদদের জিহাদি কার্যক্রম

ধারাবাহিক এসব বিজয়ের পর ইংরেজরা প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন বিপদের আশঙ্কা অনুভব করছিল। কাবুলের উত্তর দিকে প্রতিটি স্থানে গোত্রীয় যুবকরা ছোট ছোট দুর্গ ও ছাউনি স্থাপন করে ইংরেজদের বিপক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিল। পারওয়ান, কাপিসা ও লাঘমানে চলছিল ইংরেজবিরোধিতার এক অপ্রতিরোধ্য তুফান। ইংরেজ কমান্ডার জেনারেল সেইল ও আলেকজান্ডার বার্নিস এই তুফান রুখে দিতে বড় বড় বাহিনী নিয়ে চতুর্দিক থেকে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ করছিল। কুররা বাগের পার্শ্ববর্তী বড় বড় গ্রাম ও দুর্গ, যেখান থেকে শক্তিশালী প্রতিরোধযুদ্ধ চলছিল, অসাধারণ প্রতিরোধের পরেও ইংরেজদের কামান-গোলার আঘাতে তছনছ হয়ে যায়; কিন্তু অগণিত শহিদের লাশ ওঠানোর পরেও জনগণের অন্তরে জিহাদ ও ইমানি চেতনায় কোনো ভাটা পড়েনি।

চারিকার অঞ্চলের কেল্লা জঙ্গিতে আলি খান মুজাহিদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান। ইংরেজদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আলি খানের আক্রমণে অসংখ্য ইংরেজ সেনা সেদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশেষে ইংরেজরা কামানের গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ইংরেজি সেনারা দুর্গটি

এ সময় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবরোধের মধ্যে থেকেও পরিবার-পরিজনসহ আলি খান মুজাহিদ দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। ইংরেজ সেনাদের লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অবরোধে ভেঙে বেরিয়ে যান। এরপর যুক্ত হন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুজাহিদদের সঙ্গে। ইংরেজরা সেদিন তাঁকে ধরতে না পেরে আফসোসে আঙুল কামড়াতে থাকে।

মির মাসজিদি খানের অসাধারণ বীরত্ব

আফগানিস্তানের আরেক দুঃসাহসী মুজাহিদের নাম ছিল মির মাসজিদি খান। আফগান জনতা আজও এই মুজাহিদকে স্মরণ করে থাকে। নিজের দুর্গে তিনি ৫০ জন মুজাহিদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তাদের কাছে অস্ত্র হিসেবে সে সময় পুরানো যুগের দীর্ঘকায় বন্দুকসহ হালকা কিছু অস্ত্র ছিল; কিন্তু তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অনন্য পর্যায়ের তিরন্দাজ ও শক্তিশালী যুবক। তরবারি চালনায় ছিলেন অনন্য পারদর্শী।

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে যখন ইংরেজরা তাদের দুর্গ অবরোধ করে বসে, তখন দুর্গের গোপন কুঠুরি থেকে মুজাহিদরা অব্যর্থ নিশানা করে অসংখ্য ইংরেজকে তিরবিদ্ধ করেন। সেদিন অবিশ্বাস্যভাবে একটি তিরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বহুসংখ্যক ইংরেজ সেনা তিরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অবরোধ ধরে রাখা ইংরেজদের জন্য অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। এ সময় তারা আধুনিক কামান-গোলা একের পর এক দুর্গের ওপর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। আগুনে ঝলসে ফেলতে চাচ্ছিল তারা মুজাহিদদের। ধারাবাহিক কামানের গোলার আঘাতে দুর্গের দেয়ালে নানা জায়গায় বড় ফাটল তৈরি হয়েছিল। সবচেয়ে বড় ফাটল লক্ষ করে সেনারা একের পর এক নতুন গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ফাটল বিরাট বড় আকার ধারণ করে। ইংরেজ কমান্ডারের ইশারায় এক প্লাটুন সেনা দুর্গে প্রবেশের জন্য ফাটলের দিকে এগিয়ে আসে; কিন্তু ফাটলের একদম কাছে পৌঁছলে তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে হতবাক হয়ে যায়। দুর্গে অবস্থানকারী মুজাহিদরা সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে ফাটলটি পূরণ করে ফেলেছিলেন। মির মাসজিদি খান তখন তরবারি উঁচু করে ফাটলটি পাহারা দিচ্ছিলেন। ইংরেজ সেনারা প্রাণান্তর চেষ্টা করেও দুর্গে প্রবেশ করতে পারেনি। ফাটলটি গোলাকার হওয়ায় ইংরেজ সেনারাও বাহির থেকে খুব জোরালো আক্রমণ করতে পারছিল না। এক-দুজন করে সেনা এগিয়ে আসত; কিন্তু সেখানে অবস্থানরত মুজাহিদরা তরবারির আঘাতে তাদের কুচি কুচি করে কেটে ফেলতেন।

মুজাহিদরা যখন নিশ্চিত হন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজরা দুর্গে প্রবেশ করবে, তখন তারা একটি শক্তিশালী হামলা করে বসেন। এই হামলা এত শক্তিশালী ছিল যে,

ইংরেজরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুজাহিদরা এ সময় মির খানকে সঙ্গে নিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে বাতাসের মতো হারিয়ে যান।

মির খান এই লড়াইয়ের পরেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন। তিনি এবার প্রথমে আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুহাম্মাদ খান তখন পারওয়ানের আশেপাশে অবস্থান করছিলেন। মির খানের আগমনে আমিরের বাহিনীতে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সবাই একজোট হয়ে শক্তিশালী হামলার পরিকল্পনা করতে থাকেন। সুদীর্ঘকালের জিহাদি পরিক্রমায় মির খানের ধারাবাহিক অবদান ছিল। বহুবার তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আশেপাশের বসতিগুলোতে আজও মির খানের বীরত্বের গল্প শোনানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা গল্প-কবিতায় জনগণ এখনো চিরজাগরূক করে রেখেছে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তারা সেগুলো নতুন প্রজন্মের সামনে পাঠ করে।

২ নভেম্বরের যুদ্ধ

২ নভেম্বর ইংরেজদের জন্য কঠিন একটি দিন ছিল। সে সময় ইংরেজদের এজেন্ট শাহজাদা তাইমুর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জেনারেল সেইল ইংরেজবাহিনী নিয়ে তার পিছে পিছে এগিয়ে আসছিল। চাণক্য রাজনীতিতে অভিজ্ঞ হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল ইবলিসি জাদুমন্ত্র সঙ্গে নিয়ে গোত্রীয় এলাকাগুলোতে ইংরেজদের পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা প্রচারের নাটক মঞ্চস্থ করে বেড়াচ্ছিল। ইংরেজদের ভরসা ছিল, এই দ্বিমুখী নীতি একটি ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে; কিন্তু ঠিক সে দিনই স্বাধীনতাকামী মুজাহিদরা পারওয়ানে তাদের ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ইংরেজদের অশ্বারোহীবাহিনী সমূলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজদের বেশ কজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আহত হয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যায়।

জেনারেল সেইল এই সংবাদ পেয়ে পাথরের মতো জমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে চারিকার অঞ্চলে চলে আসে। ইংলিশ জেনারেল ম্যাকনাটন পরাজয় সন্নিকটে বুঝতে পেরে আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। এ সময় একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান হঠাৎ করে একদম হাওয়ায় মিলিয়ে যান। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, জমিন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে অথবা তিনি আসমানে কোথাও হারিয়ে গেছেন।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের হতাশা

আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের অদৃশ্য হওয়ায় সবাই বিস্মিত হন। মুজাহিদদের মধ্যে অনেকে ভাবছিলেন, তিনি ইংরেজদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন; আবার অনেকে তাকে শহিদ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছিল; কিন্তু বাস্তবতা সবার আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। মূল বাস্তবতা ছিল এর চেয়েও ভয়ানক। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে, যুদ্ধে বিজয় অর্জনের সময় দোস্ত মুহাম্মাদ খানের অন্তরে প্রচণ্ডরকম ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি ইংরেজদের পালটা আক্রমণ ও এর পরিণতি কল্পনা করে আঁতকে ওঠেন। এরপর বিজয়ী বাহিনীকে একপাশে রেখে দুজন সঙ্গীসহ অন্ধের মতো কাবুলের দিকে পালাতে থাকেন। কেউ বুঝতে পারেনি, কেন তার মনে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল; অথচ মুজাহিদরা সে সময় বিজয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

কাবুলে পৌঁছার পর তিনি সোজা বালা হিসার দুর্গের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে তখন জেনারেল ম্যাকনাটন (General Macnaghten) ঘোড়ায় চড়ে পায়চারি করছিল। দোস্ত মুহাম্মাদ খানের একজন সঙ্গী তাকে সংবাদ দেয়, 'আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান আগমন করেছেন।' জেনারেল এই সংবাদ শুনে চমকে ওঠে। ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'একাকী নাকি বাহিনীসহ?' জবাবে বলা হয়, 'একাকী এসেছেন।' জেনারেল বলেন, 'দ্রুত তাকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে এসো।'

এর কিছুক্ষণ পর আফগানিস্তানের এই হতভাগা শাসক ইংরেজ জেনারেলের সামনে তার তরবারি, খঞ্জরসহ নিজেকে সমর্পণ করেন। পূর্ণ বিজয়কে তিনি পরাজয়ে রূপান্তর করে ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। পারওয়ানের যুদ্ধবিজেতার এমন বোকাসুলভ আচরণে জেনারেল নিজেই অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ সময় আমিরের ঝুঁকে থাকা মাথাকে অপমানের ভারে আরেকটু ঝুঁকিয়ে দিতে জেনারেল বলে ওঠে, 'আমির সাহেব, আপনাকে হিন্দুস্থানে যেতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমি ভেবেচিন্তেই আপনার এখানে এসেছি। এখন আপনি আমার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি তা মাথা পেতে মেনে নেব।' মরা কণ্ঠে জবাব দেন দোস্ত মুহাম্মাদ খান।'

জেনারেল বলে, 'আপনি আমাদের কাছে এসেছেন, এতে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তবে আপনার পুত্র আফজাল খান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। মহান ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আপনি দয়া করে তাকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করুন। সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি তাকে ও আপনার বংশধরদের আপনার কাছে ডেকে পাঠান। এই নিন কাগজ কলম, তার কাছে আপনি ফরমান পাঠান।'

নির্বাসনে দোস্ত মুহাম্মাদ খান

জেনারেলের কথামতো দোস্ত মুহাম্মাদ খান একজন বাহকের মাধ্যমে পুত্র আফজাল খানের কাছে একটি বার্তা পাঠান। পিতার এমন কর্মকাণ্ডে আফজাল খান অত্যন্ত মর্মাহত হন। যদি এ সময় তার পিতা ইংরেজদের হাতে বন্দি না থাকতেন, তাহলে তিনি হয়তো কখনো অস্ত্রসমর্পণের কথা কল্পনা করতেন না; কিন্তু এ মুহূর্তে পিতা শত্রুর হাতে বন্দি, তাই চাইলেও আর যুদ্ধ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে তিনি পরিবার-পরিজনসহ পিতার কাছে উপস্থিত হন। ইংরেজরা তার পুরো বংশকে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর হিন্দুস্থানে নির্বাসন দেয়। এ সময় দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পরিবারের সদস্য ছিল ১৪৯ জন।

জেনারেল নিকলসনের তত্ত্বাবধানে তাদের প্রথমে কলকাতায়, পরে লুধিয়ানায় নিয়ে আসা হয়। আফগানিস্তান থেকে আদায়কৃত ট্যাক্সের মধ্য থেকে ৩ লাখ রুপি প্রতিবছর মুহাম্মাদ খানের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হবে, এই মর্মে ইংরেজরা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়।

আফগান জনগণের বীরত্ব

দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে আফগান জনগণ তাদের জিহাদি নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু তার এমন পাগলামিপূর্ণ আচরণে পুরো জাতি প্রচণ্ড অপমানিত ও লজ্জিত হয়। তবে যত যা-ই হোক, তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত করেনি। পারওয়ান ও কাপিসার ময়দানে তখনো জিহাদ চলছিল। ইংরেজদের নানামুখী চক্রান্তের পরও জিহাদি আন্দোলনকে কোনোভাবেই দমানো সম্ভব হচ্ছিল না। ১৩ নভেম্বর মুজাহিদদের পক্ষ থেকে পরিচালিত একটি শক্তিশালী আক্রমণে বেশ কজন ইংরেজ অফিসার আহত হয়। জেনারেল মুমূর্ষু অবস্থায় ছটফট করছিল, এ সময় মেজর প্যাটিনজার বাকি ইংরেজ সেনা নিয়ে কাবুলের দিকে পালিয়ে যায়।

ফজলে আবাদ দুর্গ এবং কাটাখেল অঞ্চলের লোকজন পরাজিত ইংরেজবাহিনীর বিরুদ্ধে আবারও উঠে দাঁড়ায়। মির মুরাদ পলায়নরত ইংরেজবাহিনীর ওপর এমন অতর্কিত আক্রমণ করেন যে, শতাধিক ইংরেজ সেনা সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। বেঁচে যাওয়া সেনাদের মধ্যে চারজন কালিমা পড়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। এই যুদ্ধকালে আফগানদের জিহাদি চেতনা আসমান ছুঁয়ে গিয়েছিল। নারীরাও জিহাদের ময়দানে নেমে এসে পুরুষদের বিরুদ্ধে শরিক হতে থাকেন। কামান-গোলা নিক্ষেপ করে ইংরেজরা মুজাহিদদের সঙ্গে বিজয় লাভ করত ঠিকই; কিন্তু ভাগ্যক্রমে কখনো মুজাহিদদের

সামনে পড়ে গেলে তাদের আর রক্ষা হতো না। ভেড়া-বকরির মতো তাদের হত্যা করতেন মুজাহিদরা।

ডিসেম্বরের শীতলতম দিনগুলোতে হেলমান্দ অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়। মুহাম্মাদ আখতার খান আলিজাই নামের একজন গোত্রীয় সরদার এ সময় ইংরেজদের নাকে দড়ি দিয়ে দমবন্ধ করে ফেলেছিলেন।

মোল্লা এবং জিহাদের স্লোগান

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিকে দিকে বেজে উঠছিল। একজন কেন্দ্রীয় নেতার অভাব থাকা সত্ত্বেও আফগান জনগণ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াইয়ে নেমে আসে। এ সময় জনগণকে একত্রিত রাখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করেন মোল্লা সম্প্রদায়। প্রতিটি মসজিদের মিম্বার থেকে জিহাদের ফজিলত ও ফরজিয়াত সম্পর্কে অগ্নিঝরা বয়ান চলতে থাকে। আফগানরা মোল্লাদের তাদের জীবনের চেয়েও বেশি সম্মান করে এসেছে। মোল্লাদের পক্ষ থেকে প্রচারিত আসমানি আদেশের অন্যথা করার সাহস আফগানদের ছিল না। আলিমগণ আফগানিস্তানের প্রতিটি শহর, নগর, গ্রাম ও বসতিতে ঘুরে ঘুরে লোকদের জিহাদে উৎসাহিত করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা এই ফাতওয়াও প্রচার করেন, ইংরেজদের আনারস, আখরোট, আপেল অথবা অন্য কোনো ফলমূল বা রসদ দ্বারাও সহযোগিতা করা যাবে না। তাদের সঙ্গে সব ধরনের লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। সর্বজনীন বয়কট করতে হবে তাদের।

মুজাহিদদের সমরনীতি

১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ। এ বছর ইংরেজদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে তারা এ বছরটিতে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন হিন্দুকুশের পাহাড়চূড়া থেকে নানা কৌশলে আফগান মুজাহিদরা ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। ইংরেজদের বিরাট সেনাবাহিনী সে সময় আফগানিস্তানে অবস্থান করছিল। কাবুলে ২০ হাজার, জালালাবাদে ৫ হাজার, গজনিতে ১০-১৫ হাজার সেনা সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন করা ছিল। এ ছাড়া অতিরিক্ত বাহিনী সবসময় রিজার্ভে রাখা হতো।

একটি বাহিনী সবসময় পুরো দেশ ঘুরে বেড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদের মূল দায়িত্ব ছিল কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ কতটুকু শক্তি অর্জন করেছে, তা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট প্রদান করা। মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী প্রস্তুত

করা ছিল। কমপক্ষে ৭০টি কামান সবসময় তাদের কাছে প্রস্তুত থাকত। অপরদিকে আফগানদের কোনো নিয়মিত বাহিনী ছিল না। শাহ সুজা ও দোস্ত মুহাম্মাদ খান দুজনেই ন্যক্কারজনকভাবে ইংরেজদের কাছে নিজেদের সোপর্দ করার পর আফগান জনগণ প্রশাসনের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। গোত্রীয় শক্তি ও ইমানি উদ্দীপনা ইংরেজবিরোধিতায় তাদের আজও বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে এসেছে। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করব না, এই নীতি আফগানরা শত শত বছর যাবৎ বুকের তাজা রক্ত দিয়ে পালন করে এসেছে। আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা শক্তিশালী এই চেতনা এবং প্রাচীন আমলের গোত্রীয় যুদ্ধপদ্ধতি ব্যবহার করে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল।

একজন ইতিহাসবিদের ভাষ্যমতে, আফগান মুজাহিদদের কাছে অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ছিল। শীতকালের তীব্র শীত থেকে বাঁচতে শরীরে তাঁরা একধরনের পশমি চাদর প্যাঁচিয়ে রাখতেন; অথবা বারুদ ভরতি একটি পাত্র কাপড়ে প্যাঁচিয়ে বুকে বেঁধে রাখতেন। পুরানো যুগের লম্বা নলের বন্দুক ছিল তাঁদের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র! সম্মুখযুদ্ধের জন্য তাঁরা ব্যবহার করতেন তরবারি ও ধারালো খঞ্জর। এ দুটি অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁরা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। পৃথিবীর কারও সাধ্য ছিল না, সম্মুখযুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে।

অপরদিকে ইংরেজদের প্রতিটি বিজয়ের পেছনে একমাত্র অবদান রেখেছিল তাদের তোপ-কামান। তা না হলে সম্মুখযুদ্ধে তারা কখনো আফগানদের পরাজিত করতে পারেনি। খাবারের জন্য প্রত্যেক মুজাহিদের কাছে চামড়ার একটি ছোট্ট থলি থাকত। এই পাত্রে শুষ্ক রুটি ও কিছু সবজি তারা সংগ্রহ করে রাখতেন। পানির একটি মশক ঝোলানো থাকত প্রত্যেক মুজাহিদের কোমরে। ঘোড়া ও খচ্চরের জন্য ঘাস অথবা বুট তাঁরা নিজেদের খাবারের পাত্রে জমা করে রাখতেন। ধারাবাহিক কয়েকদিন তাঁরা একটানা পাহাড়ি পথে সফর করতে পারতেন। এ সময় ক্লান্তি তাঁদের স্পর্শ করতে পারত না। ইংরেজদের সামরিক কনভয় অথবা কোনো ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা করে বাতাসের বেগে হারিয়ে যেতে পারতেন তাঁরা।

ইংরেজ ইতিহাসবিদ লেডি সেইল—যিনি আফগান ও ইংরেজদের যুদ্ধগুলো সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন—তিনি লেখেন,

> *সম্মুখযুদ্ধে আফগান যুবকরা ইংরেজ সেনাদের ওপর ঠিক সেই গতিতে হামলে পড়ত, যেভাবে বকরির পালের ওপর একটি ক্ষুধার্ত বাঘ হামলে পড়ে।*

আফগান মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি ছিল তাঁদের অব্যর্থ নিশানা। তাঁরা

৪০০-৫০০ গজ দূর থেকে অব্যর্থ নিশানায় ইংরেজদের ঘায়েল করতে পারতেন। বেশ কিছু যুদ্ধে মুজাহিদরা শত শত গুলি নিক্ষেপ করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে সময়ে একটি গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তাদের পুরানো যুগের বন্দুকগুলো দিয়েও তাঁরা ইংরেজদের আধুনিক বন্দুকের মোকাবিলা করতেন। মুজাহিদদের কিছু কিছু দলের কাছে ছোট ছোট কামান গনিমত হিসেবে এসেছিল।

পরবর্তীকালে তাঁরা ইংরেজদের কয়েকটি বড় কামান লুট করতে সক্ষম হন। এই কামানগুলো সামনে রেখে দক্ষ অস্ত্রকারিগররা মুজাহিদদের ছোট ছোট কামান তৈরি করে দিয়েছিলেন। এগুলো দিয়ে তাঁরা পাহাড়ের চূড়া থেকে ইংরেজদের ওপর গোলা নিক্ষেপ করতেন। তবে এ জন্য তাঁদের অমানুষিক শ্রম ব্যয় করে কামানগুলো পাহাড়ের উপর নিয়ে যেতে হতো। জেনারেল এরি আফগান মুজাহিদদের নিশানা-দক্ষতা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন, 'ইংরেজ সেনাদের উচিত, আফগান যোদ্ধাদের কাছ থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করার বিদ্যা রপ্ত করা! আফগান যোদ্ধারা বুঝেশুনে গোলা নিক্ষেপ করে থাকে। অযথা গোলাগুলি তারা কখনো করে না; অথচ আমাদের সেনারা চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো গুলি ছুড়তে থাকে। তাদের কামানের গোলাগুলো অধিকাংশ সময় নিরপরাধ পশুপাখি, গাছপালা ও পাহাড়ে আঘাত হেনে থাকে।'

আফগান নারীদের জিহাদি জজবা

এসব যুদ্ধে মুজাহিদদের সঙ্গে নারীরাও অংশ নিতেন। নানাভাবে তাঁরা এসব যুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন। মুজাহিদদের জন্য খাবার, পানি, রসদ এবং আহতদের চিকিৎসায় এই নারীরা সাহায্য করতেন। গেরিলা মুজাহিদদের জন্য তাঁরা তাঁদের ঘরগুলো সবসময় উন্মুক্ত রাখতেন। ইংরেজ সেনারা কখনো যদি লড়াইয়ের ময়দানে পিছু হটে কোনো মহল্লা অথবা বসতিতে এসে পৌঁছাত, তখন নারীরা ঘরের ছাদে উঠে ছাউনি তৈরি করে ফেলতেন। এরপর সেখান থেকে পাথর, গরম পানি ইত্যাদি তাদের ওপর নিক্ষেপ করতেন। তাদের জুলুম-অত্যাচার এবং পদে পদে ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো কোনো কিছুই এই বীরাঙ্গনা নারীদের ইংরেজবিরোধিতা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

আফগান মুজাহিদরা এ যুদ্ধে তাঁদের শতবর্ষী পুরানো গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতির সফল ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা খোলা ময়দানে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করে থাকা ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না; বরং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ইংরেজবাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা করতেন। এরপর ইংরেজ সেনারা হামলাকারী মুজাহিদদের পেছনে ছুটতে থাকলে অপর একটি দল এসে আবারও তাদের পেছন থেকে হামলা করত। এভাবে ক্লান্তিকর দীর্ঘ যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদের পরাজিত অথবা

বাধ্য হয়ে নিরাপদ অবস্থানে ফিরে আসতে হতো। মুজাহিদরা কখনো দুয়েকদিনের জন্য যুদ্ধে নামতেন না; বরং ধারাবাহিকভাবে কয়েক সপ্তাহের প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ শুরু করতেন। গেরিলা যোদ্ধাদের পিছু ধাওয়া করার সময় ইংরেজরা বুঝতেই পারত না, তারা কোন দলকে ধাওয়া করছে। মূলত একটি দলকে অবরুদ্ধ করতে দ্রুত ধাবমান ইংরেজবাহিনীকে মুজাহিদদের কয়েকটি দল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলত। হিন্দুকুশের সুবিশাল পর্বতশ্রেণির প্রতিটি চূড়া ও গিরিখাত ছিল মুজাহিদদের নখদর্পণে; কিন্তু ইংরেজদের জন্য হিন্দুকুশ ছিল মৃত্যু-উপত্যকার অপর নাম।

দেখা যেত মুজাহিদদের একটি দলের পিছু ধাওয়া করতে করতে ইংরেজবাহিনী এমন একটি পাহাড়চূড়া অথবা গিরিখাতে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখান থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। ঠিক এমন সময় চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলতেন মুজাহিদরা। পাহাড়চূড়ায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা বন্দুকধারীরা পাখির মতো তাদের শিকার করতেন। এ সময় এদিক-সেদিক পালানো অথবা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যাওয়া ছাড়া ইংরেজ সেনাদের কোনো গত্যন্তর থাকত না। শীতকালে মুজাহিদরা পাহাড় থেকে নেমে বসতিগুলোতে পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতেন। বরফ গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবউদ্যমে শুরু হতো নতুন বছরের বসন্তকালীন অভিযান।

কামানের মোকাবিলায় তরবারি

গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের ভূমি ইংরেজদের জন্য মৃত্যুকূপে পরিণত হতো। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল। কালাত অঞ্চলে গুলজাই গোত্রের সরদার গুল মুহাম্মাদ খান ইংরেজদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মাস্টার লিচকে কান্দাহার থেকে অপহরণ করেন। জেনারেল নট অশ্বারোহীবাহিনীর সঙ্গে কামানসহ তাকে মুক্ত করতে অভিযানে বের হয়। গুলজাই গোত্রের অসমসাহসী যোদ্ধারা উন্মুক্ত তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে ইংরেজদের কামানের সামনে এসে উপস্থিত হন। দু-পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে যায়। ইংরেজদের কামানের আঘাতে মুজাহিদদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়; কিন্তু তাদের অসম সাহসিকতা ও অনন্য বীরত্ব ইংরেজদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। এই জিহাদের নেতৃত্বদানে হেলমান্দের কাছে আলিমদের তত্ত্বাবধানে মুজাহিদদের একটি নতুন জোট গঠিত হয়েছিল। সেনাবাহিনীর পতাকায় 'হাসবিআল্লাহ' শব্দগুলো অঙ্কিত করা হয়।

এই বাহিনী মুহাম্মাদ আকরাম খানের নেতৃত্বে হেলমান্দ নদী অতিক্রম করে ইংরেজদের ওপর প্রবল আক্রমণ করে। তবে এই অভিযান সফল হয়নি। গ্রেপ্তার হন মুহাম্মাদ আকরাম খান। ইংরেজরা তাঁকে কামানের মুখে বেঁধে গোলা চালিয়ে শহিদ করে দেয়।

অসমসাহসী এক নারী

আকরাম খানের শাহাদাতের পরও গোত্রের সদস্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। আকরাম খানের স্ত্রী অত্যন্ত সাহসী নারী ছিলেন। তিনি বোরকা পরে তাঁর মুজাহিদ স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেতেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে বাহিনীর পতাকা তাঁর হাতে অর্পিত ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এসব যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। ফলে নিজ গোত্রের মধ্যে বীরঙ্গনা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি তৈরির প্রচেষ্টা

আলোচিত যুদ্ধগুলোতে কান্দাহার দক্ষিণ-আফগানিস্তানের আন্দোলনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। ইংরেজরা এখানে তাদের একটি শক্ত ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রবিনসন নামের এক অফিসারকে কান্দাহারের গোত্রীয় সরদারদের মধ্যে বিরোধ তৈরিতে কাজে লাগায়। মুজাহিদদের পরাজিত করতে ইংরেজদের শেষ হাতিয়ার ছিল এটি। তাঁদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারলেই শুধু তাদের জন্য বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে। ইংরেজ অফিসার কয়েকজন পোপলজাই সরদারকে ১ লাখ রুপি করে উপহার দেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল, বারেকজাই গোত্রের সঙ্গে আলোচ্য গোত্রের একটি বিরোধ তৈরি করা; কিন্তু ঘৃণ্য এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। উভয় গোত্রের মধ্যে আগের চেয়ে অধিক ঐক্য ও সংহতি ফিরে আসে। তারা একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অধিকহারে ইংরেজবিরোধী জিহাদে যোগ দিতে থাকেন।

গজনির যুদ্ধক্ষেত্র

১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই। গজনি ও আশেপাশের অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রগুলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে। কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ইংরেজদের চলাফেরা, রসদপ্রবাহ ও যোগাযোগব্যবস্থা সবকিছুই গজনির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই মুজাহিদরা প্রথমে গজনিকে চলাচলের অযোগ্য করে তোলেন। এতে করে ইংরেজদের রসদপ্রবাহ ও যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও গজনি ইংরেজদের অধীনে ছিল; কিন্তু নিজেদের দুর্গ ও ছাউনি থেকে বেরিয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে লড়াই করার মতো সাহস তাদের ছিল না।

ধীরে ধীরে মুজাহিদদের শক্তি বাড়ছিল। তাঁরা জুলাইয়ে তাজ মুহাম্মাদ খান ও মালিক মুহাম্মাদ খানের নেতৃত্বে গজনি অবরোধ করেন। ফলে কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যে ইংরেজরা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় মুজাহিদদের সামরিক বড় দুর্বলতা

ছিল, তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত বারুদ ও কামান ছিল না। তাঁরা কাবুলের নায়িব আমিনুল্লাহ লোগারির কাছে গজনির মুজাহিদদের জন্য গোলাবারুদ এবং দুয়েকটি কামান পাঠানোর আবেদন করেন; কিন্তু মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কাবুলের যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তাঁদের পক্ষে সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়নি। তার পরও গজনিকে পাঁচ মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখা হয়। অবশেষে আফগানিস্তানে শীতকালীন মৌসুম এসে পড়ে।

গারদেজের যুদ্ধক্ষেত্র

এ বছর শীতকাল এসে গেলেও মুজাহিদদের কর্মতৎপরতা থেমে ছিল না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, এ বছর তুষারপাত শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা যেভাবেই হোক আফগানিস্তান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে ছাড়বেন। এ ছাড়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, গারদেজের দুর্গ মুজাহিদরা দখল করে ফেলেছেন। জেনারেল ম্যাকনাটন তখন তিনজন দুর্ধর্ষ ইংরেজ অফিসারের অধীনে কমান্ডো বাহিনী নিয়ে কাবুল থেকে বেরিয়ে পড়ে। গারদেজ পৌঁছে তারা দুর্গ অবরোধ করলে মুজাহিদরা অবরুদ্ধ থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ইংরেজবাহিনী শহর দখলের চেষ্টা করতে থাকে; কিন্তু মুজাহিদরা কোনো সুযোগ দেননি। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ১৭ অক্টোবর ইংরেজরা কাবুলে ফিরে যায়।

কাবুলের সার্বিক অবস্থা

এদিকে কাবুলের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত থমথমে। বিখ্যাত মুজাহিদ নেতা মির মাসজিদি খান আবারও ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়ক অবরোধ করে বসেন। ১৯ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজরা অভিযানে বের হয়। লেফটেন্যান্ট ড্যানি একটি বাহিনীসহ খরদ গিরিপথের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে মুজাহিদরা ছাউনি তৈরি করে অপেক্ষমাণ ছিলেন। ঠিক তার পেছনে জেনারেল সেইল বাকি ইংরেজ সেনাদের নিয়ে কামান-গোলাসহ এগিয়ে আসে। মুজাহিদরা তখন কিছুটা অবরুদ্ধ অবস্থায় অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধ প্রদর্শন করেন। জেনারেল সেইলসহ বড় বড় অফিসার মারাত্মক আহত হয়। কয়েক ডজন ইংরেজ সেনাও নিহত হয় এ দিন।

একই সপ্তাহে কাবুলে অবস্থানকারী মুজাহিদরা কাবুলে সর্বজনীন আক্রমণ করেন। এতে করে ইংরেজরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়। চতুর্দিক থেকে ধারাবাহিক আক্রমণে তারা এ পর্যায়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুজাহিদদের সঙ্গে তারা আলোচনার জন্য একমত হয়। তাদের প্রতিনিধি মুজাহিদদের কাছে এসে সন্ধির জন্য আবেদন করতে থাকে; কিন্তু মুজাহিদরা কোনোভাবেই সন্ধির পক্ষে রাজি ছিলেন না। তবে ইংরেজদের

কিছুটা চাপে ফেলতে তাঁরা সরাসরি উত্তর না দিয়ে জানান, 'এ ব্যাপারে আগামী দিনে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব।' এরই মধ্যে মুজাহিদদের আক্রমণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। কাবুলে ইংরেজদের গোলাম আফগানদের জন্য টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। শাহ সুজাসহ ইংরেজদের শত শত তল্পিবাহক কাবুল ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

সম্মিলিত জোট গঠন

মুজাহিদদের পৃথক পৃথক দলগুলো তখন বুঝতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং মতের মিল থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি সম্মিলিত জোট গঠিত হলে জিহাদ পরিচালনা করা তাঁদের জন্য সহজ হবে। সবার ঐকমত্যে একটি জোট গঠন করে অভিজ্ঞ সরদারদের নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। সমগ্র আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কর্মতৎপরতা এই নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এই জোটের নেতৃবৃন্দ। মূলত এমন কোনো একক ব্যক্তিত্ব তখন মুজাহিদদের মধ্যে ছিলেন না, যার অধীনে সবাই একত্রিত হতে পারতেন। এ জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সম্মিলিত শুরা, যারা সমগ্র আন্দোলনকে পরামর্শক্রমে নিয়ন্ত্রণ করবেন। এমন একটি প্রস্তাবে সবাই একমত হন।

রমজান চলে এসেছিল। দেশজুড়ে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে কাবুল ও আশেপাশের শহরে একের পর এক গোপন বৈঠক করতে থাকেন। নভেম্বর মাস শুরু হয়ে যায়। সৌরবছরের ঋতুবদলের ফলে এ সময় স্বাভাবিকভাবেই আফগানিস্তানে শীত থাকে। জনগণ শীতের রমজান অত্যন্ত আরামের সঙ্গে পালন করছিল। জিহাদি কর্মতৎপরতাও চলছিল সমানতালে। ঠিক এ সময় পহেলা নভেম্বর ১৮৪১ কাবুলের কোচা বাগ নবাব এলাকায় সারা দেশের মুজাহিদ আমিরগণ একত্রিত হন।

১৬ রমজান। সে দিন ইংরেজরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, কাবুলের নগরফটক, চৌরাস্তা ও প্রতিটি জায়গায় কড়া তল্লাশি থাকার পরেও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশ থেকে একত্রিত হয়ে কাবুলের একটি এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে শলাপরামর্শে নিয়োজিত হয়েছেন। দীর্ঘ পরামর্শের পর নেতাদের একটি তালিকা গৃহীত হয়, যারা দেশজুড়ে পরিচালিত জিহাদি আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করবেন। এ তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাবুলের মির মাসজিদি খান কোহিস্তানি, নবাব মুহাম্মাদ জামান খান, শাহজাদা আকবর খান, সরদার উসমান খান, মোল্লা মুমিন গুলজাই, সিকান্দার খান, মোল্লা আহমাদ, খান শিরিন জাওয়া শের, মির জুনায়েদ কাবুলি, মুহাম্মাদ হাশিম কাহ ফারোশ, দরবেশ খান, আবদুস সালাম খান পোপলজাই, মির হাজি মাসুম ইবনু মির ওয়াইজ রুহানি ও শামসুদ্দিন খানের মতো বিখ্যাত ব্যক্তি। আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে মির্জা আহমাদ কান্দাহারি, আতা মুহাম্মাদ খান কান্দাহারি, গুল মুহাম্মাদ গুলজাই,

তাজ মুহাম্মাদ গজনবি, সাইয়িদ হাশিম কুনারি ও সাদাত খান লালপুরির মতো মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এই কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। দুরদুরান্ত থেকে বার বার নেতৃবৃন্দের একত্রিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। এ কারণে এই পরামর্শসভায় নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে ১২ জনকে উচ্চ কাউন্সিলের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই ১২ জন নেতা সমগ্র কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণ করবেন। কাউন্সিলের প্রধান নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হয় সরদার আতা মুহাম্মাদ খানকে। তিনি মুলত সাবেক আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের ভাতিজা ছিলেন। তাঁর সহকারী নির্বাচিত করা হয় বিখ্যাত আমির আমিনুল্লাহ লোগারিকে। প্রথমজনকে 'নওয়াব' আর পরেরজনকে 'নায়িব' উপাধি প্রদান করা হয়।

জিহাদি প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত

কাউন্সিলে পরামর্শসভায় সিদ্ধান্ত হয়, নায়িব আমিনুল্লাহর অধীনে ১০ হাজার মুজাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। অন্যান্য অঞ্চলের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ মুজাহিদ দলকে সামরিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, নতুন অস্ত্রের জোগান, মুজাহিদদের রসদ সরবরাহ ও যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিটি দলের জন্য একজন আমির ও একজন সহকারী নিযুক্ত করা হয়।

শত্রুদের ভেতরে প্রবেশ করে তথ্যসংগ্রহের জন্য শক্তিশালী একটি গোয়েন্দাবাহিনী তৈরি করা হয়। আলিমগণের একটি দাওয়াতি জামাআতও প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল, জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের কূটচাল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং এই সমস্যা সমাধানে ইসলামি জিহাদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলা। পাঞ্জশিরের মুজাহিদদের একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা দুর্গের বাহির ও ভেতর থেকে লড়াইয়ের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। এমনকি দুর্গের দেয়াল কীভাবে টপকে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়, এ বিষয়ে তাঁরা ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এ জন্য তাঁদের বাহিনীকে এই কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয়।

ইংরেজদের যোগাযোগমাধ্যম অর্থাৎ, চিঠিপত্র চলাচলের রাস্তায় ধরে ফেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে এর অনুবাদ করতে একদল মুজাহিদকে প্রশিক্ষিত করা হয়। কাউন্সিলের নেতাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তাঁরা মুজাহিদদের মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক ডিভিশনকে আলাদা আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। আরও সিদ্ধান্ত হয়, রমজানেই শত্রুদের সেনাফাঁড়ি এবং ছোট ছোট দুর্গতে ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু করতে হবে। তাদের যোগাযোগ ও রসদপ্রবাহের সকল পথ অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে। এরপর

শত্রুদের প্রতিটি দলকে মুজাহিদরা নিজের অঞ্চলে গিলে ফেলবেন। পরামর্শসভার শেষ সিদ্ধান্ত ছিল, ধারাবাহিক এই আক্রমণের প্রথম আক্রমণ বড় আকারে করতে হবে। লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচিত হয় কাবুল শহর। এখানে সরকারি মহলগুলোতে থাকা ইংরেজ কর্মকর্তা ও সেনাপতিদের ওপর প্রথম বড় হামলা করা হবে।

কাবুলের বিপ্লব

১৭ রমজান ১২৫৭—২ নভেম্বর ১৮৪১। এ দিনটি একটি নতুন সূর্য নিয়ে আফগানিস্তানে উদয় হয়েছিল। সূর্যকিরণের প্রতিটি ছটাই বলে দিচ্ছিল, আজকের দিনটি অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছুটা ভিন্নরকম হতে চলেছে। জিহাদের সেই আগুনের ঝলক আজ কাবুলে ইংরেজদের শক্তিশালী কেন্দ্র ধ্বংস করতে তৈরি হয়েছিল। সে দিন কাবুলের প্রতিটি মসজিদ থেকে 'আল জিহাদ আল জিহাদ' স্লোগান ভেসে আসছিল। কাবুলের সব বাজার ও গলি স্থানীয় জনগণ আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু পদাতিক ও অশ্বারোহী মুজাহিদদের চলাফেরা নজরে পড়ছিল। মাঝেমধ্যে তাঁরা তকবিরধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিলেন।

মুজাহিদদের কাছে ছোট ছোট ছয়টি কামান ছিল। ধীরে ধীরে তাঁদের কাফেলা কাবুলের একটি নির্দিষ্ট এলাকার দিকে এগিয়ে যায়। এখানে একটি সরকারি মহলে বসবাস করত ইংরেজ জেনারেল আলেকজান্ডার বার্নিস। মহলের চারপাশ ছিল সুউচ্চ দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালে অবস্থানরত ইংরেজ সেনারা মুজাহিদদের এগিয়ে আসতে দেখে থামতে বলে। যখন পরিস্থিতি বেগতিক মনে হয়, তখন গুলি ছুড়তে শুরু করে; কিন্তু মুজাহিদদের থামিয়ে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। প্রথমে হাসান খান অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টির মধ্যেও মহলের ভেতর প্রবেশে সক্ষম হন। তাঁর পেছনে খিজির খান এবং অন্য মুজাহিদরা ভেতরে প্রবেশ করেন। আমিনুল্লাহ খান লোগারি সরাসরি এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ অফিসার আলেকজান্ডারকে গ্রেপ্তার করে ফেলেন মুজাহিদরা। বন্দি অবস্থায় সে চোখ বন্ধ করে মুজাহিদদের সামনে বসে পড়ে।

এর কিছুক্ষণ পর কাবুলের বাসিন্দারা শহরের প্রধান সড়কের চৌরাস্তায় আলেকজান্ডারের কর্তিত লাশ ও মাথা ঝুলে থাকতে দেখে। আলেকজান্ডারের ভাই চার্লসও এই আক্রমণে নিহত হয়। ইংরেজ অফিসার ব্রাডফোর্ড মারাত্মক আহত হয়। ইংরেজদের নিকৃষ্টতম তল্পিবাহক মোহনলাল পলায়নরত অবস্থায় ধরা পড়ে। যখন তাকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে কাঁপতে কাঁপতে কালিমা পড়তে শুরু করে। মুজাহিদরা মৃত্যুশয্যার তার এই কালিমা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন

না; কিন্তু শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এই মুহূর্তে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁরা পরে তাকে খান শিরিন খানের হাতে সোপর্দ করেন।

এক ইংরেজ অফিসারের ইসলাম গ্রহণ

সে দিন মুজাহিদদের বেশ কয়েকটি দল ইংরেজদের প্রায় ডজনখানেক সরকারি মহলে হানা দিয়েছিল। মহলগুলো তছনছ করে দেওয়া হয়। ইংরেজদের শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল ম্যাকনাটন এই হামলায় এত ভয় পেয়ে যায় যে, সে তার স্থায়ী আবাস বালা হিসার দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর কেল্লা বিবি মাহরু নামে একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। ইংরেজ অফিসার জেনারেল ক্যামিবল—যার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা সমগ্র ইংল্যান্ডে প্রসিদ্ধ ছিল—বাহিনীসহ কাবুল থেকে পালানোর সময় নারীরা ছাদ থেকে পানি ও পাথর নিক্ষেপ করে তাদের বিপর্যস্ত করে ফেলেন। মুজাহিদরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ৭০০ সেনাকে কচুকাটা করেন। জেনারেল ক্যামিবল অবরোধের মধ্যে পড়ে যায়। এ সময় সে জোরে জোরে কালিমা পড়তে থাকে! তাঁরা তাকে অসহায় পেয়ে ক্ষমা করে দেন।

শাহ সুজার অসহায়ত্ব

প্রথমদিন শাহ সুজা কাবুলের এই বিপ্লবকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি তার আপন মহলে বিলাসিতায় মগ্ন ছিলেন। প্রচন্ড শোরগোল ও বিশৃঙ্খলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য লোক পাঠান। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় তিনি পুত্র শাহজাদা তাইমুরকে জনগণের কাছে পাঠান। তার আদেশ ছিল, জনগণ যেন মুজাহিদদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে। শাহজাদা তাইমুর বাইরে এসে বুঝতে পারেন, এটি কোনো সাধারণ গণজমায়েত নয়; এ তো গণবিপ্লব! মুজাহিদরা ইংরেজদের ইঁদুরের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। পলায়নরত ইংরেজ সেনারা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তাইমুর বুঝতে পারেন, মুজাহিদদের গতিরোধ করা কোনোভাবেই ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে এই বিপ্লব থেকে ফিরে আসার বদলে আরও উৎসাহ দেওয়া উচিত। এ জন্য তিনি এগিয়ে গিয়ে মুজাহিদ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের অনুরোধ করেন, যেন এই বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজদের নামনিশানা আফগানিস্তানের মাটি থেকে মুছে ফেলা হয়। এরপর তিনি সুবোধ বালকের মতো আবার শাহি মহলে ফিরে আসেন। মূলত শাহজাদা যদি মুজাহিদদের সঙ্গে এভাবে ইতিবাচক আচরণ না করতেন, তাহলে হয়তো তার নিজেরই ক্ষতি হয়ে যেত।

৩ নভেম্বর মুজাহিদরা কাবুলের বিখ্যাত দুর্গ চাহার বাগ, নিশান খানসহ কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা দখল করে সেখানে সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। পরদিন মধ্যরাতে মাহমুদ খান দুর্গ তাঁদের দখলে চলে আসে। ইংরেজরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে পাগলের মতো কাবুল ছেড়ে পালাচ্ছিল। এদিকে মুজাহিদরা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের গুদামগুলো একে একে বুঝে নিচ্ছিলেন। এভাবে সমগ্র কাবুলের ওপর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ এসে যায়।

শাহ সুজার প্রভাব এবং কাবুলের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ তখন ছিল না বললেই চলে। এই বিপ্লবে তার কোনো অংশ ছিল না; বরং সবাই জানত যে, তিনি ইংরেজদের তল্পিবাহকমাত্র। কাবুল প্রশাসনের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীলরা তার প্রতি এতটুকু দয়া প্রদর্শন করেন যে, তার কোনো ক্ষতি করেননি; কিন্তু মুজাহিদরা সমগ্র শহরে নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সকল চাকর-গোলাম নিজ থেকেই মহল থেকে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এরপর তারা সবাই একত্রিত হয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে যোগদান করে।

মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা

ইংরেজরা মুজাহিদদের কাবুল দখল করতে দেখে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। ইংরেজদের তল্পিবাহক মোহনলাল—যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল—এ সময় খান শিরিন খানের পাশে অবস্থান করছিল। মূলত সে তার গোপন মিশন নিয়েই এখানে এসেছিল। ইংরেজ অফিসার জন কেনলি মোহনলালকে গোপনে চিঠি পাঠাত। এবার তার প্রতি নির্দেশনা ছিল, খান শিরিন খানকে যেভাবেই হোক প্ররোচিত করতে হবে। তাকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে ১ লাখ রুপি প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তার দায়িত্ব শুধু মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা।

মোহনলাল খান শিরিন খানকে বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়; কিন্তু খান শিরিন খান কোনোভাবেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করে নিজের ইমান নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না। তিনি সরাসরি অস্বীকৃতি জানান। ইংরেজরা এরপর একই পদ্ধতিতে সকল মুজাহিদ নেতাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দিতে থাকে; কিন্তু মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। তাদের মধ্যে কোনো ধরনের ফাটলও তৈরি হয়নি। গুলজাই সরদাররা ইংরেজদের এসব প্রস্তাবের জবাবে সরাসরি বলে দেন, 'আমরা ইতিমধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি, আফগানিস্তান থেকে তোমাদের বিতাড়িত করেই আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ব।'

গোপনে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের হত্যা

ইংরেজদের শেষ প্রচেষ্টা ছিল, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে কোনোভাবে আলোচনার টেবিলে

নিয়ে আসা; কিন্তু মুজাহিদরা কোনো ধরনের আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না। তখন ইংরেজদের অবস্থা হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের অধিকাংশ অফিসার বালা হিসার দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। অন্যান্য ইংরেজ নেতা বিবি মাহরুর শক্তিশালী দুর্গে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নেয়। কান্দাহার ও গজনি থেকে কোনো সাহায্যের আশা করাও তাদের জন্য সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা, মুজাহিদরা কাবুলকে সমগ্র আফগানিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। এ সময় শুধু হিন্দুস্থান থেকেই রসদ ও সাহায্য আসা সম্ভব ছিল। এ জন্য ইংরেজরা হিন্দুস্থান থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় কালক্ষেপণ করতে থাকে। একইসঙ্গে তারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি অথবা দুর্বলতা সৃষ্টির জন্য দিনরাত চিন্তাভাবনা ও শলাপরামর্শ করতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ পরামর্শের পর তারা একটি নতুন পরিকল্পনা পেয়ে যায়।

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাউকে তল্পিবাহক হিসেবে দলে ভেড়াতে না পেরে এবার তারা মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে। ইংরেজরা এমন কিছু মানুষ পেয়ে যায়, যারা অর্থের বিনিময়ে গাদ্দারির জন্য প্রস্তুত ছিল। ইংরেজরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে। মুজাহিদদের শীর্ষ নেতাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলতে হবে। এই মুনাফিক সরদারদের একজন ছিল মুহাম্মাদুল্লাহ। সে ইংরেজদের বেতনভোগী হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদ নেতা মির মাসজিদি খানকে হত্যার দায়িত্ব নেয়। মির সাহেব তখন অসুস্থ ছিলেন। মুহাম্মাদুল্লাহ অত্যন্ত গোপনে তাঁর খাবারে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে শহিদ করে দেয়। এভাবে একজন কেন্দ্রীয় নেতা থেকে মুজাহিদরা মাহরুম হয়ে পড়েন।

আরেকজন গাদ্দার সরদার আবদুল আজিজ ইংরেজদের পক্ষ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে আবদুল্লাহ খান আচাকজাইয়ের মতো বিখ্যাত মুজাহিদ নেতাকে পেছন থেকে গুলি করে শহিদ করে দেয়; অথচ এ সময় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অসম সাহসিকতার সঙ্গে বিবি মাহরু দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। একইভাবে পাইন্দা খান নামের একজন সরদার ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর সে মুজাহিদদের একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে জালালাবাদে গুলি করে শহিদ করে দেয়।

নতুন নেতৃত্ব

ধারাবাহিক এই গোপন হত্যাকাণ্ডগুলোর মাধ্যমে মনে হচ্ছিল, ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সকল মুজাহিদ নেতা গাদ্দারদের হাতে শহিদ হয়ে যাবেন; কিন্তু ঠিক এ সময় মুজাহিদদের মধ্যে নতুন কিছু নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্র। বহু বছর ধরে তিনি নির্বাসনে

ছিলেন। বুখারার আমির নাসরুল্লাহর বন্দি হিসেবে তিনি কষ্টকর সময় অতিবাহিত করেন। বেশ কজন বুজুর্গের অনুরোধে তাঁকে বুখারার আমির মুক্ত করে দেন। মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানের পথ ধরেন তিনি। পথিমধ্যে বলখ, বামিয়ান এবং ঘুর প্রদেশের বেশ কজন সরদার তাদের সশস্ত্র বাহিনীসহ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন। অবশেষে তিনি কাবুলে পৌঁছে যান। এই সময় বিখ্যাত সরদার মুহাম্মাদশাহ গুলজাই একটি বড় দলের সঙ্গে কাবুলে এসে পৌঁছান। এভাবে মুজাহিদদের মধ্যে তৈরি হওয়া নেতৃত্বশূন্যতা কিছুটা হলেও পূরণ হয়ে যায়।

ইংরেজদের অসহায়ত্ব

ইংরেজদের উচ্চপদস্থ অফিসার জেনারেল ম্যাকনাটন এ সময় আফগানিস্তানের ইংরেজবাহিনীর সাধারণ কমান্ডার ছিল। সে বিবি মাহরু দুর্গের সুউচ্চ দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। অস্ত্রসমর্পণ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তার। কেননা, শেষ তথ্য অনুযায়ী, হাজার হাজার মুজাহিদ তুফানের গতিতে বালা হিসার ও বিবি মাহরু দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ইংরেজ অফিসাররা দুর্গের ভেতর থেকে চারপাশের পাহাড়ে মুজাহিদদের চলাফেরা ও কার্যক্রম সরাসরি লক্ষ করছিল। এদিকে মুজাহিদদের নেতৃত্ব এখন আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্র ও অন্যান্য অসমসাহসী সরদারের হাতে চলে এসেছিল। মুজাহিদদের সামরিক শক্তিতে নিঃসন্দেহে এটি ছিল শক্তিশালী সংযোজন। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এ সময় ভাবছিলেন, যেহেতু দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্র ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশই এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, তাই পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতা ও কাবুলের শাসক হিসেবে দোস্ত মুহাম্মাদ খানকেই নির্বাচিত করতে হবে। এ সময় তিনি ইংরেজদের হাতে হিন্দুস্থানে বন্দি হিসেবে অবস্থান করছিলেন। শেষ প্রস্তুতি হিসেবে মুজাহিদরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র, কামান, রসদসহ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় ইংরেজদের পক্ষ থেকে সংবাদ আসে, তারা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত।

সন্ধিচুক্তি

ইংরেজ জেনারেল ম্যাকনাটন প্রাণ বাঁচিয়ে কোনোভাবে আফগানিস্তান থেকে পালাতে চাইছিল। তার প্রতিনিধিরা মুজাহিদদের কাছে এসে জানায়, 'ইংরেজদের সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে। আর কখনো তারা আফগানিস্তানে আক্রমণের জন্য আসবে না; কিন্তু যদি আফগান শাসক তাদের সহায়তা কামনা করে, তাহলে ভিন্ন কথা। শাহ সুজা ইংরেজদের অধীনে থেকে নিজেকে নিরাপদ

ভাবতেন, এ জন্য তাকে লুধিয়ানায় ইংরেজদের অধীনে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে আফগান প্রশাসন প্রতিবছর তাকে ১ লাখ রুপি প্রদান করবে। এটা তার সম্মানার্থে এবং পারিবারিক ব্যয়নির্বাহের জন্য। এর বিনিময়ে আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে পুনরায় কাবুলে পাঠানো হবে।'

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের এই শর্তগুলো নির্দ্বিধায় মেনে নেন। তবে তারা বেশ কিছু শর্তও সংযোজন করেন। যেমন : ইংরেজরা তাদের সব অস্ত্র এবং ছয়জন অফিসারকে মুজাহিদদের কাছে জামানত হিসেবে আপাতত রেখে যাবে। শাহ সুজা নিজেও মুজাহিদদের কাছে থাকবেন, যতক্ষণ আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার পরিবার-পরিজন এবং বংশধরসহ হিন্দুস্থান থেকে কাবুলে এসে না পৌঁছান। ইংরেজদের সকল আসবাবপত্র ও মালামাল এখানেই থাকবে। শুধু সফরের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব, রসদ ও খাদ্যদ্রব্য নিতে পারবে।

জেনারেল ম্যাকনাটনকে জানানো হয়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে মুজাহিদরা কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছেন। এ খবর শুনে তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। ১১ ডিসেম্বর সে একটি উপত্যকায় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বাধ্য হয়ে এ সময় সে মুজাহিদ নেতাদের দেওয়া সব শর্ত মেনে নেয়। দুদিন পর রেকা ও জুলফিকার দুর্গ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, রসদসহ মুজাহিদদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছয়জন ইংরেজ অফিসার—জেনারেল ট্রেভর, জেনারেল ড্র্যামন্ড, জেনারেল স্যাকনর, জেনারেল প্যাটিনজার, জেনারেল এরি ও জেনারেল ওয়ার ব্যারটন—চুক্তি মোতাবিক বন্দি হিসেবে মুজাহিদদের কাছে রেখে যায় তারা।

এ সময় একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। শাহ সুজা শান্তিচুক্তির ব্যাপারে জানার পর ইংরেজদের অধীনে হিন্দুস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানান। মুজাহিদদের কাছে প্রস্তাব পাঠান, 'আপনারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখুন।' কিন্তু ইতিমধ্যেই স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা আফগানিস্তান ছেড়ে দিতে বাধ্য। এ সময় অবরুদ্ধ ইংরেজদের এক জায়গায় একত্রিত করা হবে প্রথম সফল পদক্ষেপ। ১৪ ডিসেম্বর সরদার আহমাদ খান বালা হিসার দুর্গে অবরুদ্ধ থাকা ৫ হাজার ইংরেজ সেনাদলকে নিরাপত্তার সঙ্গে বিবি মাহরু দুর্গে জেনারেল ম্যাকনাটনের কাছে নিয়ে আসেন। পরাজিত এ বাহিনীর এখান থেকে খাইবার পাস হয়ে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তারা বেরিয়ে যেতে দেরি করছিল। তারা অজুহাত দিতে শুরু করে, এই অল্প রসদ এত দীর্ঘ সফরের জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনীয় পশুর পাল ও রসদ না হলে এত দীর্ঘ সফরে ইংরেজবাহিনী বেরোতে পারবে না।

যেহেতু চুক্তিতে ছিল পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তাদের প্রদান করা হবে, তাই

মুজাহিদরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, রসদ ও ভারবাহী পশুর পাল প্রদান করেন। খাদ্যদ্রব্য, রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি গ্রহণ এবং নতুন ৫ হাজার ইংরেজ সেনা জেনারেলের কাছে পৌঁছার পর তার মাথায় শয়তানি ভাবনা জেগে ওঠে। সে ভাবতে থাকে, এত সুবিশাল বাহিনী ও রসদ ব্যবহার করে তারা অনায়াসে আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে এক মাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে। এরই মধ্যে হিন্দুস্থান থেকে তাদের জন্য সেনাসাহায্য ও রসদ এসে পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে জাতিগতভাবে গাদ্দারির বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে গিয়ে সে আবারও মুজাহিদদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে বসে। নতুন একটি আলোচনার দ্বার উন্মোচন করার চেষ্টা করে সে।

সে জানত, দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্র শাহজাদা মুহাম্মাদ আকবর খান—পরবর্তীকালে তিনি উজির আকবর খান নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন—একজন উদীয়মান তরুণ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। জেনারেল অনুভব করে, তার মাধ্যমে হয়তো ইংরেজরা স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। এই চিন্তা থেকেই আকবর খানকে একাকী আলোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়। আকবর খান নিজে না গিয়ে তার বিশিষ্ট জেনারেল সরদার আহমাদ খানকে পাঠান। জেনারেল ম্যাকনাটন একটি গোপন চিঠির মাধ্যমে তার সঙ্গে একটি গোপন চুক্তির প্রস্তাব পেশ করে। গোপন এ প্রস্তাবটি মুজাহিদদের জন্য অত্যন্ত ভয়ানক এবং ব্যক্তিগতভাবে শাহজাদা আকবর খানের জন্য কঠিন পরীক্ষা হিসেবে আবির্ভূত হয়। চুক্তিনামায় নিম্নলিখিত শর্ত লেখা ছিল,

- খাইবার পাস থেকে বোলান পাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ পূর্ব-আফগানিস্তান শাহ সুজার অধীনে দিয়ে দিতে হবে। এই অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন সরদার মুহাম্মাদ আকবর খান।
- আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে কাবুল পৌঁছে দেওয়া হবে। কাবুল, পশ্চিম ও উত্তর-আফগানিস্তান তিনি শাসন করবেন। এই সমগ্র অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পিতাপুত্র মিলে পরে নির্ধারণ করে নিতে পারবেন।
- নতুন এই আফগান প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর ইংরেজরা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আর কোনো হস্তক্ষেপ করবে না।
- মুহাম্মাদ আকবর খানকে ১২ লাখ রুপি অনতিবিলম্বে প্রদান করা হবে। এরপর প্রতিবছর ২ লাখ রুপি সম্মাননা হিসেবে প্রদান করা হবে।
- মুহাম্মাদ আকবর খান মুজাহিদদের নায়িব আমিনুল্লাহ লোগারিকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবেন। অন্যান্য মুজাহিদ নেতাকে কাবুল থেকে বিদায় করে দিতে হবে তাকে।

আকবর খান এই ষড়যন্ত্রমূলক গোপন চিঠি অত্যন্ত পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিতে পাঠ করেন। যদি তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ সামনে রেখে জাতিগত ও ধর্মীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছা করতেন, তাহলে জেনারেল ম্যাকনাটনের তির অব্যর্থ লক্ষ্যে পরিণত হতো। জিহাদি আন্দোলন আফগানিস্তান থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ তাআলা যুবক নেতা আকবর খানকে আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করেছিলেন। অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মেধার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। কিন্তু মেধা, প্রজ্ঞা এবং বিবেচনায় বড় বড় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হতো। তিনি ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলে তাদেরকেই পিষে ফেলতে মনস্থ করেন।

ইংরেজদের গোপন চিঠির জবাবে তিনি সরকার আহমাদ খানকে এ কথা বলে পাঠান যে, 'আকবর খান আপনাদের প্রস্তাবটি পছন্দ করেছে। তবে ইংরেজরা বরাবরই চুক্তিভঙ্গকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। সে জন্য আকবর খান আপনাদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা করছে।' জেনারেল পরবর্তী চিঠিতে জানায়, 'আলোচ্য চুক্তির ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে কোনো চুক্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটবে না। এ ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি।' প্রতিশ্রুতির প্রমাণস্বরূপ সে নিজের রিভলবার মুহাম্মাদ আকবর খানের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

আকবর খান অত্যন্ত সংগোপনে এই গোপন চিঠিগুলো মুজাহিদ নেতাদের দেখাতেন। আকবর খানের খোদাভীরুতা, আত্মমর্যাদা ও দেশপ্রেম দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। আমিনুল্লাহ খান লোগারি ও নবাব মুহাম্মাদ জামান তখন বলেন, 'ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছেও একই ধরনের প্রস্তাব ও চিঠি এসেছে।' মূলত আফগানিস্তানে বৃহত্তর ঐক্য—যা মুজাহিদরা তৈরি করেছিলেন—ইংরেজরা ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। এ জন্য তারা উচ্চপদস্থ সকল নেতাকে একই প্রস্তাব দিয়ে প্রলোভিত করার চেষ্টা করতে থাকে। আফগানিস্তানকে টুকরো টুকরো করতে এটি ছিল ইংরেজদের সবচেয়ে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের একটি। অপরদিকে মুজাহিদদের ইখলাস, আন্তরিকতা ও খোদাভীরুতার অনন্য নিদর্শন ছিল ষড়যন্ত্রের ফাঁস হয়ে যাওয়া। ইংরেজদের ধোঁকাবাজি এবং জাতিগতভাবে তাদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের বিষয়টি আবারও প্রমাণিত হয়। তখন সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জেনারেল ম্যাকনাটনকে তার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জন্য গ্রেপ্তার করা হবে। বাকি ইংরেজবাহিনীকে শুধু শক্তির জোরে আফগানিস্তান থেকে বের করা সম্ভব। কেননা, তারা আলোচনার মাধ্যমে বেরোনোর মতো জাতি নয়।

এদিকে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ আকবর খান জেনারেল ম্যাকনাটনকে আলোচনার জন্য সময় নির্ধারনের ব্যাপারে চিঠি লেখেন। ম্যাকনাটন কূটনৈতিকভাবে এত কাঁচা হাতের

মানুষ ছিল না। সে জবাবে লেখে, 'পূর্ববর্তী সন্ধিচুক্তিগুলোর কাগজপত্র আফগান সরকারের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই প্রথমে আপনি তাদের কাছ থেকে হলফনামা গ্রহণ করুন যে, তারা আগের সকল চুক্তিকে বাতিল করে আপনার করতে যাওয়া নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন।'

আকবর খান পরামর্শক্রমে আমিনুল্লাহ লোগারিসহ অন্যান্য নেতা থেকে লিখিত হলফনামা গ্রহণ করেন। আকবর খান হন তাদের আলোচনার প্রতিনিধি। এরপর অত্যন্ত সংগোপনে তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি সরদার আহমাদকে রাতের আঁধারে ইংরেজদের কাছে পাঠান। সে সময় রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। তবু জেনারেল চিঠিবাহক আহমাদকে ভেতরে ডেকে নেয়।

এ সময় সরদার আহমাদ জেনারেলকে বলেন, 'শাহজাদা আকবর খান শাহ সুজার প্রশাসনে মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য চুক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত; কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে প্রদেয় ১২ লাখের পরিবর্তে ৩০ লাখ রুপি দ্রুততম সময়ে তাকে দিতে হবে। এ ছাড়া বার্ষিক সম্মাননা হিসেবে ২ লাখ রুপিতে তার স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে; তবে ৩ লাখ রুপি হলে ঠিকঠাক চলাফেরা করতে পারবেন। অতএব, আপনাদের ৩ লাখ রুপি দিতে হবে।'

জেনারেল ম্যাকনাটন উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে আনন্দে উল্লাস করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে সে সরদার আহমাদের হাতে তুলে দেয়। এ-ও বলে, 'বিস্তারিত আলোচনা আগামীকাল সকালে বিবি মাহরু ও মাহমুদ খান দুর্গের মধ্যস্থলে সংঘটিত হবে।'

সরদার আহমাদ চলে যেতেই জেনারেল দিবাস্বপ্নে কাবুলি পোলাও-বিরিয়ানি খেতে শুরু করে। শত্রুদের মধ্যে বিভক্তি তৈরিতে সাফল্য পেয়ে তার আনন্দের কোনো সীমা ছিল না। এবার তার পরিকল্পনা ছিল, সকল নেতাকে আলোচনার টেবিলে এনে একত্রে তাঁদের হত্যা করে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন অফিসারকে ডেকে আদেশ দেয়, 'সকালে যখন আলোচনার জন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হবেন, তখন কামান নিয়ে সেনারা আশেপাশের গোপন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে। মুজাহিদদের চারদিক থেকে কামানের আওতায় নিয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে আমিনুল্লাহ লোগারির বাসগৃহের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁকে জীবিত অথবা মৃত ইংরেজদের চাই-ই চাই।'

পরদিন ইংরেজ সেনারা মাহমুদ খান দুর্গ ঘিরে ফেলবে, ঠিক এর পূর্বমুহূর্তে জেনারেল এলফিনস্টোনের কাছ থেকে একটি সংবাদ আসে। সে জানায়, 'মুজাহিদরা অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করে চলাফেরা করছেন। তাঁরা আগে থেকেই মাহমুদ খান দুর্গে কামান স্থাপন করে রেখেছেন। এই মুহূর্তে দুর্গকেন্দ্রিক কিছু করতে গেলে সেটি ইংরেজদের

জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।' জেনারেল ম্যাকনাটনের কাছে সংবাদটি অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল; তবু সে আনন্দিত ছিল। কারণ, আজ সে আফগানিস্তানকে দুই ভাগে বিভক্ত করার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

২৩ ডিসেম্বর ১৮৪১। ভোরে জেনারেল ম্যাকনাটন, ক্যাপ্টেন লরেন্স, ক্যাপ্টেন ট্রেভর ও ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জি বিবি মাহরু দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে সরদার আকবর খান, মহিউদ্দিন খান, খোদা বখশ খান ও মুহাম্মাদশাহ খান আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। সরদার আহমাদ খান ব্রিটিশ জেনারেলদের স্বাগত জানান। আকবর খান এগিয়ে এসে জেনারেল ম্যাকনাটনের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। শ্বেতাঙ্গ জেনারেল ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের জন্য লালায়িত হয়ে স্বপ্ন দেখছিল। সে এগিয়ে এসে নিজের আসনে বসে পড়ে।

আকবর খান ভারিক্কি চালে এগিয়ে এসে তার সামনে আসন গ্রহণ করেন। এরপর শুরু হয় আলোচনা। কিন্তু তাঁর শব্দ ও বাক্যগুলো জেনারেলের কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হতে থাকে। তিনি নতুন চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা ছেড়ে ইংরেজদের জুলুম-অত্যাচার, ষড়যন্ত্র ও চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে বলে যেতে থাকেন। তিনি বলেন, 'তোমরা ইংরেজরা কখনো প্রতিজ্ঞা পূরণ করো না। এ জন্য পৃথিবীতে তোমাদের কোথাও কোনো সম্মান নেই। তোমরা বিদেশিরা আফগানিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি, তাদের আপসে যুদ্ধ করানো এবং আফগানিস্তানকে সুদীর্ঘকাল শাসনের লক্ষ্যে একে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারো না।'

এরপর তিনি জেনারেলের সামনে একত্রিত করা সকল কাগজপত্র উপস্থাপন করেন। এখানে কোনোটিতে তার আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছিল, আবার কোনোটিতে অন্য নেতাদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দলে ভেড়ানোর প্রস্তাবনা ছিল। আকবর খান জেনারেলকে চরম অপমানিত করে বলেন, 'তুমি একই সময়ে আমাদের নেতাদের কাছে পৃথক পৃথক ষড়যন্ত্রের প্রস্তাব দিয়েছ। প্রত্যেককেই তুমি দেশ, ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে গাদ্দারির জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছ। প্রত্যেকের সঙ্গে তুমি ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি ও সন্ধি করার প্রস্তাব রেখেছ। এক চুক্তির সঙ্গে অন্য চুক্তির কোনো মিল নেই। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি বিষয় ছিল অপরিবর্তনীয়—আফগানিস্তানকে দু-টুকরো করে ফেলা। ইংরেজদের দীর্ঘস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করা।'

আকবর খান এভাবে দীর্ঘ ১৫ মিনিট অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে জেনারেলের সামনে একের পর এক ইংরেজদের ছলচাতুরি ও ধোঁকাবাজির ইতিহাস তুলে ধরতে থাকেন। অবশেষে আফগানিস্তানের ইতিহাসে অন্যতম অসমসাহসী নেতা জেনারেলের চুপসে যাওয়া মুখের ওপর শেষ সিদ্ধান্তমূলক বাক্যটি ছুড়ে দেন। তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে

আমরা তোমাদের আর কোনো কথা কখনো বিশ্বাস করব না। এখন শুধু একটি উপায় রয়েছে—তোমাদের আমরা বন্দি হিসেবে গ্রহণ করব, যতক্ষণ-না ইংরেজবাহিনী আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যায়।'

জেনারেল তখন লজ্জা, অপমান ও শঙ্কায় কুকড়ে গিয়েছিল। আকবর খান তাকে বলেন, 'তোমার জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তম। আফগানিস্তানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কাছে থেকে যাও।' এরপর আকবর খানের ইশারায় জেনারেল এবং অন্যান্য অফিসারকে বন্দি করে নিয়ে যায় সেনারা।

তিনি নিজে উঠে এসে ম্যাকনাটনের হাত ধরেন। এরপর তাকে কাবুলের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হন। জেনারেল কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সরদার আহমাদ খান এগিয়ে এসে শক্তভাবে জেনারেলের আরেক হাত ধরে ফেলেন।

জেনারেল ম্যাকনাটনের হত্যাকাণ্ড

ইংরেজ অফিসারদের এভাবে বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া দেখে তাদের সেনারা গুলিবর্ষণ শুরু করে। এদিকে মুজাহিদরাও আগে থেকে সতর্ক অবস্থানে ছিলেন। তাঁরাও পালটা গুলি শুরু করেন। সরদার আকবর খানের চেষ্টা ছিল, কোনোভাবে জেনারেল ও তার অফিসারদের মাহমুদ খান দুর্গ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। এতে করে তাদের জামানত হিসেবে বন্দি রেখে ইংরেজদের বিতাড়িত করা সহজ হবে; কিন্তু সমস্যা ছিল ইংরেজদের এ দুর্গটি। একদম কাছে অবস্থিত ছিল এটি। যদি কোনোভাবে ইংরেজ অফিসাররা হাত থেকে ছুটে যায়, তাহলে পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। পালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা অত্যন্ত ছুটোছুটি ও ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছিল। যদি তারা কোনোভাবে পালাতে পারে, তাহলে উলটো মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ হত্যাকাণ্ডের শিকার হবেন। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আকবর খান মুজাহিদদের ইশারা করেন। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলকে তার আরেক অফিসার ট্রেভরসহ হত্যা করে ফেলা হয়।

এ পরিস্থিতিতে ঘোড়ায় চড়ে কোনোভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় জেনারেল লরেন্স। তবে সব শেষে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জিকে জীবিত অবস্থায় মাহমুদ দুর্গে পৌঁছাতে সম্ভব হন মুজাহিদরা। সরদার মুহাম্মাদ আকবর খান মুজাহিদদের হাতে তাকে বন্দি অবস্থায় দেখে টিপ্পনী কেটে বলেন, 'আচ্ছা! তোমরাই তাহলে সেই শ্বেতাঙ্গ, যারা আমাদের দেশ দখল করতে এসেছ?'

ম্যাকনাটন আফগানিস্তানে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ একজন জেনারেল ছিল। তার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজরা বুঝতে পারে, আফগানিস্তানে অবস্থান করা তাদের জন্য কোনোভাবেই কল্যাণকর নয়। এ সময় তারা জেনারেল এলফিনস্টোন ও প্যাটিঞ্জারের নেতৃত্বে নতুন

একটি কমিটি গঠন করে। তারা আফগানিস্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে সেনাপ্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। মুজাহিদদের সঙ্গে আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো চূড়ান্ত হয় :

১. ইংরেজরা তাদের সকল সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র মুজাহিদদের কাছে জমা দিয়ে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে।

২. তারা আফগান প্রশাসনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৪ লাখ রুপি প্রদান করবে।

৩. জামানত হিসেবে বন্দি করা অফিসারদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তাদের বদলে অবিবাহিত অফিসারদের বন্দি হিসেবে পাঠানো হবে।

তৃতীয় শর্তটি শুনতে যদিও আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিল; কিন্তু ইংরেজদের কাছে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, অবিবাহিত অফিসাররা ইংরেজসমাজের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিবাহিত অফিসার। এর কারণ হলো, বিবাহিত অফিসাররা হত্যাকাণ্ড অথবা বন্দিত্বের শিকার হলে তাদের আত্মীয়স্বজন ও স্ত্রীরা সমাজে প্রচণ্ড কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করত। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় যে, ৬ জানুয়ারি ১৮৪২ ইংরেজ সেনাবহর আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে।

'তুষার হবে তাদের কাফন'

৬ জানুয়ারি ১৮৪২। দলে দলে কাবুল থেকে ইংরেজরা বেরিয়ে যাচ্ছে। সেনাপ্রত্যাহারের এই সময়ে তাদের চেহারা ও মনোভাব ছিল দেখার মতো। প্রচণ্ড হতাশা, অপমান আর পরাজয়ের গ্লানিতে পাংশু হয়ে যাওয়া তাদের চেহারা ক্যামেরাবন্দি হলে খুব ভালো হতো। গ্লানিপূর্ণ সেই পরাজয়ের অনুভূতি ধারণ করে একজন ইংরেজ অফিসার—যে কবি ছিল—লিখেছে,

যেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে পড়ে
সেখানে কিছু মানুষকে সরে পড়তে হয়
এরপর বরফের মধ্যে হয় তাদের কাফন।
এই সুজলা-সুফলা ভূমির মধ্যে প্রত্যেকটি টুকরো
তাদের পায়ের নিচে ছোট্ট জমিখণ্ডে
একজন সেনার কবর রচনার জন্য প্রস্তুত।

ফের চুক্তিভঙ্গ

কাবুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই ইংরেজরা আবারও তাদের ধোঁকাবাজি শুরু করে দেয়। চুক্তি অনুযায়ী সব অস্ত্র রেখে যাওয়ার কথা; কিন্তু তারা মুজাহিদদের কাছে

অকেজো অস্ত্রশস্ত্র ও কামানগুলো রেখে নিজেরা ভালো অস্ত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তাদের পরবর্তী স্টেশন ছিল জালালাবাদ। ইংরেজদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল জেনারেল এলফিনস্টোন। পথে সে জানতে পারে, জালালাবাদে জেনারেল সেইল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বসে আছে। পেশোয়ার থেকে সেনাসাহায্য ও রসদ এসে যাওয়ারও সম্ভাবনা প্রবল। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল এলফিনস্টোনের মাথা থেকে চুক্তির কথা উবে যায়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, জালালাবাদ পৌঁছে জেনারেল সেইলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পুনরায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে।

এদিকে মুজাহিদরাও বসে ছিলেন না। কাবুল থেকে ইংরেজরা বেরিয়ে যাওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত তারা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। জেনারেলের নিয়ত বদলে যাওয়ার বিষয়টি তারা আঁচ করে ফেলেন। এবার তারা চেষ্টা করেন, এলফিনস্টোন জালালাবাদে পৌঁছানোর আগে যেন জেনারেল সেইলের বাহিনী জালালাবাদ ত্যাগ করে। একইসঙ্গে তাঁরা জেনারেল এলফিনস্টোনকে জানিয়ে দেন, সে যেন তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অস্ত্র ও কামানগুলো মুজাহিদদের হাতে জমা দেয়। চুক্তি মোতাবিক এমনটি হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এই মুহূর্তে এসে সে বিষয়টি অস্বীকার করে বসে। ইংরেজদের পক্ষ থেকে এটি ছিল আরেকটি চুক্তিভঙ্গের ঘটনা।

আবারও শুরু হলো যুদ্ধ

পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে দেখে মুজাহিদরা জেনারেলকে জালালাবাদ পৌঁছানোর আগেই থামিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। যদি তারা তাকে জালালাবাদ পৌঁছানোর সুযোগ দেন; আর ওদিক থেকে পেশোয়ারের সেনাসাহায্য এসে পড়ে, তাহলে খুব সহজেই তারা জালালাবাদকে একটি বিরাট সেনাক্যাম্পে বানিয়ে ফেলবে। মুজাহিদদের জন্য এই বাহিনীর মোকাবিলায় তখন আরও কয়েক মাস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হতে পারে। অপরদিকে ইংরেজরাও জালালাবাদ থেকে ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাবাজির কূটকৌশল ব্যবহার করে কাবুল দখলের প্রচেষ্টা চালাবে। যেহেতু জেনারেল নিজেই কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই মুজাহিদদের পক্ষেও তাকে নিরাপত্তার সঙ্গে জালালাবাদ পৌঁছানোর কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। এ সময় তারা তাকে রুখে দিতে যুদ্ধের সূচনা করেন।

জেনারেল এলফিনস্টোনের বাহিনীর খবর

এ যুদ্ধ বিরাট একটি পরিসরে রচিত হতে যাচ্ছিল। মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সরদার মুহাম্মাদ আকবর খান। ইংরেজদের কাবুল থেকে বিতাড়িত করার পেছনে এই নেতার

অবদান ছিল অপরিসীম। তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়ায় তিনি মুজাহিদদের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। এদিকে ইংরেজদের সেনাসংখ্যাও ছিল প্রায় ১৫ হাজারের মতো। বরাবরের মতো মুজাহিদরা গেরিলাযুদ্ধে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তারা পাহাড়-পর্বত, খানাখন্দ, গিরিপথ থেকে লুকিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এবারও ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তবে এবার আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে, শুধু ৮ জানুয়ারির যুদ্ধেই ৫ হাজার ইংরেজ সেনা মৃত্যুবরণ করে। কাবুল শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত খরদা কাবুল অঞ্চলে ইংরেজদের এত বেশি লাশের স্তূপ জমে যে, এই অঞ্চলের নাম পরে 'কবরস্থান লস্করে এলফনিস্টোন' নামে বিখ্যাত হয়ে যায়।

ডাক্তার ডিফের আত্মহত্যা

এ সময় ইংরেজ সেনাদের মনে প্রচণ্ড ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়। পদে পদে তারা মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল। ইংরেজ সার্জন ডাক্তার ডিফ তার সেনাদের এভাবে বেঘোরে মারা পড়তে দেখে অসহায় হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে নিজেকে নিবৃত করতে না পেরে গলায় রুমাল প্যাঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। মুজাহিদদের গেরিলা আক্রমণ প্রচণ্ডতা ধারণ করেছিল। ইংরেজ সেনারা জালালাবাদ পৌঁছানোর চেষ্টায় লাশ মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

৯ জানুয়ারি জেনারেল এলফনিস্টোন সরদার আকবর খানকে অনুনয়-বিনয় করে তাদের পরিবার-পরিজন ও গোলামদের রক্ষার জন্য অনুরোধ করে। সরদার আকবর খান তার অনুরোধ রক্ষার্থে ইংরেজবাহিনীর নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও গোলামদের নিরাপদে জালালাবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন। এতে করে ইংরেজবাহিনীতে শুধু অফিসার ও সেনা ছাড়া আর কেউ বাকি রইল না। ফলে তাদের জন্য চলাফেরা করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে।

জালালাবাদে শুধু ডাক্তার ব্রাইডন পৌঁছলেন

ইংরেজরা সেনাসহ অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারছিল। জেনারেল এলফিনস্টোন তখন মনে করে, এই মুহূর্তে তাদের জন্য লড়াই করা অত্যন্ত সহজ। লড়াই করার মতো একটি জায়গা পেয়ে গেলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তারা আবারও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। পরদিন একটি জুতসই জায়গাও তারা পেয়ে যায়; কিন্তু মুজাহিদরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আক্রমণ করে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন।

১০ ও ১১ জানুয়ারি ইংরেজদের জন্য কিয়ামত অপেক্ষা করছিল। কাবুল থেকে ২২

মাইল পূর্বদিকে জাগাদ লাক নামে একটি জায়গায় ইংরেজরা প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার হয়। সে দিন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, একজন ইংরেজ সেনাও অক্ষত ছিল না; হয় মৃত্যুবরণ করেছিল অথবা মারাত্মক আহত হয়েছিল। সে দিন কয়েক হাজার ইংরেজ সেনা মৃত্যুবরণ করে। যারা আহত হয়েছিল, তাদের জখম এত মারাত্মক ছিল যে, তারা নড়াচড়া করতে পারছিল না। এদের মধ্যে শুধু ডাক্তার ব্রাইডন—যে ইতিমধ্যে তিনটি স্থানে আহত হয়েছিল—অত্যন্ত কষ্ট করে জালালাবাদ পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এরপর জেনারেল সেইলকে ঘটনার আদ্যোপান্ত খুলে বলে। নিজেদের শোচনীয় পরাজয় এবং ১৫ হাজার সেনার মৃত্যুসংবাদ শোনায় তাদের। জেনারেল এলফিনস্টোন কোনোমতে প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল। সে তার সেনাদের লাশের ওপর দিয়ে পেছনে ফিরে যায়। এরপর সরদার আকবর খানের হাতে নিজেকে তুলে দেয়।

জালালাবাদ অবরোধ

এ সময় জালালাবাদে ইংরেজদের একটি বিরাট শক্তি সমবেত হয়েছিল। কাবুল থেকে এগিয়ে আসা ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পরেও জেনারেল সেইল জালালাবাদ ত্যাগ করতে চাইছিল না। কেননা, পেশোয়ার থেকে সেনাসাহায্য আসার ব্যাপারে সে ছিল পুরোপুরি নিশ্চিত। এ সময় মুজাহিদদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় জালালাবাদের ওপর। সরদার মুহাম্মাদ আকবর খান ১৫ হাজার সেনা ও ৫ হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে জালালাবাদ অবরোধ করেন। পাশাপাশি সুলতান আহমাদ খানকে ৩ হাজার দুর্ধর্ষ মুজাহিদ দিয়ে খাইবার পাসে পাঠান। তাঁদের মিশন ছিল, পেশোয়ার থেকে আগত ইংরেজ সেনাসাহায্য ও রসদপ্রবাহ রুখে দেওয়া। জালালাবাদে ইংরেজদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাদের হাতে বেশ কয়েক মাসের রসদ ছিল। ফলে অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়। মুজাহিদরা জালালাবাদ দুর্গ থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাঁদের ছাউনি স্থাপন করেন। এবার তাঁরা বড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

গজনিতে ইংরেজদের পরিণতি

একই সময়ে গজনিতে ইংরেজদের অবরোধ করে রাখার প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। মুজাহিদদের কাছে বড় কামান না থাকায় ইংরেজদের দুর্গ তাঁরা বিজয় করতে পারছিলেন না। অবশেষে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে সরদার শামসুদ্দিন খান কাবুল থেকে বড় বড় কামান ও গোলা নিয়ে গজনিতে পৌঁছান। এবার শুরু হয় গজনির দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ওপর ধারাবাহিক গোলাবর্ষণ। ইংরেজ অফিসার কর্নেল পালমার প্রতিরোধের সাহস হারিয়ে ফেলে; কিন্তু প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে

সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পর পরিবেশ অনুকূল হলে সে সকল অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, কামানসহ গজনি থেকে অত্যন্ত সংগোপনে বেরিয়ে কাবুল মহাসড়কের দিকে এগিয়ে যায়। সে ভেবেছিল, তাদের কাছে থাকা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ফলে মুজাহিদদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর অত্যন্ত নিরুপদ্রবভাবে কাবুলে পৌঁছতে পারবে; কিন্তু গজনির দুর্ধর্ষ মুজাহিদরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছু ধাওয়া করেন। আগে থেকেই মহাসড়কের নানা স্থানে মুজাহিদরা অপেক্ষমাণ ছিলেন। ইংরেজরা তাঁদের আক্রমণের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। ইংরেজদের সব সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যায়। ইংরেজ সেনারা প্রাণ বাঁচাতে এদিক-সেদিক পালানোর চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। প্রায় সবাই সেদিন মারা পড়ে। বাকি কয়েকজন অফিসার পুনরায় পালিয়ে এসে গজনিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাদেরকে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে হয়। বন্দি হওয়া সেনা-অফিসারদের কায়িক পরিশ্রম ও গোলামির জীবনযাপন করতে দেওয়া হয়। মুজাহিদদের পক্ষ থেকে বন্দিদের প্রতি এই আচরণ ইংরেজদের জেলখানায় বন্দিদের ওপর হওয়া আচরণের চেয়ে বহুগুণ উত্তম ছিল।

বিরাট আক্রমণের পরিকল্পনা

১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ। কাবুলে মুজাহিদদের মজলিসে শুরা একটি জরুরি সভার আয়োজন করে। এখানে সিদ্ধান্ত হয়, নায়িব আমিনুল্লাহ খান ও মির হাজির নেতৃত্বে মুজাহিদদের সকল সামরিক শক্তিকে একত্রিত করে জালালাবাদের ওপর শেষ ও চূড়ান্ত আক্রমণ করা হবে। ইংরেজদের শেষ সেনাকে হত্যার আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই যুদ্ধ ক্ষান্ত করা যাবে না। এই সিদ্ধান্তের পর কাবুল থেকে জালালাবাদ পর্যন্ত মহাসড়কের প্রতিটি স্থানে মুজাহিদদের তাঁবু ও পতাকা লাগানো হয়। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী মুজাহিদ এতে অংশ নেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে শেষ চূড়ান্ত আক্রমণে শহিদ হতে এসেছিল।

শাহ সুজার পরিণতি

এ সময় কাবুলের বালা হিসার দুর্গে শাহি মহলে বসবাসরত প্রভাবহারানো শাসক শাহ সুজার সঙ্গে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি যদি আফগানিস্তানে নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই মুজাহিদদের সঙ্গে জালালাবাদের মহাসড়কে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ইংরেজদের সেনা প্রত্যাহারের পর তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব মুজাহিদরা নেবেন না। শাহ সুজা মৃত্যুকে সামনে উপস্থিত হতে দেখে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। তবে

মুজাহিদদের সঙ্গে জালালাবাদ যেতে তিনি টালবাহানা শুরু করেন। এতে করে কাবুল থেকে মুজাহিদদের জন্য জালালাবাদের দিকে মার্চ করা বিলম্বিত হতে থাকে। অবশেষে ৪ এপ্রিল শাহ সুজা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। এগিয়ে যান মুজাহিদদের ছাউনির দিকে; কিন্তু তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ হয়তো তার ভাগ্যে লেখা ছিল না।

৫ এপ্রিল তিনি যখন মুজাহিদদের ছাউনির কাছে পৌঁছান, তখন কয়েকজন আফগান সরদার ৬০ জন সেনাসহ তার ওপর হামলে পড়ে। মুহূর্তেই লাশে পরিণত হয় শাহ সুজার দেহ। এই নেতারা সম্ভবত ভেবেছিলেন, শাহ সুজার উপস্থিতিতে ইংরেজরা নতুন কোনো ষড়যন্ত্রের সূচনা করতে পারে। এই হতভাগা শাসকের জীবন যতটা অপমানজনক ছিল, তার মৃত্যু এরচেয়েও শতগুণ বেশি লাঞ্ছনাদায়ক হয়। ইংরেজদের তল্পিবাহক সেজে এই ব্যক্তি আবদালি বংশের মান-ইজ্জত এবং ঐতিহ্যকে অপমানিত করেন। ইংরেজদের আফগানিস্তানে নিয়ে আসার ব্যাপারে তার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এ জন্য জাতির ইতিহাসে এই ব্যক্তি একজন ঐতিহাসিক গাদ্দারের স্থানে রয়েছে। আফগান ইতিহাসে তার নাম কাপুরুষ, মুনাফিক, গাদ্দার, দেশদ্রোহীর তালিকায় চিরকাল রাখা হবে।

কাবুলে গৃহযুদ্ধ এবং ইংরেজদের নতুন ষড়যন্ত্র

শাহ সুজার হত্যাকাণ্ডে মূলত নবাব জামান খানের সেনারা অংশগ্রহণ করেছিল। কিছুদিন পর তিনি কাবুলে পৌঁছান এবং নিজে বাদশাহ হওয়ার ঘোষণা দেন। মুজাহিদরা তখন জালালাবাদের দিকে আক্রমণের জন্য চলে গিয়েছিলেন। কাবুল ছিল একদম খালি। নবাব জামান খানের এমন বোকামিসূলভ আচরণে তাঁরা হতবাক হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে হঠাৎ করে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। নায়িব আমিনুল্লাহ খান বাধ্য হয়ে জালালাবাদ ছেড়ে কাবুলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। জামান খানের বাদশাহিকে তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। কেননা, ইংরেজদের বিতাড়নে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল শাহজাদা আকবর খানের। অতএব, বাদশাহ হওয়ার মতো যোগ্যতা ও অবদান শুধু তাঁরই রয়েছে।

কাবুল তখন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি অংশে নবাব মুহাম্মাদ জামান খান তার সেনাদল নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এদিকে নায়িব আমিনুল্লাহ খান বালা হিসাব দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। দুজনের মধ্যে হঠাৎ সংঘর্ষ বেধে যায়। নায়িব আমিনুল্লাহ খান শাহজাদা আকবর খানের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। ওদিকে আকবর খান ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমিনুল্লাহ খান চাচ্ছিলেন শাহজাদা কাবুলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাদশাহি ঘোষণা করবেন।

এদিকে মুহাম্মাদ আকবর খান নিজেই একটি বিরাট বিপদে পড়ে যান। জালালাবাদে মুজাহিদরা তাঁদের সামরিক শক্তিবলে ইংরেজদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে একত্রিত হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে সামরিক বিজয় হলেও পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনায় বসতে হচ্ছে। এ সময় ইংরেজদের কূটনৈতিক অবস্থান কিছুটা শক্তিশালী হয়ে যায়। মূলত ঘটনা হচ্ছে, হিন্দুস্থানে নিযুক্ত ইংরেজ গভর্নর জেনারেল তার অবরুদ্ধ বাহিনীকে রক্ষার জন্য একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করে। সে হিন্দুস্থানে নির্বাসিত সাবেক আফগান শাসক আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে ফুঁসলিয়ে আবারও আফগানিস্তানের শাসক হিসেবে মনোনীত করার প্রলোভন দেখাতে থাকে। ইংরেজরা তাকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, 'আপনাকে আমরা নিরাপদে কাবুলে পৌঁছিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করাব।' বিনিময়ে একটি শর্তারোপ করে তারা। মুজাহিদরা যেন জালালাবাদ থেকে পিছু হটে হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিম পাশে চলে যায়, যাতে করে অবরুদ্ধ ইংরেজবাহিনী নিরাপদে পেশোয়ারে পৌঁছাতে পারে।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের ঐতিহাসিক বোকামি

দোস্ত মুহাম্মাদ খান ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, মুজাহিদরা কত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন; আর ইংরেজরা কী পরিমাণ বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি বোকামিসূলভ আচরণ প্রদর্শন করে ইংরেজদের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন। পুত্র শাহজাদা আকবর খানকে চিঠি লিখে তিনি জানান, তারা যেন ইংরেজদের রাস্তা খালি করে দেয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি তার চশমা ও জর্দার কৌটা পুত্রের কাছে পাঠান। শাহজাদা আকবর খানের কাছে এই সংবাদ অবিশ্বাস্য ঠেকছিল; কিন্তু চশমা ও জর্দার কৌটা দেখার পর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় তিনি পাচ্ছিলেন না। তবে এত বড় সিদ্ধান্ত তিনি একা নিতে পারেন না। এ জন্য ইংরেজদের সঙ্গে মুজাহিদদের পুনরায় আলোচনার টেবিলে বসতে হয়। এ সময় ইংরেজরা লক্ষ করে, আকবর খান এখনো আগের অবস্থানে রয়েছেন। তখন তারা তাঁকে হুমকি দিয়ে বলে, 'যদি আপনি আমাদের শর্ত মেনে না নেন, তাহলে আমরা আপনার পিতা এবং সমগ্র বংশকে হিন্দুস্থান থেকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণের আশাবাদ রাখবেন না।'

স্বাক্ষরিত হলো নতুন চুক্তি

এই হুমকিতে কিছুটা কাজ হয়। শাহজাদা আকবর খান বিচলিত হয়ে পড়েন। ওদিকে কাবুলে গৃহযুদ্ধ ধীরে ধীরে প্রচণ্ডতা লাভ করছিল। আশঙ্কা হচ্ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই মুজাহিদদের পারস্পরিক ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং ইংরেজরা পুনরায় শক্তি অর্জন

করে কাবুল দখল করে ফেলবে। অবশেষে চিন্তাভাবনার পর শাহজাদা এই সিদ্ধান্ত নেন যে, মুজাহিদদের সর্বসম্মতিক্রমে ইংরেজদের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে মুজাহিদরা তাঁদের অবস্থান থেকে পিছু হটবেন না। তিনি নেতৃবৃন্দকে এটা বোঝাতে সমর্থ হন যে, তাঁর পিতা ফিরে এলে আফগানিস্তানে ঐক্যবদ্ধ একটি ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। ইংরেজদের জন্য এটুকুই বেশ স্বস্তিদায়ক ছিল। ফলে এ কথার ওপরেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ ঘটনার পর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শাহজাদা আকবর খান কাবুলে পৌঁছান এবং নবাব মুহাম্মাদ জামানকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিশৃঙ্খলা থেকে কাবুলকে রক্ষা করেন। পিতার ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর কাছে শাসনভার অর্পণ করা হয়। এদিকে চুক্তি অনুযায়ী আগস্টে জেনারেল সেইল তার বাকি সেনা নিয়ে জালালাবাদ থেকে পেশোয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।

ইংরেজদের শোচনীয় পশ্চাদ্‌গমন

গজনি ও কান্দাহারে ইংরেজদের সঙ্গে মুজাহিদদের সংঘর্ষ হয়েছিল। ফলে গজনিতে ইংরেজদের অস্তিত্ব প্রায়ই নিঃশেষ হয়ে পড়ে। কান্দাহারে জেনারেল নট ৮ হাজার সেনাসহ নিজেদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ২০ আগস্ট তারা চুক্তি মোতাবিক কান্দাহার থেকে কাবুল মহাসড়ক ধরে পেশোয়ারের পথে রওনা দেয়। ফলে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে মোট ৫৪ হাজার ইংরেজ সেনা লাঞ্ছনা ও অপমান মাথায় নিয়ে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।

চরম হাস্যকর অজুহাত প্রদর্শন

ঐতিহাসিক এই শোচনীয় পরাজয়ের পর ইংরেজরা তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা ঢাকতে একের পর এক হাস্যকর ও আশ্চর্যজনক অজুহাত বিশ্বের সামনে বলে বেড়াতে থাকে। তারা এ কথা প্রচার করে, 'আফগানিস্তান বিজয়ের পর তারা সেখানে তাদের অধীন আফগানদের শাসনক্ষমতা অর্পণ করে ফেরত এসেছে।' আর এর প্রমাণস্বরূপ তারা জালালাবাদ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রতিটি গ্রামে একজন ইংরেজ নবাব ও গভর্নর মনোনয়ন করেছিল। তবে মজার ব্যাপার হলো, তাদের মনোনীত এ সকল ব্যক্তি ইংরেজরা এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের পিছু পিছু নিজেরাও বাড়িঘর ছেড়ে পেশোয়ারের পথ ধরে। কেননা, মুজাহিদদের ভয়ে তাদের পক্ষে আফগানিস্তানে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পরই হিন্দুস্থানে এ সকল নবাব ও গভর্নরকে সমবেত হতে দেখা যায়।

হিন্দুস্থানে পৌঁছে ইংরেজ অফিসার আফগানিস্তান বিজয় উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। মিথ্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে তারা এমন এমন হাস্যকর আয়োজন

করেছিল যে, পৃথিবীবাসী তাদের ধোঁকাবাজি দেখে অবাক হয়ে যায়। ইংরেজরা একটি দরজা তৈরি করে। এরপর পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতিতে ঘোষণা করে, এটি হলো সেই দরজা, যেটি সুলতান মাহমুদ গজনবি সোমনাথের মন্দির থেকে লুট করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা হিন্দুস্থানবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করে লুট হওয়া হিন্দুস্থানি সম্পদ পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এসব নাটক তাদের শোচনীয় পরাজয়ের বাস্তব গল্পকে কখনো লুকিয়ে রাখতে পারেনি। চরম অপমানজনক ঐতিহাসিক এই পরাজয় আজ পর্যন্ত ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। সে যুগের বেশ কজন ইংরেজ অফিসার, সাংবাদিক ও পর্যটক তাদের স্মৃতি ও ভ্রমণকাহিনি থেকে এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে লেডি ফ্লোরেনটিয়া সেইলের ভ্রমণকাহিনি বিখ্যাত। তিনি জেনারেল সেইলের স্ত্রী ছিলেন। এই ভ্রমণকাহিনি তাজকিরা মাসায়েব দর আফগানিস্তান *নামে* ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

এই ভদ্রমহিলা মুজাহিদদের হাতে বন্দি ছিলেন। এরপর মুক্ত হয়ে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে পৌঁছান। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আফসোস! ইংরেজরা যদি তাদের প্রথম অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিত, তাহলে পরবর্তীকালে তাদের আবারও চরম অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পরাজিত হতে হতো না।

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ,* মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।

২. *Encyclopedia of Islam.* Vol-1

৩. *উর্দু দায়িরায়ে মাআরিফ ইসলামিয়া।*

৪. *তাজকিরা মেমসাহেব দার আফগানিস্তান,* বেগম লেডি সেইল, ফারসি তরজমা।

৫. *দর যাওয়ায়ারি তারিখে আফগানিস্তান,* আহমাদ আলি কাহজাদ।

৬. *সিরাজুত তাওয়ারিখ,* মির্জা ফয়েজ মুহাম্মাদ খান।

১৭ তম অধ্যায়

দোস্ত মুহাম্মাদ খান, শের আলি খান ও ইয়াকুব আলি খান

মুসলিমবিশ্ব এমন দুঃখজনক ঘটনা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে যে, সফল ইসলামি বিপ্লবের পরও কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হয়নি। হাজার হাজার মুজাহিদের আত্মত্যাগেও পরিবেশে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আফগানিস্তানের বরকতময় ভূমিতে এমন আন্দোলন বহুবার পরিচালিত হয়েছে, যেখানে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সঠিক ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু অনেকবার এমনও হয়েছে, প্রচুর কুরবানির পরও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়নি। এই ব্যর্থতাগুলোর পেছনে ছিল অদূরদর্শী চিন্তাধারা, ভুল পদক্ষেপ আর অযোগ্য নেতৃত্ব। কখনো কখনো এই আন্দোলনগুলো সফল হলেও ফলাফল ঘরে তুলে আনা সম্ভব হয়নি।

মুজাহিদদের ঐতিহাসিক দুটি ভুল সিদ্ধান্ত

১৮৪০ থেকে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধে ব্রিটিশদের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের দম্ভের প্রাসাদ। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পরও কাঙ্ক্ষিত সামরিক সাফল্য এবং আফগান মাটিতে শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। মাত্র রাজনৈতিক একটি ভুল সিদ্ধান্তের ফলে এমন দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে ব্রিটিশরা আফগান থেকে পালিয়ে যাওয়ার এক বছরের মধ্যে বিজয়ী মুজাহিদরাই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলন মুজাহিদদের সম্মিলিত একটি শুরা কাউন্সিলের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তানের প্রায় সকল আলিম, সরদার ও মুজাহিদ কমান্ডার। আমিনুল্লাহ খান লোগারি, মুহাম্মাদশাহ খান, নবাব মুহাম্মাদ জামান খান ও মির হাজির মতো বিখ্যাত মুজাহিদ নেতা এই আন্দোলনের প্রধান পুরোধাপুরুষ ছিলেন।

জিহাদি আন্দোলন যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, ঠিক তখন সাবেক শাসক দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্ররাও এই আন্দোলনে অংশ নেন। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আকবর খান সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। তিনি আন্দোলনে নিজের কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ব্যবহার করেছিলেন। একপর্যায়ে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দও অনায়াসে তাঁর ওপর ভরসা করতে শুরু করেন। প্রায় সব সিদ্ধান্তে তাঁর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। মুহাম্মাদ আকবর খান দেশপ্রেমিক ও আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মেধা ও প্রতিভা, সক্ষমতা ও যোগ্যতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল সর্বজনবিদিত; কিন্তু এতসবের পরও মুহাম্মাদ আকবর খান ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ কৌশলগত বড় একটি ভুল করছিলেন, যা তাঁদের পুরো আন্দোলনকে পরবর্তী সময়ে প্রভাবিত করে ফেলে। তাঁরা তাঁদের সকল শক্তিসামর্থ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং ক্ষমতাগ্রহণ ও রাষ্ট্রপরিচালনার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। অথচ সময়ের চাহিদায় এটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে জিহাদি আন্দোলনে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় পার করেছিলেন। ফলে আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে কীভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন, তার রূপরেখা নিয়ে ভাববার সময় তাঁরা পাননি।

ইংরেজরা যখন আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে, তখন নতুন কোনো প্রশাসনিক রূপরেখা কারও সামনে ছিল না। এই সুযোগে প্রভাবশালী যেকোনো নেতা চাইলে নিজেকে স্বায়ত্তশাসক হিসেবে যেকোনো অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা দিতে পারত। হয়েছিলও তা-ই। সুযোগের এই সোনালি সময়ে মুহাম্মাদ জামান খান নিজেকে কাবুলের আমির হিসেবে ঘোষণা করে বসেন। কিন্তু এই ঘোষণার পরক্ষণেই আমিনুল্লাহ খান লোগারি এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বসেন। ফলে যা আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তা-ই ঘটে। কাবুল শহর দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শুরু হয় অত্যন্ত দুঃখজনক গৃহযুদ্ধ।

যদিও গৃহযুদ্ধের এই ধারাবাহিকতা মুহাম্মাদ আকবর খানের হস্তক্ষেপে খুব দ্রুত থেমে গিয়েছিল; কিন্তু গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ আবারও এমন একটি ঐতিহাসিক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা আফগানিস্তানের আগামীর দিনগুলোকে দীর্ঘদিনের জন্য অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার পরিবেশে নিয়ে যায়। এই ঘটনার ফলে শুধু একনিষ্ঠ আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দই অসহনীয় জুলুম ও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন তা নয়; বরং ভবিষ্যতে তাদের ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটিও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

মূলত মুজাহিদদের উচিত ছিল, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ইসলামি শাসন

প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শূরা গঠন করা। মুজাহিদদের এই মজলিসে শূরাতে এমন কাউকে রাখা উচিত ছিল না, জিহাদের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। যিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে আগে থেকেই সম্পর্ক রক্ষা করে গেছেন, এমন কাউকেও সঙ্গে রাখা উচিত ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঘটনাপ্রবাহ এমনই দুঃখজনক দিকে মোড় নিতে থাকে। মুজাহিদরা কাবুলে গৃহযুদ্ধের হালকা ঝলক লক্ষ করে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা দেশের জনগণকে একক শাসনের অধীনে নিয়ে আসতে অত্যন্ত দ্রুত অপরিণামদর্শী একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। সিদ্ধান্তটি ছিল এমন, ইতিমধ্যেই একবার দেশ-ছাড়া হওয়া পদচ্যুত সাবেক আফগান বাদশাহ দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে পুনরায় শাসনভার অর্পণ করা হবে। সবাই ধারণা করেছিলেন, দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা, ব্রিটিশদের ব্যাপারে আফগান জনগণের মনোভাব ইত্যাদি লক্ষ করে নবগঠিত স্বাধীন আফগানিস্তানে জনগণের সুধারণাকে সম্মান দেখিয়ে ইসলামি শাসন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন। এ ছাড়া তার ব্যক্তিত্বের কারণে তাকে আফগান সরদাররাও একবাক্যে গ্রহণ করে নেবে। মুহাম্মাদ খানের ব্যাপারে এমনই ইতিবাচক ছিল চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া মুজাহিদ নেতাদের ধারণা।

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এই ধারণাও করেছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে সামরিক পরাজয় এবং কূটনৈতিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পর দোস্ত মুহাম্মাদ খান বিদেশি শক্তিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করবেন। দেশের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে তাদের চিহ্নিত করবেন।

তাঁরা ভেবেছিলেন, দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো পুত্র মুহাম্মাদ আকবর খানের হাতে সঁপে দেবেন। কেননা, আকবর খান অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা, সামরিক দক্ষতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। সে ক্ষেত্রে বাদশাহ হিসেবে দোস্ত মুহাম্মাদ খান হবেন পোশাকি বাদশাহ আর কার্যত শাসনভার চলবে মুহাম্মাদ আকবর খানের নির্দেশে।

সুধারণার মরীচিকা

মুজাহিদের নেতৃবৃন্দের এই সুধারণা ছিল আসলে মরুভূমির মরীচিকার মতো। আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান এখনো সেই পুরানো ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর দোস্ত মুহাম্মাদ খান-ই রয়ে গেছেন। যিনি বিজয় অর্জন করেও ইংরেজ জেনারেল ম্যাকনাটনের সামনে নিজের তরবারি তুলে দিয়েছিলেন। অনুগত প্রজার মতো আত্মসমর্পণ করতে একাকী পৌঁছে গিয়েছিলেন কাবুলে। চার বছরের নির্বাসন ও বন্দিত্ব তাকে একচুলও পরিবর্তন করতে পারেনি; বরং উলটো তিনি আগের চেয়ে অধিক আরামপ্রিয়, দুনিয়ালোভী, ভীরু, কাপুরুষ ও স্বার্থপর হয়ে ওঠেন।

মুজাহিদদের বিজয়ের পর যখন তিনি কলকাতার বন্দিত্ব থেকে আফগানিস্তানে ফিরে আসেন, ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিতে গিয়ে তখন ঐতিহাসিক শয়তানি এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে আসেন। এই চুক্তি মোতাবিক হেরাত ও কান্দাহার আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব থেকে বেরিয়ে যায়। এই ঘটনার পর ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাবুলে পৌঁছান। এরপর তাকে শাসনভার ফিরিয়ে দিলে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী বাদশাহর মতো ভেবে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা এককভাবে নিজের হাতে তুলে নেন তিনি। মুজাহিদরা তার হাতে সমস্ত ক্ষমতার বাগডোর তুলে দিয়েছিলেন, ফলে এখন সব নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাঁদেরকে এখন এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, আফগানিস্তান এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে একজন স্বাধীন খানদানি আফগান সরদারের মাধ্যমে শাসিত হচ্ছে। নাপাক ইংরেজদের অধীনতা থেকে জালিম আফগান শাসক হাজার গুণ উত্তম, এই সান্ত্বনাই এখন মুজাহিদদের গ্রহণ করে নিতে হয়। স্বাধীন শাসকের পক্ষ থেকে সামান্য প্রভাববিস্তার এবং অন্যায় আচরণ সহ্য করে নেওয়ার আহ্বান জাতির জন্য তেমন বড় কিছু নয়। হাজার বছর ধরে তারা এ ধরনের শাসক দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছেন।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের রাজনৈতিক পরিক্রমা

দোস্ত মুহাম্মাদ খান ধীরে ধীরে তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকেন। জনগণের ওপর জুলুম-অত্যাচার এবং ইচ্ছামতো আদেশ-নিষেধ জারি করতে শুরু করেন। তিনি ইংরেজদের এখনো তার শুভাকাঙ্ক্ষী ও হর্তাকর্তা মনে করতেন। কাবুলের শাসনভার ইংরেজরাই তাকে এনে দিয়েছে, এমনটাই ছিল তার ভাবনা। তিনি পুত্র মুহাম্মাদ আকবর খানের কাছ থেকে সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। কেননা, পুত্র ছিলেন ইংরেজদের প্রতি চরম বিরূপ মনোভাবাপন্ন। প্রভুদের প্রতি পুত্রের এই মনোভাব তার একদমই পছন্দ ছিল না।

মুহাম্মাদ আকবর খান আফগান সরদার ও মুজাহিদদের ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, জাতির এই ক্রান্তিকালে কাপুরুষ ও অত্যাচারী পিতার পর তিনিই ক্ষমতায় বসবেন। আপাতত জনগণের ওপর জুলুম-অত্যাচার থেকে পিতাকে যেকোনো মূল্যে বিরত রাখবেন। পিতা যদি বড় কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যত হন, তখন যোগ্য এই পুত্র তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এমন ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে রাখবেন; কিন্তু আকবর খানের হাত থেকে রাজনৈতিক সকল ক্ষমতা চলে যাওয়ায় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের আশা-ভরসার শেষ প্রদীপটুকুও দপ করে নিভে যায়।

আমিনুল্লাহ লোগারির পরিণাম

দোস্ত মুহাম্মাদ খান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাকে অত্যন্ত আশঙ্কার চোখে দেখছিলেন। হতে পারে, জনগণ কোনো একদিন মুজাহিদদের সহায়তায় তার শাসনভার উলটে দেবে। অলীক ধারণার এই ভিত্তি থেকে তিনি একে একে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে শায়েস্তা করা শুরু করেন। এ ধারাবাহিকতায় তার আচরণ ধীরে ধীরে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। প্রথমে তিনি মুজাহিদদের প্রবীণ ও প্রধান নেতা আমিনুল্লাহ খান লোগারির ওপর প্রতিশোধের হাত অগ্রসর করেন। তাঁর ওপর রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে তাঁকে কুখ্যাত বালা হিসার দুর্গে বন্দি করা হয়। ১৭ বছর ধারাবাহিকভাবে এই বন্দিত্ব বরণ করেন আমিনুল্লাহ খান। অবশেষে বন্দি অবস্থাতেই ইনতিকাল হয় তাঁর। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদানকারী বয়োজ্যেষ্ঠ এই মুজাহিদ নেতা জাতির পক্ষ থেকে অবশেষে কৃতজ্ঞতার এই উপহার গ্রহণ করেন! আফগান ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়ের পেছনে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত হন স্বৈরশাসক দোস্ত মুহাম্মাদ খান। ঐতিহাসিকভাবে কোনোভাবেই তিনি এ দায় এড়াতে পারেন না।

অন্যান্য মুজাহিদ নেতার সঙ্গেও একই ধরনের রাজনৈতিক আচরণ করা হতে থাকে। সরদার উসমান খান, নবাব মুহাম্মাদ জামান খান, শুজাউদ্দৌলা খান ও শামসুদ্দিন খানের মতো বিখ্যাত মুজাহিদ নেতাকে দোস্ত মুহাম্মাদ খান পথের কাঁটা মনে করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে, দেশজুড়ে এমন আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ও সামাজিক প্রভাব থাকার পরও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ কেন দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে প্রতিহত করেননি? এর জবাব হলো, মুজাহিদরা ছিলেন আফগান জনগণের সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। মনপ্রাণ দিয়ে তাঁরা ইসলাম ও আফগানিস্তানকে ভালোবাসতেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল না, শুধু শাসনভার গ্রহণের জন্য তাঁরা দেশকে একটি গৃহযুদ্ধের পরিবেশ উপহার দেবেন। তবে কাফির বহিঃশত্রুকে কোনোভাবেই আফগানের মাটিতে থাকতে দেওয়া যাবে না, এ ব্যাপারে তাঁরা সবাই ছিলেন একমত। কিন্তু বহিঃশত্রুকে দেশ ছাড়া করতে গিয়ে আফগান জনগণ ইতিমধ্যে যে পরিমাণ আত্মত্যাগ করেছিল, তা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে একজন স্বৈরশাসক আফগানিস্তান শাসন করলেও ব্যক্তি হিসেবে তিনি মুসলমান ও অত্যন্ত উচ্চবংশীয় একজন ব্যক্তি। অযথা তার বিরোধিতা করে আফগানিস্তানকে নতুন আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তর করতে তাঁরা কোনোভাবেই ইচ্ছুক ছিলেন না। ঠিক এ কারণে তাঁরা খানের জুলুম-অত্যাচার ও হঠকারী স্বৈরশাসন সহ্য করে যাচ্ছিলেন।

এই মুহূর্তে একটি নতুন আন্দোলন গড়ে তুললে তা শতভাগ সফল হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। খানের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার যদিও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দই হচ্ছিলেন, তবু তাঁদের আশা ছিল, কোনো একদিন হয়তো পরিস্থিতি বদলে যাবে। আফগানের মাটিতে কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের আবির্ভাব ঘটবে। আবারও নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলার জীবন ফিরে পাবে আফগান জনগণ। এ ছাড়া মুহাম্মাদ আকবর খান মুজাহিদদের কাছে তখনো একটি নিভু নিভু প্রদীপ হিসেবে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ফলে তড়িঘড়ি করে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত তাঁরা আর নিতে চাচ্ছিলেন না। সবার এই ধারণা ছিল, দোস্ত মুহাম্মাদ খান বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইনতিকাল করবেন। এরপর ক্ষমতা গ্রহণের জন্য মুহাম্মাদ আকবর খান একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে শাসন গ্রহণ করবেন।

খোদ মুহাম্মাদ আকবর খান—যিনি মুজাহিদদের শুরার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন—নিজেও পিতার বিরুদ্ধে নতুন আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না; বরং একটি সুযোগের অপেক্ষায় থাকাকেই শ্রেয় মনে করছিলেন। ফলে দোস্ত মুহাম্মাদ খানের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব হয়নি। এদিকে তিনি একে একে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে তাঁর প্রতিহিংসার রোষানলে পিষ্ট করতে থাকেন। জিহাদের বরকতে একটি শুরার অধীনে চলে আসা সকল মুজাহিদ নেতা ও জিহাদি শক্তি এ সময়ে ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শাসন বণ্টন

দোস্ত মুহাম্মাদ খান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তার উত্তরাধিকারীদের আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর ও সেনাপতি হিসেবে পদায়ন করতে থাকেন। এরপর তিনি বেছে বেছে তার পুত্রদের হাতে তুলে দিতে থাকেন নানা প্রশাসনিক পদ। মুহাম্মাদ খানের সন্তানসন্ততির সংখ্যা ছিল ৫২ জন। ফলে তার কাছে পদায়ন করার মতো ব্যক্তির অভাব ছিল না। এ সময় তিনি আফগানিস্তানকে ছোট ছোট প্রদেশে বিভক্ত করে ফেলেন। এর পরও বেশ কজন অযোগ্য শাহজাদা পদপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পরে তাদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের সিপাহসালার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। এমনকি আফগান সেনাবাহিনীকে এ সময় তিনি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি ভাগের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় একেকজন শাহজাদাকে। ফলে সেনাবাহিনীর কমান্ডও ভেঙে পড়ে। এতে করে অবশ্য একটি ইতিবাচক ফল এসেছিল। শাহজাদা মুহাম্মাদ আকবর খান—যিনি তখনো উল্লেখযোগ্য কোনো দায়িত্ব পাননি—সেনাবাহিনীর পাঁচ ভাগের একটি বড় অংশের সেনাপতির দায়িত্ব পেয়ে যান।

দুটি বিশেষ পদক্ষেপ

দায়িত্ব পাওয়ার পর শাহজাদা প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদক্ষেপ হাতে নেন। প্রথমত, তিনি তার পিতার রোষানল থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে বাঁচানোর চেষ্টা শুরু করেন। এ ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু সাফল্যও হাতে ধরা দেয়। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে সুলতান আহমাদ খান ও মুহাম্মাদশাহ খান গুলজাইর মতো কেন্দ্রীয় নেতা দোস্ত মুহাম্মাদ খানের রোষানল থেকে বেঁচে যান; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমিনুল্লাহ খান লোগারিকে কোনোভাবেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। মহান এই মুজাহিদ কারাভ্যন্তরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি আফগানিস্তানের ভৌগোলিক মানচিত্রকে পূর্ণতা দিতে সুদীর্ঘ পদক্ষেপ হাতে নেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি ষড়যন্ত্র করে কান্দাহার ও হেরাতকে আফগানিস্তানের মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। আকবর খান অত্যন্ত কৌশলে এই অঞ্চল পুনরায় আফগানিস্তানের মানচিত্রে ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ সময় তাঁর পিতা ব্রিটিশদের বিরোধিতা হচ্ছে ভেবে পুত্রের পদক্ষেপ বন্ধ করে দেন। এভাবে খুব কাছাকাছি গিয়েও তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

আকবর খানের মৃত্যু

পাঞ্জাবের রাজা রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর বিখ্যাত শিখ সাম্রাজ্য একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। নতুন নেতৃত্ব সর্বদা ব্রিটিশ রাজশক্তির আগ্রাসনের ভয়ে প্রকম্পিত থাকত। তাদের কাছে মনে হচ্ছিল, ব্রিটিশদের চেয়ে আফগানদের অধীনতা ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করাই নিরাপদ ও লাভজনক হবে। তারা কূটনৈতিকভাবে আফগান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। এই সুযোগকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে মুহাম্মাদ আকবর খান সেনাবাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে এগিয়ে যান; কিন্তু সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছার পর এবারও তাঁর কাছে পিতার একটি ফরমান এসে পৌঁছায়। কোনোভাবেই পাঞ্জাব সীমান্তে আক্রমণ করা যাবে না, এই মর্মে কঠোর নির্দেশনা ছিল চিঠিতে। ফলে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয় আকবর খানকে। এ সময় পিতা-পুত্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ। দীর্ঘ তিন বছর ধরে আফগানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুতগতিতে অবনমনের শিকার। আফগানিস্তানের জনগণ ধীরে ধীরে মুহাম্মাদ খানের বিপক্ষে চলে যাচ্ছিল। কিছু কিছু গোত্র তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ নেমে আসে; কিন্তু অত্যন্ত কঠোর হস্তে প্রতিটি বিদ্রোহ দমন করেন তিনি। ঠিক এ বছরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পাঞ্জাব সীমান্তের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে যায়। দেখতে দেখতে তারা দখল করে ফেলে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ। ফলে আবারও আফগান সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আগমনী সংকেত বাজতে থাকে।

এমন সংকটময় মুহূর্তে শাহজাদা মুহাম্মাদ আকবর খান ম্যালেরিয়ার মতো সামান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আকবর খানের হত্যাকারী কে

ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, মুহাম্মাদ আকবর খান কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পরে জানা যায়, চিকিৎসক তাঁকে ওষুধের পরিবর্তে বিষমিশ্রিত তরল পানি পান করিয়েছিল। এই বিষের প্রভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযুক্ত ডাক্তারকে শাস্তি দেওয়ার কোনো প্রমাণ ঐতিহাসিক বর্ণনায় নেই। তার ওপর আদালতে মামলা হয়েছিল, এ ধরনের প্রমাণও পাওয়া যায়নি। অথচ সবাই জানত, দোস্ত মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত কঠোর মেজাজ ও শক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কাউকে তিনি ছাড় দিতেন না। দোষী ব্যক্তি তো পরের কথা, নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও তার বিরুদ্ধচারীদের তিনি কখনো ছেড়ে দেননি। তাহলে কীভাবে সম্ভব যে, যোগ্য পুত্রের ব্যাপারে অভিযুক্ত ডাক্তারকে তিনি কোনোরকম শাস্তির আওতায় নিয়ে আসেননি। পরে এ ধারণাই জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে, পিতা তার পুত্রকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেছেন। কাবুলের জনগণ এটা জনসমক্ষে বলে বেড়াতে শুরু করে যে, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আমির মুহাম্মাদ খান তার সুযোগ্য পুত্র আকবর খানকে হত্যা করেছেন।

মুহাম্মাদ আকবর খানকে উত্তর-আফগানিস্তানের বিখ্যাত শহর মাজার-ই-শরিফে দাফন করা হয়। আফগান জনগণ তাঁকে একজন মুজাহিদ নেতা ও সফল সেনাপতি হিসেবে চিরকাল স্মরণ করে এসেছে। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইংরেজদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। অযোগ্য, অদক্ষ আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের সুযোগ্য পুত্র আকবর খানকে আফগান জনগণ 'উজির' উপাধি প্রদান করে। তাঁর যোগ্যতার ব্যাপারে আফগানরা একমত ছিল; কিন্তু অর্থব আর গোলামি মানসিকতাসম্পন্ন পিতা তার পুত্রের যোগ্যতাকে জাতির কল্যাণে ব্যবহার হতে দেননি। ফলে আফগান জনগণ ও উম্মাহ অমিত সম্ভাবনাময়ী এই নেতা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যে সময়ে তিনি সমাজ ও রাজনীতিতে সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু করেছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়। কাবুলে একটি মহল্লা ও আলিশান একটি মসজিদ উজির আকবর খানের নামে মাথা উঁচু করে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মুহাম্মাদশাহ খানের সশস্ত্র আন্দোলন

উজির আকবর খানের মৃত্যুর পরপরই পিতা দোস্ত মুহাম্মাদ খান জিহাদি নেতৃবৃন্দের

প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন। এই মুহূর্তে কাবুলে আর কোনো উল্লেখযোগ্য মুজাহিদ নেতা উপস্থিত ছিলেন না। তবে জালালাবাদে মুহাম্মাদশাহ খান ছিলেন। তিনি মুজাহিদদের শুরাপরিষদের প্রথমসারির একজন নেতা। মুহাম্মাদ খানের শক্ত প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি। তবে মুহাম্মাদ আকবর খানের কারণে তাঁরা বহু বছর ধরে কোনো সশস্ত্র আন্দোলনে যাননি; কিন্তু আকবর খানের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদশাহের মুজাহিদবাহিনী রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের সকল সম্ভাবনাকে নিজ চোখে বিলুপ্ত হতে দেখেন। এ সময় তাঁদের কাছে একটিমাত্র বিকল্পই রয়ে গিয়েছিল; সশস্ত্র জিহাদি আন্দোলন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে সমাজ ও জাতির সার্বিক কল্যাণকামনায় তাঁরা এ পর্যায়ে জালালাবাদ থেকে জিহাদি আন্দোলনের সূচনা করেন। কাবুল ও নাঙ্গারহারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী গুলজাই গোত্র এ সময় মুজাহিদদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার সুযোগ্য পুত্রের জীবদ্দশায় তাঁকে বড় কোনো প্রশাসনিক পদ দেননি। তিনি উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা থাকলেও ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের কারণে তাঁকে এই পদও দেওয়া হয়নি। কেননা, ব্রিটিশরা তার পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তিনিও ব্রিটিশদের দু-চোখে দেখতে পারতেন না। অপরদিকে অন্যান্য শাহজাদার মধ্যে দোস্ত মুহাম্মাদ খানের উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। জনগণ আকবর খানের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ঝলক দেখতে পাচ্ছিল। তাঁকে নিয়েই তারা স্বপ্ন দেখত।

মুহাম্মাদ আকবর খান যখন ইনতিকাল করেন, ঠিক তখন এতদিনের নীরবতার অবসান ঘটে। দোস্ত মুহাম্মাদ খান এবার উত্তরাধিকারী মনোনয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পুত্র গোলাম হায়দার খানকে তিনি শাহজাদাদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ সময় আকবর খানের অধীনে থাকা সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশকে নবনিযুক্ত উত্তরাধিকারী গোলাম হায়দার খানের অধীনে প্রদান করেন। অর্থাৎ, সালতানাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার পাশাপাশি গোলাম হায়দার খান হয়ে ওঠেন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাপতি। এদিকে মুহাম্মাদশাহ খান কাবুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালু রেখেছিলেন। দোস্ত মুহাম্মাদ খান তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বেশ কয়েকবার বাহিনী পাঠালেও প্রতিবারই কাবুলের সেনাবাহিনী হতোদ্যম হয়ে ফিরে আসে।

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল থেকে বিরাট একটি সেনাবাহিনী রওনা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, মুহাম্মাদ খানকে পরাজিত করে বন্দি করে নিয়ে আসা; কিন্তু এবারও অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় কাবুলের সেনাবাহিনী। মুহাম্মাদশাহ খানও তাঁর সশস্ত্র জিহাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। একপর্যায়ে এমন একটি সময় এসে পড়ে,

যখন মনে হচ্ছিল দোস্ত মুহাম্মাদ খান তাঁর হাতে পরাজিত হয়ে যাবেন। ঠিক তখনই একটি গাদ্দারির ঘটনা ঘটে। ফলে যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি ঘুরে যায়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে একটি যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। এ সময় মুহাম্মাদশাহ খানের ডানহাত হিসেবে পরিচিত সিপাহসালার আবদুল আজিজ খান তার বাহিনী নিয়ে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। ফলে মুহাম্মাদশাহ খানের বাহিনী ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে যুদ্ধের পটভূমি পরিবর্তন হয়ে যায়। অত্যন্ত অসহায়ভাবে শহিদ হতে থাকেন মুজাহিদরা।

পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে মুহাম্মাদ খান কৌশলগতভাবে পিছু হটেন। এই যুদ্ধে মুজাহিদরা তাঁদের মানসিক ও সামরিক আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ফলে মুজাহিদদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মুহাম্মাদশাহ খান তাঁর নিকটতম মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে লাঘমান ও নুরিস্তানের মধ্যবর্তী হিন্দুকুশের পর্বতচূড়ায় হারিয়ে যান।

স্বৈরাচারী বাদশাহির যুগ

মুজাহিদদের পরাজয়ের পর দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার আসল চেহারায় ফিরে আসেন। মুজাহিদদের অসীম আত্মত্যাগের ফলে যে স্বাধীনতা আফগানিস্তান অর্জন করেছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মুজাহিদদের সম্মিলিত যে শক্তি ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, সেই আফগান ঐক্য তিনি বিনষ্ট করেন। শুরু হয় তার স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারী শাসনের যুগ। জনগণের ভালো-মন্দের দিকে তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা চালু করেন। আগের পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন শাসকদের মতো তিনিও 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' আচরণে ফিরে যান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তৈরি হয় দহরম-মহরম সম্পর্ক। অথচ সাধারণ জনগণের চিন্তাচেতনা ও স্বাধীনতার প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। আফগানিস্তান সে সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে পদস্খলন ও অবনমনের শিকার হতে থাকে। দীর্ঘ দুই দশক ধরে এই অবনমন চলতে থাকে। রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আফগানিস্তান পার্শ্ববর্তী প্রতিটি অঞ্চলের চেয়ে শত বছর পেছনে চলে যায়।

দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার পুত্রদের মধ্যে সমগ্র আফগানিস্তানের শাসনভার বণ্টন করে দেওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণ মূলত অকার্যকর হয়ে পড়ে। প্রত্যেক পুত্র তার নিজ শাসনাঞ্চলে অতিরিক্ত ট্যাক্স, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং রাজকোষ কুক্ষিগত করে সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে। গরিব, অসহায়, মাজলুম কৃষক ও সাধারণ জনতা জুলুমের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকে। কমবেশি প্রতিটি অঞ্চলে জনগণের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে; তবু কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কানে সামান্য খবর পৌঁছানোর কোনো সুযোগ ছিল না। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতির দিকে গেলে স্থানীয় জনগণ

তাদের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। দেখতে দেখতে চারদিকে বিদ্রোহ দানা বাধতে থাকে। ছোট ছোট গোত্রের সরদাররা এ সময় আফগানিস্তানের চলমান প্রশাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে ওঠেন।

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ খান সারেলি ও ইয়ার মুহাম্মাদ খান তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা প্রদান করেন। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে শাবারগান অঞ্চলের ক্ষুব্ধ জনতা মির হাকিম খানের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তোখি ও হোতাক অঞ্চল বিদ্রোহী কার্যক্রমের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। তবে প্রশাসন অত্যন্ত শক্ত হাতে প্রতিটি বিদ্রোহকে দমন করে।

ইংরেজদের সঙ্গে নতুন চুক্তি

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার দুর্বল হয়ে পড়া শাসনভার মজবুত করা এবং ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় করতে পুত্র ও সালতানাতের উত্তরাধিকারী গোলাম হায়দার খানকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান। হায়দার খান ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লরেন্সের সঙ্গে ঐতিহাসিক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিকে 'জামরুদের চুক্তি' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এই চুক্তির অধীনে দোস্ত মুহাম্মাদ খান ইংরেজদের সার্বিক সহায়তা লাভ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে সব ধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি তাকে আফগানিস্তানের সর্বজনীন ও স্থায়ী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপরই দোস্ত মুহাম্মাদ খান কান্দাহারের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সে সময় কান্দাহার আফগানিস্তানের সীমানা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ছোট্ট সালতানাত। তবে এই সালতানাতের প্রশাসক তেমন অভিজ্ঞ না হওয়ায় কান্দাহারের সামগ্রিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও গোলমেলে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রশাসক কুহান দিল খান মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরপরই ১৪ জন উদীয়মান গোত্রপতি নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই শুরু করে দেয়। প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দোস্ত মুহাম্মাদ খান অভিযান চালিয়ে কান্দাহার দখল করে নেন। এদিকে পশ্চিমের বিশাল হেরাত প্রদেশ তখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে শাসিত হচ্ছিল। তবে সেখানকার প্রশাসক ইয়ার মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু হলে হেরাতেও তৈরি হয় প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইরানি সালতানাত সেনাবাহিনী পরিচালনা করে খুব সহজেই দখল করে নেয় হেরাতের মতো সুবিশাল নগরী।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের হাতে ছিল ব্রিটিশদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সব ধরনের সহায়তার আশ্বাসবাণী। এ সময় তিনি ইংরেজদের সঙ্গে নতুন আরেকটি সম্পূরক চুক্তি

স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির অধীনে হেরাত থেকে ইরানিদের বিতাড়িত করে হেরাতকে আফগানিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়। বিনিময়ে ইংরেজরা গ্রহণ করে বেশ কয়েকটি স্বার্থবাদী প্রকল্প। ৬ জানুয়ারি ১৮৫৭ দোস্ত মুহাম্মাদ খানের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্চে ইংরেজরা সামান্য কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই হেরাতকে ইরানিদের হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়; বিনিময়ে লাভ করে অমূল্য কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা।

হেরাতে সুলতান আহমাদের শাসন

ইরানের সেনাবাহিনী হেরাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দোস্ত মুহাম্মাদ খানের জামাই ও মুজাহিদদের প্রাক্তন নেতা সুলতান আহমাদ খান শ্বশুরের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে ইরানে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, ব্রিটিশদের কূটনৈতিক চালে আবদ্ধ হয়ে ইরানিরা হেরাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে রাতারাতি সীমান্ত পেরিয়ে হেরাতে উপস্থিত হন। দোস্ত মুহাম্মাদ খান অথবা তার বাহিনী হেরাতে পৌঁছানোর আগেই জনগণ সুলতান আহমাদ খানকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। শ্বশুরের পক্ষে আর নতুন কাউকে শাসক হিসেবে পাঠানোর কোনো সুযোগ ছিল না। এ সময় সুলতান আহমাদ নিজেকে হেরাতের স্বাধীন প্রশাসক হিসেবে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন।

৫ বছর পর্যন্ত শরিয়া মোতাবিক একজন মুজাহিদের মতো তিনি হেরাত শাসন করেন। জনগণ এ সময় অত্যন্ত স্বাধীন, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল জীবন উপহার পেয়েছিল। সুলতান আহমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাও দিন দিন বাড়ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ফারাহ প্রদেশ দখল করে নেন। এ সময় মনে হচ্ছিল, ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে সমগ্র আফগানিস্তান বিজয় তাঁর জন্য সময়ের ব্যাপারমাত্র। ইংরেজরাও তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে তাঁকে শুরুর দিকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতে থাকে। পরবর্তীকালে তাদের কূটনৈতিক জালে আবদ্ধ করার চেষ্টাও করে; কিন্তু সুলতান আহমাদ খান ছিলেন একজন আত্মমর্যাদাশীল প্রজ্ঞাবান আফগান নেতা। তিনি ইংরেজদের ফাঁদে পা দেননি; বরং তাদের সহযোগিতা করা থেকে মুখের ওপর না করে দেন। ফলে ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক নানা প্রকল্প হাতে নেয়। কেননা, সুলতান আহমাদ খান ধীরে ধীরে অত্যন্ত শক্তিমান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন।

আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান তার জামাতা সুলতান আহমাদ খানকে সালতানাতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করতেন। তাঁকে দমনের লক্ষ্যে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে হেরাতের দিকে বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান। সুলতান

আহমাদ খান অবরুদ্ধ অবস্থায় অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। টানা কয়েক মাস দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। অবশেষে প্রয়োজনীয় রসদের জোগান বন্ধ থাকায় শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পাশাপাশি নানা রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। লোকেরা দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। সুলতান আহমাদের প্রিয়তমা স্ত্রী ও দোস্ত মুহাম্মাদ খানের কলিজার টুকরো মেয়ে এ সময় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভদ্রমহিলার মৃত্যুতে উভয় শিবিরেই নেমে আসে শোকাবহ পরিস্থিতি। এ সময় যুদ্ধবিরতি দেওয়া হয়। দু-পক্ষের সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে দোস্ত মুহাম্মাদ খানের কন্যার জানাজা আদায় করে।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের দখলে হেরাত

এই ঘটনার তিন মাস পর প্রিয়তমা স্ত্রীর শোকে শোকাহত স্বামী সুলতান আহমাদ খান নিজেও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ৬ এপ্রিল ১৮৬৩ তিনিও পরকালের পথে যাত্রা করেন। সুলতানের ইনতিকালের পরও নগরবাসী এক মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় শহর প্রতিরক্ষা করে যায়; কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদ না থাকায় তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে হয়েছিল।

এক মাস পর অর্থাৎ, ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে হেরাত নগরী দোস্ত মুহাম্মাদ খানের হাতে চলে যায়। এভাবে ধারাবাহিকভাবে কান্দাহার ও হেরাতের মতো বৃহত্তম দুটি শহর দীর্ঘদিন পর আফগানিস্তানের প্রাচীন মানচিত্রে নিজেদের যে স্থান, যেকোনোভাবেই হোক সেটি অর্জন করে নেয়।

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের ইনতিকাল এবং গৃহযুদ্ধে আফগানিস্তান

হেরাত বিজয়ের পর দোস্ত মুহাম্মাদ খান খুব বেশি দিন আফগানিস্তান শাসন করতে পারেননি। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের জুনে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো পার করছিলেন। একদিন এভাবেই হঠাৎ করে সুবিশাল সালতানাত ছেড়ে পরকালের পথে যাত্রা করেন তিনি। সরদার পাইন্দা খানের ১৮ পুত্রের মধ্যে দোস্ত মুহাম্মাদ খান আফগানিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তার জীবন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কখনো তার মাথায় শোভা পেয়েছে ক্ষমতার মুকুট, আবার কখনো বরণ করেছেন বন্দিত্বের হাতকড়া। কখনো বরণ করতে হয়েছে নির্বাসন। আমরা তাকে কখনো শক্তিমান বিজেতাদের কাতারে দেখতে পাই, আবার কখনো তাকে দেখি শত্রুদের সামনে নতজানু একজন কাপুরুষ শাসক হিসেবে। যদিও তার জীবনের শেষ বছরগুলো একজন স্বাধীন-সার্বভৌম স্বৈরশাসকের ভূমিকায়

কেটেছে। এ সময় তার রাজনৈতিক সকল প্রতিপক্ষকে তিনি কোণঠাসা করতে সক্ষম হন। ব্রিটিশ রাজশক্তির সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

আফগানিস্তানের অনেক ইতিহাসবিদ তাকে একজন জাতীয় নেতা হিসেবে বীরের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। কেননা, তিনি তার শাসনামলে আফগানিস্তানকে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একইসঙ্গে কান্দাহার ও হেরাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ পুনরায় আফগানিস্তানের মানচিত্রে যুক্ত করতে সমর্থ হন তিনি। তবে বিশ্বজুড়ে জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে পরাশক্তি হয়ে ওঠা ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে তার দহরম-মহরম সম্পর্ক এবং আফগানিস্তানের তুমুল জনপ্রিয় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে একে একে হত্যা করার মতো ঘৃণিত কার্যক্রমের দায়ভার কখনো তিনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। এ ছাড়া স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন, তা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি জেলা ও প্রদেশের গভর্নর এবং বাহিনীকে বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রতিটি অংশের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছিলেন একেকজন শাহজাদাকে। এই শাহজাদাদের স্বেচ্ছাচারিতা, অবর্ণনীয় জুলুম-দুর্নীতি আফগানিস্তানকে কার্যত লুটেরাদের সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল। দোস্ত মুহাম্মাদ খানের এসব কার্যক্রম পর্যালোচনা করে তাকে কোনোভাবেই জনদরদি ও কল্যাণকামী শাসক হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মুহাম্মাদ খানের ইনতিকালের পর শুরু হয় বহুল কাঙ্ক্ষিত সেই গৃহযুদ্ধ—যেটি তিনি তার সন্তানদের গভর্নর ও সিপাহসালারের পদ অর্পণ করার মাধ্যমে বীজ হিসেবে বপন করেছিলেন—ধীরে ধীরে সমগ্র আফগানিস্তানে শাহজাদাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শের আলি খান, মুহাম্মাদ আজম খান ও মুহাম্মাদ আফজাল খান। মুহাম্মাদ আফজাল খানের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে এই গৃহযুদ্ধের পরিবেশে সঙ্গ দিয়েছিলেন তার যুদ্ধবাজ পুত্র আবদুর রাহমান খান। পিতার সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে এই আবদুর রাহমান খান 'আমির আবদুর রাহমান খান' নামে আফগানিস্তানের বিখ্যাত শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন।

নতুন শাসক শের আলি খান

দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্রদের মধ্যে তৈরি হওয়া তুমুল গৃহযুদ্ধ ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত চলমান থাকে। ধারাবাহিকভাবে চলা পাঁচ বছরের এই গৃহযুদ্ধের বিস্তারিত ইতিহাস জানা আমাদের জন্য ততটা জরুরি নয়। তবে যুদ্ধের উপসংহার হিসেবে আমরা এতটুকু জানলেই হবে যে, যুদ্ধ শেষে বিজয় এসেছিল শের আলি খানের হাতে।

শের আলি খান অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধে আফগানিস্তান আগের চেয়ে অধিক ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে যায়। ক্ষমতা গ্রহণের পর তাই শের আলি খানের সামনে প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় আফগানিস্তানের পুনর্গঠন। তাঁর পিতার শাসনামল এবং গৃহযুদ্ধ মিলিয়ে সুদীর্ঘকাল যাবৎ আফগানিস্তান কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারেনি; বরং প্রতিনিয়ত অবনমনের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। এ সময় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সালতানাতের সীমানা বৃদ্ধিতে কোনো আগ্রহ দেখাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রশাসনিকভাবে অক্ষম আফগানিস্তান নতুন সীমানার ভার বহন করতে পারবে না। তিনি আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের ছেড়ে দেওয়া সীমানা পর্যন্তই আফগানিস্তানকে ধরে রাখেন। এরপর শুরু করেন অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন। যদিও তিনি খুব বেশি সময় পাননি। তারপরও মাত্র কয়েক বছরে আফগানিস্তানকে খাদের কিনারা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। পূর্ববর্তী কয়েক যুগে জুলুম-অত্যাচারের রীতিনীতি তিনি বিলুপ্ত করেন। সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী নীতিমালা পরিবর্তন করে জনকল্যাণমূলক নীতিমালা প্রবর্তন করেন। প্রতিটি অঞ্চলে সেনাছাউনিকে শহর থেকে বের করে দূরবর্তী অঞ্চলে স্থাপন করেন। কৃষক-মজুর এবং স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ীদের সরকারি কোষাগার থেকে ভর্তুকি প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালান। হাজার হাজার বেকার যুবককে পুঁজি প্রদান করে নতুন উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করেন।

এ সময় তিনি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন শিক্ষাখাতে। কেননা, দীর্ঘ কয়েক যুগের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের শিক্ষাকার্যক্রম সমগ্র দুনিয়া থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়েছিল। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং নতুন নতুন কলাকৌশল প্রবর্তনে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে আফগানিস্তানে প্রকাশনা যুগের সূচনা হয়। স্থাপন করা হয় আধুনিক যুগের প্রেস। এ সময় ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী *শামসুন নাহার* নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা সরকারিভাবে বেরোনো শুরু হয়। এই *পাক্ষিকের* সম্পাদক ছিলেন হাজি মুহাম্মাদ হাসান খান। সেনাবাহিনীকে আধুনিক ধাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিলেন শের আলি খান। নতুন নতুন অস্ত্রাগারও এ সময় তিনি নির্মাণ করেন। সরকারিভাবে এই অস্ত্রাগারে নির্মিত হতো বন্দুক, বারুদ ও পিস্তল। বারুদ নির্মাণশিল্পে আফগানিস্তান এই সময় প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে শের আলি খান কাবুলের উত্তর দিকে শেরপুর নামে একটি নতুন জনবসতি গড়ে তোলেন। পাশাপাশি নির্মাণ করা হয় একটি ছোট্ট সেনাছাউনি। সুনিপুণ আর চমৎকারভাবে ঢেলে সাজানো হয় এই অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা। বসতির চারদিকে শের খান তৈরি করেন ২০ ফিট উঁচু নগরপ্রাচীর, ১ হাজার সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার

ও ৬ হাজার কারিগরের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে এই বসতি নির্মাণকাজ; কিন্তু পরে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেলে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা আর সম্ভব হয়নি।

সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি

আফগানিস্তান এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে; কিন্তু এই যুদ্ধের আলোচনা একপাশে রেখে এই মুহূর্তে এমন এক ব্যক্তিকে আমাদের জানা উচিত, যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আফগানি চিন্তাবিদ। ইসলামপ্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর চিন্তাধারা ও সংস্কারমূলক নীতিনির্ধারণীগুলো ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মুসলিমবিশ্বের অধিকাংশ ইসলামি আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। ইসলামের বিজয়ের জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকা মহান এই মনীষীর নাম জামালুদ্দিন আফগানি রাহ.।

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ—১২৫৪ হিজরিতে বর্তমান কুনার প্রদেশের আসাদ আবাদ নামক জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিমবিশ্বের রাজনীতিকে পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত করা এবং পশ্চিম থেকে আসা বিধ্বংসী চিন্তাধারাকে রুখে দেওয়া ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। সাইয়িদ জামালুদ্দিন একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও বাগ্মী বক্তা ছিলেন। তিনি একাধারে পশতু, ফারসি, আরবি, তুর্কি, রুশ ও ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে হিন্দুস্থান, ইরাক, সিরিয়া ও হিজাজ সফর করেন। এ সময় তিনি ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ইউরোপীয় দর্শন ও পশ্চিমা চিন্তাধারার ওপর অত্যন্ত গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের কারণে আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান তাঁকে নিজ দরবারে জায়গা করে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। ফলে তাঁকে সেভাবে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীকালে শের আলি খানের শাসনামলে তিনি অত্যন্ত সমাদর লাভ করেন। তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে শের আলি খান যথাযথ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং সাইয়িদ সাহেবের বিরোধীপক্ষের অবিরত বিরোধিতার কারণে একসময় তিনি মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হন। চলে যান হিন্দুস্থানে। পরে জীবনের নানা পর্যায়ে মিসর, তুরস্ক, ইরান, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানিতে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ভ্রমণ এবং অবস্থান করেন।

সাইয়িদ সাহেবের সারা জীবনের প্রচারিত দাওয়াতের মিশন ছিল, ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রিক আন্দোলনের একটি রূপরেখা দাঁড় করানো। তিনি মূলত 'প্যান ইসলামিজম' (Pan Islamism) নামে একটি চিন্তাধারা নিয়ে সামনে এগোচ্ছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল, মুসলিমবিশ্বের জিহাদি ও বিপ্লবী মানসিকতার যুবকদের একটি

আন্দোলনের অধীনে নিয়ে এসে খিলাফতব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি পশ্চিমা শক্তির বিধ্বংসী চিন্তাধারা ও ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুসলিমবিশ্বকে মুক্ত করতে হবে। সুদূরপ্রসারী এই মিশনের জন্য তিনি ইউরোপে বহুবার সফর করেছেন।

তাঁর দাওয়াতি মিশনের ফলে মুসলিমবিশ্বের চিন্তাশীল মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। সফর অবস্থায় বেশ কয়েকবার বিরোধী রাষ্ট্রগুলো তাঁকে জেল-জুলুম ও নজরবন্দি করেছিল। কোনো কোনো দেশ তাঁকে জোরপূর্বক দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। তবু সাহস হারাননি ক্ষণজন্মা এই ব্যক্তি। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে অবস্থানের সময় তিনি একটি পত্রিকা বের করেন। কিছুদিন পর তিনি দারুল খিলাফাহ ইসতাম্বুলে চলে আসেন। জীবনের শেষ পাঁচটি বছর তিনি এখানেই কাটিয়ে দেন।

মরহুম সাইয়িদ সাহেবের বিপ্লবী আন্দোলনের রূপরেখা অনুসরণ করে আফগানিস্তান, হিন্দুস্থান, মিসর, তুরস্ক ও বৃহত্তর সিরিয়ায় অনেক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে জেগে ওঠা ইসলামি এই আন্দোলনগুলোর নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারায় সাইয়িদ সাহেবের চিন্তার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জীবনভর পশ্চিমা দর্শন ও ইউরোপীয় চিন্তাধারা অধ্যয়নের ফলে সাইয়িদ সাহেবের মানসপটে কিছুটা আধুনিক মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। ইসলামকে তিনি যেই আতশকাচের মাধ্যমে দেখা শুরু করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিগত ১৩০০ বছরের মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহদের চিন্তাধারার বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয়। যার ফলে অসাধারণ বৈচিত্র্যময় ও বিপ্লবী জীবনের অধিকারী হওয়ার পরেও সাইয়িদ সাহেবের সামগ্রিক চিন্তাধারাকে উম্মতের অধিকাংশ আলিম বিশুদ্ধ ও সঠিক চিন্তাধারা হিসেবে গ্রহণ করেননি।

ফিরিঙ্গিদের নতুন কূটচাল

শের আলি খানের শাসনামলে আফগানিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। চতুর ইংরেজরা লোভাতুর দৃষ্টিতে আবারও আফগানিস্তানে সুসংহত হয়ে ওঠা সমাজের দিকে নজর দিতে শুরু করে। আগের মতো আফগানিস্তানের অমূল্য সম্পদ লুটের কূটচাল তাদের মাথায় জেগে ওঠে; কিন্তু অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ তারা সহজে ভোলেনি। তাই শের আলি খানের উপস্থিতিতে আফগানিস্তান আক্রমণের কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারছিল না।

এদিকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়। এর রেশ তখনো কাটেনি। ওদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আফগানিস্তান বিষয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় দুটি পক্ষ। এক পক্ষ সরাসরি আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে

মতামত দিচ্ছিল; কিন্তু অপর পক্ষ আগের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে এই ফাঁদে পা দিতে বারণ করছিল। পরে সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত আফগানিস্তানে রাজনীতি ও কূটনীতির মারপ্যাঁচ দিয়ে শাসকদের কাবু করার চেষ্টা করা হবে।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করে। প্রথমে তারা আমির শের আলি খানকে হিন্দুস্থানে সরকারিভাবে সফরের আমন্ত্রণ জানায়। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সঙ্গে পুনরায় দোস্ত মুহাম্মাদ খানের মতো একতরফা চুক্তি স্বাক্ষর করবে; কিন্তু এতসব বোঝার পরেও শের আলি খান অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ২৭ মার্চ ১৮৬৯ আম্বালার দুর্গে ইংরেজদের সঙ্গে আমির শের আলি খানের দীর্ঘ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের পক্ষে উপস্থিত ছিল ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো। কিন্তু আলোচনার শুরুতেই ইংরেজদের কোনো সুযোগ না দিয়ে শের আলি খান অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমি আমার পিতার করে যাওয়া একতরফা চুক্তিগুলো নবায়ন করতে আসিনি। আমার পিতার সেই চুক্তিগুলোর ফলে আফগানিস্তান বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমি নতুনভাবে আপনাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ভিত্তিতে চুক্তি করতে এসেছি।' এ কথা বলে তিনি দ্বিপাক্ষিক স্বার্থরক্ষা করে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখ করেন, যেখানে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ রাজশক্তি দুটো সমপর্যায়ের রাষ্ট্র হিসেবে একে অপরকে বন্ধুত্বসুলভ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

কিন্তু ইংরেজরা কোনোভাবেই এ ধরনের চুক্তি মেনে নিতে রাজি ছিল না। তারা পুনরায় শের আলি খানের সামনে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করে, এমনসব শর্ত উল্লেখ করতে থাকে। শের আলি খান একপর্যায়ে গর্জে ওঠে বলেন, 'আমি এখানে আপনাদের ক্রীড়নক হিসেবে আসিনি।' অবশেষে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় একটি সাধারণ আনুষ্ঠানিক সফর শেষে শের আলি খান আফগানিস্তানের ফিরে আসেন।

দ্য গ্রেট গেম

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হলে ইংরেজরা তাদের শাসনভার পরিচালনার বৈধতা পেয়ে যায়। এ সময় হিন্দুস্থানকে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে না রেখে সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তির মাধ্যমে শাসন করতে শুরু করে। ফলে সমগ্র হিন্দুস্থান ব্রিটিশ রাজশক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়। এ ঘটনার কিছুদিন পর আমির শের আলি খানের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি, যে কারণে এবার ব্রিটিশ রাজশক্তি আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের কথা ভাবছিল।

ঠিক একই সময়ে উত্তর মেরুর বরফাচ্ছন্ন অঞ্চল রাশিয়া ধীরে ধীরে তার ভাল্লুকের

থাবা বিস্তৃত করতে শুরু করে। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য একের পর এক মুসলিম মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত প্রদেশগুলো দখল করতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদীদের জন্য তখন রাশিয়ান রাজশক্তি একটি বড় প্রতিপক্ষ ছিল। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার জার সম্রাট উজবেকিস্তানের খিভা পর্যন্ত দখল করে নেয়। এ শহরটি একদম আমু দরিয়ার কিনারে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলের ঠিক পরেই ছিল আফগানিস্তানের সীমানা। যদিও আফগানিস্তানের সঙ্গে রাশিয়া কূটনৈতিকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল; কিন্তু এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না যে, যেকোনো দিন যেকোনো মুহূর্তে রাশিয়ার জার শাহি আফগান সীমানায় তার সেনা নিয়ে উপস্থিত হয়ে যেতে পারে।

কার্যত রাশিয়ার সেনাবাহিনী হিন্দুস্থান সীমানার একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তি এ সময় হকচকিয়ে যায়। দুটি পরাশক্তি একটি সরলরেখায় এসে পড়ার মানেই হলো বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া। এ জন্য ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড লিটন একটি সামরিক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করছিল। তার ভাবনা ছিল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস বাহিনীকে হিন্দুকুশের গিরিখাতে সার্বক্ষণিক মোতায়েন করে রাখবে। এতে করে রাশিয়া সময় চাইলেও হিন্দুস্থানে অতর্কিত আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু এই সেনা মোতায়েনের জন্য তার প্রয়োজন আফগানিস্তানের শাসকদের অনুমোদন। তার ভালো করেই জানা ছিল, শের আলি খান খুব সহজেই এই অনুমোদন দেবেন না।

তবে লর্ড লিটন আফগানিস্তানের ইতিহাস, রাজনীতি এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রথা-প্রচলন সম্পর্কে অবগত ছিল। সে জানত, ইতিহাসের এই দোদুল্যমান মুহূর্তে আফগানিস্তান কোনোভাবেই নিরপেক্ষ থাকবে না। তার একটি বাক্য এ সময় অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে পড়ে, 'আফগানিস্তান ব্রিটিশ রাজশক্তির পক্ষে থাকবে অথবা তারা রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করবে।'

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে পেশোয়ারে আমির শের আলি খান ও ইংরেজদের মধ্যে সেনা মোতায়েন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এ সময় আমিরের পক্ষ থেকে আলোচনায় প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সাইয়িদ নুর মুহাম্মাদ খান। বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ, দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান কূটনীতিবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ ছাড়া ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে একমত পোষণ করেননি। হিন্দুকুশের গিরিখাতে শুধু ব্রিটিশ সেনা মোতায়েন থাকবে, এটা তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনা কোনো সিদ্ধান্ত বয়ে আনেনি। কিছুদিন পর মার্চে ইতিহাসবিখ্যাত এই কূটনীতিবিদ পেশোয়ারে ইনতিকাল করেন। ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে এমন মহান কূটনীতিবিদের ইনতিকালে আফগানিস্তান রাজনৈতিকভাবে অনেক বড় ধাক্কা খায়।

রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্তানের চুক্তি

ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে ব্যর্থ শান্তি-আলোচনার পর শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে আরেক পরাশক্তি রাশিয়া। ব্রিটিশরা বহু চেষ্টা করেও আলোচনায় আর ফিরে আসতে পারেনি। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে হিন্দুস্থানে তাদের ফিরে যেতে হয়। তবে তারা আফগানিস্তানের শাসকমহলে ব্রিটিশ এজেন্ট নিয়োগ দিতে সক্ষম হয়। এদিকে কাবুলে নিয়মিত জার সম্রাটের দূত আসা-যাওয়া শুরু করে। বেশ কয়েক দফা আলোচনার পর আফগানিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের নামে হলেও খাতা-কলমে আফগানিস্তানের স্বার্থকে এগিয়ে রেখেছিল। চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া সময়-সুযোগমতো হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে এলে আফগানিস্তান তাকে হিন্দুস্থানে এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেবে। প্রয়োজনে সেনা-সহযোগিতা ও রসদপ্রবাহে সাহায্য করবে। বিনিময়ে রাশিয়া যদি হিন্দুস্থান বিজয় করতে পারে, তাহলে কাশমির, পাঞ্জাব, ডেরা গাজি খান, পেশোয়ার ও বেলুচিস্তান প্রদেশকে আফগান সার্বভৌমত্বে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ফিরিঙ্গিদের গুপ্তচরবৃত্তি

ঐতিহাসিক গ্রেট গেমে পিছিয়ে পড়ায় ব্রিটিশরা এবার শুরু করে গুপ্তচরবৃত্তির নতুন অভিযান। শের আলি খানের দরবারে কাজি আবদুল কাদির নামের ব্রিটিশদের এক গোয়েন্দা কাজ করত। রাশিয়ার সঙ্গে হওয়া শান্তিচুক্তির সকল আলোচনা সে গোপনে নথিবদ্ধ করেছিল। পরে এগুলো ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়।

আমির শের আলি খান তখন অনুভব করেন, ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি তাঁর কাছে নেই। বেশ কজন উজির ও দরবারি ইতিমধ্যে ব্রিটিশদের অনুগত দাসে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন গোত্রপতি বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়ে আছে। শুধু ব্রিটিশদের একটি ইশারা এলেই পুরো দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

সে সময়ে মাজার-ই-শরিফের তাগারাশাহ নামে একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ছিল। এই ব্যক্তি এক বৈঠকে হাজার হাজার দিরহাম ও হাদিয়া-তোহফা জনতার কাছ থেকে আদায় করতে পারত। ফলে তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সাধারণ জনগণ তো বটেই, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উজিররা পর্যন্ত তাকে অসীম শ্রদ্ধা করত। বেশ কজন উজির-নাজির তার ভক্তে পরিণত হয়। শহরের বাইরে ছিল তার বাসস্থান। বিরাট একটি মহল ছিল এই বাড়ি। সব ধরনের উপভোগ্য আসবাবপত্র ছিল সেখানে। এই ভন্ড পিরের যখন মৃত্যু হয়, তখন তার বাড়িতে কোনো কারণে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেখানে

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র থেকে শুরু করে ইউরোপীয় মদের বোতলের সারি এবং নানা ধরনের উপভোগের উপায়-উপকরণ পাওয়া গিয়েছিল। ভাবুন অবস্থা!

বুজুর্গের ছদ্মবেশে এই ব্যক্তি ছিল ব্রিটিশদের একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা। ইসলামকে কলুষিত এবং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করতে এমন শত শত ব্যক্তি সে সময় দেশজুড়ে কাজ করে যাচ্ছিল।

দ্বিধান্বিত শের আলি

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চার দশক পর আবারও নতুনভাবে আফগানিস্তান নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এ সময় সার্বিক পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছিল। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে গত চার দশকে ব্রিটিশরা পুরো বিশ্ব থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিল। টেলিগ্রাফ, রেলগাড়িসহ বেশ কয়েকটি আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম আবিষ্কৃত হওয়ায় তারা এবার নতুনভাবে আফগানিস্তান বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আগে তাদের সেনাছাউনি ছিল শুধু দক্ষিণ ও মধ্য-হিন্দুস্থানে। আফগানিস্তান ও তাদের পূর্ব সীমানার মধ্যে ছিল ৭০০ মাইলের ব্যবধান। সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল শক্তিশালী শিখ সাম্রাজ্য। দীর্ঘ এই পথ অতিক্রম করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তান আক্রমণ করতে হয়েছিল। রসদপ্রবাহের কোনো সুযোগ বা জটিল মুহূর্তে সামরিক সাহায্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না জেনেও তারা আফগানিস্তানে আক্রমণের দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

কিন্তু এই দফা পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন তারা রেলগাড়ির সাহায্যে হিন্দুস্থানের যেকোনো জায়গায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারে। মূলত হিন্দুস্থানের উন্নতি নয়, নিজেদের সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করতে তারা নতুন নতুন আবিষ্কৃত সকল যোগাযোগব্যবস্থা হিন্দুস্থানে স্থাপন করেছিল। এ সময় হিন্দুস্থানজুড়ে টেলিগ্রাফের তার বিছানো হয়। চোখের পলকে তারা শত শত মাইল দূরে তাদের বার্তা পৌঁছাতে পারত। দার্জিলিং থেকে শুরু করে কন্যাকুমারী, কলকাতা থেকে শুরু করে পেশোয়ার পর্যন্ত ব্রিটিশরা রেলপথ চালু করে ফেলেছিল। এ ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন নয়; বরং এখন চলছিল সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন। প্রশাসনিকভাবে নতুন শক্তি সংযোজনের ফলে ব্রিটিশরা ছিল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। এ সময় শিখ সাম্রাজ্য অস্তমিত হয়ে পড়েছিল; আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যোদয় হয়েছিল পাঞ্জাবের দিগন্তে।

অপরদিকে আফগানিস্তান তুলনামূলকভাবে শত বছর পিছিয়ে পড়েছিল। প্রশাসনিকভাবে বিক্ষিপ্ততার শিকার ছিল আফগান সরকার। সামরিক দিক থেকে তো তারা ব্রিটিশদের

সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় ছিল না। ৫০ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনী থাকলেও সাজসরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র ছিল হাতে গোনা, তা-ও পুরানো। বিগত ৪০ বছরে উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো সংযোজন হয়নি এই কাঠামোতে। দোস্ত মুহাম্মাদ খানের শাসনামলে কিছুটা উন্নতি করলেও শের আলি খানের শাসনামলে আফগানরা গ্রেট গেমের শিকার হয়। ফলে দুই পরাশক্তির মধ্যে বাফার জোন[১] (Buffer Zone) হয়ে পড়ায় নিজেরা তেমন প্রবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়নি। পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্য থেকে তারা শত বছর পেছনে পড়ে যায়।

উপরিউক্ত কার্যকারণগুলোর ফলে শের আলি খানের পক্ষে সরাসরি ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে নামা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে ব্রিটিশরা সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও জনজীবনে শৃঙ্খলা ধরে রাখলেও শের আলি খান খুব ভালো করেই জানতেন, ব্রিটিশ গোয়েন্দাচক্র যেকোনো মুহূর্তে তাঁর প্রশাসনকে দুর্বল করে দিতে পারে। তিনি ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান হলেও সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। সামরিক শক্তিতে তাঁর বাহিনী সমকালীন যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এমন দুর্বল ও নাজুক অবস্থায় তিনি দুই পরাশক্তির মধ্যে অসহায়ের মতো ঝুলতে থাকেন।

অভিযানের প্রস্তুতি এবং সন্ধি আলোচনা

ইংরেজরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সিন্ধু নদের উপর এ সময় একটি নতুন সামরিক সেতু নির্মাণ করা হয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যেন খুব দ্রুত অতিক্রম করতে পারে, এ জন্য নতুন এ সেতুটি তৈরি করা। এ ছাড়া কোয়েটা, বেলুচিস্তান ও ওয়াজিরিস্তান থেকে রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত নানা জায়গায় ছোট ছোট সেনাছাউনি ও সরাইখানা তৈরি করা হয়। এর পরপরই ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল জেনারেল নভেল চেম্বারলিন ও স্যার লিও কাভাগনারি (Louis Napoleon Cavagnari) ১ হাজার সেনাসহ হিন্দুস্থান-আফগানের সীমান্তে এসে পৌঁছায়। দিনটি ছিল ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ। সীমান্তের এই স্থানকে বলা হতো আলি মসজিদ। আমির শের আলি খান ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতির খবর শুনে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পাঠানো প্রতিনিধিদল সীমান্তে এসে ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনায় বসে।

ইংরেজরা এবার তুলনামূলক শক্তিশালী অবস্থানে থাকায় আগের মতো একতরফা শর্ত উল্লেখ করতে থাকে। তাদের প্রধান প্রস্তাব ছিল, কাবুল থেকে রুশ গোয়েন্দাদল ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ফেরত পাঠাতে হবে। ইংরেজদের একটি সেনাদল এবং

[১] এমন ভূখণ্ড—দুটি বৃহৎ শক্তি বা পরাশক্তি নিজেদের ভৌগলিক সীমার মধ্যে যাকে নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে তাদের শক্তি পরীক্ষার স্থানও হয়ে পড়ে এই বাফার জোনগুলো।

কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক মিশন স্থাপনের সুযোগ দিতে হবে। আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিকে ব্রিটিশদের চাহিদামতো পুনরায় ঢেলে সাজাতে হবে। বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি আফগানিস্তানকে প্রতিবছর ১২ লাখ রুপি সহযোগিতা প্রদান করবে। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য তারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে এখানে এসেছে।

ইংরেজদের আক্রমণ : খাইবারের যুদ্ধ

পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেলেও শের আলি খান ভেবেছিলেন, ইংরেজরা হয়তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য হুমকি দিচ্ছে; কিন্তু তারা এবার সত্যিই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আফগান সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, দুর্বল শত্রুকে ব্রিটিশরা কখনো ছেড়ে দিত না।

২১ নভেম্বর ১৮৭৮। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী তিনটি গিরিপথ ধরে আফগানিস্তানে আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণ এত দ্রুত ও অতর্কিত ছিল যে, আফগান প্রশাসন ও সেনাবাহিনী প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে নেওয়ারও সময় পায়নি। এমনকি তারা মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিল না। শের আলি খান প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ভেবে তাঁর বাহিনীকে কৌশলগতভাবে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তিনি জনগণকে এই আশ্বাস দিতে থাকেন, ব্রিটিশদের তিনি আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত থেকে বের করতে পারবেন। তাঁর ঐতিহাসিক বোকামিসূলভ সিদ্ধান্তের কারণে কোথাও আফগান সেনারা প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেয়নি। ফলে বড় শহরগুলো বিনা যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে চলে যেতে থাকে।

ব্রিটিশ জেনারেল ব্রাউন ও জেনারেল মেডকে জালালাবাদ মিশন সোপর্দ করা হয়েছিল। তারা প্রথমে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ২১ নভেম্বর সীমান্তফাঁড়ি আলি মসজিদ অঞ্চলে আক্রমণ করে। মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করেন। জেনারেল ব্রাউনকে বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের অতিরিক্ত রসদ পৌঁছে গেলে ২২ নভেম্বর তারা আলি মসজিদ দখল করে ফেলে।

সীমান্ত অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেলেও আফগানরা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে আসেনি। প্রথমে আফ্রিদি গোত্র অসম বীরত্ব ও প্রচণ্ড সাহসিকতা দেখিয়ে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করে। তারা দিনরাত এক করে ব্রিটিশদের ওপর দফায় দফায় হামলা করতে থাকে। এ সময় তাদের সঙ্গে মেহমান্দ ও শিনওয়ারি গোত্র যোগ দেয়। একইসঙ্গে সোয়াত ও বুনিরের আলিমরা সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণা করেন। ফলে আপামর জনতা জিহাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ময়দানে নেমে আসে। ব্রিটিশদের শক্তি খর্ব করতে তারা বেছে নেয় রসদপ্রবাহের দীর্ঘ সারির ওপর গেরিলা আক্রমণ। আফ্রিদি গোত্রের যুবকরা এত শক্তিশালী আক্রমণ করত যে, ব্রিটিশরা হতোদ্যম হয়ে পড়ত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কামান ও ভারবাহী

পশুর পাল। টানা কয়েকদিন তারা এত বেশি সফল গেরিলা আক্রমণ করেন যে, বেশ কিছুদিনের জন্য আফগানিস্তানে ব্রিটিশ শক্তির রসদপ্রবাহ বন্ধ হয়ে পড়ে।

এ সময় জেনারেল ব্রাউন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জালালাবাদ দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এখানে আফগান প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন বাধা না আসায় সে জালালাবাদ দখলে সক্ষম হয়। তবে স্থানীয় জনগণ কোনোভাবেই ব্রিটিশ রাজশক্তির সামনে মাথা নত করতে রাজি ছিল না। জালালাবাদের পতন হলে লাঘমান থেকে ইসমাতুল্লাহ খান নামে একজন মুজাহিদ নেতা গোত্রীয় সদস্যদের একত্রিত করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি ময়দানে দু-পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই সংঘটিত হয়; কিন্তু বীরবাহাদুর এই যোদ্ধাদের কাছে তরবারি ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। ফলে ব্রিটিশরা দূর থেকে কামান নিক্ষেপ করলে তাদের পক্ষে যুদ্ধে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসমাতুল্লাহ খানের বহুসংখ্যক সঙ্গী শহিদ হয়ে গেলে তিনিও পিছু হটতে বাধ্য হন।

কান্দাহারের যুদ্ধক্ষেত্রে

ব্রিটিশ জেনারেল ডোনাল্ড স্টুয়ার্ট ও জেনারেল বেড উলফ একটি সেনাবাহিনী নিয়ে কোয়েটা ও চমনের রাস্তা ধরে কান্দাহারে পৌঁছে যায়। সেখানকার শাসক আফজাল খান ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যান; কিন্তু স্থানীয় জনগণ বুক চিতিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর অবশ্য তারা পরাজিত হন। এরপর ব্রিটিশদের অনুগত দাস হিসেবে পরিচিত নবাব গোলাম হুসাইনকে কান্দাহারে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। একইসঙ্গে মূল দায়িত্বশীল গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় সনেট জন ডেভিড নামের এক ইংরেজ জেনারেলকে।

কান্দাহার খুব সহজেই বিজয় করে ফেলায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা জেনারেল স্টুয়ার্ট সেনাবাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করে। এক অংশ নিয়ে কালাত দুর্গের দিকে এগিয়ে যায়; আর অপর অংশ জেনারেল বেড উলফের অধীনে গারশাক দুর্গ বিজয় করে। কিন্তু কান্দাহারের আশেপাশের অঞ্চলের জনগণ ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ-আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর চলাচল অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। অবশেষে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় তারা কান্দাহার দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ এবার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর রসদপ্রবাহের রাস্তা অবরোধ করতে শুরু করেন। কান্দাহার নগরের চারপাশে দেখতে দেখতে এত বেশি ভারবাহী পশুর লাশ জমতে থাকে যে, কিছুদিনের মধ্যে কান্দাহারে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে।

নিচের কয়েকটি ঘটনা লক্ষ করলে আমরা সে সময়ে কান্দাহারের জনগণের সাহসী

পদক্ষেপগুলোর কিছু ধারণা লাভ করতে পারব :

- একবার এক কান্দাহারি মুচি ইংরেজ অফিসার জনের ওপর হামলে পড়ে। দুই হাত দিয়ে গলা টিপে তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন এই কান্দাহারি; কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে একজন হিন্দুস্থানি গোলাম এসে তার মনিবকে রক্ষা করে। আত্মমর্যাদাশীল এই মুজাহিদ মুচিকে জনসমক্ষে ফাঁসি দেওয়া হয়।
- নুর আহমাদ কান্দাহারি নামের একজন যুবক সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় হামলা করে কয়েকজন ইংরেজ সেনাকে হত্যা করেন।
- গুলজাই গোত্রের একজন কাঠমিস্ত্রি তাঁর দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ সেনাদের ওপর হামলে পড়েন। একে একে সাতজন ফিরিঙ্গিকে হত্যা এবং চারজনকে আহত করার পর অবশেষে তাঁরা শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।
- কান্দাহারের একটি মাদরাসার পাঁচ শিক্ষার্থী ইংরেজ সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। তিনজনকে হত্যা করার পর তাঁরা নিজেরাও শহিদ হয়ে যান।
- একবার এক লাঠিয়াল কান্দাহারি যুবক একাকী ইংরেজদের তোপখানায় আক্রমণ করে বসেন। তোপখানার তোপচিকে হত্যার পর আরও তিনজন ইংরেজ সেনাকে হত্যা করেন। অবশেষে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের সৌভাগ্য হয় তাঁরও।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য এখানে অবস্থান করা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একটি শান্তিচুক্তির জন্য তারা ছিল বেজায় অপেক্ষমাণ। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা শহর খালি করে হিন্দুস্থানে ফিরে যায়।

খুররম এজেন্সি

ইংলিশ জেনারেল ফ্রেডরিক রবার্টস খুররম এজেন্সির রাস্তা ধরে আফগানিস্তানে প্রবেশ এবং এখানে অবস্থিত শহরগুলো দখলের দায়িত্ব পেয়েছিল। ২১ নভেম্বর ১৮৭৮ তার বাহিনী নিয়ে ঠলের রাস্তা ধরে খুররম এজেন্সিতে প্রবেশ করে। শের আলি খান আগে থেকেই তাঁর বাহিনীকে সীমান্ত অঞ্চল খালি করার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে বিনা প্রতিরোধে তারা এজেন্সি পেরিয়ে আফগান সীমান্তে প্রবেশ করে; কিন্তু পেওয়াড়ের পাহাড়ে অপেক্ষমাণ মুজাহিদদের একটি দল ব্রিটিশদের রক্ত পানের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। কারিম খান, মুহাম্মাদ খান ও আবদুল আলি খান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর আধুনিক সমরাস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে আসেন।

জেনারেল রবার্টস ঠল অঞ্চলে পৌঁছে ঘোষণা করে, সীমান্ত অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন ইংরেজদের অধীনে চলে এসেছে। পাশাপাশি এ ঘোষণা দেওয়া হয়, ইংরেজরা কোনো ধর্মমতের বিরুদ্ধে নয়, তাই সমাজের ধর্মীয় শাস্ত্রবিদদের ধর্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে আসারও কোনো প্রয়োজন নেই। মূলত ইংরেজরা আলিমদের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাকে সমীহ করত। তারা জানত, আলিমরা জনগণের নেতৃত্বে এলে কোনোভাবেই বিদেশি শক্তি হিসেবে সেই অঞ্চলে তারা টিকতে পারবে না। জনগণকে এটাও বোঝানো হয় যে, ইংরেজরা আফগান জনগণের বিরুদ্ধে নয়, তারা শুধু শের আলি খানের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ অবস্থানের কারণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে শের আলি খান ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৮ কাবুলে একটি বড় সভা আয়োজন করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে আলিম, দরবারি উজির-নাজির, মন্ত্রিপরিষদ ও গোত্রপতিরা। এঁদের মধ্যে বিরাট একটি অংশ ব্রিটিশদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে ছিলেন; কিন্তু শের আলি খানের মাথায় চলছিল ভিন্ন একটি পরিকল্পনা। তিনি চাচ্ছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তি নবায়ন করে জোটবদ্ধ হয়ে মাঠে নামতে। কেননা, তার কাছে থাকা সীমিত সামরিক শক্তি দিয়ে ব্রিটিশদের মোকাবিলা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই সভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি বলখ হয়ে রাশিয়া যেতে চাচ্ছি। সেখান থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে ফিরে আসব। আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আফগানদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে।'

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত গণ্যমান্যদের মধ্য থেকে চিৎকারধ্বনি ভেসে আসে—'না না, আপনি যেতে পারেন না। আপনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন। আমরা তির-তরবারি দিয়েই ইংরেজদের বিতাড়িত করব।' কিন্তু শের আলি খান কারও কথা শোনেননি। তিনি আপাতত ইংরেজদের সঙ্গে কোনোভাবেই যুদ্ধে নামতে রাজি ছিলেন না। পরদিন তিনি একটি বড় কাফেলাসহ দ্রুতগতিতে উত্তর-আফগানিস্তানের পথে যাত্রা করেন।

বলখ পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, শহরের প্রশাসক ফয়েজ মুহাম্মাদ খান সীমান্তের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। শহর-প্রশাসকের ভাষ্য ছিল, 'আমরা আমাদের বাদশাহকে দেশ ছেড়ে যেতে দিতে পারি না। আমরা তাঁর উপস্থিতিতে জিহাদের ঘোষণা দিতে চাই। স্বল্প প্রস্তুতি ও সামান্য সরঞ্জাম নিয়েই আমরা এই যুদ্ধে বিজয়ী হব।'

ফয়েজ মুহাম্মাদ খানের এই ভাষ্য বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশশক্তিকে অজেয় মনে হলেও আগ্রাসনের মাত্র দু-মাসের মধ্যে আফগান জনগণ তাদের বেশ কয়েকটি ময়দানে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। সাধারণ সেনা ও শহরের

প্রশাসকরা মাঠ ছেড়ে পালালেও সাধারণ জনতা ব্রিটিশবাহিনীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। জালালাবাদ, খোস্ত ও কান্দাহারের বীর জনতা ব্রিটিশবাহিনীকে শক্তির জানান দিচ্ছিল। এদিকে খোস্তের ময়দান থেকে জেনারেল রবার্টসের পরাজয়ের খবরও আসছিল। জেনারেল রবার্টস খুররম এজেন্সি দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশের পর একটি বড় বাহিনীসহ উত্তর-আফগানিস্তানে অভিযান অব্যাহত রাখে। শুরুতে বেশ কয়েকটি শহর অনায়াসে বিজয় করলেও ধীরে ধীরে আফগান জনগণের সাহসিকতা টের পেতে থাকে সে। মূলত গাদ্দার ও মুনাফিকদের সহযোগিতা ছাড়া তার এই বিজয়গুলো অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

অবশেষে খোস্তের প্রশাসক মুহাম্মাদ আকরম খান বিনা যুদ্ধে অঞ্চলের গোপন ও প্রতিরক্ষামূলক সার্বিক তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপসহ ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন; কিন্তু সাধারণ জনগণ, আলিম ও গোত্রীয় সদস্যরা জেনারেল রবার্টসের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করে রাখেন।

১৭ জানুয়ারি ১৮৯৭। মেঙ্গল, উজির, জাদরান, মেহসুদ ও আলি খেল গোত্রের বীর জনতা হিন্দুকুশের পাহাড় থেকে বীরদর্পে নেমে এসে তুফানের বেগে ইংরেজদের ওপর হামলা করেন। দেখতে দেখতে সারি সারি লাশ পড়ে যায়। ইংরেজরা পরিস্থিতি ঠাহর করতে না পেরে পিছু হটে খোস্ত ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তারা সুলতান জান নামের একজন গাদ্দার মুনাফিককে খোস্তের দায়িত্ব অর্পণ করে। পিছু হটা ইংরেজরা পুনরায় খুররম এজেন্সিতে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করে। এদিকে আত্মমর্যাদাশীল গোত্রীয় শক্তি মুনাফিক সরদারের দুর্গ আক্রমণ করে বসেন। এ সময় খুররম এজেন্সিতে অপেক্ষমাণ জেনারেল রবার্টস পুনরায় শক্তি অর্জন করে আক্রমণের চেষ্টা করছিল। সংবাদ পেয়ে গোত্রীয় শক্তি জেনারেলের বাহিনীকে আরেকবার ধাওয়া দিলে এবার আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ধরে রাখতে পারেনি। ফলে চিরদিনের জন্য খোস্তের মাটি থেকে ইংরেজদের বিদায় নিতে হয়।

খাইবার গিরিপথ হয়ে আফগানিস্তানের প্রবেশকারী জেনারেল ব্রাউন ও জেনারেল মেড নাঙ্গারহারের মাটিতে প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। পেছন থেকে মুজাহিদরা তাদের রসদবাহী কাফেলাকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। মেহসুদ ও উজির গোত্রের সদস্যরা ৪ হাজার বন্দুক হাতে নিয়ে টানাক এলাকায় ব্রিটিশদের এক প্লাটুন সেনার ওপর আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ব্রিটিশবাহিনী। কোহাটের মাটিতেও ইংরেজরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে ৬ হাজার নতুন সেনার একটি তাজাদম বাহিনী কঠিন এই পরিস্থিতিতে পাঠানো হয়েছিল। গোত্রীয় শক্তি অবশেষে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ওদিকে কান্দাহারের মাটিতে অবরুদ্ধ ইংরেজবাহিনীর রসদ ফুরিয়ে আসছিল। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আফগানদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলছিল। এ সময় যদি আফগান মুজাহিদ ও গোত্রীয় বীরদের সঙ্গে সরকারি বাহিনী যুক্ত হয়ে লড়াই করত, তাহলে ইংরেজবাহিনী আগের আফগানযুদ্ধের চেয়েও ন্যক্কারজনকভাবে লেজ গুঁটিয়ে পালাতে বাধ্য হতো। মুজাহিদ ও সাধারণ জনতার এই বিজয়ের পরও শের আলি খানের সাহস সঞ্চার হয়নি। তিনি ইতিপূর্বে ইংরেজদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন আর এবার রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া যুদ্ধের সাহস দেখাতে পারছিলেন না।

এ সময় পরাজিত মানসিকতা নিয়ে শের আলি খান আমু দরিয়ার কিনারে ছাউনি স্থাপন করে রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি রাশিয়ার সাহায্য কামনা করলেও তাকে হতাশ হতে হয়। জার সাম্রাজ্যের শাসকরা তাকে এ সময় কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। উলটো তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ভৌতিক পরামর্শ দেয় শের আলিকে। এদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা হয়ে উঠছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শের আলি খানের হুকুমে সরকারি বাহিনী ও দুর্গের প্রশাসকরা কোনো প্রতিরোধ না করায় ইংরেজরা ধীরে ধীরে আবারও আফগানিস্তানের ভেতরে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে থাকে। শের আলি খানও ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, শেষপর্যন্ত কাবুলে পৌঁছানোর মতো অবস্থাও তাঁর থাকেনি। শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন তিনি। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ৫৬ বছর বয়সি এই শাসক সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

হতভাগা আরেক শাসক ইয়াকুব আলি খান

আমির শের আলি খান কাবুল থেকে মাজার-ই-শরিফের পথে রওনা হওয়ার আগে তাঁর সভাসদরা তাঁকে একজন দায়িত্বশীল উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতে বার বার অনুরোধ করেছিল। মূলত শের আলি খানের পক্ষ থেকে মনোনীত উত্তরাধিকারী পুত্রটি ছিল একেবারে কমবয়সি ও অযোগ্য। তাঁর সবচেয়ে যোগ্য পুত্র ইয়াকুব আলি খানকে তিনি রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দি করে রেখেছেন। বড় বড় যুদ্ধে এই পুত্র নিজের বীরত্ব, সাহসিকতা ও নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি কোমরবন্ধ ও মাথায় হেলমেট পরে অংশ নিতেন। দাঁড়িয়ে থাকতেন সম্মুখসারিতে। শত্রুসারিতে অস্ত্রহাতে প্রবেশ করতেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য জনগণ তাঁকে 'শেরে বাচ্চা' বা 'বাঘের বাচ্চা' উপাধি দিয়েছিল।

গোত্রীয় সরদার ও সরকারি মন্ত্রীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইয়াকুব আলি খান যদি ক্ষমতা

গ্রহণ করেন, তাহলে চলমান জটিল পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধির মাধ্যমে আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে। তাদের বার বার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শের আলি খান অবশেষে তাঁর এই পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে রওনা হয়েছিলেন।

কিন্তু শের আলি খানের মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে যখন ইয়াকুব আলি খান কাবুলের মসনদে আরোহণ করেন, তখন জনগণ অবাক হয়ে লক্ষ করেন, এই সেই ইয়াকুব আলি খান নয়, যাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল আফগান জনগণকে মুক্ত করার প্রত্যয়। এই মুহূর্তে তিনি একজন অক্ষম অথর্ব শাসক ছাড়া ভিন্ন কিছু নন। মূলত দীর্ঘ সাত বছর কারাবরণ তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন অক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। তিনি সত্যিকারার্থেই মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। যেমন, অস্ত্র দেখামাত্র তাঁর চেহারার রং ও ধরন পালটে যেত, যুদ্ধের আলোচনা শুনলে তিনি ভয়ে কুকড়ে যেতেন ইত্যাদি।

ইংরেজদের মৌলিক তিনটি লক্ষ্য

ইয়াকুব আলি খানকে কাবুলের মসনদে দেখার পর ইংরেজরা যারপরনাই খুশি হয়। বিনা যুদ্ধে আফগানিস্তানের মতো অঞ্চল তাদের অধীনে আসবে, এ সংবাদ তাদের আনন্দিত করে তোলে। যুদ্ধ ছাড়া তাদের এত বড় একটি বিজয় অর্জন হবে, এটি তারা কল্পনাও করেনি।

এই মুহূর্তে ইংরেজদের তিনটি মৌলিক লক্ষ্য ছিল—এক. হিন্দুস্থান ও আফগানিস্তানের তিনটি ঐতিহাসিক প্রবেশপথ যথা বোলান পাস, খাইবার পাস ও খুররম এজেন্সির গিরিপথের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। দুই. আফগানিস্তানের সঙ্গে রক্ত ও ঐতিহ্যের বাঁধনে আবদ্ধ গোত্রগুলো, যারা পেশোয়ার থেকে শুরু করে খাইবার ও জালালাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে বসবাস করে, আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত করা। তিন. আফগানিস্তানে রাশিয়ার প্রভাব অস্তমিত করে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করা।

গান্দমাক চুক্তি

এই লক্ষ্যে ইংরেজ প্রতিনিধিদল ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ইয়াকুব আলি খানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। ইয়াকুব আলি খান ব্যক্তিগতভাবে তখন এত দুর্বল ছিলেন যে, আলোচনার শুরুতেই তিনি ইংরেজদের ভয়ে ভীত হয়ে সকল শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিতে উদ্যত হন। এ সময় উপস্থিত প্রতিনিধিদল তাঁকে বুঝিয়ে চুপ করাতে সক্ষম হয়।

ইংরেজদের সঙ্গে এরপর আলোচনা শুরু করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ। আলোচনা দীর্ঘ হতে শুরু করে। ১৫ দিন পর্যন্ত কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারেনি দু-পক্ষই। এবার ইংরেজ প্রতিনিধিদল চাল পালটে সরাসরি বাদশাহর সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে। প্রতিনিধিদের বার বার নিষেধের পরও শের ইয়াকুব আলি খান সরাসরি আলোচনা করতে সম্মত হয়ে পড়েন। কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবেই হোক যুদ্ধ থামাতে হবে। ইংরেজরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, ইয়াকুব আলি খান তাদের প্রতিটি শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন, এ জন্য তারা নতুন নতুন আরও কঠিন শর্ত আরোপ করতে শুরু করে।

২৬ মে ১৮৭৯। শের ইয়াকুব আলি খান এ দিন ইংরেজদের পক্ষ থেকে দাবি করা সকল শর্ত নির্দ্বিধায় বিনাবাক্যে মেনে নেন। স্বাক্ষর করেন এই ন্যক্কারজনক চুক্তিপত্রে। গান্দমাক নামক গ্রামে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলে এটি গান্দমাক চুক্তি হিসেবে বিখ্যাত। এই চুক্তির মাধ্যমে বেশ কিছু ভৌগোলিক রদবদল দৃশ্যপটে আসে!

- আফগানিস্তান এখন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে।
- আফগান প্রশাসকরা তাদের সকল পররাষ্ট্রনীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি করবেন। ব্রিটিশ স্বার্থবিরোধী কোনো পররাষ্ট্রনীতি তারা কখনো তৈরি করতে পারবে না।
- আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক একটি প্রতিনিধিদল এবং তাদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত একটি বাহিনী সর্বদা অবস্থান করবে। এই প্রতিনিধিদল একইসঙ্গে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি আফগান প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাবে।
- খাইবার, খুররম, পিসিন, সিবি ও বোলান অঞ্চল ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।
- পেশোয়ার ও জালালাবাদের মধ্যে বসবাসকারী গোত্রগুলো ইংরেজদের শাসনাধীন থাকবে।
- আফগান প্রশাসনের মধ্যে আগে ও বর্তমানে ইংরেজদের জন্য গোয়েন্দাকার্যক্রম পরিচালনাকারী মুনাফিকদের জাতীয় ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হবে।

যেহেতু চুক্তি মোতাবিক জালালাবাদ, নাঙ্গারহার ও কান্দাহারকে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, এ জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই অঞ্চলগুলো থেকে বেরিয়ে আসে।

লন্ডনে বিজয় উদ্‌যাপন

এ চুক্তিটি আফগানিস্তানের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের একটি অন্যতম অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। বিদেশি শক্তির জন্য এই চুক্তি শাপেবর হয়ে দাঁড়ায়। আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়ে পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ। বীরবাহাদুর আফগান জনগণ কোনোভাবেই এই চুক্তি মেনে নিতে পারছিল না। অপরদিকে কলকাতা ও লন্ডনে সাধারণ জনগণ এমনকি প্রশাসনিকভাবে এই বিজয় উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। এই চুক্তিকে ঘোষণা করা হয়েছিল মহান বিজয় হিসেবে। লন্ডনের পার্লামেন্টে সমকালীন ভাইসরয় জনপ্রতিনিধিদের ঠিক এই ভাষ্য দিয়ে সুসংবাদ শোনাচ্ছিল,

> *আমাদের এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের স্বাধীন ও শক্তিশালী সীমান্তকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করা। এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা এই মহান উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়েছি। আফগানিস্তানে প্রবেশের তিনটি ঐতিহাসিক প্রধান গিরিপথ এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আফগান প্রশাসকরা কোনোভাবেই এখন আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতায় নামতে পারবে না।*

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ,* মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।

২. *সিরাজুত তাওয়ারিখ,* মির্জা ফয়েজ মুহাম্মাদ খান।

৩. *Encyclopedia of Islam.* Vol-I

৪. *উর্দু দায়িরায়ে মাআরিফ আল-ইসলামিয়া,* পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি।



১৮ তম অধ্যায়

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

ন্যক্কারজনক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইংরেজদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল কাবুলে এসে পৌঁছায়। এই দলের প্রধান ছিল স্যার লুই কাভাগনারি। প্রতিনিধিদলে বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিত, কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিল। চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের সঙ্গে বিরাট একটি সেনাবহরও অবস্থান করছিল। এই দলের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আফগান প্রশাসককে বিনা যুদ্ধে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলোর মতো একটি ব্রিটিশ-আফগান করদ রাজ্যে পরিণত করা। এ অঞ্চলের সার্বক্ষণিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং বাদশাহর ওপর মানসিক চাপ অব্যাহত রাখা। এর মাধ্যমে নানা প্রকারের ফায়দা গ্রহণ করাও ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বাদশাহর আদেশে বিখ্যাত বালা হিসার দুর্গ ইংরেজদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে নির্মাণ করা হয় আলিশান মহল। কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে আগমনকারী এই দল কিছুদিনের মধ্যেই প্রশাসনিকভাবে আফগানিস্তান শাসন করতে শুরু করে। স্যার লুই সরাসরি বাদশাহকেও নির্বাহী আদেশ জারি করতে থাকে।

স্যার লুইয়ের হত্যাকাণ্ড

অক্ষম অথর্ব বাদশাহ ইয়াকুব আলি খান শুরু থেকেই ব্রিটিশদের ভয়ে ভীত থাকতেন। এবার কাবুলে তাদের প্রতিনিধিদল আসার পর থেকে তিনি চাপরাশির মতো তাদের সঙ্গে বিনয়াবনত (আসলে গোলামসুলভ) আচরণ শুরু করেন। এই দৃশ্য কাবুলের জনগণ ও দরবারের মন্ত্রীরা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিলেন না। কেননা, ন্যক্কারজনক সেই চুক্তির কারণে ইতিমধ্যেই তাদের নাক কেটে গিয়েছিল। এখন তারা তাদের বাদশাহকে সরাসরি বিদেশি শক্তির কাছে নতজানু হতে দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারেননি। একপর্যায়ে কাবুলের জনগণ ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর তারা কাবুলের রাজপথে বেরিয়ে আসে। কারিম খান নামের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে আফগান সরকারের একটি বাহিনী বালা হিসার দুর্গ অবরোধ করে বসে। এ

সময় জনগণ তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়। সবাই মিলে একসঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। তারা ঘোষণা করে, 'যদি এই মুহূর্তে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল দুর্গ থেকে বেরিয়ে না যায়, তাহলে তাদের কেউ জীবিত ফেরত যেতে পারবে না।'

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার লুই প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ে। বাদশাহ ইয়াকুব আলি খানের কাছে পরিস্থিতির সার্বিক বিবরণ জানিয়ে সংবাদ পাঠায় সে। চুক্তি অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা হয়। এ সময় বাদশাহ তার প্রধান সেনাপতিকে আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার আদেশ দেন; কিন্তু প্রধান সেনাপতি যখনই জনগণের কাছে গিয়ে সরকারি আদেশ শোনানোর চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাকেই ঘোড়ার জিন থেকে মাটিতে নামিয়ে লাথি-ঘুসি দিয়ে 'সংবর্ধনা' জানানো হয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার লুই চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল। সে আমির ইয়াকুবের কাছে প্রাণভিক্ষা চায়। বাদশাহ তার শ্বশুর সরদার ইয়াহিয়া খান, পুত্র মুসা খানসহ বেশ কজন সেনাপতিকে বিক্ষোভরত জনতার কাছে পাঠান। বাদশাহর প্রতিনিধিরা আন্দোলনকারীদের সামনে উপস্থিত হয়ে বার বার কুরআনের শপথ করে বিক্ষোভ থেকে বিরত হতে তাদের অনুরোধ করতে থাকেন; কিন্তু প্রচণ্ড বিক্ষোভরত জনতার কানে এসব কথার কোনো মূল্য ছিল না। বিক্ষোভকারীদের বড় শক্তি ছিল তাদের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক সরকারি সেনাদের উপস্থিতি।

তবে এ সময় স্যার লুইয়ের ডেপুটি একটি ষড়যন্ত্র আঁটে। সে মহলের কর্মচারী তাইমুরশাহকে ডেকে বলে, 'তুমি বিক্ষুব্ধ জনতার কাছে গিয়ে সেনাদলের প্রধান কারিম খানকে খুঁজে বের করবে। এরপর তাকে গোপনে জানাবে, যদি তারা এ দফা জনরোষ ছত্রভঙ্গ করে দেয়, তাহলে তাদের ছয় মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান করা হবে।' কিন্তু আত্মমর্যাদাবান আফগান কর্মচারী মহল থেকে বেরিয়ে নিজেই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে আরও উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের মহলে আক্রমণ শুরু হয়। স্যার লুইসহ প্রায় সকল ব্রিটিশ প্রতিনিধি মৃত্যুবরণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা এতটাই ফুঁসে ছিল যে, তারা সম্পূর্ণ মহলই আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

এই ঘটনা আফগান জনগণের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি বিরাট বড় চপেটাঘাত ছিল। পুরো বিশ্বে এই ঘটনা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। টেলিগ্রাফের কল্যাণে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে হিন্দুস্থানের ভাইসরয় লর্ড লিটনকে শক্ত আদেশ পাঠানো হয়। আফগান জনগণ থেকে শক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয় ভাইসরয় লিটন। তাদের নতুন রসদপ্রবাহ ও সেনাসাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। এদিকে লর্ড লিটন সারা বিশ্বে ঘটনাটি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। সেনারা ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দাবি করেছিল, দাবি পূরণ না

হওয়ায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে এই ঘটনা ঘটায়; এমন একটি প্রেক্ষাপট ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে প্রচারিত হতে থাকে। পাশাপাশি আফগান জনগণের কাছে এই খবর পৌঁছানো হয়, অতি শীঘ্রই তাদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী পৌঁছে যাবে। তারা যেন মৃত্যুর দূতকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ব্রিটিশদের যুদ্ধ ঘোষণা

জেনারেল ফ্রেডরিক রবার্টসের নেতৃত্বে বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের উদ্দেশে রওনা হয়। এ বাহিনীতে জেনারেল মেসি, জেনারেল বেকার ও জেনারেল মাইক ফরসেনও ছিল। মিথ্যা ও ধোঁকাবাজিতে বিশ্বসেরা ইংরেজ জাতি এবারেও তাদের চিরায়ত আচরণ প্রদর্শন করছিল। পথ চলতে চলতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের জনগণকে এ কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিল যে, বাদশাহ ইয়াকুব আলি খানের নির্দেশ ও অনুরোধে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠা জনতাকে শায়েস্তা করতে আমরা সেনাসহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে জেনারেল স্টুয়ার্ট দক্ষিণ-আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। কান্দাহারের প্রশাসক শের খান ইংরেজদের ভয়ে ভীত হয়ে কান্দাহারের চাবিকাঠি তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে একজন অনুগত দাস হিসেবে প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। বিনিময়ে ব্রিটিশরা তাকে পুনরায় কান্দাহারের গভর্নর হিসেবে মনোনীত করে। এদিকে দুর্বল আফগান রাজা ইয়াকুব আলি খান পায়ের নিচে মাটি দেখতে পাচ্ছিলেন না। বিশ্বপরাশক্তি হয়ে ওঠা ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনোভাবেই তিনি পেরে উঠবেন না, এমন ধারণা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই যেকোনো শর্ত মেনে তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সন্ধিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তিনি তার প্রধান উজির হাবিবুল্লাহ খান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মির্জা শাহ মুহাম্মাদকে ইংরেজদের কাছে পাঠান। তারা ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল রবার্টসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাদশাহর পক্ষ থেকে পাঠানো বিষয়গুলো আলোচিত হয়। তাদের মূল ভাষ্য ছিল, ইংরেজরা যেন নতুন করে আবার সেনাবাহিনী পরিচালনা না করে। কেননা, আফগান বাদশাহ নিজেই বালা হিসার দুর্গের দুঃখজনক ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু ইংরেজরা এই প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাকচ করে দেয়। এর কিছুদিন পর জেনারেল রবার্টসের কাছে বাদশাহ ইয়াকুব আলি খানের পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে। তিনি একজন অনুগত দাসের মতো ভাষা ব্যবহার করে ব্রিটিশদের ক্ষোভ কিছুটা হলেও প্রশমন করতে চেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,

আমি জানি, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আগমন হচ্ছে মূলত আমার প্রশাসনকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে। এ জন্য আমি আগে থেকেই আমার সকল প্রশাসক, সিপাহসালার এবং গোত্রীয় সরদারকে ব্রিটিশবাহিনীকে স্বাগত জানানোর জন্য আদেশ দিয়ে রেখেছি।

জেনারেল রবার্টস সত্য সত্যই সেনাবাহিনী নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। শুধু লোগার অঞ্চলে সামান্য প্রতিরোধ ছাড়া কাবুল পৌঁছা পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি তারা। হতভাগা বাদশাহ ইয়াকুব আলি খান ইংরেজদের অভ্যর্থনা জানাতে তার সাত বছর বয়সি পুত্র, সেনাবাহিনীর সিপাহসালার এবং ২০০ অশ্বারোহীসহ কাবুলের বাইরে বেরিয়ে আসেন; কিন্তু পরে যা হয়েছিল, তা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি।

ব্রিটিশদের হাতে বন্দি আফগান বাদশাহ

জেনারেল রবার্টস হাতের মুঠোয় এসে পড়া শত্রুকে একটি মুহূর্ত সুযোগ দিতে চায়নি। অভ্যর্থনা জানাতে আসা বাদশাহকে সে পৃথিবীর সকল কূটনৈতিক নীতি ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার করে। ৬ অক্টোবর ১৮৭৯ ব্রিটিশবাহিনী কাবুলের প্রান্তসীমায় পৌঁছে সেখানে সেনাছাউনি স্থাপন করে। ইয়াকুব আলি খান কিছুদিন তাদের সেনাক্যাম্পে বন্দি থাকেন।

জনতার প্রবল প্রতিরোধ

আমরা আগেই বলেছি, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্থানে যেখানেই ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, সেখানে মূলত আলিমদের পক্ষ থেকে জিহাদের ফাতওয়াই সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এরপর আফগানিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগণ এবং সর্বোপরি গোত্রীয় যুবকরা জিহাদকে অব্যাহত রাখেন। জেনারেল রবার্টসের আগমনে আফগানিস্তানের আলিমগণ আরেকবার সাধারণ জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে গোত্রীয় সরদার ও ইমানদীপ্ত যুবকরা নানা জায়গা থেকে এসে আবারও ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধে একত্রিত হয়ে পড়েন। জেনারেল রবার্টস যখন চাহার আসিয়াব ময়দানে উপস্থিত হয়, তখন হাজার হাজার স্বাধীনচেতা আফগান জনতা কাতারবন্দি হয়ে কাবুলের প্রতিরোধযুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েন। এদিকে বন্দি বাদশাহ অবাক দৃষ্টিতে তার জনগণের অসম প্রতিরোধযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কামানের পর কামান দেগে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে আফগান যুবকদের হাতে ছিল দো-নলা বন্দুক আর পুরানো পিস্তল। এগুলো দিয়েই তাঁরা ব্রিটিশবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; কিন্তু কামানের গোলার আঘাতে অসংখ্য মুজাহিদ শহিদ হতে থাকেন। অধিকাংশ

মুজাহিদ শহিদ হওয়া অথবা আহত হয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত এই অসম যুদ্ধ চলতে থাকে।

১৬ অক্টোবর ১৮৭৯। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আফগান বীর জনতা মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়। জেনারেল রবার্টস প্রচণ্ড সামরিক শক্তিবলে কাবুলে প্রবেশ করে। এ সময় আফগান সরকারি বাহিনী কাঠপুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। লর্ড লিটনের পক্ষ থেকে জেনারেল রবার্টসকে অত্যন্ত শক্তভাবে বেশ কয়েকটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যেমন :

- অভিযান চলাকালে কোনো ধরনের দয়া দেখানো যাবে না। আফগানিস্তানের জনগণকে এবার উচিত শিক্ষা দিতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ কখনো বিদ্রোহ করার সাহস দেখাতে না পারে।
- প্রথমেই আফগানিস্তানের সরকারি ও প্রশাসনিক দুর্গ বালা হিসারকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।
- সামরিক ছাউনি ও দুর্গগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।
- আফগানিস্তানের রাজকোষ হস্তগত করতে হবে। কেউ প্রতিরোধ করতে এলে তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করবে।
- এই লক্ষ্যগুলো পূরণ হলে আফগানিস্তানকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- আফগানিস্তানের মাটিকে মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপুর্ণ সেনাঘাঁটি বানাতে হবে।
- এ ছাড়া এই অঞ্চলকে বহুভাগে বিভক্ত করে ফেলতে হবে, যাতে করে গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় না থাকে।

জেনারেল রবার্টস কাবুলে প্রবেশের এক সপ্তাহ পর একটি বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করে ঘোষণা দেয়,

> দুদিন পর বালা হিসার দুর্গের অধিবাসীসহ পুরো স্থাপনা সমুলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কাবুলের প্রশাসন, আফগানিস্তানের মুদ্রা এবং রাজকীয় প্রেস সবকিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালিত হবে। কাবুল শহর এবং এর আশেপাশের পাঁচ মাইল সীমার মধ্যে সশস্ত্রভাবে কেউ চলাফেরা করতে পারবে না। যদি কাউকে সশস্ত্র অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে এর সাধারণ সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড। এ ছাড়া ইংরেজ রাষ্ট্রদূত ও অফিসারদের হত্যাকারী যুবকদের অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

এই ঘোষণার পর বালা হিসার দুর্গের ফটক ও ছাদে তোপ-কামান স্থাপন করা হয়। কাবুলের অধিবাসীরা ক্ষোভে-দুঃখে নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকেন; কিন্তু কারও পক্ষে টু-শব্দ করার কোনো সুযোগ ছিল না।

ইয়াকুব আলি খানের পরিণতি

আমির ইয়াকুব আলি খান দুশ্চরিত্র ইংরেজদের হাতে বন্দি ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর ইংরেজরা জোরপূর্বক তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। দুদিন আগে দেওয়া হুমকি অনুযায়ী কাবুলের ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষাদুর্গ বালা হিসার এবং এখানে বসবাসকারী জনগণকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হয়। রাজকীয় অস্ত্রভান্ডারে সে সময় ২৫০ টন বারুদ, ৮৫টি কামান, কয়েক হাজার বন্দুক, তরবারিসহ বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ব্রিটিশরা হস্তগত করে। আফসোস! যদি ইয়াকুব আলি খান এই সমরাস্ত্রগুলো ব্যবহার করতেন, তাহলে অন্তত এত অপমানিত ও অপদস্থ হয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে ইস্তফা দিতে হতো না। কাবুল বিজয়ের এক মাস পর ইংরেজরা অথর্ব এই শাসককে হিন্দুস্থানে নির্বাসন দেয়। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন হিন্দুস্থানে কাটিয়ে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ ছাড়া আফগান প্রশাসনের বেশ কজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও হিন্দুস্থানে নির্বাসন দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মুহাম্মাদ খান, সরদার ইয়াহিয়া খান ও সরদার জাকারিয়া খান ছিলেন অন্যতম।

জেনারেল রবার্টস ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতদের হত্যাকারী যুবকদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর ছিল; কিন্তু কাবুলের জনগণ তাকে কোনোভাবে সহায়তা করতে রাজি ছিল না। তখন সে কাবুলের প্রশাসনিক তিনজন শীর্ষ ব্যক্তি জেনারেল খসরু খান, সরদার সুলতান আজিজ খান এবং শহরের প্রধান কারারক্ষী আসলাম খানকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খান ও প্রধান সেনাপতি দাউদশাহ খানকে বন্দি করা হয়। এই মুহূর্তে আফগানিস্তান সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের অধীনে চলে গিয়েছিল। শুধু কাবুলেই ২০ হাজার ইংরেজ সেনা ৪৬টি আধুনিক কামান নিয়ে অবস্থান করত।

কাবুলবিজেতা জেনারেল রবার্টসকে তার এই অমানবিক কার্যক্রমের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে অভিনন্দনবার্তা পাঠানো হয়। ভারতবর্ষের ভাইসরয় গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন জেনারেল রবার্টসের সামরিক অর্জনে খুশি হয়ে তাকে আফগানিস্তানে নিজের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে লে. জেনারেল পদে ভূষিত করে।

জেনারেল রবার্টস কাবুলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এত শক্তভাবে সাজিয়েছিল যে, কোনো

ধরনের হামলার আশঙ্কা ছিল না। সে ইংরেজবাহিনীর বড় একটি অংশকে সিয়াহ সঙ্গা দুর্গ থেকে সরিয়ে শেরপুর দুর্গে স্থানান্তর করে। এটি সেই দুর্গ, যা সাবেক শাসক শের আলি খানের সময় নির্মাণ শুরু হয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জীবদ্দশায় তিনি এর নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। ২১ ফিট উঁচু শক্তিশালী প্রাচীর একে দুর্ভেদ্য বানিয়ে ফেলেছিল। শক্তিশালী কামান ছাড়া এর দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। জেনারেল সর্তকতাবশত দুর্গের দেয়ালজুড়ে কাঁটাতার লাগিয়ে দেয়। এরপর এই দুর্গেই সে তার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে।

আফগানিস্তানে শুরু হয় তার স্বেচ্ছাচারী শাসনের যুগ। একটি বিরাট সিংহাসনে আরোহণ করে সে বসে থাকত। আশেপাশে গাদ্দার মুনাফিক ও দেশদ্রোহী কিছু আফগান সরদার তার সামনে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে থাকত। জেনারেল রবার্টসের প্রতিটি কথায় গোলামসুলভ মাথা নাড়া এবং তার সঙ্গে সকল মতামতে 'জি হুজুর' বলা ছাড়া এদের আর কোনো কাজ ছিল না। এ সময় সে নিজেকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি রানি ভিক্টোরিয়ার সেরা জেনারেল ভাবতে শুরু করে।

কান্দাহার থেকে কাবুল : একটি ব্যর্থ অভিযান

এত প্রতিরক্ষা গ্রহণের পরও জেনারেল রবার্টস সবসময় জনরোষের ভয়ে ভীত থাকত। আফগান জনগণের বিদ্রোহী মনোভাব তার অজানা ছিল না। এ জন্য সে কান্দাহারে অবস্থানরত ইংরেজি বাহিনীকে কাবুলে চলে আসার নির্দেশ দেয়। তবে কান্দাহার থেকে কাবুলে রওনা হওয়ার পথে ইংরেজবাহিনী ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রথমে গুলজাই গোত্র তাদের পথরোধ করে বসে। সাহেব খান নামের একজন সরদার তাঁর মুজাহিদ সঙ্গীদের নিয়ে ইংরেজদের ওপর হামলে পড়েন। একেকজন মুজাহিদ জীবনবাজি রেখে হলেও কয়েকজন ইংরেজ সেনাকে হত্যার চেষ্টা করতে থাকেন। পির মুহাম্মাদ নামের একজন মুজাহিদ তাঁর একটি হাত বাহু থেকে আলাদা হওয়ার পরও যুদ্ধ চালিয়ে যান। শহিদ হওয়ার পর তাঁর শরীরে ১৩টি বড় ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। অবশেষে ব্রিটিশবাহিনী কাবুলে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে কান্দাহার দুর্গে ফিরে যায়।

বেজে উঠেছে জিহাদের দামামা

জেনারেল রবার্টস কাবুলে দুই মাস অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পার করে। এরপর শুরু হয় শীতকাল। হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণির বরফ জমতে শুরু করে; কিন্তু উষ্ণ হতে থাকে আফগান জনগণের হৃদয়। তপ্ত খুন শত মাইল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে তাদের শিরা-

উপশিরায়। কাবুলের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরক্ষাপ্রাচীরেও তারা ধস নামিয়ে দিতে শুরু করেন। জেনারেল রবার্টসের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। আফগান জনগণ এই দুই মাসে ব্রিটিশদের আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য পরখ করে নিয়েছিল। ব্রিটিশরা যে আপাদমস্তক মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ জাতি, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। ইয়াকুব আলি খানের প্রশাসনকে সুসংহত করতে কাবুলে অবতরণ করে সেই তাকেই তারা হিন্দুস্থানে নির্বাসন দিয়েছে। এরপর জনগণের সরলতার সুযোগ নিয়ে জেঁকে বসেছে কাবুলের মসনদে।

আফগান জনগণের প্রাণের ধর্ম, ইমান-ইজ্জত আর আত্মমর্যাদা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। এই নাজুক পরিস্থিতিতে কাবুলের আশেপাশের শত শত গ্রাম, বসতি, মহল্লা ও উপত্যকায় বসবাসকারী লক্ষাধিক জনতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরেকবার অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। এ সময় উত্তেজিত জনতাকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন বেশ কজন গোত্রপতি সরদার, আলিম এবং সাবেক সেনা-অফিসার। কাবুল ও কোহে দামান অঞ্চলে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন গোলাম হায়দার কাবুলি, সাবেক সেনা-অফিসার কারিম খান, মির বাচ্চা কোহে দামানি ও মির গোলাম কাদির। লোগার অঞ্চলে গোলাম হায়দার চরখি, সামান্দার খান ও মুহাম্মাদ হাসান খান লোগারি জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ময়দান শহর ও ওয়ারদাক অঞ্চলে জেনারেল জান খান অসংখ্য আগ্রহী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। গজনি ও জাবুল প্রদেশে মোল্লা দীন মুহাম্মাদ জনগণকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকেন। এই মহান নেতা জনগণের মধ্যে মুশক আলম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোল্লা আবদুল গফুর লঙ্গারি ও গুল মুহাম্মাদ খান আন্দারি তাঁদের বিশিষ্ট সঙ্গী ছিলেন। নানগারহারে জাব্বার খেল গোত্রের সরদার ইসমাতুল্লাহ খান যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। হেরাতের সরকারি বাহিনীর কর্মকর্তা হাফিজুল্লাহ খান ও আইয়ুব খান সেখানে মুজাহিদদের নেতৃত্ব প্রদান করছিলেন।

প্রায় দুই মাস প্রতিটি অঞ্চলের মুজাহিদরা নিজেদের মতো করে কঠোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তবে এই পুরো প্রক্রিয়া চলছিল অত্যন্ত সংগোপনে। গোয়েন্দা জাল ছড়িয়ে থাকার পরও ব্রিটিশদের কানে পর্যন্ত যায়নি। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ গোপন পরামর্শ-বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রতিটি অঞ্চল থেকে মুজাহিদরা কাবুলের দিকে মার্চ করবেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই চারদিক থেকে কাবুলকে ঘেরাও করে ফেলা হবে, যাতে করে ব্রিটিশবাহিনী দিনের আকাশে রাতের তারা দেখতে পায়। একটি ঝটিকা আক্রমণে যেন কাবুলের পতন ঘটে, এমনই ছিল তাঁদের পরিকল্পনা। এতে করে অতিরিক্ত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুজাহিদরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

২ ডিসেম্বর ১৮৭৯। প্রথমে গজনিতে মোল্লা মুশক আলম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তোলেন। দেখতে দেখতে সমগ্র আফগানিস্তানে জিহাদের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে

ওঠে। চারদিক থেকে মুজাহিদদের কাফেলা কাবুলের দিকে এগোতে থাকে। গতবারের মতো এবারও মুজাহিদদের সমরাস্ত্রের মধ্যে ছিল পিস্তল, দো-নলা বন্দুক আর তরবারি। প্রায় এক সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কাবুলের সন্নিকটে এসে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মুজাহিদবাহিনী। এ সময় প্রচণ্ড শীতকাল ছিল। স্বাভাবিকভাবে শীতকালের এই কঠিন সময়ে আফগান জনগণ অভিযান পরিচালনা করত না; কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, শত্রুকে অবরোধ করে রেখে সময় দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

মুজাহিদদের পরিকল্পনা ছিল, ইংরেজরা কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের খতম করে দেওয়া; কিন্তু চতুর ইংরেজরা আগে থেকেই মুজাহিদদের মধ্যে তাদের কয়েকজন গুপ্তচর নিয়োগ করে রেখেছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল সরদার আলি মুহাম্মাদ খান। তার মাধ্যমে যথাসময়ে ব্রিটিশরা অভিযানের সংবাদ পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল রবার্টস তার যুদ্ধের ছক এঁকে ফেলে। এ সময় সে ব্রিগেডিয়ার মাইক ফরসনকে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে কাবুলের উত্তর দিকে কারিজ মির অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। আরেকটি ছোট বাহিনীসহ ব্রিগ্রেডিয়ার বেকারকে কাবুলের পশ্চিমে আরগান্দা অঞ্চলে নিয়োজিত করে। এতে করে মুজাহিদরা চারদিক থেকে কাবুলকে ঘিরে ফেললেও নিজেদের মধ্যে অন্তর্বর্তী যোগোযোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। গজনির মুজাহিদরা কোহিস্তানের মুজাহিদদের সঙ্গে এবং পাগমানের মুজাহিদরা ময়দান শহরের মুজাহিদদের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো সুযোগ পাবে না।

ইমান আর অস্ত্রের মোকাবিলা



পাগমানের মুজাহিদরা কারিজ মির অঞ্চলে মাত্রই পৌঁছেছিলেন, ঠিক তখনই ব্রিগ্রেডিয়ার মাইক ফরসন তার বাহিনী নিয়ে কারিজ মিরের পর্বতচূড়া দখল করে নেয়। ওদিকে মির বাচ্চা খানও তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েন। একরাতে অসমসাহসী এই যোদ্ধারা ব্রিটিশবাহিনীর তোপখানায় আক্রমণ করে বসেন। ইংরেজ সেনারা অতর্কিত হামলা সামলে নিয়ে এলোপাথাড়ি কামানের গোলা ছুড়তে থাকে। মির বাচ্চা খান এ দিন পিছু হটেন। কারিজ মিরের ঠিক পাশেই তিনি ফাঁড়ি তৈরি করে নেন। পরদিন ১১ ডিসেম্বর জেনারেল জান মুহাম্মাদ খানও তাঁর মুজাহিদবাহিনী নিয়ে এদিকে এসে পড়েন। তাঁরা কাজি কেল্লায় নিজেদের ফাঁড়ি তৈরি করে নেন।

এদিকে জেনারেল রবার্টস শেরপুর দুর্গ থেকে যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। এ সময় জেনারেল মেসিকে আদেশ দেওয়া হয়, সে যেন তার বাহিনীসহ বাম দিকে এগিয়ে যায় এবং জেনারেল ম্যাকফরসনের (General Mackforson) বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। একইসঙ্গে জেনারেল মাইককে ডান দিকে

মার্চ করে কারিজ মির অঞ্চলের মুজাহিদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে। ম্যাকফরসন জেনারেল রবার্টসের আদেশমতো পদক্ষেপ নিতে যাবে, ঠিক তার আগেই মির বাচ্চা খান দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষমাণ থাকা চিতার মতো জেনারেল মাইকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আক্রমণ এত মারাত্মক ছিল যে, জেনারেল ম্যাক সামনে এগিয়ে যেতে পারছিল না, আবার পেছনে সরেও আসতে পারছিল না। এ সময় জেনারেল জান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে জেনারেল মেসির বাহিনীর পশ্চাদ্‌গমন করেছিলেন। তিনি জেনারেল ম্যাকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই ইংরেজবাহিনীকে আক্রমণ করে বসেন।

ব্রিগ্রেডিয়ার স্টোন বেকার তখন চাহার আসিয়াব অঞ্চলে মুজাহিদদের রুখে দিতে অপেক্ষা করছিল, সে-ও লোগারের মুজাহিদদের আক্রমণের আওতায় চলে আসে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি অংশে ইংরেজরা এভাবে পদর্যুস্ত হতে থাকে। জেনারেল রবার্টসের কাছে এই মর্মান্তিক সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বিশেষ বাহিনীসহ 'উঁচু বাগবান' গ্রামের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে এগিয়ে যায়। এমন সময় একজন যুবক দৌড়ে এসে সকল প্রতিরোধ ভেঙে জেনারেল রবার্টসের ওপর আক্রমণ করে বসে। মাজহার আলি নামের এক বাঙালি[২] দেহরক্ষী নিজের জীবন দিয়ে জেনারেল রবার্টসকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। তা না হলে সেদিন জেনারেল রবার্টসের খেলা সেখানেই সাঙ্গ হতো। ইংরেজরা কাজি দুর্গের কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা সাধারণ আক্রমণ শুরু করে দেন। তারা তোপখানা থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে যাবে, ঠিক এ সময় মুজাহিদরা চারদিক থেকে ইগলের মতো উড়ে এসে তোপখানায় হামলে পড়েন। উপত্যকায় শুরু হয় হাতাহাতি লড়াই। ইংরেজ সেনারা তখন পালাতে চাচ্ছিল; কিন্তু আফগান যুবকরা তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়নি। চাকু ও খঞ্জরের ধারালো আঘাতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ব্রিটিশবাহিনীর রক্তস্রোত বয়ে যেতে থাকে।

জেনারেল রবার্টসের পলায়ন

জেনারেল রবার্টস প্রথমবারের মতো তার সেনাদের এভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে আপন সেনাদের বুকে খুর চাপা দিয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। সেদিন মাত্র ৪০ জন ইংরেজ সেনা তার সঙ্গে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

পথে 'দুহ মাজাঙ্গ' নামে একটি সংকীর্ণ গিরিখাত ছিল। জেনারেল রবার্টস সেনাদের একাংশকে এখানে মোতায়েন করে। যদি মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করেন, তাহলে যেন এখানে এসে তারা বাধাগ্রস্ত হয়। গিরিপথ পেরিয়ে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে

[২] হায় দুর্ভাগ্য।

পৌঁছে সে বিশ্রাম নিতে থাকে। সেনারা তাকে পাহারা দিচ্ছিল। এ সময়ে ইংরেজদের গোলাম মুনাফিক আলি মুহাম্মাদ আফগান সরকারি বাহিনী ও কিছু গোত্রীয় যোদ্ধা নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়; কিন্তু গোত্রের সদস্যরা গ্রামে এসে জেনারেল রবার্টসকে দেখে তাকে সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। উলটো তারা মুজাহিদদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেরণায় ইংরেজদের মালামাল লুট করতে থাকে। রবার্টস পরিস্থিতি আঁচ করে কোনোমতে শেরপুর দুর্গে পালিয়ে যায়।

পলায়নরত অবস্থায় সে ইংরেজবাহিনীকে শেরপুর দুর্গে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়। এ ছাড়া কাবুলে মোতায়েন করা সকল ইংরেজ সেনাকে অনতিবিলম্বে শেরপুর দুর্গে চলে আসার ফরমান জারি করা হয়। কেননা, এই দুর্গ ছাড়া কোথাও ইংরেজ সেনারা নিরাপদ ছিল না। পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই কাবুল শহর ও আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইংরেজবাহিনীগুলো দ্রুতগতিতে শেরপুর দুর্গে অবস্থান নেয়। জেনারেল রবার্টস এ সময় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করে এই দুর্গের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও মজবুত করে। দুর্গের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ জেনারেলদের হাতে সোপর্দ করে। এ সময় জেনারেল ম্যাকফরসন, জেনারেল হিউজ গফ, কর্নেল জ্যাকনিজ ও জেনারেল হেলজু দুর্গের বিভিন্ন অংশের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। দুর্গের সুবিশাল প্রাচীর এত শক্তিশালী ছিল যে, ইংরেজরা নিশ্চিত ছিল মুজাহিদদের পুরানো ধাঁচের কামান এই দেয়ালের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ ছাড়া অতিরিক্ত পাঁচ মাসের রসদও তখন দুর্গে মজুদ ছিল।

এরপরও ইংরেজ সেনা ও জেনারেলরা মুজাহিদদের ভয়ে এতটাই ভীত হয়ে পড়ে যে, কয়েক রাত পর্যন্ত তাদের চোখে ঘুম আসেনি। মাত্র দুই দিনের যুদ্ধে তারা প্রাণভয়ে সমগ্র কাবুল তাদের সেনামুক্ত করেছিল। তখন পর্যন্ত মুজাহিদরা দুর্গটি পুরোপুরি ঘেরাও করেননি। ফলে ইংরেজদের জন্য রসদের জোগান অব্যাহত থাকে।

জেনারেল রবার্টস পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে গান্দামাক অঞ্চলে অপেক্ষমাণ জেনারেল চার্লসকে তার বাহিনীসহ শেরপুর দুর্গে চলে আসতে বলে। এতে করে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইংরেজবাহিনীর শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হবে। জেনারেল চার্লস জালালাবাদ হয়ে কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছিল। ঠিক এ সময় লাঘমানের মুজাহিদরা তাকে ঘেরাও করে ফেলে। তবে ইংরেজরা অনবরত কামানের গোলা ছুড়তে থাকলে মুজাহিদরা সরে দাঁড়ান। অবশেষে অনেক রসদ নিয়ে জেনারেল চার্লস শেরপুর দুর্গে এসে পৌঁছায়। এ সময় জেনারেল রবার্টস টেলিগ্রাফের মাধ্যমে হিন্দুস্থানেও সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠায়। এভাবে ২৪ ডিসেম্বর অতিরিক্ত কিছু রসদ তাদের কাছে এসে পড়ে।

ইংরেজরা শেরপুর দুর্গে নিজেদের অবরুদ্ধ করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা মুশক আলম ও জেনারেল জান মুহাম্মাদ মুজাহিদদের নিয়ে কাবুলে প্রবেশ করেন। গোলাম হায়দার খান লোগার থেকে বালা হিসার দুর্গে পৌঁছে যান। এরপর তখতে শাহ নামক এলাকায় তারা ছাউনি স্থাপন করেন। ফলে শেরপুর দুর্গ মোটামুটি তিন দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। জেনারেল রবার্টস তখন অবরোধ ভেঙে তার বাহিনীকে এগিয়ে যেতে আদেশ দেয়। ১৩ ডিসেম্বর জেনারেল জান মুহাম্মাদের বাহিনীর ওপর প্রথম হামলা হয়। টানা চার ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। অবশেষে জান মুহাম্মাদ পিছু হটেন। পাহাড়ের এই উঁচু চূড়াটি দখল করে নেয় ইংরেজরা। বাকি মুজাহিদরা তখন সিয়াহ সঙ্গ দুর্গে অবস্থান নেন।

জেনারেল রবার্টস মুজাহিদদের পিছু হটতে দেখে তার সকল সেনাকে একযোগে কামানের গোলা ছুড়তে নির্দেশ দেয়। এতে ইতিবাচক ফলাফল লাভ করে ইংরেজ সেনারা। মুজাহিদদের প্রায় সব ছাউনি তারা দখল করে নেয়। ব্রিটিশবাহিনী এ সময় আসমাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়াকে নিজেদের নতুন ঘাঁটি হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তাদের অবস্থান আরও মজবুত ও সুসংহত হয়ে পড়ে।

আবদুল্লাহ ও জুহরার ঘটনা

এতক্ষণ আমরা যুদ্ধময়দানে মুজাহিদদের আত্মত্যাগের ঘটনা শুনছিলাম। ঠিক একই মুহূর্তে শহুরে জীবনে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা ঘটছিল। প্রতিটি ঘটনাই ইতিহাসের শিক্ষণীয় উপাদান হতে পারে। তবে আমরা এখানে দুয়েকটি উল্লেখ করছি।

কাবুলে আশিকান ও আরিফান নামে একটি মহল্লা ছিল। এই মহল্লার বাসিন্দারা অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। এই মহল্লাতে আবদুল্লাহ আশিকাঁ নামের একজন সুদর্শন ও বীর মুজাহিদ যুবক বসবাস করত। জুহরা নামের এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর আসরের সময় যখন কাবুলের বাইরে ব্রিটিশ সেনা ও মুজাহিদদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল, তখন অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব বেশি আত্মীয়স্বজন বা মেহমান উপস্থিত ছিলেন না। কেননা, এই মহল্লার অধিকাংশ পুরুষ তখন জিহাদে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রথা অনুযায়ী পুত্রের মা পুত্রের হাতে মেহেদি লাগিয়ে দেন। এর অর্থ ছিল, আজকে তোমার জীবনের ফুলশয্যার রাত। বাসরঘরে প্রবেশ করে নববধূকে দেখে হৃদয় জুড়াবেন, ঠিক এই সময়ে কাবুলে সংবাদ পৌঁছে, মুজাহিদরা যুদ্ধে টিকতে না পেরে পিছু হটেছেন। আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাশীল প্রতিটি নারীর মতো জুহরার মনেও এই সংবাদ অত্যন্ত দাগ কাটে। মুজাহিদদের পরাজয়ের খবর তার রঙিন

জীবনের আনন্দ-অনুভবকে মলিন করে দেয়। স্বপ্নময় জীবনের প্রথম প্রহরেই বধূ তার বরকে আবেগঘন সুরে বলে ওঠেন, 'কী আশ্চর্য কথা! এই মহল্লার সব যুবক আগ্রাসী জালিম ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত; আর আবদুল্লাহ নামের এক যুবক নববধূর সঙ্গে রাতযাপন করছে!'

নববধূর মুখে এমন কথা শুনে যুবক আবদুল্লাহ দ্রুত দাঁড়িয়ে যান। প্রিয়তমা স্ত্রীকে বলেন, 'সত্যি বলছি, এই মুহূর্তে আমার মন তো জিহাদের ময়দানেই পড়ে ছিল। জুহরা! আমি যাচ্ছি। যদি ফিরে না আসি, তাহলে পরবর্তী জীবনে ইনশাল্লাহ দেখা হবে।' এ কথা বলে তিনি কোমরে তরবারি বেঁধে বন্দুক হাতে নিয়ে জিহাদের ময়দানে রওনা হয়ে যান।

এই প্রেমিক কোন অঞ্চলের বাসিন্দা

আবদুল্লাহর মতো আরও অসংখ্য যুবক মুজাহিদদের পিছু হটার সংবাদ পেয়ে রাতারাতি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যান। পরদিন ১৪ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের আগে মুজাহিদদের কাছে শত শত যুবক যোগদান করে। এই যুবকদের মধ্যে উসমান খান সাফি ও তার ভাই মুহাম্মাদশাহ খানও ছিল। তারা তাদের গোত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এই ভাইদের বীরত্ব সমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ জেনারেলরাও তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখত। এ জন্য যুদ্ধের আগে এই ভাইদের কাছে প্রস্তাব আসে, যদি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ান, তাহলে ৩ লাখ রুপি হাদিয়া প্রদান করা হবে; কিন্তু জান্নাতের বিনিময়ে মাত্র ৩ লাখ রুপি তাদের কাছে অত্যন্ত কম মনে হয়েছিল!

সেদিনের যুদ্ধে এই ভাইয়েরা একে অপরের চেয়ে অধিক বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য মুজাহিদরাও প্রবল বিক্রমে হামলা করতে থাকেন। দেখতে দেখতে ইংরেজদের লাশের স্তূপ জমে যায়। সেদিন কাবুলের পাহাড়ে বীরত্ব ও সাহসিকতার একটি নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছিল। মুজাহিদদের প্রতিটি দল নানাভাবে এবং নানা আঙ্গিকে ব্রিটিশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। এ ছাড়া কাবুলের ৪০০ জন পর্দানশিন মা-বোন পাহাড়ি রাস্তায় দৌড়ে দৌড়ে মুজাহিদদের সাহায্য করেছিলেন। কারও হাতে ছিল পানির জগ, কারও হাতে মলম-পট্টি। অনেকে রুটির ডালা নিয়ে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে দৌড়ে ফিরছিলেন। সুবহানাল্লাহ! গোলাবারুদ আর কামানের গর্জনের তোয়াক্কা না করে তাঁরা মুজাহিদদের জন্য ওষুধ, পানি ও খাবারের জোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৮৩ জন বীরঙ্গনা নারী এই যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। জাতির জন্য তাঁরা রেখে যান আত্মত্যাগের এক নতুন ইতিহাস।

সেদিন ব্রিটিশ সেনারা পাহাড়ের উপর থেকে এমনভাবে গড়িয়ে পড়ছিল, যেন মনে হচ্ছিল মৃদু ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে ইংরেজরা পিছু হটে পালিয়ে যায়।

কিছুদূর যাওয়ার পর জেনারেল রবার্টস তার বাহিনীকে পুনরায় সজ্জিত করে। আবারও যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসার পাঁয়তারা করতে থাকে তারা। ইংরেজরা কামানের গোলা অনবরত চালাতে চালাতে মুজাহিদদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দেয়। পরিস্থিতি লক্ষ করে উসমান খান সাফি তরবারি কোষমুক্ত করে বীরবিক্রমে একাকী সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। লক্ষ্য ইংরেজদের তোপখানা। তাঁর সহযোদ্ধারাও তাঁর পিছু পিছু এগিয়ে আসতে থাকেন। উসমান খানের সঙ্গে তাঁরাও তোপখানার ওপর আক্রমণ করেন। উসমান খান একপর্যায়ে গোলার আঘাতে মাটিতে পড়ে যান; কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। শেষপর্যন্ত ইংরেজরা তোপখানা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ সময় কাবুলের উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসা মুজাহিদদের দল ইংরেজদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সিয়াহ সঙ্গ ও খায়ের খানার পর্বতচূড়া দখলে সক্ষম হন। যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে, এমন সময় পাহাড়-চূড়াগুলো মুজাহিদদের দখলে এসে পড়ে। জেনারেল রবার্টস তার জীবিত থাকা গুটিকয়েক সেনা নিয়ে শেরপুর দুর্গে পুনরায় পালিয়ে যায়।

সন্ধ্যার আগে শহিদদের লাশ কাবুল ও অন্যান্য গ্রামে পৌঁছানো হয়। জনগণ অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে তাঁদের বিদায় জানাতে একত্রিত হয়। শহিদদের মধ্যে আবদুল্লাহর লাশও ছিল, যিনি গত রাতে নববধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বৃদ্ধা মা যুবক পুত্রের জানাজা দেখে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে থাকেন। এ সময় ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন নববধূ জুহরা। প্রিয়তম স্বামীকে একনজর দেখতে জানাজার দিকে এগিয়ে যান। মেহেদিরাঙা হাতে চুমু দিয়ে বলেন, 'মা! তুমি কান্না করো না। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তোমার ছেলে হয়ে বেঁচে থাকব। তোমাকে ছেলের অভাব বোধ করতে দেবো না।'

সেদিনের পর থেকে জুহরা আবদুল্লাহ নামে পরিচিতি পেয়ে যান। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, কাবুলে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। কাবুলের জনগণ আজও আবদুল্লাহ ও জুহরার গল্প বলার সময় অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন।

পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত

১৪ ডিসেম্বর ১৮৭৯। আগের দিনের যুদ্ধ ইংরেজদের দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছিল। জেনারেল রবার্টস গত রাতেই হিন্দুস্থানে ফিরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। আফগানিস্তানের মাটিতে এক মুহূর্তও অবস্থান করার ইচ্ছা ছিল না তার। তবে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সফরের পথকে নিরুপদ্রব করতে চেয়েছিল সে। এ জন্য অতিরিক্ত রসদ এবং মুজাহিদদের পক্ষ থেকে হামলা না হওয়ার জামানত প্রয়োজন ছিল তার। তবে এই মুহূর্তে কোনো

চুক্তির সম্ভাবনা নেই, এটাও জানা ছিল। এদিকে কাবুল পুরোপুরি মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। মোল্লা দীন মুহাম্মাদ ও মোল্লা মুশক আলম কাবুলের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই শহরে গাদ্দার মুনাফিকদের দিন শেষ হয়ে এসেছিল। সরদার মুহাম্মাদ হাসান খান ইবনু দোস্ত মুহাম্মাদ খান ও সরদার আবদুল্লাহ খান ইবনু সুলতান আহমাদ খান তাদের গাদ্দারির পরিণতি থেকে বাঁচতে গজনির দিকে পালিয়ে যান। তবে সরদার হাশিম খান এবং আরও কতিপয় গাদ্দার সরদার আইয়ুব খানের মধ্যস্থতায় সাধারণ ক্ষমা লাভ করে। তারা শপথ করে, সামনে কখনো মুজাহিদদের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করবে না।

পরবর্তী এক সপ্তাহ মুজাহিদ ও ইংরেজদের লাশ দাফন, আহতদের চিকিৎসা এবং নতুন যুদ্ধের পরিকল্পনার মধ্যে অতিবাহিত হয়। এ সময়ে ইংরেজ গোয়েন্দা সরদার আলি মুহাম্মাদ তার বন্ধুদের মাধ্যমে জেনারেল রবার্টসকে মুজাহিদদের সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সব তথ্য জানিয়ে দেয়। শেরপুর দুর্গে মুজাহিদরা সরাসরি আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল সবাই যেন চূড়ান্ত হামলার জন্য প্রস্তুতি নেন। নির্ধারিত সময়ে কোহে সামাই পর্বতচূড়া থেকে আগুন জ্বালানো হবে। ঠিক সেই সময় চারদিক থেকে দুর্গের ওপর যেন মুজাহিদরা বীরবিক্রমে আক্রমণ করেন।

শেরপুর দুর্গে আক্রমণ

২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯। হাড়কাঁপানো শীতের রাত। কাবুলের চারদিক থেকে মুজাহিদরা শেরপুর দুর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে শুরু হয় কাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য অপেক্ষা। অবশেষে রাতের মধ্যপ্রহরে আসমাই পর্বতের চূড়া থেকে আগুনের শিখা বিশেষ ভঙ্গিতে জ্বলে ওঠে। চূড়ান্ত ইঙ্গিত পেয়ে মুজাহিদরা দুর্গের দিকে হামলার জন্য এগিয়ে যান। জেনারেল রবার্টস আগে থেকেই এ হামলার ব্যাপারে অবগত ছিল। ফলে সে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। মুজাহিদরা যখনই দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছান, ইংরেজদের গোলাবারুদ হঠাৎ করে গর্জে ওঠে। চোখের পলকে লাশের সারি পড়ে যায়। মুজাহিদরা এরপরও অসীম সাহস দেখিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। অসংখ্য সাথিকে শহিদ আর আহত হতে দেখেও তাঁরা একসময় দুর্গপ্রাচীরের নিচে পৌঁছে যান। এখানে ইংরেজদের কামান আর কাজ করবে না; কিন্তু এ সময় গোপন স্থানে স্থাপন করে রাখা বন্দুকের মাধ্যমে ইংরেজ সেনারা মুজাহিদদের আবারও নিশানা বানাতে শুরু করে। এদিকে ২১ ফিট উঁচু দুর্গপ্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করছিলেন মুজাহিদরা। রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষ পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেরপুর দুর্গের সামনে মুজাহিদদের লাশের স্তূপ তৈরি হয়েছিল সে দিন।

কঠিন এ সময়ে মুজাহিদদের দুজন গুরুত্বপূর্ণ সরদার মুহাম্মাদ সারখাবি ও বাদশাহ খান সারখাবির মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বাহিনী নিয়ে পিছু হটতে উদ্যত হন; অথচ মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখন নতুন হামলার ছক তৈরি করছিলেন। প্রাচীরে আরোহণ করা ছিল সময়ের ব্যাপারমাত্র; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই দুই কমান্ডার পিছু হটলে মুজাহিদদের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে শেরপুর দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে হয় মুজাহিদদের।

২৩ ডিসেম্বর কৌশলগত এই পিছু হটার সময় সবাই নিয়ত করেছিলেন, খুব দ্রুত একত্রিত হয়ে আবারও দুর্গে আক্রমণ করা হবে; কিন্তু তার আর প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ২৪ ডিসেম্বর ইংরেজদের জন্য অত্যন্ত খুশির খবর অপেক্ষা করছিল। মেজর জন রাস এক প্লাটুন সেনাসাহায্য নিয়ে অবরুদ্ধ শেরপুর দুর্গবাসীর কাছে পৌঁছে যায়। সে প্রথমে দুর্গের আশেপাশের প্রতিটি গ্রাম ও বসতি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, মুজাহিদরা যাতে আক্রমণের সময় স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে না পারেন।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এবার ইংরেজরা শক্তি সঞ্চয় করে শেরপুর দুর্গ থেকে কাবুলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ২৩ ডিসেম্বরের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এখনো সামলে নিতে পারেননি মুজাহিদরা। ইতিমধ্যে কাবুলের দিকে ইংরেজদের এগিয়ে আসার সংবাদ তাঁদের বিচলিত করে তোলে। এরপর হঠাৎ সংবাদ আসে, জেনারেল রবার্টস ইতিমধ্যেই কাবুলের দরজায় পৌঁছে গেছে। জেনারেল রবার্টস নিশ্চিতভাবে জানত, মুজাহিদরা কাবুলকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সবধরনের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই এ মুহূর্তে সে মুজাহিদদের মধ্যে ফাটল তৈরির গোপন ষড়যন্ত্র করে। প্রথমে সে এ কথা ছড়িয়ে দেয় যে, ২৩ ডিসেম্বর মুজাহিদদের পরাজয়ের পেছনে নেপথ্য নায়ক ছিলেন জেনারেল মুহাম্মাদ জান খান। তিনি ইংরেজদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তাঁকে ইংরেজরা সোনা ভরতি একটি সিন্দুক উপহার দিয়েছে; অথচ এটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি অপপ্রচার।[৩]

পরাজয়ের মূল দায়ভার মুহাম্মাদশাহ সারখাবির ঘাড়ে যায়। জেনারেল জান মুহাম্মাদ খান নিরপরাধ ছিলেন। ইংরেজদের এই প্রোপাগান্ডার ফলে মুজাহিদদের মধ্যে কিছুটা হলেও অসন্তোষ ও অনৈক্যের রেশ ফুটে ওঠে। জনগণের মধ্যে তো এই অপপ্রচারের প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এমন পরিস্থিতিতে আশঙ্কা করেছিলেন, সত্যমিথ্যা মিশ্রিত এসব সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুজাহিদদের মধ্যে দুর্বল

[৩] বস্তুত, ইংরেজদের মতো মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ জাতি মানবেতিহাসের পাতায় আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়নি। লক্ষ করলে তাদের প্রায় প্রত্যেকটি বিজয়ের পেছনে আপনি ধোঁকা ও বেইমানি দেখতে পাবেন।

মানসিকতার লোকেরা সত্য সত্যই ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে। বুদ্ধি করে তাঁরা এবার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাদের ভাষায়ই মোকাবিলা শুরু করেন। তাঁরাও প্রচার করতে থাকেন, মুহাম্মাদ জান খানের পাওয়া সিন্দুকটিতে কোনো সোনা ছিল না। সেখানে ছিল সোনালি মোড়কে মোড়া সোনালি পাটের আঁশ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজদের বেইমানি ও ধোঁকাবাজি প্রকাশ করে দেওয়া, যাতে প্রলুব্ধ হয়ে কেউ গাদ্দারির ইচ্ছা না করে। কয়েকদিন পরই বাস্তব সত্য সবার সামনে উন্মোচিত হয়। সবাই জেনে যায়, যুদ্ধে পরাজয়ের মূল দায়ভার মুহাম্মাদ সারখাবির ছিল, জেনারেল জান খান ছিলেন প্রচারিত সকল অপবাদের উর্ধ্বে।

গজনিতে গৃহযুদ্ধ

এদিকে ইংরেজদের আরেক গাদ্দার সরদার কর্নেল অলিউল্লাহ খান গজনি ও আশেপাশের অঞ্চলে গোত্রীয় যোদ্ধাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে। এতে করে ইংরেজদের জন্য কাবুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হতে থাকে। গোত্রীয় যোদ্ধাদের মধ্যে পশতুন, তাজিক ও হাজারা গোত্রের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে লেগে যায়; অথচ কিছুদিন আগেও তারা সবাই একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। মূলত সরদার অলিউল্লাহ খানের গোপন ষড়যন্ত্র তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলে। মোল্লা মুশক আলম দুঃখজনক এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাবুল থেকে গজনি অভিমুখে রওনা হন। এখানে এসে কৌশল ও প্রজ্ঞার সঙ্গে তিনি এই গোত্রীয় বিভেদ নিরসন করে সমগ্র অঞ্চলকে ভয়ানক গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করেন।

ইংরেজদের দীর্ঘ পরিকল্পনা

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ। নতুন বছর শুরু হয়েছে। ইংরেজরা এ সময় শেরপুরের দুর্গসহ কাবুলের কয়েকটি কেন্দ্রীয় সামরিক ছাউনি দখলে সক্ষম হয়। এদিকে মুজাহিদরা শীঘ্রই বড় ধরনের কোনো হামলা করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। জেনারেল মুহাম্মাদ জান খান ও মির গোলাম কাদির খানের মতো নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ সরদার নতুন করে মুজাহিদ সংগ্রহ করতে আপন আপন অঞ্চলে চলে যান। কোহিস্তান, পাঞ্জশির, গুরবান্দ ও কোহে দামান অঞ্চলের অধিকাংশ মুজাহিদ ২৩ ডিসেম্বরের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এ জন্য খুব চটজলদি নতুন করে মুজাহিদ সংগ্রহ করাও সহজ ছিল না; কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়ে জেনারেল রবার্টস তার বাহিনীকে দ্রুতগতিতে প্রস্তুত করে ফেলে। মুজাহিদদের সম্ভাব্য পরবর্তী হামলা থেকে বাঁচতে সে তার সকল সেনাকে কাবুল থেকে

জালালাবাদের মহাসড়কে বিভিন্ন জায়গায় ফাঁড়ি স্থাপনের আদেশ দেয়। এতে করে মুজাহিদরা চাইলেও ব্রিটিশবাহিনীকে কোণঠাসা করতে পারবেন না।

জেনারেলের লক্ষ্য ছিল, নতুন করে কোনো যুদ্ধে না জড়িয়ে বাহিনীকে কোনোভাবে পেশোয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। এরপর কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ করবে। মুজাহিদদের মধ্যে সামান্য বিভেদ হলেই পরবর্তী আঘাত হানবে তারা।

কান্দাহার থেকে কাবুলের পথে জেনারেল স্টুয়ার্ট

এ সময় কান্দাহার এবং গজনিতেও বেশ কিছু ইংরেজ সেনা এবং কয়েকজন বিখ্যাত জেনারেল অবস্থান করছিল। জেনারেল রবার্টস এদের মধ্যে কান্দাহারে অবস্থানরত জেনারেল স্টুয়ার্টকে তার বাহিনীসহ কাবুলে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। স্টুয়ার্ট এক ব্রিগ্রেড সেনা এবং ১২টি তোপসহ কাবুলের পথে যাত্রা করে। এদিকে ইংরেজবাহিনীকে সফর করতে দেখে গেরিলা মুজাহিদদের রক্তে আগুন ধরে যায়। তাঁরা গজনির আহমাদ খেল নামক স্থানে ইংরেজবাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলেন। অসমসাহসী কয়েকজন বীর মুজাহিদ ইংরেজবাহিনী থেকে দুটি তোপ ছিনিয়ে নেন। একইসঙ্গে তাঁরা ইংরেজদের বেশ কিছু রসদও জব্দ করেন।

এরপর শুরু হয় অসম লড়াই। ১২টি তোপ-কামান এবং শক্তিশালী আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজবাহিনীর মোকাবিলায় মুজাহিদদের পুরানো বন্দুক এবং দুটি তোপ যুদ্ধের পরিবেশ নতুন করে তৈরি করছিল! খোদ ইংরেজ ইতিহাসবিদদের কাছেও এই যুদ্ধের বর্ণনা অনেকটাই আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে। স্বল্পসংখ্যক আফগান যুবক বিশাল ইংরেজবাহিনীকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে থাকেন। ইংরেজরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। অবশেষে উপায় না পেয়ে তারা তাদের কামানগুলো রক্ষা করতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

২২ এপ্রিল জেনারেল স্টুয়ার্ট তার বাকি সেনাদের নিয়ে গজনিতে উপনীত হয়। এবার সে জেনারেল রবার্টসের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠায়, তার বাহিনী গজনিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, যেকোনো মূল্যে তাকে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক।

জেনারেল রবার্টস তৎক্ষণাৎ মেজর জন রাসের নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনী গজনির উদ্দেশ্যে পাঠায়; কিন্তু ২৫ এপ্রিল চাহার অসিয়াব নামক স্থানে মুহাম্মাদ হাসান খান লোগারি এই বাহিনীকেও ঘিরে ফেলেন। এদিকে জেনারেল স্টুয়ার্টকে ময়দান ওয়ারদাকের মরুভূমিতে মুজাহিদরা আবারও ঘিরে ফেলে ছত্রভঙ্গ করে দেন।

অবশেষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি শিকার করে তাকে কাবুলে পৌঁছাতে হয়। নতুন বাহিনী চলে আসায় বেশ আনন্দিত হয় জেনারেল রবার্টস। তার মনে শক্তি ফিরে আসে। শেরপুর দুর্গকে এবার নিরাপদ ভাবতে থাকে ইংরেজরা। সে আশা করছিল, কিছুদিনের মধ্যেই পেশোয়ার থেকে দুই ডিভিশন নতুন সেনা এসে পড়বে।

অস্ত্রবিরতির ঘোষণা

জেনারেল রবার্টস কিছুদিনের জন্য নিরাপদ পরিবেশ পেয়ে গিয়েছিল। তবে তার জানা ছিল, শক্তির জোরে আফগানজাতিকে কোনোভাবেই পদানত করা সম্ভব নয়। তাই আবারও একজন কাঠপুতুল শাসকের সন্ধান শুরু করে, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোলাম হিসেবে কাবুলের মসনদে বসে থাকবে।[৪] এমন একটি খসড়া প্রস্তাব হিন্দুস্থান হয়ে লন্ডনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দেয় সে। এ পরিকল্পনা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। জেনারেল স্টুয়ার্ট এখন এই মিশন বাস্তবায়নে গভীর ষড়যন্ত্র ও চরম ধোঁকাবাজির সঙ্গে তার কার্যক্রম শুরু করে।

প্রথমে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানে এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ব্রিটিশরা আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনাবাহিনীসহ বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। তারা কোনোভাবেই আর যুদ্ধবিগ্রহ চায় না। আফগান জনগণ যেভাবে পছন্দ মনে করে, সেভাবেই তাদের শাসক নির্বাচন করবে। এই ঘোষণার অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব আফগানসমাজে পরিলক্ষিত হয়। যে-সকল মুজাহিদ একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁরাও নতুন শাসক নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেন।

নতুন শাসক নির্বাচনের লক্ষ্যে জিরগা

ইংরেজরা জানত, মুজাহিদরা যুদ্ধময়দানে বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে তাদের পরাজিত করেছে; কিন্তু রাজনীতি ও কূটনীতির ময়দানে ব্রিটিশরা কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছে। কেননা, রাজনীতি মানেই ধোঁকাবাজি আর শঠতার মারপ্যাঁচ। মুজাহিদদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি করার এটি ছিল সেরা সুযোগ। ব্রিটিশরা জানত, একটু চেষ্টা করলেই মুজাহিদদের মধ্যে দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন নেতাদের ক্ষমতার লড়াইয়ে উসকে দেওয়া সম্ভব। এ সময় তারা এ সকল নেতাকে গোপনে গোপনে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাবে। এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্রই মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

কিছুদিন পর ইংরেজরা গজনিতে একটি সাধারণ জিরগা তথা সম্মেলনের আয়োজন

[৪] সব যুগেই এমন অনুগত তাবেদার শাসকশ্রেণি (Installment of Puppet Regimes) করার চল ছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই ধারা আজও বিদ্যমান।

করে। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল, আফগান জনগণকে ইংরেজদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন করে তোলা। ইংরেজরা আফগানিস্তানে একটি স্বাধীন ও সুসংহত প্রশাসন দেখতে চায়, এমন চিত্র আফগান জনগণের মস্তিস্কে তারা তুলে ধরে। জেনারেল রবার্টস অত্যন্ত চালাকি করে এই জিরগা প্রচণ্ড শীতে তুষারপাতের সময় আয়োজন করেছিল, যাতে দুরদুরান্ত থেকে গোত্রীয় সরদার ও আলিমরা গজনি পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারেন। ফলে সারা দেশ থেকে এই জিরগায় মাত্র ১৮৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এখানে সিদ্ধান্ত হয়, আফগানিস্তানের আগামীর শাসক হিসেবে বাদশাহ শের আলি খানের সন্তানদের মধ্য থেকেই কাউকে নির্বাচিত করা হবে। তবে তিনি কে হবেন, এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। কিন্তু ইংরেজরা তাদের হাতে বন্দি ইয়াকুব আলি খানকে পুনরায় আফগানিস্তানের স্বাধীন শাসক হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে মতামত প্রদান করে। মূলত ইয়াকুব আলি খান ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আফগানিস্তানে একজন অক্ষম ও অসহায় শাসক হিসেবে বিরাজমান ছিলেন।

আবদুর রাহমান খানের আত্মপ্রকাশ এবং জিহাদের ঘোষণা

চলমান পরিস্থিতিতে যখন মোল্লা মুশক আলম, জেনারেল জান মুহাম্মাদ খান ও মির গোলাম কাদির গজনি, কাবুল আর গুরবন্দের দূরবর্তী এলাকাগুলোতে মুজাহিদদের সুসজ্জিত করছিলেন, ঠিক সে সময়ই হেরাতের বিপ্লবী জনতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাদের জিহাদি জজবা এবং স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মত্যাগের মানসিকতা লক্ষ করে সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান নিজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তবে তাঁরা এ সময় কাবুলের পরিস্থিতিও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। মুজাহিদ এবং ইংরেজদের মধ্যে চলমান পরিস্থিতির শেষ অবস্থা জানতে তাঁরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন।

সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান তাঁর এই পর্যবেক্ষণমূলক সময় অতিবাহিত করার মধ্যেই হঠাৎ করে আফগান দিগন্তে এমন এক অভূতপূর্ব রাজনীতিবিদ এবং 'মুজাহিদ' নেতৃত্বের উদয় হয়, যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব খুব অল্পদিনেই সমগ্র আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন সরদার আবদুর রাহমান খান। আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পৌত্র, সরদার মুহাম্মাদ আফজাল খানের পুত্র। তিনি বহু বছর ধরে রাশিয়ায় নির্বাসনে বসবাস করছিলেন। আফগানিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিল না। রুশ সরকারের অধীনে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তবে বংশীয়ভাবে তিনি রাজনীতিবিদের রক্ত নিয়ে জন্মেছিলেন। ফলে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনমানসে রাজনীতির মারপ্যাঁচ খুব সহজেই আসন গেড়ে নেয়। একজন দক্ষ কূটনীতিবিদের

সকল গুণ তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল। প্রশাসনিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রবাহিত হতো তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরায়।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আফগানিস্তানের রাজনীতিতে সফলভাবে প্রবেশের জন্য এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না। তাই রুশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে আমু দরিয়া পেরিয়ে মাতৃভূমিতে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে মাত্র ১০০ জন অশ্বারোহী সেনা ছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। শহরে প্রবেশ করেই তিনি ঘোষণা করেন, আবদুর রাহমান খান ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর দিতে মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছে। বাপ-দাদার ভূমিতে স্বাধীন-সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবদুর রাহমান খান জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে জনগণ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। যদিও তখন পর্যন্ত উত্তর-আফগানিস্তান জিহাদি আন্দোলনে তেমন বড় কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি। এমনকি গোত্রীয় সরদার ও গভর্নররা পর্যন্ত ঝিমিয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু জনগণের মধ্যে তখনো জিহাদি জজবা আর স্বাধিকার চেতনা অটুট ছিল। আমির আবদুর রাহমান খান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুভূতি জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে প্রশাসক আর গভর্নররাও তাঁর সঙ্গে জিহাদি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন।

আবদুর রাহমান খানের গ্রহণযোগ্যতা

আবদুর রাহমান খান উত্তর-আফগানিস্তানের বিদ্যমান পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। উচ্চবংশীয় আর শাসকশ্রেণির সন্তান হওয়ায় জনগণের মধ্যে তার আলাদা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। এ জন্য তিনি যখন জিহাদের ঘোষণা করেন, তখন হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী তাঁর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে যায়। তবে বাদাখশানের গভর্নর আমির হাসান ঈর্ষান্বিত হয়ে আবদুর রাহমান খানের সঙ্গে যুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু জনগণের মন জয় করে ফেলা আবদুর রাহমান খান এখানেও তাঁর ব্যক্তিত্বের কারিশমা দেখাচ্ছিলেন। স্থানীয় জনগণ এই পর্যায়ে এসে গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। আবদুর রাহমানের কাছে তারা ৬ হাজার সেনা এবং ৩ লাখ রুপি নগদ সাহায্য পাঠায়। অন্যান্য গোত্রীয় সরদার এ ঘটনা দেখে আমিরের প্রতি প্রভাবিত হতে থাকে।

মির মুহাম্মাদ উমর খান ২ হাজার অশ্বারোহী ও ১ হাজার পদাতিক সেনা নিয়ে আবদুর রাহমান খানের অধীনে চলে আসেন। বলখের শাসনকর্তা গোলাম হায়দার খান এত দ্রুতগতির পরিবর্তন দেখে সন্দেহে পড়ে যান। তার মনে হচ্ছিল, আবদুর রাহমান খানের নিয়তে ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। হয়তো তিনি রাশিয়ার জন্য কাজ করছেন। এ জন্য

তিনি তাঁর জিহাদি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে পারছিলেন না। আবদুর রাহমান খানের সমর্থনে কাজ করতে থাকা কয়েকজন সরদারকে বিশৃঙ্খলার ভয়ে তিনি ইতিমধ্যে হত্যাও করে ফেলেন। সংগঠিত করেন বেশ কিছু যুদ্ধবাজ যুবককে; কিন্তু এ সময় সাধারণ জনতা ও সরকারি সেনারা আবদুর রাহমান খানের সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করে। বিপরীতমুখী ফলাফল লক্ষ করে গোলাম হায়দার খান প্রাণ বাঁচাতে পরভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

দু-ধারী তরবারি

এভাবে আবদুর রাহমান খানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ইংরেজরা তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রচার করছিল, আফগানিস্তানের জনগণ যাকে ইচ্ছা দেশ শাসনের জন্য নির্বাচিত করতে পারবে, এ ক্ষেত্রে তারা পক্ষপাতমূলক কোনো আচরণ করবে না। এ জন্য দেশের অধিকাংশ সরদার ও নেতৃবৃন্দ ভাবতে থাকেন, যদি আবদুর রাহমান খানকে সর্বজনীন নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত সবাই তাঁর অধীনে এসে পড়বে। কোনো ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া সমগ্র আফগানিস্তান একত্রিত হয়ে পড়বে; আর এই সময়ে বাধ্য হয়ে ইংরেজরা আফগানিস্তানের মাটি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে। পরিণতিতে দীর্ঘদিন পর শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরে পাবে আফগানিস্তানের মাটি ও মানুষ।

হেরাতে জিহাদি আন্দোলনরত মুজাহিদ সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান নিজেও এমনটা ভাবছিলেন। ইংরেজদের ওপর আক্রমণ শুরুর আগে তিনি আবদুর রাহমান খানের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ শুরু করেন। দুজনের মধ্যে ঐক্য হয়ে গেলে জিহাদি আন্দোলন অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করা যাবে, এ লক্ষ্যে তিনি আবদুর রাহমানের কাছে বেশ কয়েকটি চিঠি পাঠান। সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান আবদুর রাহমান খানের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন। কেননা, সমকালীন ইতিহাসে কোনো মুজাহিদ নেতা তাঁর মতো এভাবে নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি। ইংরেজরাও তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে ভীত ছিল। এ জন্য সবাই ধারণা করছিল, আবদুর রাহমান খান সমগ্র আফগানিস্তানের জিহাদি আন্দোলনকে একীভূত করে ব্রিটিশবিরোধী সর্বমুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন; কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, আবদুর রাহমান খান মুজাহিদ নন, একজন প্রাজ্ঞ ও ঝানু রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন দু-ধারী তলোয়ার। তিনি মুজাহিদদের সমর্থন নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করতে চাচ্ছিলেন। এ জন্য তিনি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মতো নতুন নতুন চাল ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন, যা বাহ্যদৃষ্টিতে কারও চোখে পড়ছিল না।

আবদুর রাহমান খান ইংরেজবিরোধী জোটের প্রস্তাবে সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খানকে কূটনীতির ভাষায় ঠিক এভাবে জবাব দিয়েছিলেন,

> *ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতার মধ্যে আফগানিস্তানের তেমন কোনো ফায়দা নেই। আমাদের উচিত হবে সবাই মিলে নিজেদের রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করা। প্রতিবেশী ইংরেজদের সঙ্গে পরাশক্তি হিসেবে সুসম্পর্ক রাখা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত।*

ইংরেজদের নৈকট্য পেতে কূটনীতি

আবদুর রাহমান খান তাঁর এই জবাবি চিঠিটি স্বেচ্ছায় এমন একটি পথে পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে সেটি খুব সহজেই ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে। যখন ইংরেজদের কাছে এই চিঠি পৌঁছায়, তখন তারাও ভেবে বসে, আবদুর রাহমান খানই একমাত্র মধ্যপন্থি নেতা, যিনি একইসঙ্গে আফগান সরদার এবং ইংরেজদের সঙ্গে সমান তালে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা রাখেন। তাই তখন থেকে তারাও তাঁর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে হিন্দুস্থানের ভাইসরয়ের কাছে একটি বিশেষ বার্তা এসে পৌঁছে। তাতে বলা ছিল, আফগানিস্তানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জনকারী নেতা আবদুর রাহমান খানের সঙ্গে দ্রুত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আগামী শীতকাল আসার আগেই তাঁর সঙ্গে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, যাতে করে ইংরেজবাহিনী নিরাপদে আফগানিস্তানের পাথুরে চোরাবালির ভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অপরদিকে যেন নবগঠিত আফগানিস্তানে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে, এ ব্যাপারেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আবদুর রাহমান খান ও ইংরেজদের মধ্যে যোগাযোগ

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল। ব্রিটিশ কূটনৈতিক দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গ্রিফেন (General Griffen) আবদুর রাহমান খানের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। রাশিয়া থেকে আবদুর রাহমান খান কোন উদ্দেশ্যে দেশে ফিরেছেন, মূলত সেটি জানতে চায় সে। আবদুর রাহমান খান তাঁর অধীনে একত্রিত হওয়া গোত্রীয় সরদারদের চিঠিটি দেখিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চান। সবাই তখন বলেন,

> হে ইংরেজ! তোমরা আমাদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাও। নাহলে আমরা তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। কোনো ধরনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার

আগে আফগানিস্তানে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি ব্রিটিশদের অর্থনৈতিকভাবে পূরণ করে দিতে হবে।

কিন্তু আবদুর রাহমান খান এ ধরনের কোনো জবাব তাঁর চিঠিতে লেখেননি। তিনি অত্যন্ত উচ্চমার্গীয় কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার করে জবাবে লেখেন,

সম্মানিত বন্ধু, আমি তাশখন্দের সম্মানিত বাদশাহ জেনারেল কাফমানের অনুমতিক্রমে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছি। আপাতত আমার ইচ্ছা নিজের জাতিকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে তুলে এনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন উপহার দেওয়া। এ ক্ষেত্রে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এগিয়ে আসবে, তাদেরও সমুচিত জবাব দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। শুনেছি, আপনারা আলোচনা করতে আগ্রহী। যদি সত্যই আপনাদের মনে আলোচনার সদিচ্ছা থেকে থাকে, তাহলে নারীদের মতো ফিসফিসিয়ে আলোচনার পরিবর্তে বন্ধুত্বসুলভ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে এগিয়ে আসুন। ইনশাআল্লাহ, ঐকমত্য তৈরি হতে সময় লাগবে না।

মুজাহিদদের আক্রমণ

ইংরেজ এবং আবদুর রাহমান খানের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ জিহাদি আন্দোলনকে স্থবির করে ফেলেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে শুধু কালক্ষেপণ চলছিল কিন্তু কোনো সমাধান হচ্ছিল না। সরদার আবদুর রাহমান খান তীক্ষ্ণ মেধা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ব্যবহার করে তাঁর অধীন সকল সরদার ও সেনাকে আশ্বস্ত করে রেখেছিলেন; কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের মুজাহিদ ও সরদাররা ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠতে থাকেন। বিশেষ করে যুবক মুজাহিদরা তাঁদের নিজ নিজ আমির ও সরদারের কাছে জিহাদের ব্যাপারে বার বার প্রশ্ন করতে থাকেন—ইংরেজদের ওপর আমরা কবে চূড়ান্ত আক্রমণ করব? নেতাদের কাছে এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো জবাব ছিল না। ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।

সময় যত ঘনিয়ে আসছিল, ইংরেজদের অবস্থান সুসংহত আর মুজাহিদদের অবস্থান ততই দুর্বলতর হচ্ছিল। হেরাতে সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের বাহিনীতে পরিস্থিতি এ পর্যায়ে চলে যায় যে, প্রতিদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হতো বাহিনী কবে রওনা হবে? সরদার আইয়ুব খান অপেক্ষায় ছিলেন, কবে আবদুর রাহমান খানের কাছ থেকে ইতিবাচক চিঠি এসে পৌঁছাবে। কবে গজনি ও কাবুলের মুজাহিদরা চূড়ান্ত জিহাদ শুরু করবে? তবে আপাতত তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না। ঠিক এমন মুহূর্তে জানা যায়, সরদার শের আলি খান কান্দাহারে ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সরদার

মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের পরিকল্পনা ছিল, তিনি হেরাত থেকে কান্দাহারের দিকে এগিয়ে যাবেন। সেখানে দক্ষিণ-আফগানিস্তানকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করে এরপর কাবুলের দিকে রওনা হবেন।

অপরদিকে আবদুর রাহমান খান ও অন্যান্য অঞ্চলের মুজাহিদরা উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে ধীরে ধীরে কাবুলের দিকে এগিয়ে আসবেন। এভাবে ইংরেজদের চারদিক থেকে ঘেরাও করা সম্ভব; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। আবদুর রাহমান খানের নিয়ত ও পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। একপর্যায়ে হেরাতের অদম্য যুবা মুজাহিদদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা সরদার আইয়ুবের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফকির খানকে হত্যা করে ফেলে। তিনি এই পুরো বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এরপর নিজেরাই জিহাদের ঘোষণা দিয়ে কান্দাহারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সরদার আইয়ুব খানের হাতেও বিকল্প কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে তিনিও বাহিনীর সঙ্গে কান্দাহারের পথে এগিয়ে যান। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের জুনে ১২ হাজার মুজাহিদ এবং ৩২টি তোপসহ তাঁরা কান্দাহারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় উপনীত হন।

শহিদদের ভূমি মাইওয়ান্দ

২০ জুলাই ১৮৮০। মুজাহিদরা কান্দাহার সীমান্তে পৌঁছেছেন। মাইওয়ান্দ একটি বিখ্যাত গ্রাম। মরুময় প্রান্তর। সবুজের দেখা নেই কোথাও। মুসলিমবাহিনীর এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে ইংরেজরাও জেনারেল ব্রুজের নেতৃত্বে একটি বাহিনী নিয়ে ময়দানে আসে। ইংরেজরা সৌভাগ্যক্রমে কুনার নদীর কিনারে তাদের ছাউনি স্থাপনের সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে পানি এবং অতিরিক্ত রসদ সরবরাহের কিছু প্রাকৃতিক ব্যবস্থা তারা লাভ করে; কিন্তু মুজাহিদরা বাধ্য হয়ে ময়দানের অপর দিকে মরুপ্রান্তরে ছাউনি ফেলেন। চারদিকে কোথাও পানি নেই। এ সময় সৌভাগ্যবশত তাদের ছাউনি থেকে কিছু দূরে পুরানো যুগের একটি কারিজের* সন্ধান পাওয়া যায়। মুজাহিদরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে সেটি পুনরায় নবায়ন করেন। ফলে আল্লাহর রহমতে পানির ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য প্রাণভরে পানি পান করেন। প্রাণীদেরও প্রয়োজনমতো পান করানো হয়।

ছয় দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী একে অপরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। প্রতিপক্ষের শক্তিসামর্থ্য পরখ করা হচ্ছিল এ সময়। ইংরেজরা এবার ১২ হাজার সেনাসহ ময়দানে এসেছিল। এ ছাড়া তাদের কাছে ছিল আধুনিক সমরাস্ত্র ও কামান। অপরদিকে

* কারিজ অভিনব একটি সেচপদ্ধতি, যা একইসঙ্গে জমিতে সেচ দেয় এবং সুপেয় পানির প্রবাহ সরবরাহ করে। আমরা আগে এ পদ্ধতির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সরদার শের আলি খান এ সময় তার বাহিনীসহ ইংরেজদের ছাউনিতে অবস্থান নেয়। তাকে ও তার বাহিনীকে আধুনিক সমরাস্ত্র প্রদান করে তারা।

এদিকে মুজাহিদদের সংখ্যা যদিও ইংরেজদের সমান ছিল; কিন্তু সমরাস্ত্র আর রসদ ছিল একেবারে কম। তবে শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য অথবা তাদের অধিক সমরাস্ত্র মুজাহিদদের কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাঁরা ইমানি চেতনা এবং জিহাদি জজবায় পূর্ণ ছিলেন। হৃদয় ছিল তাঁদের প্রশান্ত। যুদ্ধ শুরু হতে দেরি হওয়ায় উলটো তাঁরাই যুদ্ধ শুরু করতে নিয়মিত গেরিলা আক্রমণ করতেন। প্রতিদিন ইংরেজবাহিনী থেকে রসদসামগ্রী এবং দুয়েকজন সেনাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ফিরে আসতেন। একধরনের উসকানিমূলক পদক্ষেপ ছিল এগুলো।

এ ছাড়া মুজাহিদরা চাচ্ছিলেন যুদ্ধ যেন দ্রুত শুরু হয়। কেননা, যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সে সময়ের মধ্যে কাবুল থেকে ইংরেজদের জন্য সেনাসাহায্য আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। ইংরেজ কমান্ডার নিজেও ইচ্ছা করে কালবিলম্ব করছিল। কেননা, সে কাবুল থেকে সেনাসাহায্যের অপেক্ষায় ছিল। ষষ্ঠ দিন মুজাহিদরা সিদ্ধান্ত নেন, আগামীকাল ভোরে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করা হবে।

২৭ জুলাই ১৮৮০। মাইওয়ান্দের ময়দান নতুন একটি ইতিহাস রচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। মুজাহিদদের অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস প্রত্যক্ষ করতে আসমান-জমিন যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। মুজাহিদদের সম্মিলিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। ঠিক ফজরের পর এই হামলা করা হয়। হাজার হাজার আফগান যুবক তাকবিরধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ইংরেজদের সেনাসারির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। ইংরেজরাও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা তোপ-কামান প্রস্তুত করে ফেলে। মুজাহিদরা দ্রুতগতিতে তোপের সীমানা পেরিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যান। এ সময় ইংরেজ সেনারা তাদের বন্দুকের নলগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। কামানের সঙ্গে যুদ্ধ করা মুজাহিদদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু ইংরেজদের ফায়ারিংয়ের জবাবে তারাও তাদের পুরানো বন্দুকের মুখ খুলে দেন। ইংরেজরা অনবরত বন্দুকের ম্যাগাজিন খালি করছিল; আর মুজাহিদরা অত্যন্ত ধীরেসুস্থে তাদের পুরানো বন্দুক দিয়ে একে একে পাখির মতো তাদের শিকার করছিলেন।

সূর্য যতই মাথার উপরে উঠছিল, যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ততই বাড়ছিল। রোদের প্রখরতায় ময়দান ছিল উত্তপ্ত। বালুকারাশি গলিত লোহার মতো আচরণ করছিল। মুজাহিদরা বার বার ইংরেজদের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেও সুবিধা করতে পারছিলেন না। এদিকে ইংরেজ সেনারা তাদের আধুনিক সমরাস্ত্রের মাধ্যমে ধারাবাহিক সাফল্য পাচ্ছিল। এসব

হামলায় অনেক মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। আহতদের সারিও ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মুজাহিদরা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন।

মুজাহিদদের সাহস ও হিম্মতের উদাহরণ হিসেবে এতটুকু বলা যায়, সেদিন নারীরাও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা সামনে এগিয়ে এসে মুজাহিদদের সাহস জুগিয়ে যাচ্ছিলেন। বীরাঙ্গনা নারীদের মধ্যে মালালাই নামের এক নারী আন্দোলনের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি জিহাদি সংগীত গেয়ে মুজাহিদদের মধ্যে সাহস ও জিহাদি স্পৃহা তৈরি করতেন। এর মাধ্যমে মুজাহিদরা অনুপ্রাণিত হতেন। ইংরেজরা অবাক হয়ে লক্ষ করছিল, আধুনিক সমরাস্ত্রের মোকাবিলা করতে না পেরেও আফগানরা লাশের সারি মাড়িয়ে তাদের কাছে আসার চেষ্টা করছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার বটে!

সকাল থেকে এ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ইংরেজদের অবস্থান শক্তিশালী ছিল। দ্বিপ্রহর হতে না-হতেই ৫০০ জন মুজাহিদ শহিদ এবং সাড়ে ৮০০ জন গুরুতর আহত হন। ইংরেজ কমান্ডার ভাবছিল, আর কিছুক্ষণ এভাবে মুজাহিদদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারলে পরের প্রহরে তারাই এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করতে পারবে।

খাতুন মালালাইর তারানা

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মুজাহিদদের কয়েকজন কমান্ডার শহিদ হয়ে যান। হায়দার খান কান্দাহারি, আবদুল গফুর খান মাশার হেরাতি, বাচ্চা কবির খান ও মুহাম্মাদ জামান বারেকজাইয়ের মতো বিখ্যাত মুজাহিদ নেতা জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু এরপরও মুজাহিদরা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলেন। এ সময় পতাকাবাহী একজন মুজাহিদ গুলি খেয়ে পড়ে গেলে বীরাঙ্গনা মালালাই অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এসে পতাকা সামলে নেন। এরপর আপন কাঁধে প্রতিস্থাপন করে আবৃত্তি করতে থাকেন,

> *আমার কাঁধে মাশুকের রক্তসংবলিত একটি চারা গাছ রয়েছে। সবুজশ্যামল মাঠে গজিয়ে ওঠা তরুলতার চেয়েও এটি অধিক শক্তিশালী।*
>
> *যদি তুমি এই তরুর জন্য মাইওয়ান্দের ময়দানে আজ জীবন দিতে না পারো, তাহলে মনে রেখো, তোমার জীবন ষোলো আনাই বৃথা।*

মহিয়সী এই নারীর বীরত্বপূর্ণ কয়েকটি বাক্য ক্লান্ত হয়ে পড়া মুজাহিদদের নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে। পূর্ণ উদ্যমে তাঁরা আবারও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে আফগান সংস্কৃতিতে এই পঙ্‌ক্তিগুলো ঐতিহাসিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়। আজও মুজাহিদদের মধ্যে বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সময় এই পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করা হয়ে থাকে।

নতুন পরিকল্পনা এবং অভিনব যুদ্ধকৌশল

বেশ কিছু মুজাহিদ নেতা এবং কমান্ডার ইতিমধ্যে শহিদ হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য এই মুহূর্তে বাকি নেতৃবৃন্দ যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করে ফেলেন। উপ-সেনাপতি হাফিজ খান গেরিলা পদ্ধতি ছেড়ে দিতে মুজাহিদদের আদেশ দেন। ইংরেজদের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার বদলে এবার তাদের শুয়ে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিকাংশ মুজাহিদ এভাবে শুয়ে পড়লে ইংরেজরা হতভম্ব হয়ে যায়। এই মুহূর্তে সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের নেতৃত্বে ৪ হাজার সেনা ময়দান থেকে আচমকা বেরিয়ে যায়।

জেনারেল ব্রুজ তখন ভেবে বসে, হয়তো তাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই সে পরিস্থিতিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে সেনাদের এগিয়ে গিয়ে সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দেয়। আদেশমতো ইংরেজ সেনারা মুজাহিদদের একেবারে কাছে চলে আসে। মনে হচ্ছিল একটিমাত্র আক্রমণেই এবার তাঁদের নিঃশেষ করে দেবে তারা; কিন্তু যখনই তারা মুজাহিদদের হাতের নাগালে চলে আসে, তখনই হঠাৎ বন্দুকগুলো গর্জে ওঠে। এ সময় ইংরেজদের অগ্রগামী গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। কেননা, মুজাহিদদের একটি গুলিও ব্যর্থ হচ্ছিল না। কিছুসময় দুই বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি চলে। এরই কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে চতুর্দিক থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তাকবিরধ্বনি ভেসে আসতে থাকে। ইংরেজরা তখন কিছুই বুঝতে পারছিল না। দুই মিনিটের মধ্যেই চারপাশে ধুলোর মেঘ দেখা দেয়। মনে হচ্ছিল, চতুর্দিক থেকে ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। এই মুহূর্তে এসে ইংরেজবাহিনী বাস্তবতা কিছুটা বুঝতে শুরু করে।

মূলত সরদার আইয়ুব খানের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেনি; বরং তারা বেশ কয়েক মাইল পেছনে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রকে ঘিরে একটি বৃহৎ বৃত্ত তৈরি করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে তারা এই বৃত্তকে সংকুচিত করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন। ফলে ইংরেজরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশদের শোচনীয় পরাজয়

দেখতে দেখতে অশ্বারোহী মুজাহিদরা ইংরেজদের কচুকাটা করতে থাকেন। এবার শুরু হয় হাতাহাতি লড়াই। তরবারি আর খঞ্জর দিয়ে শত্রুদের ধরাশায়ী করতে থাকেন মুজাহিদরা। ইংরেজ সেনাদের গলাকাটা লাশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, শত বছর পুরানো যুগে যেন ফিরে গেছে আজকের যুদ্ধের পটভূমি। তবে ইংরেজরা এই বিক্ষিপ্ত

অবস্থায়ও তাদের সারি ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় ইংরেজদের ওপর মুজাহিদদের অবস্থান শক্তিশালী হয়ে পড়েছে বলে মনে হতে থাকে। ইংরেজদের আধুনিক যুদ্ধকৌশল ও সমরাস্ত্র সেদিন মুজাহিদদের ইমানি জজবা আর অসম বীরত্বের সামনে পরাজয় বরণ করে।

ইংরেজরা এতক্ষণ তাদের কামান-গোলা আর বন্দুকের মতো আধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন যুদ্ধে মুজাহিদদের পরাজিত করে আসছিল; কিন্তু আজকের লড়াইয়ে তারা পুরানো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা টের পায়। অবশেষে ইংরেজরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে। এই মুহূর্তে কোনো সঠিক নির্দেশনা না থাকায় যে যেদিকে পারে, সেদিকে পালিয়ে যেতে থাকে; কিন্তু মুজাহিদরা তাদের এই সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন না। ফলে অধিকাংশ ইংরেজ সেনা পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। ১২ হাজার সেনার মধ্যে মাত্র ৬০০ জন সেদিন বেঁচে পালাতে পেরেছিল। অর্থাৎ ১১ হাজার ৪০০ ইংরেজ সেনা মাইওয়ান্দের ভূমিতে সেদিন মৃত্যুবরণ করে। অবিশ্বাস্য!

ইতিহাসবিদ মির্জা ইয়াকুব আলি খুওয়াফি লিখেছেন, '১২ হাজার ইংরেজ সেনার মধ্যে মাত্র ২৫ জন সেদিন প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হয়।' আরেকটি বর্ণনামতে, ২৫ জন্য সেদিন বেঁচে ফিরে যেতে পেরেছিল একটি বিশেষ কারণে। কেননা, সেদিন ইংরেজ সেনাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে আফগানি পোশাক পরেছিল। ফলে তাদের আর ধাওয়া করা হয়নি। তবে ইংরেজ সেনারা পলায়নরত অবস্থায় গাদ্দার সরদার শের আলি খানকে তাদের সঙ্গে পেয়ে যায়। সে গোপন রাস্তা ধরে কান্দাহার পর্যন্ত তাদের পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। পলায়নরত এই সেনাদের মাধ্যমেই কান্দাহারে অবস্থানরত ইংরেজ জেনারেল প্রাইম রোজ এমন শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পেয়েছিল। এ ছাড়া সে সময় যোগাযোগের অন্য কোনো মাধ্যম বাকি ছিল না। কান্দাহার থেকে সংবাদ খুব দ্রুত কাবুলে পৌঁছে যায়। কাবুল থেকে সরাসরি লন্ডন। সংবাদ পৌঁছামাত্র সমগ্র ব্রিটিশ শাসন নড়েচড়ে বসে। আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে তাদের চেহারা। পরবর্তী আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তারা আফগানিস্তানের অপ্রতিরোধ্য আর অপরাজেয় ভূমি থেকে বেরিয়ে যায়, এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল লন্ডনের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় থেকে। অবশেষে ব্রিটিশরা আফগানিস্তানে তাদের সামরিক পরাজয় কার্যত স্বীকার করে নেয়।

সরদার আবদুর রাহমান খানের শাসন গ্রহণ

ইংরেজদের পরাজিত করার নেপথ্যে সরদার আইয়ুব খান ও তাঁর মুজাহিদবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। মূলত তাঁরাই তাদের আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তাই আগামীর আফগানিস্তানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবচেয়ে

বেশি হকদার ছিলেন তাঁরাই; কিন্তু সরদার আবদুর রাহমান খান কাবুলে অবস্থান করে ঐতিহাসিক এই বিজয়ের ফল রাজনৈতিকভাবে স্যাবোটাজের চেষ্টা করেন। ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার কারণে তিনি এ সময় তাদের সমর্থন পাচ্ছিলেন।

২৭ জুলাই ১৮৮০ মাইওয়ান্দের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঠিক এর একদিন আগে সরদার আবদুর রাহমান খান ১০ হাজার মুজাহিদের উপস্থিতিতে চাহারিকার নামক স্থানে একটি বিশাল জনসভায় আফগানিস্তানের বাদশাহ হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। ইংরেজদের সামনে এই মুহূর্তে দুটি ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করছিল। একদিকে তো কান্দাহারে সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান তাঁর বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে আশেপাশের অঞ্চল ইংরেজমুক্ত করার মিশনে পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন, অপরদিকে কাবুলে সরদার আবদুর রাহমান খানের কাছে জড়ো হয়েছিলেন ১ লাখ জানবাজ মুজাহিদ। কান্দাহারের মতো তাঁরা যদি কাবুলে অবস্থানকারী ইংরেজবাহিনীর ওপর হামলা করেন, তাহলে তাঁদের পরাজিত করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। তাই এই মুহূর্তে কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে থাকে ইংরেজরা।

ইংরেজদের সঙ্গে কূটনীতি

প্রথমত কঠিন এই পরিস্থিতিতে ইংরেজরা অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও দূরদির্শতার সঙ্গে সরদার আবদুর রাহমান খানের সঙ্গে কূটনৈতিক সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যায়। আবদুর রাহমান খান ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না; বরং তিনি মুজাহিদদের সুবিশাল এই জামাআতকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এ জন্য তিনি আগে থেকেই ইংরেজদের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব বজায় রাখতেন। ফলে ইংরেজ এবং সরদার আবদুর রাহমান খানের মধ্যে একটি কূটনৈতিক চুক্তি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইংরেজরা সরদার আবদুর রাহমান খানকে আফগানিস্তানের সর্বজনীন বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। বিনিময়ে আবদুর রাহমান খান ব্রিটিশবাহিনীকে সমগ্র আফগানিস্তানের বড় বড় প্রাদেশিক শহর থেকে নিরাপত্তার সঙ্গে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শুধু তা-ই নয়, ইংরেজরা যখন বুঝতে পারে, সরদার ক্ষমতাগ্রহণের স্বার্থে যেকোনো শর্ত মেনে নিতে পারেন, তখন তারা আগের গান্দমাক চুক্তির বেশ কিছু নিন্দনীয় শর্ত তাঁর সামনে উপস্থাপন করে। তিনি বিনা দ্বিধায় সেসব শর্ত মেনে স্বাক্ষর করেন।

অপমানজনক গান্দমাক চুক্তি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মে আমির ইয়াকুব আলি খান এবং সমকালীন ইংরেজ গভর্নরের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। সেই চুক্তি মোতাবিক আফগানিস্তান তার পররাষ্ট্রনীতিতে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ শাসনের অধীন হয়ে পড়ে। এমনকি

ভৌগোলিকভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংযোগকারী বিখ্যাত গিরিপথগুলোর নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়। ইংরেজরা আরেকবার সরদার আবদুর রাহমান খানের হাতে সে নিন্দনীয় শর্তগুলো চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষর করিয়ে নেয় :

১. আফগানিস্তানে প্রশাসকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিদেশি অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে পররাষ্ট্র সম্পর্ক তৈরি করবে না।

২. বোলান পাস, পেওয়াড় পাস, খুররম পাস ও খাইবার পাস ইংরেজদের অধীনে থাকবে।

৩. পিশিন ও সিবি অঞ্চলে ইংরেজরা তাদের সেনাছাউনি নির্মাণের সুযোগ পাবে।

৪. কান্দাহারকে স্বায়ত্তশাসনের অধীনে এনে ভিন্ন একজন শাসক কর্তৃক এই অঞ্চল শাসনের সুযোগ করে দিতে হবে।[৬]

আবদুর রাহমান খান এসব শর্ত বিনা দ্বিধায় মেনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। একইসঙ্গে তিনি সমগ্র আফগানিস্তান থেকে ইংরেজদের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন; অথচ মুজাহিদরা কোনোভাবেই ইংরেজদের আফগানিস্তান থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে দিতে চাচ্ছিলেন না।

কান্দাহারের যুদ্ধ থেকে ইংরেজদের পলায়ন

এদিকে সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান বিজয়ী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করে বসেন। অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনারা তখন তাদের জীবনের শেষ প্রহর কেমন হবে, সেসব নিয়ে ভাবনায় বিভোর ছিল। জেনারেল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে একটি বিরাট বাহিনী শেরপুর দুর্গ থেকে কান্দাহারের দিকে পাঠিয়ে দেয়। আবদুর রাহমান খান এই বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য তার বিশেষ কজন সেনাপতিকে বাহিনীর সঙ্গে পাঠান। কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে বসবাসকারী সকল গোত্রীয় সরদারকে তিনি ইংরেজদের ওপর আক্রমণ না করতে অনুরোধ জানান। সরদাররা আবদুর রাহমান খানের অনুরোধ রক্ষা করে এ দফা তাদের সুযোগ দেয়। ফলে এক বছর ধরে কাবুল থেকে কান্দাহারের পথ ইংরেজদের জন্য মৃত্যুর বিভীষিকা হয়ে থাকলেও এবার তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

জেনারেল রবার্টস কোনো ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে ঝড়ের গতিতে পথ চলতে থাকে। অবশেষে ২৮ আগস্ট তারা কান্দাহার পৌঁছে যায়। এ সময় কালবিলম্ব

---

[৬] কেন যেন প্রতি যুগেই কান্দাহারকে বিদেশি শক্তিগুলো আফগানের মূল ভূমি থেকে পৃথক রাখতে চেয়েছে। এ এক অবোধ্য রহস্য! এই মাটি থেকে সম্ভবত স্বাধিকার চেতনা ও ইমানি সুবাস সর্বদা চারদিকে ছড়াতে থাকে।

না করে তারা সরদার আইয়ুব খানের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতর্কিত হামলা মুজাহিদদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় প্রমাণিত হয়। বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হন। জেনারেল রবার্টসের বাহিনী অত্যন্ত নিরাপদ ও বিজয়ী বেশে কান্দাহার দুর্গে প্রবেশ করে। এবার সে ঘোষণা করে, সমগ্র আফগানিস্তানের বাদশাহ হলেন সরদার আবদুর রাহমান খান। তাই আমরা কান্দাহারকে তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সমর্পণ করব। মূলত জেনারেলের সঙ্গে শামসুদ্দিন খান নামের একব্যক্তি কাবুল থেকে কান্দাহারে এসেছিল। আবদুর রাহমান খানের কান্দাহার প্রতিনিধি হিসেবে তাকেই নির্বাচিত করা হয়। ইংরেজরা তার হাতে কান্দাহারের চাবি তুলে দেয়। তারা ভাবতে থাকে, আফগানিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে নিজেদের কবজায় রেখে তারা নিরাপদে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে যাচ্ছে। আবদুর রাহমান খান তাদের বন্ধুপ্রতিম শাসক হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল স্বার্থকে মূল্যায়ন করবেন। বাহ্যত আফগানিস্তানকে স্বাধীন দেখালেও আবদুর রাহমান খান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগিতা ছাড়া একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারবেন না। ফলে আফগান জনগণের দীর্ঘদিনের স্বাধীন আফগানিস্তান স্বপ্নই থেকে যাবে।

কাবুলে আবদুর রাহমান খান

আগস্টে ইংরেজদের হিন্দুস্থান ফিরে যাওয়ার পালা শুরু হয়। এদিকে কাবুলের উপকণ্ঠে অপেক্ষায় থাকা আবদুর রাহমান খান তখন কাবুলে প্রবেশ করেন। কাবুলের সাধারণ জনগণ যারা ইংরেজদের প্রত্যাগমনকে সরদার আবদুর রাহমান খানের কৃতিত্ব ভেবে বসে ছিল, তারা বাদশাহকে সম্মান, অভিবাদন ও উষ্ণ স্বাগত জানাতে থাকে। আবদুর রাহমান খান কাবুলে প্রবেশের পর বাগেশাহর এলাকায় তাঁর ছাউনি স্থাপন করেন। এ সময় ইংরেজবাহিনীর দুজন জেনারেল যথাক্রমে জেনারেল গ্রিফেন এবং স্টুয়ার্ট হিন্দুস্থান ফিরে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে বিদায় নিতে আবদুর রাহমান খানের সামনে উপস্থিত হয়।

পরে এই জায়গা ইংরেজদের প্রত্যাগমনের স্মৃতি ও আফগানজাতির বিজয় হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে একটি মিনার তৈরি করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় বুর্জ শহর আরা। এই মিনারের ধ্বংসাবশেষ আজও কাবুলে ইংরেজদের পরাজয় এবং ঐতিহাসিক পলায়নের স্মৃতি ধরে রেখেছে।

ইংরেজদের পলায়ন নিয়ে কিছু কথা

এটা সত্য যে, ১৮৭৯-১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ঐতিহাসিক যুদ্ধের পূর্ণ ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। আবদুর রাহমান খান ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা করে আফগানদের

জন্য তেমন কিছু আদায় করতে পারেননি। উলটো ইংরেজরা পরাজিত হয়েও তাঁর থেকে বেশ কিছু স্বার্থ আদায় করে নেয়। তবে এতটুকুই-বা কম কী যে, গরিব, অসহায়, দুর্বল এবং সবধরনের আধুনিক উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত একটি জাতির কাছে সমকালীন বিশ্বপরাশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ন্যক্কারজনকভাবে পরাজিত হয়ে মাঠ ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এক বছর নয় মাস পর্যন্ত তারা এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে; অথচ এই ব্রিটিশরাই উপমহাদেশের মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চল একের পর এক বিজয় করেছিল। তাদের সামান্য প্রতিরোধও কেউ করতে পারেনি।

মনে রাখতে হবে, ইংরেজরা এ সময় তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্ত অতিবাহিত করছিল। সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ডঙ্কা বাজত। সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর অপরাজেয়। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের তুলনায় এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, সক্ষমতা, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, সামরিক শক্তি, শিল্পবিপ্লব এবং রাজনৈতিক অর্জনের দিক থেকে বহুগুণ এগিয়ে ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা তখন সাফল্য ও বিজয়ের মুখ দেখছিল। হিন্দুস্থানের প্রতি ইঞ্চি জমি ব্রিটিশদের অধীনে শাসিত হচ্ছিল। সে সময় আরব দেশগুলো ব্রিটিশ রাজনীতির অধীনে চলে গিয়েছিল। অনারব দেশগুলো হয়ে পড়েছিল সরাসরি ব্রিটিশ উপনিবেশের অংশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এটিই ছিল সেই সময়, যখন তারা এই সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করত না। শক্তির সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকা এই পরাশক্তি আফগানিস্তানের মাটিতে মুসলমানদের ইমানি জজবা আর শাহাদাতের তামান্নার কাছে আরও একবার পরাজয় বরণ করে।

এ পরাজয় এতটাই শোচনীয় ছিল যে, ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের পরাজয়ের সঙ্গে এটি কোনো তুলনাই রাখে না। মুজাহিদদের সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাশক্তি দুই বছর টিকে থাকতে পারেনি। অবশেষে কোনোমতে জান বাঁচিয়ে হিন্দুস্থানে পৌঁছতে চুক্তিপত্রে তাদের স্বাক্ষর করতে হয়।

যদি এই মুহূর্তে আবদুর রাহমান খান রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে না আসতেন, তাহলে একজন ব্রিটিশও আফগানিস্তান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত না। আজ হয়তো আমরা হাজার হাজার ব্রিটিশ সেনার কবরের সন্ধান করতে হিন্দুকুশের পাহাড় চষে বেড়াতাম; কিন্তু আবদুর রাহমান খান এমন কিছু হতে দেননি। তিনি চুক্তির মাধ্যমে শুধু তাদের নিরাপদ রাস্তা করে দেননি; বরং তাদেরকে প্রয়োজনীয় রসদ এবং পশুপালও উপহার দিয়েছিলেন। এমনকি এই পশুপালের খাবারের দিকেও সুদৃষ্টি রেখেছিলেন। হিন্দুস্থান পৌঁছা পর্যন্ত সমগ্র বাহিনীকে সামনে-পেছনে নিরাপত্তা দিয়েছিল তাঁর বাহিনী। এভাবে শীতকাল আসার আগেই ইংরেজদের

পুরো বাহিনী আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এই চিত্র ছিল ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয়।

৬০ হাজার ইংরেজ সেনার মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ, আফগানিস্তানে অভিযানে আসা বাহিনীর প্রায় অর্ধেক সেনার সলিলসমাধি হয় এখানে। বিশ্বজুড়ে সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চরম অপদস্থ হতে হয়েছিল। লজ্জায় অপমানে তাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। একইসঙ্গে এ কথা প্রমাণিত হয়, মুসলমানরা তাদের পতনের যুগে এসেও অসহায় আর দরিদ্র অবস্থায় বিশ্বপরাশক্তিদের টনক নাড়িয়ে দিতে পারে। আজও তারা বড় থেকে বড় বাহিনীকে ইমানি চেতনা আর জিহাদের মাধ্যমে পরাজিত করতে সক্ষম।

চূর্ণ হলো পরাশক্তির দম্ভ

ঐতিহাসিক এই পরাজয়ের কী প্রভাব পড়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর? অগণিত সেনা, শক্তিশালী রাজনীতি, আধুনিক সমরাস্ত্র এবং অপরিমিত রসদ থাকার পরও আফগানিস্তানের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় তাদের শক্তির দম্ভ চূর্ণ করে দেয়। বেশ কজন ব্রিটিশ ইতিহাসগবেষক এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। এরপর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আগামী দিনে আর কখনো আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদি করা হয়, তাহলে পরিণতি এর চেয়েও ভয়াবহ হবে। এই প্রেক্ষাপটে একজন বিখ্যাত ইংরেজ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাস-গবেষক মাস্টার ওয়েলিংটন লিখেছেন,

> *আফগান জনগণের প্রতিরোধযুদ্ধের শক্তিশালী মনোভাব আমরা বেশ কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছি। নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসে অনড় এই যোদ্ধা জাতি কান্দাহারের মরুভূমি ও জালালাবাদের পাহাড় উভয় স্থানেই তাদের চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম। এদের কাছে আদর্শ ও বিশ্বাসের বিপরীতে জীবনের কোনো মূল্য নেই। শত শত যুবক নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাস রক্ষার্থে একপলকে জীবন বিলিয়ে দিতে পারে। মাতৃভূমিকে এরা জীবন দিয়ে ভালোবাসে। চাপিয়ে দেওয়া শাসন এরা মেনে নিতে পারে না।*
>
> *ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই জাতি ১৮৪২ ও ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে দুই বার যুদ্ধে নেমেছিল; অথচ এই সময়গুলোতে তারা সমরনীতি ও যুদ্ধকৌশলে সেই প্রাচীন যুগেই অবস্থান করছিল। আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজি তাদের*

হাতে ছিল না; কিন্তু এরপরও তারা অসম সাহস আর বীরত্ব দেখিয়ে হাতে থাকা সাধারণ অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধে নেমেছিল। তাদের বিশ্বাসমতে, অবিশ্বাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নাম জিহাদ। এই জিহাদ তাদের সর্বাবস্থায় করতে হবে।

আমাদের জানামতে, আফগান জনগণের মধ্যে আজও এই মনোভাব ও মানসিকতা রয়ে গেছে। নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মাতৃভূমি রক্ষায় তারা ভয়ানক রূপ ধারণ করতে পারে। এই রূপ আজও ঠিক ততটাই ভয়ানক রয়েছে, যেমনটি ছিল প্রথম অ্যাংলো- আফগানযুদ্ধের সময়।

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ,* মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।

২. *তাজুত তাওয়ারিখ,* আমির আবদুর রাহমান খান।

৩. *সিরাজুত তাওয়ারিখ,* মির্জা ফয়েজ মুহাম্মাদ খান।

১৯ তম অধ্যায়

আমির আবদুর রাহমান খানের যুগ

আবদুর রাহমান খান আফগানিস্তানের অতীত শাসকদের মতো 'আমির' উপাধি ধারণ করে কাবুলের মসনদে আসীন হন। ক্ষমতাগ্রহণের সময় তার সামনে এমন কিছু সমস্যা ছিল, যেগুলো সমাধান করা ছিল তার জন্য অপরিহার্য।

১৮৪২ ও ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা পরাজিত হলেও যুদ্ধ আফগানিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। শিল্পকারখানাগুলো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যবসাবাণিজ্যে নেমে আসে চরম ধস। স্থাপত্যশিল্পসহ উন্নয়নপ্রক্রিয়া হয়ে পড়ে একেবারে স্থবির। জনপদগুলো পরিণত হয় বিরানভূমিতে। শিক্ষাব্যবস্থার শুধু কঙ্কালটাই বাকি ছিল। কৃষিব্যবস্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভীষণভাবে। আবদুর রাহমানের ক্ষমতাগ্রহণকালে আফগানিস্তানের সার্বিক অবস্থা ছিল বর্ণনাতীত শোচনীয়। শাসনব্যবস্থার কাঠামো এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, নতুন করে পুনর্গঠন ছাড়া বিকল্প ছিল না। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে তখনকার অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তখন আফগানিস্তান প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ছিল না। সব বাণিজ্যরুট ছিল ইংরেজদের অধীনে। এ ছাড়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগও হয়ে পড়ে অনেকটা ব্রিটিশদের করুণা-নির্ভর। আফগানিস্তান হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলোর একটি। বিগত শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার পরিস্থিতি একই অবস্থায় রয়ে গেছে।

আমির আবদুর রাহমানের সংস্কারনীতি

আমির আবদুর রাহমান খান এই অরাজক পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরতে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে স্বভাবে স্বেচ্ছাচারিতা থাকায় তার কয়েকটি পদক্ষেপ হয় ভারসাম্যহীন এবং কয়েকটি হয় ইসলামি মূল্যবোধবিরোধী। যেমন : রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ঘাটতি পূরণে তিনি জনগণের ওপর নতুন করে ট্যাক্স চাপিয়ে দেন। এ ছাড়া বাড়িয়ে দেন পুরানো কিছু ট্যাক্সের পরিমাণ।

তবে তিনি বাণিজ্যখাতে খুব জোর দেন। এ লক্ষ্যে মহাসড়কগুলো নিরাপদ করে তোলেন। চুরির অপরাধে ফাঁসির বিধান প্রবর্তন করেন। চোরাই মাল বিক্রি করলে ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ করে দিতেন। জনমনে তাঁর ভীতি এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, পথে কারও থলে পড়ে থাকলে সেটা কেউ উঠিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাত না। ব্যবস্যাবাণিজ্য এতটাই চাঙা হয়ে ওঠে যে, আফগান ব্যবসায়ীরা হিন্দুস্থানের পেশোয়ার, করাচি ও ইরানের মাশহাদে নিজেদের বাণিজ্য গড়ে তোলে। সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এই বাণিজ্যকর্ম দেখাশোনা করত। বিভিন্ন পেশা ও শিল্পে বেশ উন্নতি দেখা দেয়। কার্পেট, চামড়া, ও পোশাকশিল্প ফুলে-ফেপে ওঠে। শহরগুলোতে গড়ে উঠতে থাকে বিশালাকার বিল্ডিং। এসবের মধ্যে 'পুল খুশতি মসজিদ', 'মাহতাব কেল্লা' এবং 'বাগে বাবর' ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক জীবন

আমির আবদুর রাহমানের শাসনব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনার আগে তাঁর প্রথমিক জীবন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া সমীচীন মনে করছি। আমরা যদি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর কর্মতৎপরতা তুলে ধরি, তাহলে আশা করি এ ব্যাপারে পাঠকের আর কোনো তৃষ্ণা বাকি থাকবে না।

আমির আবদুর রাহমান ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আফজাল খানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। আফজাল খান ছিলেন তাঁর পিতা আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান কর্তৃক নিযুক্ত বলখ প্রদেশের শাসক। আফজল খানের বড় ছেলে ছিলেন আবদুর রাহমান। আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে ক্ষমতাদখল নিয়ে যুদ্ধ বাধলে যুবক আবদুর রাহমান তাঁর পিতার পক্ষ হয়ে সেসব যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তখন আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতায় ছিলেন আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের মনোনীত আমির শের আলি খান। আফজাল খান সে সময় ছেলে আবদুর রাহমানকে সঙ্গে নিয়ে শের আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এই গৃহযুদ্ধের ব্যাপ্তি ছিল ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে আফজল খান মারা গেলে আমির আবদুর রাহমান তার আরেক চাচা আজম খানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। শুরুর দিকে তিনি অল্পবিস্তর সাফল্য পান। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য কাবুল করায়ত্ত করে নেন। তবে শেষ পর্যন্ত সরকারি বাহিনীর সঙ্গে গজনির পাশে চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হন।

নির্বাসন থেকে শাহি মসনদ

এই পরাজয়ের পর আবদুর রাহমান খান ঠিকানাহীন মুসাফিরের মতো গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকেন। কিছুদিন ওয়াজিরিস্তানে অবস্থান করে পরে ইরানে চলে যান। বহু ঘাটের পানি পানের পর একপর্যায়ে মধ্য-এশিয়ার তাশখন্দে চলে যান। তার এ দুরবস্থা দেখে রুশ গভর্নর কাফম্যান দয়াপরবশ হয়ে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে। জীবনধারণের জন্য ভাতাও নির্ধারণ করে দেয়।

এদিকে ১৮৭৯ খিষ্টাব্দে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলে শের আলি খান ভীত হয়ে নিজেই ক্ষমতা থেকে নেমে যান। শের আলি খানের পলায়নের পর তাঁর ছেলে ইয়াকুব আলি খান ক্ষমতাসীন হন; কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে গেলে তাঁকেও ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এরপরই শুরু হয় জিহাদি তৎপরতা। ফলে আফগানিস্তানে ইংরেজদের পা টলে ওঠে। এই পর্যায়ে আবদুর রাহমান ক্ষমতার দাবি নিয়ে রাশিয়া থেকে আফগানিস্তানে চলে আসেন এবং ইংরেজদের আনুগত্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত করে একটি চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নেন।

আবদুর রাহমানের স্বভাব

জন্ম থেকেই আবদুর রাহমানের স্বভাবে ছিল রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা। শত প্রচেষ্টার পরও পিতা তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি। আবদুর রাহমান *তাজুত তাওয়ারিখ* নামক তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, 'বাল্যকালে একবার আমার ওপর ভাঙ ও মদ পানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পিতা আমাকে একটি কক্ষে বন্দি করে রাখেন। সেখানে আমাকে পূর্ণ একটি বছর কাটাতে হয়েছিল।'

ঘটনাটির আরেকটি চিত্র তাঁর সামসময়িক ইতিহাসবিদ ইয়াকুব আলি এভাবে লেখেন, সরদার আবদুর রাহমান বাল্যকালে শখের বসে বন্দুক চালাতেন। একবার মাজার-ই-শরিফের বাইরে বন্দুক চালনার অনুশীলনে বেরিয়ে বলেন, 'আমার বুঝে আসে না, বন্দুকের গুলিতে মানুষ মারা যায় কীভাবে!' এ কথা বলে এক গোলামকে ডেকে কয়েক ফিট দূরে দাঁড় করিয়ে তার ওপর গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ হয়ে গোলামটি মারা গেলে নির্দয় আবদুর রাহমান হাসতে থাকেন। পিতা যখন তার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হন, তখন তাকে একটি কক্ষে বন্দি করে রাখেন।

নতুন আঙ্গিকে সেনাবিন্যাস

আমির আবদুর রাহমান প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। ক্ষমতাগ্রহণের পর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ দেননি। অল্প সময়ে সমগ্র দেশে আধিপত্য বিস্তার করে নেন। তিনি পাষাণ প্রকৃতির হলেও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি অনুভব করেন, প্রাচীন রাষ্ট্রকাঠামো সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গ দিতে অক্ষম;

ব্যাপারটি ধরতে পেরে প্রশাসনিক কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসেন। প্রতিষ্ঠা করেন নতুন নতুন বিভাগ। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজান। সেনাবাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলেন। এ লক্ষ্যে নতুন কিছু আইনও প্রবর্তন করা হয়। তিনি দেশের প্রতি আটজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে একজনের জন্য সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক করেন। প্রত্যেক সেনার জন্য ছুটির দিনগুলোতেও তার স্থলাভিষিক্ত সেনা রেখে যাওয়া আবশ্যক করে দেন। যুদ্ধময়দানে কান্নাকাটি করা সৈনিককের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান জারি করেন। এমনকি হত্যার বিধানও ছিল। তবে যুদ্ধমাঠে মারা যাওয়া সেনার পিতামাতা ও সন্তানদের ভাতাও নির্ধারণ করেছিলেন তিনি।

তার গৃহীত এই পদক্ষেপের ফলে আফগান সেনাবাহিনী বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের জনবল বৃদ্ধি পায়। শুধু বন্দুকধারী সেনাসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ হাজারে। পুলিশবাহিনীকেও নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলেন। তবে আবদুর রাহমান যেহেতু চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তারই অনুকরণে পুলিশ ও বিচারবিভাগ জনগণের সেবক না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থের সেবক হয়ে ওঠে। প্রশাসনে জনগণের প্রতিনিধিত্ব, শুরাব্যবস্থার অস্তিত্ব, গোত্রীয় নেতাদের ভূমিকা এবং আলিমদের অংশগ্রহণ ছিল অবান্তর প্রশ্ন। সব ক্ষমতা এককভাবে তাঁর কুক্ষিগত ছিল। ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র 'কর্মপরিকল্পনা, শাসক ও শৃঙ্খলা' নামক সনদের ভিত্তিতে কাজ করত। বিচারবিভাগ *আসাসুল কুজাত* নামক একটি গ্রন্থের বিধানমতো ফায়সালা দিতে বাধ্য ছিল। দেশে স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ঠিকই, শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব ছিল না সত্য, তবে পুরো রাষ্ট্র যেন হয়ে উঠেছিল একটি বৃহৎ কারাগার। কারাগারের মতোই সেখানে আইনশৃঙ্খলা সক্রিয় ছিল, শুধু ছিল না ন্যূনতম ব্যক্তিস্বাধীনতা।

গুপ্তচরবৃত্তির নতুন ব্যবস্থাপনা ও নিষ্ঠুরতার উগ্র প্রদর্শনী

আবদুর রাহমান খান একজন চতুর স্বৈরশাসকের মতো বিরোধীদের সবসময় পর্যবেক্ষণে রাখতেন। প্রতিপক্ষকে সামাল দিতে হয়ে ওঠেন একজন শক্তিশালী ডিক্টেটর। দেশব্যাপী গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রাখেন। তাঁর বিরুদ্ধে যা বলা হতো, গোয়েন্দারা সব নোট করে রাখত।

তিনি গোয়েন্দাতৎপরতায় প্রাচীন রীতি ছেড়ে ব্রিটিশদের রীতি গ্রহণ করেন। তবে তার ভুল ছিল—ইংরেজরা তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে কাজে লাগাত, পক্ষান্তরে আবদুর রাহমান নিজের লোকদের ওপরও এই ব্যবস্থা চাপিয়ে দেন। তা ছাড়া গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ডও রাখেননি। যে-কাউকে এই

কাজের জন্য নিয়োগ দিয়ে দিতেন। গোয়েন্দাদের দেওয়া সংবাদ যাচাই-বাছাইয়েরও কার্যকর কোনো পদ্ধতি ছিল না। ফলে বহু গোয়েন্দা পূর্বশত্রুতার রেশ ধরে নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিয়ে দিত।

সরকারবিরোধী কথা বা কাজের অপরাধে যাদের গ্রেপ্তার করা হতো, তাদের জবানবন্দি শোনার আগেই ইংরেজদের প্রচলিত থানার মতো নির্দয়ভাবে টর্চার করা হতো। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ বেকসুর খালাস পেত। অধিকাংশকেই কারাগারের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে বন্দি থাকতে হতো; অথবা ঝুলতে হতো ফাঁসিকাষ্ঠে। সরকারবিরোধীরা সাধারণত সেসব নির্যাতনের মুখোমুখি হতো, যেগুলো ইংরেজরা তাদের এ দেশীয় কথিত বিদ্রোহীদের সঙ্গে করে থাকত। অভিযুক্তদের দীর্ঘদিন ঘুমাতে না দেওয়া, লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো, উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা, হামানদিস্তার সঙ্গে বেঁধে চাপ দেওয়া, কামানের নলের মুখে বেঁধে তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া তখন সাধারণ শাস্তি হয়ে উঠেছিল।

আমির নিজেই বিচারপতির মতো রায় দিয়ে নিজেই শাস্তি নির্ধারণ করতেন। অভিযুক্তদের জবানবন্দি ছাড়াই তাদের অত্যাচারের শিকার বানাতেন। এটা তার কাছে ছিল অনেকটা বিনোদনের মতো। এতে তিনি একপ্রকার পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতেন। তার বিচারবিভাগ কেমন ছিল, নিচে তার একটি বিবরণ দেখে নেওয়া যাক—

> তখন ছিল প্রচণ্ড শীতকাল। কতিপয় ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হিসেবে তার সামনে নিয়ে আসা হলে পেশকার বলে, 'আমির, এরা কোহে দামানের (পাহাড়ি অঞ্চলের) চোর।' আমির তখন কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই রায় দেন, 'এদের দুজনকে জবাই করে ফেলো। চারজনের হাত কেটে দাও। তিনজনের কান কেটে নাও। দুজনের চোখ উপড়ে ফেলো। তিনজনের পেট ছিঁড়ে ফেলো।'
>
> এরপর আরও কয়েকজন অভিযুক্তকে নিয়ে আসা হলে পেশকার বলে, 'আমির, এরা মুহাম্মাদ কাজিম নামের কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে চুরি করেছে।' আমির তাৎক্ষণিক রায় দেন, 'যাদের ঘরে চুরির মাল পাওয়া গেছে, তাদের চোখ উপড়ে ফেলে চোখে চুনা ঢেলে দেও। যে থানায় চুরি হয়েছে, সেই থানার কোতোয়ালকে হত্যা করে ফেলো।'

অভিযুক্তের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই তার ওপর এমন কঠিন শাস্তি আরোপ করা হতো, যা সহ্য করতে না পেরে অনেক নিরপরাধ মানুষ অপরাধ না করেও অপরাধ স্বীকার করে নিত। যেমন, মির্জা আবদুল হাকিম খানকে কোনো এক অপরাধে গ্রেপ্তার করে পেষণযন্ত্রের সামনে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, 'আমি এই কষ্ট সহ্য

করতে পারব না, আপনার যা ইচ্ছা করুন।' ফলে এক ভয়ানক অপরাধের স্বীকারোক্তি-সংক্রান্ত কাগজ লিখে তাতে তাঁর স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এর পরের দিন ওই অপরাধের ভিত্তিতে তাঁকে কামানের নলের সঙ্গে বেঁধে তোপ চালিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

ছয়টুপি-শশ কালাহ

আবদুর রাহমান প্রতিষ্ঠিত 'ছয়টুপি' প্রতিষ্ঠানও ছিল সাধারণ-বিশেষ সবার কাছে এক বিভীষিকার নাম। প্রতিষ্ঠানটি একধরনের 'তদন্তব্যুরো'র মতো ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে থাকত পাষাণপ্রাণ ছয়জন কর্মকর্তা। সেখানে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে তদন্তের নামে অকথ্য নির্যাতন করা হতো। কালক্রমে প্রতিষ্ঠানটি আতঙ্কের অপর নাম হয়ে ওঠে। কেউ যখন জানতে পারত তার নামে 'ছয়টুপি' প্রতিষ্ঠান তদন্তে নামতে যাচ্ছে, তখন সে ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাত।

আমিরের বিনোদন-রুচি

আমির ছিলেন পরিশ্রমী এবং বীরোচিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। রাজমহলের বিলাসী জীবন থেকে সামরিক ধাঁচের খেলা ও মেলা আয়োজন অধিক পছন্দ করতেন। তিনি স্থনীয় মেলা আয়োজনে খুব জোর দিতেন। বাজারে গল্পকারদের বসানো আসরগুলোকে উৎসাহ দিতেন। তার যুগে কাবুলের মাঠ ঘোড়দৌড়, তিরন্দাজি, সামরিক কলাকৌশল প্রদর্শনী, তরবারির খেলা এবং টার্গেট অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ ছাড়া শরিয়ত সমর্থন করে না, এমন বিনোদন তথা কবুতর খেলা, নাচগান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়।

চৌদ্দঘণ্টা কাজ, হাজারবার অভিশাপ

তার মত ছিল, দেশের উন্নয়নপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য বেশি বেশি কাজ করা দরকার। সুতরাং আচমকা একদিন নির্দেশ জারি করেন, অফিস-আদালতের কর্মঘণ্টা হবে সুর্যোদয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই নির্দেশের ফল দাঁড়ায়—কাজ তো ১৩-১৪ ঘণ্টা চলছিলই; কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা হয়ে পড়ছিল অর্ধমৃত। এতকিছুর পরও কারও পক্ষে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সাহস ছিল না।

অবশেষে আমিরের ছেলে মুহাম্মাদ উমরের আকিকা উৎসবে প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা ভয়ে ভয়ে আমিরের স্ত্রী 'বুবুজানের' মাধ্যমে একটি সুপারিশনামা পাঠান, যাতে

সরকারি অফিসসমূহের কর্মঘণ্টার ব্যাপারটি একটু পুনর্বিবেচনা করা হয়। আবেদনপত্রে তারা অত্যন্ত বিনয়ী ভাষায় লেখেন, দীর্ঘ সময় কাজের ফলে অনেকে অসুস্থ, অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। আমির যেন এই শুভমুহূর্তের অসিলায় তাদের ওপর একটু অনুগ্রহ করেন। কর্মঘণ্টা কিছুটা কমিয়ে নেন। চিঠিতে ৫২ জন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিল। সবাই নিজেকে আমিরের অধীন, নিমকখোর, অনুগত গোলাম, অনুগ্রহপ্রার্থী, প্রাণোৎসর্গকারী, খাদিম ইত্যাদি অভিধা দিয়ে স্বাক্ষর করেন; কিন্তু আবদুর রাহমান আবেদনপত্র ও নামগুলো পাঠ করে বলেন, 'তোমাদের ও তোমাদের পিতামাতাদের ওপর হাজার বার লানত!'

এই দফা দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হলে কারও পক্ষে পুনরায় এ নিয়ে কোনো আবেদন জানানোর সাহস হয়নি।

বৈরী পরিবেশে আবদুর রাহমান

আমির আবদুর রাহমান তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচতে দিচ্ছিলেন না। যাকে নিয়েই সামান্যতম সন্দেহ জাগত, তাকে দুনিয়াছাড়া করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতেন। একপর্যায়ে মুজাহিদরাও তার এই বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েন; অথচ তাঁদের কুরবানি ও আত্মত্যাগের ফলেই তিনি কাবুলের শাসক হতে পেরেছিলেন। তাঁদের পতাকা তুলে ধরেই তিনি ক্ষমতার মঞ্চে আসার পথ সুগম করতে সক্ষম হন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ, আবদুর রাহমানের ক্ষমতাসীন হওয়ার পরের বছরই এ বিষয়টি সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে যেমন জনআকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন নেই, তেমনি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কও অনুপস্থিত। তিনি হয়ে উঠছেন একজন নিরেট স্বৈরাচারী শাসক। তার কোনো মন্ত্রীসভা ছিল না। সব সিদ্ধান্ত ছিল ব্যক্তিগত, শাসনও ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। ফলে জনগণ তাকে একজন স্বৈরাচার ও জুলুমবাজ শাসক হিসেবে আখ্যা দেওয়া শুরু করে।

তিনি কাবুলের কারাগারে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে বন্দি করে রাখেন। জিহাদি নেতৃবৃন্দ বুঝে ফেলেন—তার জিহাদি স্লোগান ছিল সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক এক কূটচাল। তিনি মূলত ইংরেজদের ঘনিষ্ঠজন। ওদের সঙ্গে সন্ধি ও লেনদেনের মাধ্যমেই তিনি আজ ক্ষমতার মঞ্চে। তার ইংরেজতোষণ নীতির ফলেই ইংরেজরা প্রাণ নিয়ে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে। ইংরেজতোষণের ফলেই দেশকে এমন অনেক কালো-চুক্তির শেকলে বেঁধে ফেলা হয়েছে, যার ফলে দেশের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন আজ ভীষণভাবে আহত। ফলে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে

আওয়াজ তুলতে থাকেন। এঁদের মধ্যে জেনারেল জান মুহাম্মাদ খান, মোল্লা মুশক আলম, মুহাম্মাদ আফজল খান ওয়ারদাকি, সেনাপতি হুসাইন খান, ডেপুটি সেনাপতি দাউদশাহ, আকবর খান লালপুরি ও মুহাম্মাদশাহ খান আলজায়ি ছিলেন প্রথম কাতারে। এ ছাড়া যে-সকল কৃষক নতুন ট্যাক্স নির্ধারণের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারাও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

এই অসন্তোষের কারণেই একবার মাজার-ই-শরিফে তার ওপর প্রাণঘাতি আক্রমণ করা হয়; কিন্তু সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। নিক্ষিপ্ত গুলি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর থেকে তার আধিপত্য ও উগ্রতা আরও কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। যেহেতু জিহাদি নেতৃবৃন্দই ছিলেন তার সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কারণ, তাই দ্রুত তাঁদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রোপাগান্ডা চালিয়ে জিহাদি নেতৃবৃন্দকে ইংরেজদের এজেন্ট ও চক্রান্তকারী হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালান। তাঁদের নাম ও উপাধি বিকৃত করে জনসাধারণের সামনে হাস্যকরভাবে তাঁদের উপস্থাপনের চেষ্টা চালাতে থাকেন। বিশিষ্ট মুজাহিদ নেতা ও বিখ্যাত আলিম মোল্লা দীন মুহাম্মাদ আফিন্দিকে 'মুশক আলম' উপাধি দেন। আমিরের চাটুকাররা আফিন্দির মানসম্ভ্রমের ওপরও জঘন্য ধরনের আক্রমণ চালায়। তাঁকে মুশি (গন্ধমুশিক) আলিম নামে প্রচার করতে থাকে।

তবে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা যে, তিনি খোদাপ্রদত্ত যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন, নিরন্তর সরকারি অপপ্রচারও তাতে সামান্যতম দাগ ফেলতে পারেনি। তিনি জনগণের মাথার তাজ হিসেবেই থেকে যান। উলটো জনগণ সরকারের এই ঘৃণ্য তৎপরতাকে অধিকতর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। তবে সরকারের ধারাবাহিক অপপ্রচারে জনগণ আলিমদের পাশে জড়ো হতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। এতটুকু সাফল্য অর্জিত হতেই সরকারের অত্যাচারী হাত নড়ে ওঠে। শুরু হয় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের অভিযান। ফলে অল্পদিনেই ৩ হাজার মুজাহিদ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেনারেল জান মুহাম্মাদকে ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ২০০ সেনার প্রহরায় মাজার-ই-শরিফে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে পৌঁছার কিছু দূরে থাকতেই গোপনে হত্যা করে সেখানেই তাঁকে দাফন করে ফেলা হয়।

জেনারেল জান মুহাম্মাদকে হত্যার পর তাঁর ভাই আফজাল খান এবং তাঁর সঙ্গে ইসমতুল্লাহ খান, বাহরাম খানসহ আরও কয়েকজনকে বন্দি করা হয়। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের এই পরিণতি দেখে কতিপয় বিপ্লবী নেতা হিজরত করে দেশ থেকে চলে যান। এঁদের মধ্যে মির বাচ্চা খান, গোলাম মুহাম্মাদ খান, মির দরবেশ খান ও ফতেহ মুহাম্মাদ খান ছিলেন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অকোতভয় মোল্লা মুশক আলম

মোল্লা মুশক আলম তখন আফগানিস্তানেই অবস্থান করছিলেন। ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে আবদুর রাহমান তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছিলেন। ফলে খোশামোদ ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁকে কাছে টানার চেষ্টা চালিয়ে যান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর এলাকা গজনিতে এক জনসভার আয়োজন করে সেখানে তাঁকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান; কিন্তু মোল্লা মুশক আলম সরাসরি তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশেষ আমির তার ভাই শিরিন দিল খানসহ একটি প্রতিনিধিদলকে মোল্লা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে অনেক বোঝাতে থাকেন; কিন্তু তিনি রাজি হননি। প্রতিনিধিদল কারণ জানতে চাইলে তিনি তাদের মুখের ওপর বলে দেন—'৩ হাজার আফগান বুজুর্গ, যারা ইংরেজদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, ইসলামের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সীমাহীন আত্মত্যাগ করেছেন, আজ তাঁরা আমিরের কারাগারে কাতরাচ্ছেন। তাঁদের পরিণতি দেখে আফগান জনগণ আজ শঙ্কিত। আমিও একজন সাধারণ আফগান, আমিও নিজের ব্যাপারে শঙ্কা অনুভব করছি।'

মোল্লা মুশকপুত্রের বিপ্লবী আন্দোলন

মোল্লা মুশকের জবাব শুনে আমির আবদুর রাহমান তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, মোল্লা সাহেব বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন, ফলে এখন আর তার জন্য তেমন বিপজ্জনক নন। এর দুই বছর পর ১০ রবিউল আউয়াল ১৩০৩—১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মোল্লা মুশক ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর ছেলে মোল্লা আবদুল কারিম আবদুর রাহমানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন; কিন্তু সরকারি বাহিনী কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে শুরুতেই আন্দোলনটি গুঁড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। হাজার হাজার মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়।

মোল্লা মুশকের পিতৃপুরুষের 'আনদার' অঞ্চলের লোকজন যেহেতু এই আন্দোলনে বেশি সক্রিয় ছিল, তাই আমিরের নির্দেশে সেখানকার নিহত ১ হাজার সেনার মাথার খুলি আলাদা করে কাবুল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেগুলো একটি উঁচু টাওয়ারে ঝুলিয়ে প্রদর্শন করা হয়। এ অবস্থা দেখে মানুষের অন্তরে ভয়ের ভূমিকম্প বয়ে যায়। আমিরের হিংস্রতার ভয়ে সবাই কাঁপতে থাকে।

মাইওয়ান্দ বিজয়ী মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের যুদ্ধ

আবদুর রাহমানের শাসনামলের প্রথম তিন-চার বছরেই তার অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী

নিঃশেষ হয়ে যান; কিন্তু একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সাত বছর ধরে তার জন্য ভীষণ আতঙ্কের কারণ হয়ে ময়দানে সক্রিয় থাকেন। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক মাইওয়ান্দ যুদ্ধের বিজয়ী সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান। তিনি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে মাইওয়ান্দের উন্মুক্ত ময়দানে ইংরেজদের চরমভাবে নাকানিচুবানি খাইয়েছিলেন। মাইওয়ান্দ বিজয়ের পরপরই তিনি কান্দাহার অবরোধ করেন, উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের আরও কিছু যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করাবেন; কিন্তু আবদুর রাহমান ও ইংরেজদের আঁতাতের ফলে তাঁকে আবরোধ উঠিয়ে হেরাত চলে যেতে হয়।

হেরাতসহ দক্ষিণ-পশ্চিম-আফগানিস্তানের জনগণ ছিল ওই মহান মুজাহিদের প্রতি খুব অনুরক্ত। আমির তাঁর এই গ্রহণযোগ্যতা দেখে জ্বলেপুড়ে মরছিলেন। তাই তার আরাধ্য স্বপ্ন ছিল—জীবনের প্রথম সুযোগেই হেরাতে আক্রমণ চালিয়ে কঠিন এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশেষ করে ফেলবেন।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে যখন আমির রাজমসনদে বসেন, তখন থেকেই তার ও সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। সরদার সাহেব সেই তখন থেকেই আমিরকে দেশছাড়া করতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সুতরাং ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তিনি তার বিরুদ্ধে সেনা পরিচালনা করেন। তত দিনে ইংরেজরা আফগানিস্তান থেকে সেনাপ্রত্যাহার করে নিলেও রাজধানী কাবুলে তাদের বড় একটি বাহিনী থেকে যায়। তাদের সঙ্গে আমিরের চুক্তি ছিল, তারা তার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় সহায়তা দেবে। তাই চুক্তি মোতাবিক ইংরেজবাহিনী সরদার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আমিরকে পূর্ণ সহযোগিতা দেয়।

কান্দাহার দখল

সরদার আইয়ুব খান প্রথমে কান্দাহারে আক্রমণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শহরটি বিজয়ের পর গজনি হয়ে কাবুল আক্রমণ করবেন। এদিকে আবদুর রাহমানও তার প্রস্তুতি সেরে নেন। ক্ষমতালাভের প্রথম বছরেই সেনাবাহিনীকে করায়ত্ত করে নিয়েছিলেন, বিধায় তিনি দুটি বাহিনী প্রস্তুত করে একযোগে হেরাত ও কান্দাহারে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। একটি বাহিনী হেরাতের দিকে পাঠিয়ে অপর বাহিনী নিজের কমান্ডে রেখে কান্দাহার অভিমুখে এগিয়ে যান। এদিকে সরদার আইয়ুব খান কান্দাহার অভিমুখে এগিয়ে এলে কোনো বাধা ছাড়াই কান্দাহার পদানত করে ফেলেন। কারণ, কান্দাহারি জনগণ মাইওয়ান্দ বিজেতা এই মহান বীরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত। বিশেষ করে কান্দাহারের সুফিসাধক ও দরবেশগণ—'রুহানি' নামে যাঁদের ডাকা হতো—সরদার আইয়ুব খানকে জাতির পথপ্রদর্শক আখ্যা দিচ্ছিলেন। দক্ষিণ-আফগানিস্তানের শীর্ষ

আলিম মোল্লা আবদুর রাহিম কাকড়, মোল্লা আবদুল ওয়াহিদ পোপলজাইসহ আরও পাঁচজন শীর্ষ আলিম একটি জনসভা ডেকে ঘোষণা দেন, 'সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খানই আফগানিস্তানের বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। কারণ, ইংরেজবিরোধী যুদ্ধে তাঁর রয়েছে বিশেষ অবদান; আর আমির আবদুর রাহমান শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত। ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা ও ইংরেজতোষণের কারণে তার ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই।'

কান্দাহারের জনগণের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে সরদার আইয়ুব খান সরকার ঘোষণা করলেও তাদের সামরিক শক্তি ছিল সীমিত; অথচ কাবুল থেকে ধেয়ে আসা আবদুর রাহমানের বাহিনী ছিল বিশাল এবং খুবই শক্তিশালী। তারপরও যদি সরদার আইয়ুব খান তাঁর এই সীমিত শক্তি নিয়ে কান্দাহারে অবরুদ্ধ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন, তাহলে অনেক দিন তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। বিজয়ী হওয়াও অসম্ভব কিছু ছিল না; কিন্তু সরদার সাহেবকে অতি আবেগিরা খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করতে থাকে। এদের অব্যাহত চাপে তিনি কান্দাহার থেকে বেরিয়ে খোলা ময়দানে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে আবদুর রাহমানের বাহিনীর সঙ্গে তাঁর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলাফল দাঁড়ায়, শক্তিশালী বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় টিকতে না পেরে সরদারবাহিনী পরাজিত হয় এবং তাঁর জীবিত সেনারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

হেরাত ছিল সরদার সাহেবের নিরাপদ আশ্রয়স্থল; কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, কাবুল থেকে আবদুল কুদ্দুস খানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী হেরাত অভিমুখে বেরিয়ে পড়েছিল। হেরাতে তখন সরদার সাহেবের কোনো সেনা ছিল না; তিনি সব সেনা কান্দাহারে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে আবদুল কুদ্দুস খান বিনা বাধায় হেরাত দখল করে নেন।

মাইওয়ান্দ বিজেতার পরিণতি

হেরাত শত্রুদের হাতে চলে গেলে আইয়ুব খান মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এদিকে আবদুর রাহমান ইংরেজ জেনারেল প্রাইমরোজকে তাঁর ধাওয়ায় লাগিয়ে রাখেন। প্রাইমরোজের ১ হাজার বাহিনী দিনরাত তাঁকে খুঁজতে থাকলে তিনি বাধ্য হয়ে ইরানে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হন। ইরানের শাহ নাসরুদ্দিন এই শর্তে তাঁকে আশ্রয় দেন যে, তিনি রাজনৈতিক কোনো তৎপরতায় জড়িত হতে পারবেন না। আইয়ুব খানের পরাজয়ের পর আবদুর রাহমান দ্বিতীয়বারের মতো কান্দাহারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নেন। এরপর তিনি মোল্লা আবদুল ওয়াহিদ পোপলজাই ও মোল্লা আবদুর রাহিম কাকড়সহ সে-সকল আলিমকে ডেকে এনে নিজের সামনে হত্যা করেন, যাঁরা আইয়ুব খানকে বাদশাহির উপযুক্ত ঘোষণা করেছিলেন।

সরদার আইয়ুব খান ইরানে আশ্রয় নিলেও গোপনে আবদুর রাহমানের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মায়মানা[7] ও হেরাতের লোকজন আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আইয়ুব খান সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ইরান থেকে সেখানে চলে আসেন; কিন্তু তিনি আসার আগেই পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হয়ে ওঠে। হেরাতে আবদুর রাহমানের সমর্থকগোষ্ঠী এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত বেধে যায়। আইয়ুব খান এই অবস্থা দেখে হতাশা নিয়ে পুনরায় ইরানে চলে যান; কিন্তু এবার ইরানের শাহ তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার পরিবর্তে গ্রেপ্তার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। যে মহান বীরকে ইংরেজরা তাদের সমূহ শক্তি ব্যয় করেও পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি, আজ তিনি প্রতিবেশী শাসকের গাদ্দারির কারণে তাদের হাতে বন্দি! এভাবেই সমাপ্তি ঘটে এই মহান মুক্তিযোদ্ধার স্বাধীকার তৎপরতা।

মির গোলাম কাদিরকে গোপনে হত্যা

সরদার মুহাম্মাদ আইয়ুব খান ও অন্যান্য মুজাহিদ নেতাকে হত্যা, কারাদণ্ড ও দেশান্তরিত করার পর আফগানিস্তানে আমিরের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে কেবল মির গোলাম কাদির উপিয়ানি বাকি ছিলেন। আবদুর রাহমান তাঁকে বিরোধী মনে করলেও নিরাপদে থাকতে দেন। কখনো তাঁর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। পরে তাঁকে একটি সরকারি দায়িত্বও প্রদান করেন; কিন্তু কিছুদিন পর এক কর্মচারীর মাধ্যমে তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়ে নেন। এরই সঙ্গে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে শুরু হওয়া জিহাদের শেষ চিহ্নটুকুও মিটে যায়।

গাদ্দারদের ওপর অনুগ্রহবৃষ্টি

দেশের বীর সন্তানদের সঙ্গে দুঃখজনক আচরণের বিপরীতে ইংরেজদের দোসর এবং দেশ ও জাতির গাদ্দার হিসেবে যারা পরিচিত ছিল, আমির আবদুর রাহমান তাদের প্রতি বেশ উদার ছিলেন। এদের মধ্যে কান্দাহারের গাদ্দার শের আলি খানের পরিবার ছিল সবার শীর্ষে। শের আলির জাতিদ্রোহী পুত্র নুর আলি খান ইংরেজদের অনুগ্রহে করাচিতে জীবনযাপন করছিল। একবার আমির জানতে পারেন, সে করাচিতে বিরাট অঙ্কের ঋণে দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমির তখন আফনাস্তিান থেকে অর্থ পাঠিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করেন। পরে কাবুলে ডেকে এনে সেখানে তার জন্য উন্নত বাসস্থান ও ১২ হাজার মুদ্রা মাসিক ভাতা চালু করেন।

[7] বর্তমান ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী।

বলখের তুফান : প্রাণঘাতী আক্রমণ

১৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বলখের গভর্নর সরদার মুহাম্মাদ ইসহাক আবদুর রাহমানের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি সমমনা আরও কয়েকজন গভর্নরকে সঙ্গে নিয়ে আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। শুরুতে মনে হচ্ছিল, বলখ থেকে উত্থিত এ ঝড় আমির আবদুর রাহমানের মসনদ ওলট-পালট করে দেবে; কিন্তু আমিরের বেপরোয়া জুলুম ও নির্দয় আচরণ এই ঝড় থামিয়ে দেয়। বলখে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসার পর আমির সেখানকার পরিস্থিতি দেখার জন্য নিজে সেখানে উপস্থিত হন; কিন্তু পথে মাজার-ই-শরিফে তার ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ পরিচালিত হয়। আততায়ীর নিক্ষিপ্ত বুলেট তার শিরস্ত্রাণ উড়িয়ে তাঁবুর খুটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সেনাকে আহত করে। আততায়ীকে তাৎক্ষণিক হত্যা করা হয়।

সরদার মুহাম্মাদ ইসহাক খানের বিদ্রোহ সামাল দেওয়ার পর শীর্ষস্থানীয় অনেক অফিসারকে বন্দি করা হয়। আবদুর রাহমান কাবুল ফিরে এসে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেন। প্রতিদিন ১৫ জন অফিসারকে কাবুলের 'মুরাদ খান ময়দানে' বেঁধে এনে তাঁদের টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হতো।

হাজারা সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আমির আবদুর রাহমানকে এক কঠিনপ্রাণ শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়। এটি ছিল বামিয়ানের আশেপাশে অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় বসবাসরত হাজারা সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। হাজারাদের এই বিদ্রোহ তাকে অনেক দিন ধরে অস্থির করে রাখে। হাজারা সম্প্রদায় বিশ্বাসে শিয়া, পেশায় কৃষক এবং শিল্পের দিক দিয়ে ছিল কার্পেট উৎপাদক। তাদের মধ্যে সাইয়িদরাই ছিল সুখি-সমৃদ্ধ এবং তাদের হাতেই ছিল হাজারাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব। আবদুর রাহমানের যুগে হাজারাদের প্রভাব অনেক বেড়ে গেলে একপর্যায়ে তারা স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়ে বসে। হাজারা সম্প্রদায় শিয়া-সুন্নি সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে শিয়া জনগোষ্ঠীকে আমির আবদুর রাহমানের বিরুদ্ধে একজোট করে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

আমির তার চিরন্তন স্বভাবের বিপরীতে শুরুতে এই আন্দোলন মোকাবিলায় ধৈর্যধারণের নীতি অবলম্বন করেন। আলোচনার টেবিলে সমাধানের চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে তার প্রচেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূও হয়। কতিপয় হাজারা নেতা বিদ্রোহ থেকে সরে দাঁড়ায়; কিন্তু ধীরে ধীরে এ আগুন আবারও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হাজারাদের এই বিদ্রোহ এক ব্যাপক গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ

করে। এ পর্যায়ে আমির তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কঠিন হাতে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে ওঠেন। বিপুল পরিমাণ সেনাশক্তি নিয়ে হাজারাদের ওপর চড়াও হন। হাজারারাও সহজে দমবার পাত্র ছিল না। তারা সরকারি বাহিনীর শীর্ষ কমান্ডার আবদুল কুদ্দুস খানকে 'কোতল চুড়া' নামক স্থানে পরাজয় উপহার দেয়। আবদুল কুদ্দুসের পর এগিয়ে আসা ব্রিগেডিয়ার জবরদস্ত খানের বাহিনীও একই পরিণতির শিকার হয়। আমির আবদুর রাহমানের ঘনিষ্ঠ জেনারেল মির আতা মুহাম্মাদ ও জেনারেল শের মুহাম্মাদ সে যুদ্ধে ভয়ানক আহত হয়।

আবদুর রাহমান যখন অনুভব করতে পারেন হাজারাদের এভাবে পরাস্ত করা অসম্ভব, তখন তিনি বড় ধরনের যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেন। জনগণকে পাশে পেতে এই যুদ্ধের ওপর ধর্মীয় রং চড়ান। ফলে আফগানিস্তানজুড়ে শিয়া-সুন্নি বিরোধ এমন তুঙ্গে ওঠে যে, এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়ে।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি বাহিনীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। সরকারি বাহিনী হাজারাদের একেবারে তছনছ করে ফেলে। বামিয়ানসহ অন্যান্য যেসব এলাকায় হাজারাদের বসবাস ছিল, সেসব এলাকায় সরকারের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ওপর রাষ্ট্রের কঠোর সব নিয়মকানুনসহ তাদের অর্থনীতিতেও সেসব আইনকানুন চাপিয়ে দেওয়া হয়, এতদিন যা থেকে তারা মুক্ত ছিল। যেমন : ইতিপূর্বে তাদের কৃষকশ্রেণির জন্য ভূমিসীমা নির্দিষ্ট ছিল না; কিন্তু এ পর্যায়ে তা-ও সীমিত করে দেওয়া হয়।

বিদ্রোহ অবদমিত হওয়ার পর আমির হাজারাদের অনুগত নেতৃত্বশ্রেণির প্রতি উদার আচরণ দেখিয়ে যেতে থাকেন। তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান। দীর্ঘদিন ধরে হাজারা মেয়েদের দাসীর মতো অন্য দেশে বিক্রি করার যে প্রথা চলে আসছিল, তাও বন্ধ করে দেন। এভাবে হাজারাদের কঠোর হস্তে দমনের পর পুনরায় তাদের মন পেতে নমনীয় আচরণও দেখান চতুর এই শাসক।

কাফিরিস্তান থেকে নুরিস্তান পর্যন্ত

আফগানিস্তানের পূর্বদিকে অবস্থিত বরফের চাদর-পরা আকাশছোঁয়া নুরিস্তান নামক যে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা রয়েছে, তা চিরকাল থেকে আগ্রাসী শক্তির কাছে এক দুর্ভেদ্য ও দুর্বোধ্য এলাকা হিসেবে বিবেচিত ছিল। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, এই এলাকার নাম ছিল 'বুলার'। তবে ইসলামি শাসনামলে বিশালায়তনের এই এলাকাকে কাফিরিস্তান নামে ডাকা হতো। গিলগিত আর চিত্রালকেও এই এলাকার মধ্যে গণ্য করা হতো; কিন্তু ব্রিটিশরা গিলগিত ও চিত্রালকে এই এলাকা থেকে আলাদা করে নেয়। এখানকার

অধিবাসীরা হাজার বছর ধরে মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিল। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বহির্বিশ্বের কোনো প্রভাব ছিল না। তৈমুর লং ও বাবরের মতো দিগ্‌বিজয়ীরাও ওই অঞ্চল পদানত করতে পারেননি।

আবদুর রাহমান সেই নুরিস্তান পদানত করতে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রয়াস চালান। বিশেষ প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তাদের মুক্ত বিশ্বের দরজা কাবুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর থেকে নুরিস্তানের লোকজন প্রথা অনুযায়ী কাবুলের রাজদরবারে আসা-যাওয়া শুরু করে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রাহমান নাঙ্গারহারের গভর্নর গোলাম হায়দার চারখিকে নিয়মিত বাহিনী নিয়ে নুরস্তিানের ওপর চড়াও হওয়ার নির্দেশ দেন। হায়দার আলি চারখি শক্তিবলে নুরিস্তান জয়ের পরিবর্তে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি আমিরের মতো কঠোরতার পথে না গিয়ে নম্রতার মাধ্যমে সেখানকার অধিবাসীদের মন জয়ের চেষ্টা চালান। তাঁর এই নীতি ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তিনি সেখানকার মানুষের অন্তর জয় করে নেন। নুরিস্তানের শীর্ষ নেতাদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

আমিরের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর হায়দার আলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেখানকার নেতাদের বোঝাতে থাকেন। তিনি তাদের বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী শুধু বাদাখশান ও নুরিস্তানের মধ্যবর্তী পথটি উন্মুক্ত করা এবং এর নিরাপত্তাবিধানের লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে। এর ফলে হায়দার আলি যখন ৪ হাজার সেনা নিয়ে নুরিস্তানে প্রবেশ করেন, তখন রাস্তায় তাঁকে কোনো বাধার মুখে পড়তে হয়নি। কয়েকটি জায়গায় উপজাতিদের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষ হলেও যেহেতু ওরা প্রাচীন অস্ত্র তথা তির-তরবারি দ্বারা প্রতিরোধ করত, তাই আধুনিক অস্ত্রের মোকাবিলায় তারা মুহূর্তকালও টিকে থাকতে পারেনি।

সরকারি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলাকাটির আগের নাম 'কাফিরিস্তান' পরিবর্তন করে 'নুরিস্তান' রাখা হয়। কারণ, সেখানে তখন দ্রুতগতিতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। সেনাপতি হায়দার আলি চারখি প্রথমে সেখানে ৮০ জন দায়ি, আলিম ও কারিকে ডেকে নেন। এরপর এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে আজ নুরিস্তান শতভাগ মুসলিম অধ্যুষিত। তা ছাড়া সেখানে আলিমদের সংখ্যাও প্রচুর।

ইতিপূর্বে আমরা কেবল আবদুর রাহমানের অমানবিক আচরণ, দুর্বলতা আর জুলুমবাজির কথাই উল্লেখ করে এসেছি। তবে নিরপেক্ষ ইতিহাস পর্যালোচনার খাতিরে তার কিছু কৃতিত্বপূর্ণ কাজের কথাও উল্লেখ করতে হয়। তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ছিল, সেনাপতি হিসেবে হায়দার আলি চারখিকে নিয়োগ প্রদান। এই মহান লোকটি তাঁর খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতাবলে মাত্র আট মাসের সংক্ষিপ্ত মেয়াদে একটা

অসম্ভব কাজকে সম্ভব হিসেবে বাস্তবায়ন করে দেখান। ইনশাআল্লাহ এই কাজটি তাঁর জন্য সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে। ব্রিটিশ কর্তৃক যদি গিলগিত ও চিত্রালকে নুরিস্তান থেকে পৃথক করে নেওয়া না হতো, তাহলে ওই এলাকা দুটিতে এখন যে-সকল অমুসলিমের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, তা-ও থাকত না। নিশ্চয় এরাও তখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত।

উপজাতিদের নিয়ে ব্রিটিশদের চক্রান্ত

ব্রিটিশদের সঙ্গে দুটি বড় যুদ্ধের পর আফগান মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজদের শত্রুতা বেড়ে যায়। ব্রিটিশরা যেকোনো মূল্যে আফগানদের তাদের অধীন দেখতে চাচ্ছিল। এদিকে আফগানরা কোনো অবস্থায়ই বাইরের কারও অধীনতা গ্রহণের মানসিকতা রাখত না। এমন পরিস্থিতিতে আবদুর রাহমানের অবস্থা ছিল একটি টানানো রশির ওপর দিয়ে হেঁটে চলা খেলোয়াড়ের মতো, যেখানে সামান্যতম ভুল তাকে ফেলে দেবে পতনের অতল গহ্বরে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমির আবদুর রাহমান ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের সন্ধির মাধ্যমে আফগানিস্তানের স্বার্থগুলো অনেকটাই ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপরও এ বিষয় তার অজানা ছিল না যে, ইংরেজরা মুসলমানদের বন্ধু নয় বরং শত্রু। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এই বাস্তবতা জানার পরও আফগানিস্তানের আত্মপ্রত্যয়ী জাতিকে নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলায় দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয়নি তার। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন যে, সব সমস্যায় ইংরেজদের ওপর ভরসা রাখা জরুরি, তাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজা উচিত।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের সন্ধি শেষে ইংরেজরা আফগানিস্তান নিয়ে নতুন নতুন চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। এর শেষ পরিণতি ছিল ডুরান্ড চুক্তি। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের স্বাধীন গোত্রীয় অঞ্চলকে বিভক্ত করে এর অধিকাংশ ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়া। এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখাতে ব্রিটিশরা কতিপয় গোত্রীয় সরদারকে আমিরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে আফগান সীমান্তের ভেতর দখলতৎপরতায় লাগিয়ে দেয়। এই গোত্রপতিরা ইংরেজদের চক্রান্তের গুটি হয়ে সশস্ত্র অবস্থায় দলে দলে আফগান সীমান্তে ঢুকে লুটতরাজ এবং সরকারি সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে ফিরে যেত। যদিও অধিকাংশ গোত্রীয়রা জানত না, তারা কেন এমনটি করছে? কে তাদের এ কাজে প্ররোচিত করছে? তাদেরকে এ কথা বোঝানো হয়েছিল, এ হচ্ছে ইংরেজদের এজেন্ট আবদুর রাহমানের বিরুদ্ধে জিহাদ। ফলে এই তৎপরতা শুধু অব্যাহতই থাকেনি; বরং দিন দিন এর পরিধি বাড়তে থাকে। গোত্রীয়রা আফগানিস্তানে ঢুকে তাদের সমমনা

লোকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিত; আর এই অস্ত্রগুলো তাদের কাছে ব্রিটিশের এজেন্টরা সরবরাহ করত। এ ছাড়া লিফলেট ছড়িয়ে আফগান জনগণকে আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত করে তুলছিল তারা। যদি এসব কাজের পেছনে কোনো ইসলামি নেতার সমর্থন থাকত, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিত; কিন্তু সেখানে গুটি চালাচ্ছিল ব্রিটিশরা। আমির অনেক চেষ্টার পরও বিদ্রোহের আগুন থামাতে পারেননি। অবশেষে তিনি গোত্রীয়দের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তিনি এ কথা ভেবে বসেন যে, এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা তার সাধ্যের বাইরে।

কিছুদিন পর পরিষ্কার হয়ে যায়, গোত্রীয়দের এই ভয়ংকর খেলার পেছনে রয়েছে ইংরেজদের হাত; কিন্তু তখন প্রথাগত প্রতিবাদ জানানো ছাড়া তার পক্ষে আর কিছুই করার ছিল না। তবে জনগণের সামনে 'মুজাহিদি কৃতিত্ব' প্রদর্শনের লক্ষ্যে তিনি লোকদেখানো তৎপরতা শুরু করেন। যেমন, প্রতিটি জনসভায় জিহাদের কথা বেশি বেশি বলতেন। ব্রিটেনকে ইসলামের শত্রুরাষ্ট্র আখ্যা দিতেন। জনতাকে তাদের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাতেন। নিজেকে 'শরিয়তের নিরাপত্তারক্ষী' ও 'মুজাহিদ' হিসেবে প্রচার করতেন। জিহাদ ও ইংরেজবিরোধিতা-সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ করে দেশব্যাপী বিলি করতে থাকেন। ইংরেজবিরোধিতা প্রকাশের লক্ষ্যে অনেককে এই অজুহাতে গ্রেপ্তার করেন যে, এদের ঘর থেকে বিদ্রোহাত্মক লিফলেট এবং ইংরেজদের পাঠানো গোপন চিঠি পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি করা হয় যে, এমনসব মানুষকেও ধরপাকড় করা হয়, যারা কাবুলের ব্রিটিশ দূতাবাসের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করত! কিন্তু শত প্রচেষ্টার পরও আমির আবদুর রাহমান আফগানদের কাছে হারানো অবস্থান ফিরে পাননি। কেননা, সেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় থেকেই তাকে কখনো জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি আন্তরিক হতে দেখা যায়নি।

গোত্রীয়দের ওপর ব্রিটিশদের আক্রমণ

ব্রিটিশরা গোত্রীয়দের ব্যাপারে আবদুর রাহমানকে নিরাশ করার পর এবার নিজেরাই সেই বোকাদের ওপর চড়াও হয়। অসহায় গোত্রীয়রা তখন ব্রিটিশদের মোকাবিলায় আমিরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল। ফলে তারা বার বার কাবুলে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলায় তাদের সেনা ও অস্ত্রসাহায্য প্রদানের আবেদন করতে থাকে; কিন্তু আমির তাদের কোনো আবেদনই কানে তোলেননি। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা তাদের রাওয়ালপিন্ডি ও কোয়েটার সামরিক ঘাঁটিতে একসঙ্গে ৩০ হাজার সেনা বাড়িয়ে নেয়। এরপর গোত্রীয়দের এলাকায় ঝড়োগতির আক্রমণ চালিয়ে বসে। প্রথমে তারা ইউসুফজাই গোত্রকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় তাদের পরাজিত করতে

সমর্থ হয় ব্রিটিশরা। ব্রিটিশদের দ্বিতীয় হামলা ছিল দির, গিলগিত ও চিত্রাল অঞ্চলে। এখানকার লোকজন সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কয়েক শতাব্দী পেছনে বসবাস করছিল। ফলে আধুনিক অস্ত্রধারী ব্রিটিশদের মোকাবিলায় তারা কোনো প্রতিরোধই করতে পারেনি। ওয়ানা শহরে খোদ আমির আবদুর রাহমান কর্তৃক মনোনীত অফিসার গুল মুহাম্মাদ খান তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমির তাকে যুদ্ধ ছাড়া পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে ইংরেজরা খুব সহজে ওয়ানা দখল করে নেয়।

কুররমের (কুররম এজেন্সি) নেতৃবৃন্দ আমিরের কাছে লিখিত আবেদন করেন, 'আমরা আফগান সরকারের অধীনে বসবাস করতে চাই, ইংরেজদের গোলামি বরণ করতে চাই না। অনুগ্রহপূর্ক আমাদের আফগানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।' কিন্তু আমির প্রত্যুত্তরে জানান, 'গান্দমাক চুক্তির ভিত্তিতে আপনারা এই মুহূর্তে ইংরেজদের অধীন। যদি তাদের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে চান, তাহলে নিজেরাই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যান।' বেলুচিস্তানের নেতৃবৃন্দও ইংরেজদের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে বসেন। খারান অঞ্চলের নেতা নওরোজ খানের নেতৃত্বে বেলুচরা নিজেদের আফগানি পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন; কিন্তু আমির তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাননি। ফলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাহীন প্রাচীন ধাঁচের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া গোত্রীয় অঞ্চলগুলো ইংরেজদের অধীনে চলে যায়। এভাবেই ইংরেজদের চক্রান্তের খেলা সফল হয়। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ গোত্রীয় নেতাদের প্রতি আমির আবদুর রাহমানকে ইংরেজরা নানা ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে বিতৃষ্ণ করে তোলে। পাশাপাশি তাদের সহায়তা প্রদান থেকেও দূরে রাখে। তারা আবদুর রাহমানের মাধ্যমে গোত্রীয় অঞ্চলসমূহের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর সব পথও বন্ধ করে দেয়। আর এভাবেই তারা আমিরকে আফগানিস্তানের নিরাপত্তার জন্য লৌহপ্রাচীরস্বরূপ গোত্রীয়দের সহায়তা থেকে বঞ্চিত করে।

আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ

সব পথ উন্মুক্ত করে নেওয়ার পর ব্রিটিশরা আরেকবার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আফগানিস্তান দখলের প্রস্তুতি নিতে থাকে; অথচ কিছুদিন আগেও এখানকার শাসকশ্রেণিকে তাদের বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে প্রচার করে আসছিল। এ পর্যায়ে আফগান ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। ব্রিটিশরা আফগানদের অস্ত্র সরবরাহের সব রুট বন্ধ করে দেয়। আফগান ট্রানজিটব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে ফেলে। এরপর ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা পঙ্গপালের মতো বিশাল বাহিনী আফগানিস্তান অভিমুখে পাঠায়। আবদুর রাহমান

ইংরেজদের এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে নিজ বাহিনীসহ স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। অল্পদিনেই লক্ষাধিক সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এই বাহিনী কাবুল থেকে বেরিয়ে 'সিয়াহ সঙ্গ' ময়দানে এসে শিবির স্থাপন করে। তখন এদের দেখে মনে হচ্ছিল পুরো আফগান জনতাই যেন ব্রিটিশদের মোকাবিলায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ছে।

ব্রিটিশরা আফগানদের এমন প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়ে ১৫ জন অফিসারের একটি প্রতিনিধিদলকে আমিরের কাছে আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। আমির তত দিনে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। তিনি যদি তখন আলোচনায় একজন খাঁটি মুমিনের ভূমিকা পালন করতেন, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দেখাতেন, তাহলে আফগানিস্তান নিয়ে ব্রিটিশদের অবস্থান সম্পূর্ণ বদলে যেত; কিন্তু আফসোস! আলোচনার টেবিলে আবারও ফিরিঙ্গিরা বাজি জিতে নেয়।

ডুরান্ড (Durand Line Pact) চুক্তি

সংলাপের উদ্দেশ্যে ইংরেজ অফিসার ডুরান্ড একদল প্রতিনিধি নিয়ে কাবুল পৌঁছে সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করে। এই সময়ে সে নানামাত্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আফগানদের অন্তরে ব্রিটিশদের শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে ভয় ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সে প্রস্তাব রাখে, হয় আফগান সীমান্ত ব্রিটিশ-প্রস্তাবিত শর্তসহ হুবহু মেনে নেওয়া হোক, নতুবা সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হোক। সে এ কথাও বলে, এখনো ব্রিটিশবাহিনী সীমান্তে দাঁড়িয়ে আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষায় আছে। যেকোনো মুহূর্তে তারা আফগানিস্তানের ভেতরে হামলে পড়তে পারে। আমির বিষয়টি গভীরভাবে যাচাই করার আগেই সিদ্ধান্ত নেন—ইংরেজদের দাবি মেনে আফগানিস্তান রক্ষা করা হোক। আসলে তিনি জানতেন, তার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে ব্রিটিশের সহায়তায়। তার টিকে থাকাও তাদের করুণার ওপর নির্ভরশীল। আমির ভালো করেই জানতেন, যুদ্ধের ফল যা-ই হোক না কেন, যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতিতে তার ওপর ইংরেজদের অনুগ্রহ বাকি থাকবে না। তখন ওদের ছত্রছায়ায় জনগণের চাহিদার বিপরীতে তার যে বাদশাহি টিকে রয়েছে, তা-ও অক্ষুণ্ন থাকবে না। যুদ্ধের পরে তিনি আফগান জনগণের দয়ার পাত্র হয়ে দাঁড়াবেন। তারা তাকে অতীতের কর্মকাণ্ডের কারণে মোটেও ক্ষমা করবে না। তাই নিজ স্বার্থের মোকাবিলায় দেশ ও জাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে একটুও ইতস্তত হননি। জাতির ধ্বংস নিশ্চিত করতে তার কলিজায় একটুও বাধেনি। তিনি ব্যক্তিস্বার্থে আফগানিস্তানের বড় একটি অংশের দাবি থেকে হাত ধুয়ে নেন এবং সর্বকালের ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক ডুরান্ড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি সম্পর্কীয় আলোচনা

কী ছিল এই চুক্তির মধ্যে? এ সম্পর্কে খোদ আমির তার নিজের লেখা আত্মজীবনী *তাজুত তাওয়ারিখ* গ্রন্থে লেখেন,

> *ওয়াখান, কাফিরিস্তান, আসমার ও মেহমান্দের কিছু এলাকা আমার অধীনে থাকবে। এ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আমি ওয়াজিরিস্তানের অন্যান্য অংশ যথা বুলন্দ খিল, কুররম, আফ্রিদি, বাজোর, সোয়াত, বুনির, দির, চিলাস ও চিত্রাল ইংরেজদের জন্য ছেড়ে দেবো।*[৪]

এভাবেই ধূর্ত প্রতারক ডুরান্ড আবদুর রাহমানের কাছ থেকে এমন এক চুক্তিতে সই নিয়ে নেয়, যা ছিল মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট পরাজয়। এ দিনটি ছিল আফগানিস্তানের গোত্রীয় আত্মত্যাগী মুসলামনদের জন্য চরম শোকের দিন। কেননা, সেদিন হাজার কিলোমিটারের এক সুবিশাল পাহাড়ি ও পাহাড়তলি অঞ্চল কোনো যুদ্ধ ছাড়াই আফগানদের হাত থেকে চলে যায়; আর এভাবেই ইংরেজদের সহায়তায় তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। আমির তার আত্মজীবনীতে আরও লেখেন,

> *১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বরে সালামখানা ইমারতে এক সাধারণ জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের বিশেষ করে কাবুল প্রশাসনের সকল দায়িত্বশীল, গোত্রীয় নেতা এবং আমার বড় দুই সন্তান তাতে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে আমি কিছু কথা রাখি। তাদের সামনে ইংরেজদের সঙ্গে কৃত সন্ধি-প্রস্তাবগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করি। আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে বলি, আল্লাহ তাঁর অসীম কৃপায় রাষ্ট্র দুটির মধ্যে আগে যে সম্পর্ক ছিল, তা অধিকতর সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। আগে থেকে এখন ঐক্য সুদৃঢ় অবস্থানে আছে। আমি স্যার মার্টিমুর ডুরান্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে অবদান রেখেছেন।*

সন্ধির ক্ষতিকর দিক

আমির আবদুর রাহমান ও স্যার ডুরান্ডের মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী গোত্রীয় এলাকার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা অখণ্ডতাকে টুকরো টুকরো করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। ডুরান্ড চুক্তি অনুযায়ী অস্তিত্বে আসা 'ডুরান্ড লাইন'

[৪] *তাজুত তাওয়ারিখ*, ফারসি : ৪৩০-৪৩১।

ভারত বিভক্তির পরও অক্ষুণ্ন থাকে। আজও তা ওই অবস্থায়ই আছে। যেভাবে ইংরেজরা কাশমিরকে বিভক্ত করে পাকিস্তানিদের জন্য এক চিরস্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করে গেছে, একইভাবে ডুরান্ড লাইনও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে রয়েছে। ইংরেজদের এই পদক্ষেপ দুই প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো হওয়ার পক্ষে এক চিরস্থায়ী অন্তরায়।

রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্তবিরোধ

ডুরান্ড চুক্তির ফলে আবদুর রাহমান যে পরাজয়ের শিকার হয়েছিলেন এবং ভৌগোলিকভাবে তাকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এর বিরূপ প্রভাব ক্রমশ বাড়তেই থাকে। তখন রাশিয়া আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে খুব জোর দিচ্ছিল। আবদুর রাহমান যেহেতু তার দেশান্তরী জীবনে রাশিয়ার সহায়তা ভোগ করেছিলেন, তাই মানসিকভাবে ছিলেন রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ; কিন্তু রাশিয়া কর্তৃক আগ্রাসনে মুসলিম মধ্য-এশীয়দের কাতরাতে দেখে রাশিয়ার পরিবর্তে ইংরেজদের বন্ধুত্বকেই প্রাধান্য দেন।

ইংরেজদের প্রতি তার ঝুঁকে পড়াই রাশিয়াকে উত্তেজিত করতে যথেষ্ট ছিল। এ জন্য তারা কয়েকবার আফগান সীমান্তে সেনাও পাঠায়। প্রতিবারই আমিরকে অনেক কষ্টে তাদের সেসব আগ্রাসন ঠেকাতে হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আমু দরিয়ার তীরবর্তী পঞ্চনদ ফাঁড়িতে এক রক্তক্ষয়ী আক্রমণ পরিচালিত হয়। একইভাবে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে রুশরা আমু দরিয়া অতিক্রম করে খাজা সালিহ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেয়। 'ওয়াখান' করিডোর রুশরা তাদের অধীন অঞ্চল হিসেবে দাবি করে বসে। ১৮৯২ খিষ্টাব্দে রুশবাহিনী বাদাখশানের কাছে পামির মালভূমিতে দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আমির তখন ইংরেজদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর ভরসা করে বার বার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আফগানিস্তানের সীমান্ত পূর্বাবস্থায় বহাল রাখতে সংলাপ চালিয়ে যান; কিন্তু রাশিয়ার একগুঁয়ে অবস্থানের কারণে তা সফলতার মুখ দেখেনি।

অবশেষে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যে চুক্তির ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বের ওয়াখান অঞ্চলে আফগানিস্তানের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। পামিরকে দ্বিখণ্ডিত করে এর অর্ধেক আফগানিস্তান আর অর্ধেক রাশিয়াকে দিয়ে দেওয়া হয়। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে আমু দরিয়াকেই সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। এভাবেই আফগানিস্তান আমু দরিয়ার ওপারে অবস্থিত তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বঞ্চিত হয়।

আমির আবদুর রাহমানের ইনতিকাল

ডুরান্ড চুক্তির পর রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির ফলে সাধারণ জনগণের কাছে আমিরের যেটুকু অবস্থান ছিল, তা-ও খোয়া যায়। তিনি আরেকবার তার হারানো ভাবমূর্তি ফিরে পেতে মুজাহিদদের পিঠ চাপড়ানো এবং জিহাদি লিফলেট প্রচার শুরু করেন; কিন্তু প্রতারণা বার বার সফল হয় না। তিনি আর জনগণের আস্থার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অবশেষে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হন এবং সে বছরের ৯ জুমাদাল উখরা ১৩১৯ হিজরি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহের ভয়ে তিন দিন পর্যন্ত তার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হয়।

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ,* মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।

২. *তাজুত তাওয়ারিখ*, আমির আবদুর রাহমানের নিজ হাতে লেখা আত্মজীবনী (ফারসি)।

৩. *Encyclopedia of Islam.* Vol-1

৪. *উর্দু এদারায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া,* প্রকাশনায় দানিশগাহ, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি।

৫. *দরজাওয়ায়ি তারিখে মুআসির আফগানিস্তান,* আহমাদ আলি কাহজাদ।

৬. *সিরাজুত তাওয়ারিখ,* মির্জা ফয়েজ মুহাম্মাদ খান।

৭. *তারিখে তাজজিয়ায়ে শাহানশাহি আফগানিস্তান,* আল্লামা আবদুল হাই হাবিবি।

২০ তম অধ্যায়

হাবিবুল্লাহ খানের যুগে আফগানিস্তান

আমির আবদুর রাহমান খানের ইনতিকালের পর তার পুত্র হাবিবুল্লাহ খান ক্ষমতায় বসেন। তিনি মৌলিকভাবে তার পিতার চিন্তাভাবনা এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ জন্য জনগণ তাঁর ক্ষমতাগ্রহণকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছিল। সারা দেশে তাঁর শাসনকে উচ্চ আশাবাদসহ গ্রহণ কর হয়। তিনি ১৯০১-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় শাসন পরিচালনা করেন। হাবিবুল্লাহ খান একদিক থেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান শাসক ছিলেন। কেননা, একটি সুসংহত রাষ্ট্র তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। এর সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। রাশিয়া ও ব্রিটেনের মতো পরাশক্তির সঙ্গে আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে এই মুহূর্তে আপাতত বহিরাগত আগ্রাসনের কোনো আশঙ্কা ছিল না। অভ্যন্তরীণ কোনো বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলাও দেখা যাচ্ছিল না।

হাবিবুল্লাহ খান সোনালি এই সুযোগ গ্রহণ করে জনদরদি শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন। প্রশ্ন জাগে, তিনি কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন? আসুন, প্রশ্নের জবাবে আমরা তাঁর শাসনকালে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। আমরা মূলত আমির হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামলকে দুভাগে বিভক্ত অবস্থায় দেখতে পাই :

১. জনকল্যাণের যুগ

আমির হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামল যখন শুরু হয়, তখন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর একজন শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হন তিনি। জনকল্যাণমূলক কাজ ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। অত্যন্ত উদারনৈতিক মনোভাব নিয়ে তিনি এ সময় জনগণের কল্যাণে তৎপর হয়ে ওঠেন। একজন পরিপূর্ণ মুসলমান শাসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন তিনি। ক্ষমতালাভের পরপরই আফগানিস্তানে ইসলামি আইন প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। তখন তাঁর পাঁচজন স্ত্রী ছিল। শরিয়ত প্রবর্তনের ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজনকে তালাক দিয়ে দেন। এতে করে তাঁর নিজ ঘর থেকে শরিয়তের বাস্তবায়ন শুরু হতে দেখা যায়। কাবুলে একটি মহল্লা ছিল, যেখানে নাচগান হতো। সমাজের মাতাল

লোকজন সেখানে নিয়মিত আসর জমাত। আমির হাবিবুল্লাহ খান এদের সংশোধনের সুযোগ দিয়ে তাওবা করান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেন। নারীদের জন্য পর্দা ও বোরকার ব্যাপারে শৈথিল্যের অবসান ঘটান। পর্দার পোশাক হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে খাকি রঙের পর্দার প্রচলন ঘটে। এই রং ছাড়া অন্য কোনো রঙের পোশাক, চাদর এবং বোরকা পরে নারীরা বাইরে বেরোতে পারবে না, এ মর্মে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। আফগানিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জন্য জর্দা রঙের কাপড় অর্থাৎ, পুরুষদের জর্দা রঙের পাগড়ি এবং নারীদের এ রঙের বোরকা পড়ার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হয়। এতে করে সমাজে তাদের পরিচয় সহজেই পাওয়া যাবে। কবর ও মাজারকেন্দ্রিক অনৈসলামিক প্রথা-প্রচলনও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমির হাবিবুল্লাহ খানের একটি বড় কীর্তি হলো, তিনি অনেক মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। একইসঙ্গে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুল ও মকতব প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু কাবুলে ১১টি মাদরাসা তিনি সরকারি তহবিল থেকে নির্মাণ করে দেন। মাদরাসাগুলোতে শিশুরা তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে কুরআন হিফজ করে ফেলত। জনগণকে সন্তুষ্ট করতে তিনি জেলখানা থেকে নিরপরাধ এবং অধিক সাজাপ্রাপ্ত অসংখ্য বন্দিকে মুক্ত করে দেন।

ন্যায়প্রতিষ্ঠায় আমির হাবিবুল্লাহ খানের এসব কার্যক্রম জনগণের মনে তাঁর জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের জায়গা তৈরি করে। তাঁর শাসনামলের প্রথম কয়েক বছর জনগণের হৃদয় জয় করতে তিনি এ ধরনের বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করেন। রমজানে প্রতিদিন হাজার হাজার গরিব, অসহায় ও দুস্থ জনগণের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করতেন। শুধু মসজিদ নয়; বরং শাহি মহলেও তাদের জন্য মেহমানদারির আয়োজন করা হতো।

মাকতাবে হাবিব ও মাকতাবে হারবিয়া

আফগানিস্তানের জন্য জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়া এ সময় সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর অন্যতম হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষাদীক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে সমকালীন বিশ্ব থেকে শত বছর পিছিয়ে পড়েছিল দেশটি। আমির হাবিবুল্লাহ খান কাবুলে মাকতাবে হাবিবিয়া নামে একটি আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে একইসঙ্গে ইসলামিয়াত, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, ইংরেজিসহ বিভিন্ন আধুনিক বিষয় পাঠদান করা হতো।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আমির হাবিবুল্লাহ খান আফগানিস্তানের ইতিহাসে প্রথম আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র 'মাকতাবে হারবিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কুরআন হিফজ, হস্তলিপিবিদ্যা, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, আরবি ব্যাকরণ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সমকালীন আধুনিক পদ্ধতিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পদাতিক ডিভিশন, অশ্বারোহণ, কামান পরিচালনা ব্রিগেড, গুপ্তচরবৃত্তি এবং কঠোর শরীরচর্চার জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছিল। আফগানিস্তানকে শিল্পবাণিজ্যে এগিয়ে নিতে তিনি বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে প্রথমবারের মতো আফগানিস্তান মোটরগাড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়। বোম্বাই থেকে কিনে আনা মোটরগাড়ি আফগানিস্তানের সড়কপথে শোভা পাচ্ছিল। চিকিৎসাখাতেও বিশেষ মনোযোগ দেন তিনি। এ সময় কাবুলে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়।

২. স্বেচ্ছাচারিতা ও দাম্ভিকতার যুগ

আমির হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামলের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায়ে ছিল। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর অর্জিত জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকে স্বেচ্ছাচারিতার নতুন একটি চরিত্রে প্রকাশ ঘটান। নিজেকে সরাসরি মহান খোদার পক্ষ থেকে নির্বাচিত শাসক ভাবতে থাকেন। এ সময় তিনি সব ধরনের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে চলে যান। একইসঙ্গে নিজেকে শরিয়তের ঊর্ধ্বে ভাবতে শুরু করেন। তাঁর শাহি হেরেমে তখন ডজনখানেক নারী অবৈধভাবে অবস্থান করত। দিন-রাতের অধিকাংশ সময় তিনি রূপসী এই নারীদের সান্নিধ্যেই কাটাতেন। পাশাপাশি তিনি রাশিয়া ও ব্রিটেনের তোষামোদির জন্য রাজকোষ থেকে অমূল্য সব উপহার পাঠাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি আরও একটি বড় ভুল পদক্ষেপ নেন এ সময়। রাষ্ট্রকে সব ধরনের ভয়ভীতি, আশঙ্কা ও বিদ্রোহের ঊর্ধ্বে ভেবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সব দায়িত্ব তার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। যেহেতু তার মধ্যে জবাবদিহি ও দায়িত্ববোধ ছিল না, ফলে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের মধ্যেও আমিরের আচরণের প্রভাব পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে তারাও অথর্ব, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে থাকে। ফলে জনগণের সঙ্গে শাসকমহলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের জন্য গভর্নররা অন্যায় কর আরোপ শুরু করে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দিন দিন বাড়তেই থাকে। জনজীবনে নেমে আসে অনিরাপত্তা ও বিশৃঙ্খলা।

রাষ্ট্রের এমন বেহাল পরিস্থিতি চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে চিন্তিত ও উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। এ ছাড়া রাশিয়া ও ব্রিটেনকে সন্তুষ্ট রাখতে স্বাধীন রাষ্ট্র আফগানিস্তান যেভাবে

রাজকোষ খালি করে তোষামোদি শুরু করেছিল, তা জনগণের কাছে ভালো মনে হচ্ছিল না। তারা একধরনের পরোক্ষ গোলামির জিঞ্জিরে নিজেদের আবদ্ধ দেখতে পাচ্ছিল। চরম বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ এসে পড়ে। হঠাৎ একদিন পাকতিকা ও কান্দাহারের শক্তিশালী কয়েকজন আমির ও সরদার আমির হাবিবুল্লাহ খানের প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। যদিও সরকারি বাহিনী খুব সহজেই এই বিদ্রোহ সামলে নিয়েছিল; কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায়, জনগণের মধ্যে আমির হাবিবুল্লাহ খানের আগের সেই নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা আর নেই।

প্রশাসনিক কাঠামো

আমির হাবিবুল্লাহ খানের সময়ে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল এমন—রাষ্ট্রের একজন উত্তরাধিকারী থাকবেন, তিনি নায়িবে সালতানাত বা উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এ পদটি সে সময় আমির হাবিবুল্লাহ খানের ভাই নাসরুল্লাহ খানের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল। আমিরের বড় পুত্র ইনায়েতুল্লাহ খানকে 'মুয়িনে সালতানাত' আর মেজো পুত্র আমানুল্লাহ খানকে 'মুয়িনুদ দাওলা' বলা হতো।

প্রতিটি প্রদেশের গভর্নর মনোনয়ন আমির হাবিবুল্লাহ খান নিজেই করতেন। গভর্নর নির্বাচন করতেন নায়িবে সালতানাত। প্রত্যেক জেলার কমিশনারকে হাকিম বলা হতো। নায়িবে সালতানাত হাকিমকে নির্বাচন করতেন। মুয়িনে সালতানাত নির্বাচন করতেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। মুয়িনুদ্দৌলা সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের পদায়ন করতেন।

ইনায়েতুল্লাহ খান তার পিতার মতো ইংরেজদের প্রতি কোমলপ্রাণ ছিলেন; কিন্তু নাসরুল্লাহ খান ছিলেন ঠিক এর বিপরীত। ইংরেজদের তিনি দু-চোখে দেখতে পারতেন না। একই অবস্থা ছিল মুয়িনুদ্দৌলা আমানুল্লাহ খানেরও। এই দুজন চাচা-ভাতিজা আমির হাবিবুল্লাহ খানের রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শকে কখনোই ভালো চোখে দেখতেন না। তাদের সমর্থকদের মধ্যে সরদার মাহমুদ তুরজাই ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এভাবে দেখতে দেখতে অমির হাবিবুল্লাহ খানের অথর্ব রাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে ভঙ্গুর পররাষ্ট্রনীতির কারণে তার বিরুদ্ধে বিপরীত ও আদর্শিক একটি বিপ্লবী দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আমির হাবিবুল্লাহ খানের নীতি

যদিও আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন; কিন্তু পূর্ববর্তী শাসকদের চেয়ে তিনি কিছুটা কঠোর মেজাজের ছিলেন। সবসময় তোষামোদি মনোভাব তার পক্ষে দেখানো সম্ভব হতো না। উদাহরণত, যখন লর্ড কার্জন সাবেক শাসক আমির আবদুর রাহমানের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের চুক্তি

উল্লেখ করে নতুনভাবে আফগানিস্তানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বলে, তখন আমির হাবিবুল্লাহ খান সরাসরি এ ধরনের ফাঁদে পা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর যখন ইংরেজরা হিন্দুস্থানের সঙ্গে আফগানিস্তানের রেলযোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং আমির হাবিবুল্লাহ খানের সামনে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তখন আধুনিক মননশীল ব্যক্তি হওয়ার ফলে ইংরেজদের এই কূটচাল তিনি বুঝে ফেলেন। ফলে রেলযোগাযোগ স্থাপনের অনুমতি দেননি। ইংরেজরা তার কঠোর মনোভাব লক্ষ করে সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা থেকে ফিরে আসে।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল আমির হাবিবুল্লাহ খানের দরবারে আসে। প্রতিনিধিদলের কাছে একটি প্রস্তাব ও চুক্তিপত্র ছিল। মূলত আমির আবদুর রাহমান খানের সেই চুক্তির নবায়ন করতে তারা এসেছিল। হাবিবুল্লাহ খান নতুন কোনো শর্তে স্বাক্ষর না করে পুরানো চুক্তিটিই অত্যন্ত সাদামাটাভাবে নবায়ন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দিকে তিনি ইংরেজ ভাইসরয়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আফগানিস্তান তার বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ মোতাবেক আগের কৃত ওয়াদা পূরণ করতে থাকবে। ওয়াদা রক্ষা করা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ।'

গোপন সংগঠন এবং ইংরেজদের গুপ্তচরবৃত্তি

আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক রক্ষা করায় এবং তার গোলামিসুলভ পররাষ্ট্রনীতির কারণে আফগানিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছিল। সরকারি নানা পদের দায়িত্বশীল থেকে সাধারণ দিনমজুর পর্যন্ত সবাই ধীরে ধীরে তার প্রতি ভীত হতে থাকে। তাকে পদচ্যুত করতে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে এদের হাতেই তার জীবন সাঙ্গ হয়।

হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামলে ইংরেজদের তল্পিবাহক মুনাফিক আফগানদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের হাতের পুতুল, বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য মতবাদ প্রচারকরাও এই সময় আফগানিস্তানে এসে পৌঁছায়। ইমানদীপ্ত জনগণের মধ্যে তারা পরিত্যাজ্য এই মতবাদ প্রচারের দুঃসাহস দেখাতে থাকে। এদের মধ্যে একজন ছিল শাহজাদা আবদুল লতিফ। প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সে অত্যন্ত প্রভাব তৈরি করে ফেলেছিল। সীমান্তবিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত তার মতামত ছাড়া চূড়ান্ত হতো না। মোল্লা নিয়ামতুল্লাহ নামের একজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক দায়িত্বশীল ছিল সে সময়। এই ব্যক্তি সরকারের সেবার আড়ালে কাদিয়ানি মতবাদ প্রচার করত।

এতকিছুর পরও কাদিয়ানি মতবাদ আফগানিস্তানে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। জনগণ তাদের ছলচাতুরীপূর্ণ দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু থেকেই সন্দেহের চোখে দেখছিল। একপর্যায়ে প্রশাসনের নজরে এলে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করা হয়। খতমে নবুওয়াতের ওপর আদর্শিক আঘাতের অভিযোগে দলের সদস্যদের সরাসরি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। এমনকি শাহজাদা আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারে সংযুক্ত থাকার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একই পরিণতি হয়েছিল মোল্লা নিয়ামতুল্লাহরও।

ইংরেজের গুপ্তচররা নানাভাবে নানা পরিচয়ে সমাজে মিশে কাজ করত। আমির হাবিবুল্লাহ খান প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এ সময় তাকে হিন্দুস্থান ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে চিকিৎসক নিয়ে আসতে হয়েছিল। সেই সুযোগে ইংরেজদের বেশ কিছু গুপ্তচর চিকিৎসাসেবার নামে আফগানিস্তানের প্রবেশ করে। হাবিবুল্লাহ খানের প্রধান চিকিৎসক আল্লাহ জয়া খান ইংরেজদের গুরুত্বপূর্ণ একজন গুপ্তচর ছিল। এই ডাক্তাররূপী শয়তান তাকে ওষুধের বদলে বিশেষ কিছু পথ্য অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে ধারাবাহিকভাবে সেবন করাতে থাকে। যার ফলে ধীরে ধীরে তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার সকল যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে অক্ষম অথর্ব প্রতীকী বাদশাহে পরিণত হন।

দরবারি ইউনিফর্ম

আমির হাবিবুল্লাহ খান তার দরবারের পরিবেশকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাজকীয় ঐশ্বর্য ও শানশওকত বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। যেহেতু তিনি ইংরেজদের কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাই তাদের পোশাক-আশাক তার বেশ পছন্দ ছিল। তিনি তার দরবারের সভাসদদের জন্য ইংরেজদের মতো পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। কিন্তু এই পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের মনে তার জন্য বাকি থাকা জায়গাটুকুও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে এসে জনগণ বুঝতে পারে, স্বাধীন আফগানিস্তানের বাদশাহ চিন্তাচেতনায়, কৃষ্টি-কালচার, নীতি-আদর্শ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইংরেজদের পরিপূর্ণ গোলামি বরণ করে নিয়েছেন।

মাহমুদ তুরজাই : রাজনৈতিক সচেতনতার উদয়

আমির হাবিবুল্লাহ খান আফগানিস্তানের প্রথম শাসক ছিলেন, যিনি ইংরেজদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা এবং সেসব গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ রাখতেন। এমনকি তিনি ইংরেজি ভাষাও শিখেছিলেন। তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক বোঝাপড়া ও

আলোচনার সময় নিজ ভাষা ব্যবহার করতেন না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে আফগানিস্তানেও পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়। সরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল; আর এগুলোর সবই হয়েছিল আলিগড়ের আদলে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে একটি উপকার অবশ্যই হয়েছিল। ইসলামি ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী একটি প্রজন্ম তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সময়ের চাহিদা ও সমস্যাকে চিহ্নিত করার মতো যোগ্য ব্যক্তি যেমন উঠে আসেন, তেমনি কিছু ক্ষতিও হয়েছিল। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিরও প্রভাব পড়েছিল এদের মনমগজে। আফগান ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তারা পুরানো ও সেকেলে ভাবতে শুরু করে। তরুণ এই প্রজন্মের মধ্যে অনেকে ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করলেও পশ্চিমা সভ্যতাকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেননি। আফগানিস্তানের সুমহান ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ধারণ করে তারা বেড়ে উঠেছিলেন। তারা এই পরিবেশকে আরও উন্নত করার কথা ভাবতেন।

নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করার পেছনে সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি ছাড়া আরও যে-সকল চিন্তাবিদের প্রচেষ্টা ছিল, তাদের মধ্যে মাহমুদ তুরজাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কাবুল থেকে প্রকাশিত জাতীয় পত্রিকা *সিরাজুল আখবারের* সম্পাদক ছিলেন তিনি। যদিও এ পত্রিকাটি আমির হাবিবুল্লাহ খান নিজেই চালু করেছিলেন; কিন্তু শায়খ মাহমুদ এখানে সত্য ও ন্যায়ের বাস্তব প্রতিফলন অত্যন্ত শক্তিশালী ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন। সমকালীন পরিস্থিতির ওপর সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাভাবনা উঠে আসত তাঁর কলমে। তাঁর লেখা ও চিন্তায় ইংরেজ ও রুশদের তৈরি সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রসমূহের খোলা সমালোচনা উপস্থাপিত হতো। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই সম্পাদকের প্রসিদ্ধি সে সময় সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুস্থানের জ্ঞানী ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় তখন আফগানিস্তান সম্পর্কে জানা ও বোঝার জন্য নিয়মিত তাঁর লেখা পড়তেন।

শায়খ মাহমুদ মূলত মাহমুদজাই গোত্রের নেতা ছিলেন। আমির আবদুর রাহমান খানের সময়ে তাঁর বংশ আমিরের ধরপাকড় থেকে বাঁচতে আরবে হিজরত করে। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি দামেশকে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান। আমির হাবিবুল্লাহ খান মসনদে বসে যখন রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করেছিলেন এবং মুহাজিরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন, তখন শায়খ মাহমুদ পুনরায় কাবুলে ফিরে আসেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার কারণে খুব দ্রুত তিনি হাবিবুল্লাহ খানের পরামর্শদাতা হিসেবে স্থান পেয়ে যান। তিনিই প্রথমে আমিরকে সমগ্র আফগানিস্তানে সংস্কার ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য আগ্রহী করে তুলেছিলেন। আমির তাঁকে

তাঁর পারদর্শিতার কারণে মুসলিমবিশ্ব ও ইউরোপের সমকালীন হালচাল প্রশাসনকে অবগত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে যখন *সিরাজুল আখবার* বেরোনো শুরু হয়, তখন তাঁকে এর সম্পাদক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রশাসনের তোষামোদ আর সরকারি চাপ থেকে এই পত্রিকাটি অনেকাংশে মুক্ত ছিল। স্বাধীনভাবে সেখানে তিনি তাঁর চিন্তা তুলে ধরার সুযোগ পেতেন। আশ্চর্যের কথা হলো, শায়খ মাহমুদ তাঁর স্বাধীনচেতা মতগুলোর জন্য আমির হাবিবুল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তা-ই নয়; বরং তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধির কারণে নিজের দুই পুত্র ইনায়েতুল্লাহ খান ও আমানুল্লাহ খানের বিয়ে শায়খ মাহমুদের দুই কন্যার সঙ্গে করিয়ে দেন। এতে করে শায়খ মাহমুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আফগানসমাজে বহুগুণ বেড়ে যায়।

আবদুল হাদির কবিতা

এই প্রজন্মের চিন্তাবিদদের মধ্যে একটি নাম ছিল আবদুল হাদি দাওয়ি। পশতু ও ফারসি ভাষায় তাঁর রচিত শত শত কবিতা-গজল আফগান জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও দূরদর্শিতার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। একটি কবিতার কয়েকটি চরণ হচ্ছে,

کب تک اے افغانوں کے نسل آخر کب
کب تک ہاں کب تک ہاں کب تک
ریگستان کے پرندوں کی کی چہکار کانوں میں پڑ چکی
پھر بھی گہری نیند کے خراٹے کب تک
بیداری کی روشنی ایک دنیا میں پھیل چکی ہے
اے اپنے جان کے دشمنوں خواب غفلت کب تک
تمہیں اپنے حال پر خون کے آنسو رونہ چاہیے
دریاؤں اور باغوں کی سیر و تفریح کب تک

আর কত দিন, হে বীর আগফান আর কত দিন
আর কত দিন, বলো আর কত দিন
মরুর চামচিকাদের ওই যে আওয়াজ শোনা যায়
তবু গভীর নিদ্রার বিশ্রাম আর কত কাল
জাগরণী গীত আজ বেজে উঠেছে বিশ্বজুড়ে
আপন প্রাণের দুশমন যুবকেরা! কত দিন আর এই শীতনিদ্রা

ধ্বংসাত্মক উপাদান

নতুন প্রজন্মের চিন্তাবিদদের মধ্যে কয়েকজন এমন ছিলেন, যাঁরা জনগণকে নানাভাবে জাগিয়ে তোলার মিশনে নিজেদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে অবশ্যই আফগানিস্তান ও সমগ্র মুসলিমবিশ্বে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। মুসলমানরা উপনিবেশবাদীদের নখর থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে বিদ্রোহের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন ও রাজনীতিতে সমানভাবে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্মের এই চিন্তাবিদদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি এমন ছিল, যারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিভোর ছিল। নিজ দেশ ও জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাদের কাছে পুরানো এবং সেকেলে মনে হচ্ছিল। ধর্মকে তাদের কাছে উন্নতির পথে অন্তরায় মনে হতে থাকে। ইসলামি সংস্কৃতির নানা অধ্যায়কে তারা উন্নয়ন ও প্রগতির পথে প্রধানতম বাধা হিসেবে ভাবতে থাকে।

তাদের অনেকের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা ছিল উপমহাদেশের স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের মতো। শুধু উপনিবেশ স্থাপন করা ছাড়া তারা পশ্চিমের কোনো ভুল দেখতে পেত না। পশ্চিমের শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন সমাজসংস্কারের জন্য তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি মনে হতে থাকে। তরুণ চিন্তাবিদরা যখনই লেখালেখি ও বক্তৃতায় ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার তুলনায় কলম ও জবান চালনা করত, তখনই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে তাদের অধ্যয়নস্বল্পতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নানা ধরনের অসংগতি ও আকিদাবহির্ভূত চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়ে যেত। এতে করে জনগণের কাছে ইসলামের একটি খণ্ডিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির জনগণ তাদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হতে থাকে। একসময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, জনগণ তাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে মূলধারার ধার্মিক শ্রেণির সঙ্গে ইসলামপ্রশ্নে তর্কে লিপ্ত হতে শুরু করে। চিন্তাবিদদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামি ঐক্য হলেও সমাজে দেখা যেতে থাকে অনৈক্যের সুর ও স্পষ্ট বিভাজনরেখা।

বৈশ্বিক পরিস্থিতি

হাবিবুল্লাহ খানের ১৯ বছরের শাসনামলে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন

এসেছিল। তার শাসনামলে তুর্কির খিলাফতব্যবস্থায় ইউরোপ তার শেষ আঘাত হেনেছিল। হারামাইন শরিফাইন ও বায়তুল মাকদিসের ওপর ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সামরিক দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সমগ্র বিশ্ব রক্তের হোলিখেলায় মেতে ওঠে। মূলকথা, আমির হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামলের শেষ দিক ছিল ফিতনা-ফ্যাসাদ আর রক্তপ্রবাহের যুগ।

ক্ষমতায় আরোহণের কিছুদিন পর রাশিয়ায় বলশেভিক নামে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করে আফগানসমাজে। এই বিপ্লবের আদর্শিক ধাক্কা মোকাবিলার জন্য ইসলামি ঐক্যের বৈশ্বিক ধারণা বেশ কাজে আসে। মুসলিমরা সবাই একটি উম্মাহ, একটি দেহের মতো—এই আকিদাকে সামনে রেখে চিন্তাশীল সম্প্রদায় তাদের হাতে কলম তুলে নেন। আমির হাবিবুল্লাহ খানের ভাই নাসরুল্লাহ খান তখন নায়িবে সালতানাত। এই কার্যক্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন।

পতনের মুখে খিলাফত

আমির হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামলের শেষ বছরে এসে মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে খিলাফতে উসমানির পতনের জন্য আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে। ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের গভীর ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছিল। ইতালি এবং খিলাফতের মধ্যে লিবিয়ার ময়দানে যুদ্ধ বেধে যায়। এ সময় খলিফা কোনো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে সহযোগিতা চেয়েও পাননি; অথচ পুরো ইউরোপ ইতালির সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে বহু শতাব্দী পুরানো ত্রিপোলি, বেনগাজি ও লিবিয়ার বিখ্যাত শহরগুলো ইতালির হাতে চলে যায়। এরপর শুরু হয় বলকানের যুদ্ধ। উসমানি খিলাফতের সুবিশাল ইউরোপীয় অঞ্চল মুসলমানদের রক্ত দিয়ে মুছে ফেলা হয়। হাতছাড়া হয় ইউরোপীয় অধিকাংশ মুসলিম ভূমি। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইউরোপীয় শক্তিগুলো খিলাফতে উসমানির হাত থেকে বলকান অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়। প্রত্যেকটি ছোট ছোট অঞ্চলকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র ও নগররাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

যদিও বৈশ্বিক এই পরিক্রমাগুলোর সঙ্গে আফগানিস্তানের সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাই তারা খিলাফতে উসমানিকে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ পাননি। তবে আফগান সেনাবাহিনীতে বেশ কজন উচ্চপদস্থ প্রশিক্ষক ছিলেন তুর্কি অফিসার। এ জন্য আফগান সেনারা তুর্কির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

আফগানিস্তানের শাহি মহলে উচ্চপদস্থ কিছু অফিসার ও সরদার ছিলেন, যারা তুরস্ককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সহায়তার ব্যাপারে বাদশাহকে আগ্রহী করার চেষ্টা করছিলেন। কেউ কেউ তো সরাসরি গোত্রীয় যোদ্ধাদের যুদ্ধে পাঠানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। জনগণ ও গোত্রীয় সরদারদের চাপের ফলে আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকার পরও তুরস্কের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে থাকেন।

আকাবির দারুল উলুম দেওবন্দ এবং রেশমি রুমাল আন্দোলন

এই দিনগুলোতে আমির হাবিবুল্লাহ খানের কাছে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ.-এর চিঠি আসে। এখানে তিনি সমগ্র উম্মাহর অভিভাবকতুল্য তুর্কির উসমানি খিলাফত রক্ষায় আফগানিস্তানকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। মাওলানা মাহমুদ একটি বৈশ্বিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এর ফলে তিনি 'শায়খুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন।[৯] সমকালীন বিশ্ব তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁকে সর্বজনীন অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। আফগানিস্তানেও তাঁর অগণিত ছাত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্বেচ্ছাসেবী যুবক অবস্থান করছিল।

এই আন্দোলন 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' হিসেবে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। আফগানিস্তান রাশিয়া ও মুসলিমবিশ্বের বাকি শক্তিকে একত্রিত করে খিলাফতে উসমানির সংরক্ষণ এবং ইংরেজ উপনিবেশের বিষাক্ত শাসন সমাপ্ত করার লক্ষ্যে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদেরকে আকাবিরে দেওবন্দ এবং ইসলামপ্রতিষ্ঠায় তাঁদের আত্মত্যাগ, চিন্তাভাবনা ও গৃহীত কিছু প্রচেষ্টার ওপর দৃষ্টিপাত করা জরুরি। পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্তে আফগানিস্তান থেকে ডুরান্ড লাইন চুক্তির মাধ্যমে পৃথক হয়ে পড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ব্যাপারে ধারণা অর্জন করতে হবে।

এ অঞ্চলটি ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এই অঞ্চল সবসময় আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে। আফগানিস্তানে বসবাসরত গোত্রগুলোর সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ডুরান্ড লাইন স্থাপনের পরও বজায় ছিল। এ জন্য সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা অর্জন করতে হবে। কেননা, পরবর্তী বিশ্বপরিস্থিতিতে এই অঞ্চলের গোত্রীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐক্য বিশ্বপরাশক্তিদের আগ্রাসনকে বেশ কয়েকবার রুখে দিয়েছিল। আফগানিস্তানের ওপর ধেয়ে আসা প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়কে এ অঞ্চলই প্রথম মোকাবিলা করেছে।

[৯] মূলত তিনি মাল্টার বন্দিত্ব থেকে ফেরার পর এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ। সময়ের হিসেবে সেটি ছিল ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ। টাইমলাইন খেয়াল না রাখলে অনেক সময় প্রসঙ্গ বুঝতে বেগ পেতে হয়।

আসুন, এখন আমরা আফগানিস্তানের ইতিহাসকে তখনকার পরিস্থিতি সামনে রেখে অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করব। এ জন্য প্রথমে আমাদেরকে দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস জানতে হবে। একইসঙ্গে গোত্রীয় অঞ্চলগুলোতে চলমান পরিস্থিতি এবং আন্দোলনের ব্যাপারে আমরা সমান্তরালভাবে আলোচনা করতে থাকব। মনে রাখতে হবে, দারুল উলুম দেওবন্দ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হলেও বিপ্লবী আন্দোলনগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল।

দারুল উলুম দেওবন্দ

১৫ মুহাররাম ১২৮৩—১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মে। হিন্দুস্থানের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত একটি জেলার নাম সাহারানপুর। দেওবন্দ নামে এখানে একটি কসবা ছিল। অনুন্নত এই গ্রামে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবি ও মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহ. হিন্দুস্থানের পরাজিত মুসলমানদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বরকত, রহমত নাজিল করেছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রসিদ্ধি ও প্রভাব সমগ্র হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতাগণ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; কিন্তু যখন আন্দোলন ব্যর্থ হলো এবং ইংরেজদের কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন মুসলমানদের ইমান-আমল ও তাহজিব-তামাদ্দুন রক্ষার্থে তাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইংরেজদের ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা সভ্যতা আর ইমানবিধ্বংসী চিন্তাধারা যেন কোনোভাবেই মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, এ লক্ষ্যে দারুল উলুমের আকাবিরগণ কাজ করে গেছেন। তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল, উপমহাদেশ থেকে উপনিবেশবাদীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা।

দারুল উলুমের বরকতময় পরিবেশে বেশ কিছু আফগান ছাত্র পড়াশোনা করতেন। এই ছাত্র ভাইদের 'বেলায়েতি' বলা হতো। তাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের সঙ্গে দারুল উলুমের আকাবিরদের একটি যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। একইসঙ্গে দারুল উলুমের প্রভাব পৌঁছে গিয়েছিল আফগানিস্তানের চিন্তাশীল মহলে। পাঠক অবশ্যই স্মরণে রেখেছেন, সাইয়িদ আহমাদ শহিদের আন্দোলনের সঙ্গে আফগানদের একটি বিশেষ এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, যে কারণে দারুল উলুমের সঙ্গে ধার্মিক এই শ্রেণির উত্তরসূরিদের পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হয়। আফগানিস্তানের চিন্তাশীল ও ধার্মিক জনগণ দারুল উলুমকে সাইয়িদ সাহেবের চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সত্যিকার উত্তরসূরি হিসেবে গণ্য করতেন। সাইয়িদ সাহেব তাঁর উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের

জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পরও মুজাহিদরা দীর্ঘ সময় এ অঞ্চলে জিহাদের পতাকা সমুন্নত রাখেন। ইংরেজরা ১৮৫৭ থেকে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার মুজাহিদদের এই কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে; কিন্তু পূর্ণরূপে তারা কখনো সফল হতে পারেনি। মুজাহিদরা তাঁদের রুহানি শক্তিবলে সেখানে দীন ও ইমানের রক্ষাকারী হিসেবে অবস্থান করছিলেন।

মুজাহিদরা আকাবিরে দেওবন্দের সঙ্গে শুধু যে যোগাযোগ রাখতেন এমন নয়; বরং শায়খুল হিন্দের বিখ্যাত ছাত্র মাওলানা উজায়ের গুলের ভাষ্যমতে, বহু আগে থেকেই মাওলানা কাসিম নানুতবি এবং পরবর্তীকালে শায়খুল হিন্দ রাহ. তাদের গোপন নেতা হিসেবে দারুল উলুম থেকেই আন্দোলন পরিচালনা করে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, হিন্দুকুশের পাহাড়ে জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপমহাদেশীয় রাজধানীর সন্নিকট থেকে দেওয়া হচ্ছিল। নিয়মিত কিন্তু অত্যন্ত সংগোপনে দারুল উলুম থেকে আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া হতো। এমনকি যুদ্ধাস্ত্র পর্যন্ত দারুল উলুমের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত গোপন একটি স্থানে প্রস্তুত করে মুজাহিদদের কাছে পাঠানো হতো। আধুনিক সমরাস্ত্র প্রস্তুত করতে অভিজ্ঞ কারিগর এ সময় দারুল উলুমের পক্ষ থেকেই নিয়োগ করা হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ!

ইয়াগিস্তান

গোত্রীয় এ অঞ্চলটিতে মুজাহিদদের আন্দোলন ও অবস্থান ছিল অত্যন্ত শক্ত। ডুরান্ড লাইন তৈরির আগে এ অঞ্চলটি সরাসরি আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের অংশ ছিল; কিন্তু পরে অঞ্চলটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এরপরও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ সেখানে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কেননা, এখানে স্বাধীন গোত্রীয় সংস্কৃতি বজায় ছিল। সরদারদের জিরগা এবং আলিমদের ফাতওয়া অনুসরণ করে জনগণ জীবনযাপন করত। ফলে ব্রিটিশরাও তেমন ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি। ব্রিটিশরা বার বার চেষ্টার করেও এখানে ট্যাক্স ধার্য করতে এবং সরকারি আদালত প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আজও গোত্রীয় অঞ্চলগুলোতে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ স্থানীয় পঞ্চায়েতের অধীনে সমাধান হয়ে থাকে। তাতেও সমাধান না হলে আলিম ও মোল্লাদের মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাধান গ্রহণ করেন স্থানীয় জনগণ।

এখানের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং আপন সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার প্রতি ভালোবাসা ছিল অনন্য পর্যায়ের। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ পদ্ধতির পরিবর্তন তারা কোনোভাবে মেনে নিতে পারত না। এখানের নারীরা অত্যন্ত পর্দানশিন হিসেবে

পরিচিত। পুরুষদের মধ্যে লজ্জাবোধ পৃথিবীর অন্য সকল অঞ্চলের চেয়ে বেশি ভাবা হয়। যেহেতু আফগানিস্তান থেকে পৃথক করার পরও এই অঞ্চলকে ব্রিটিশরা তাদের অনুগত এবং নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারেনি, তাই তারা এই অঞ্চলকে ইয়াগিস্তান নামে প্রসিদ্ধ করে। ইয়াগিস্তান অর্থ বিদ্রোহীদের দেশ।

উমরা খান

এই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত মুজাহিদ সরদার ছিলেন উমরা খান। জুনদুল অঞ্চলে তিনি একটি শক্তিশালী ইসলামি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। ইউসুফজাই গোত্রের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে হজ করতে মক্কায় গেলে সেখানে মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

গাঙ্গুহি রাহ. এই সফরে হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ও বড় বড় আলিমের সঙ্গে হজের সফরে গিয়েছিলেন। সে সময়ে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। সমগ্র মুসলিমবিশ্ব ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যে চলে যাওয়ার পর এবার তুরস্কের উসমানি খিলাফত রাশিয়ার হাতে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় সবাই অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন। ব্রিটেনসহ অধিকাংশ ইউরোপীয় শক্তি এ সময় রাশিয়াকে সমর্থন করছিল। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমবিশ্বে তুর্কির উসমানি খিলাফত একটি অভিভাবকতুল্য অবস্থানে থাকায় একে সমর্থন এবং এর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলিমরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হজরত গাঙ্গুহি রাহ. ব্রিটিশদের শক্তি খর্ব করতে মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে একত্রিত করে একটি বৈশ্বিক আন্দোলন তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেন। এই বৈশ্বিক আন্দোলনের মূল পটভূমি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল স্বাধীন গোত্রীয় অঞ্চলগুলোকে।

ইউসুফজাই আফগান গ্রন্থের লেখক আল্লাহ বখশ ইউসুফি লিখেছেন, 'উমরা খান হজের সফরে হজরত গাঙ্গুহির হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেন। হিজাজের ভূমিতে বৈশ্বিক আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হয়। হজের সফর থেকে ফেরার পর উমরা খান ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে নিজ অঞ্চলে ইসলামি শাসন ঘোষণা করেন। সমগ্র গোত্রীয় অঞ্চল তাঁর এই ঘোষণাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়।'

উমরা খান এবং ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষ

উমরা খানকে দমন করতে ইংরেজরা বার বার গোত্রীয় অঞ্চলগুলোতে হামলা করেছিল; কিন্তু এই মহান মুজাহিদকে কোনো যুদ্ধেই তারা পরাজিত করতে পারেনি। তিনি চিত্রাল

অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে কাফিরিস্তান[১০] দখল করে নেন। এরপর ধীরে ধীরে আসমার, মালাকান্ড, দিয়ার, সোয়াত ও বুনির অঞ্চল ইসলামি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে করে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বহুগুণ বেড়ে যায়।

ইংরেজরা প্রথমে আমির আবদুর রাহমান খানের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মিলিত জোট গঠন করেছিল। এরপর ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়; কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সম্মিলিত বাহিনীকে মুজাহিদরা পরাজিত করেন। সামরিকভাবে সুবিধা করতে না পারায় চতুর ইংরেজরা তখন ধোঁকাবাজির সেই পুরানো চাল অবলম্বন করে। অঢেল অর্থ ব্যয় করে তারা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন গোত্রীয় সরদারকে দলে ভেড়াতে সক্ষম হয়। এতে করে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই গাদ্দার মুনাফিক সরদারদের সহযোগিতায় পরে একটি যুদ্ধে মুজাহিদরা পরাজিত হন। দেওবন্দি আলিমগণ সুদূর মক্কায় যে ইসলামি রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন, সেটি বেশ কয়েক বছর পর স্বজাতির গাদ্দারদের কারণে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হাজি সাহেব তুরাঙজাই

উমরা খানের পর এই অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহান মুজাহিদ হাজি সাহেব তুরাঙজাই। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে চারসাড্ডা অঞ্চলের তুরাঙজাই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ফজল ওয়াহিদ; কিন্তু 'হাজি সাহেব' নামে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর সম্পর্ক ছিল সীমান্ত অঞ্চলের বিখ্যাত বুজুর্গ শায়খ নাজমুদ্দিন ওরফে হাড্ডা মোল্লার সঙ্গে। এই বুজুর্গ ২৫ বছর যাবৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছিলেন। হাজি সাহেব শায়খের জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রভূত শিক্ষা অর্জন করেন। শায়খ নাজমুদ্দিনের পর হাজি সাহেবের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির ওপর বেশি প্রভাব তৈরি হয়েছিল দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের মাধ্যমে। দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠার যুগের পরে তিনি মহান এই প্রতিষ্ঠান ভ্রমণে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। সে সময় শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি যুবক বয়সে একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, হাজি সাহেব বয়সে শায়খুল হিন্দের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ, সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। এ হিসেবে শায়খুল হিন্দের বয়স তখন বড়জোর ২৭ বছরের আশপাশে হবে।

হাজি সাহেবের সৌভাগ্য, তিনি দারুল উলুমে অবস্থানের সময় শুনতে পান, আকাবিরে দেওবন্দ বিশেষ করে মাওলানা কাসিম নানুতবি ও মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি

[১০] এই অঞ্চলটি বর্তমান আফগানিস্তানের নুরিস্তান প্রদেশ। একসময় এর নাম ছিল কাফিরিস্তান।

রাহ. একত্রে হজের সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এ কথা জানতে পেরে হাজি সাহেবও তাঁদের সফরসঙ্গী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। এরপর প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় ফিরে আসেন হিন্দুস্থানে। জীবনের প্রথম হজ এই মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই সফরে যুবক শায়খুল হিন্দও ছিলেন।

হজের এই মুবারক সফরে হিন্দুস্থান এবং স্বাধীনচেতা আফগানিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি মজবুত ইমানি বন্ধন তৈরি হয়। হাজিদের এই কাফেলা মক্কা-মদিনায় হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর বিখ্যাত মুরশিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির সান্নিধ্যেও কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

হাজি সাহেবের সংস্কার আন্দোলন

হজ থেকে ফিরে হাজি সাহেব নিজ অঞ্চলে ফিরে যান। দেওবন্দের আলিমদের পরামর্শ মোতাবিক জিহাদের প্রশিক্ষণ এবং আত্মশুদ্ধির যুগপৎ সংস্কারমূলক আন্দোলন প্রবর্তন করেন। এই প্রশিক্ষণের মৌলিক কয়েকটি ধাপ ছিল এমন :

১. পুরো সীমান্তপ্রদেশে জনগণের মধ্যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের একটি শক্তিশালী মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে হবে। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

২. জনগণকে সামরিক ও চিন্তাগত উভয় দিক থেকে সুসজ্জিত করে তুলতে হবে, যাতে সাধারণ একজন যোদ্ধাও উপনিবেশবাদীদের গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ভাসা ভাসা হলেও ধারণা রাখে। বৈশ্বিক রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে।

৩. খ্রিষ্টান মিশনারিদের এ অঞ্চলে কোনোভাবেই কাজ করতে দেওয়া যাবে না। তাদের অপপ্রচার এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণার দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৪. ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমগ্র অঞ্চলকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

৫. সর্বোপরি হিন্দুস্থানসহ সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে মুক্ত করতে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, হাজি সাহেব আকাবির (যোদ্ধাভিজ্ঞ, শাস্ত্রীয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বয়সে প্রবীণ) আলিমদের দেখানো এই পথে ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

শায়খুল হিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। তুরাঙজাই অঞ্চলে আধ্যাত্মিক ও সংস্কারমূলক একটি খানকাও স্থাপন করেন। লোকেরা দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসে আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনা লাভ করত। ব্যক্তিসংশোধন থেকে শুরু করে পরিবার ও সমাজসংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় নিয়ে তারা ফিরে যেত আপন আপন অঞ্চলে। আল্লাহর স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মানসিকতা সবকিছুই এখান থেকে মানুষ শিখে যেত। সবধরনের কুসংস্কার ও বিদআত থেকে মুক্তি পেত।

নতুন প্রজন্মকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সীমান্তপ্রদেশজুড়ে হাজি সাহেবের উদ্যোগে দেড়শতাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা স্কুল-কলেজগুলোতে ব্রিটিশদের সিলেবাস এবং একইসঙ্গে পশ্চিমের ভয়াবহ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছিল। সেই আগ্রাসন রোধ করতে মাদরাসাশিক্ষার কোনো বিকল্প ছিল না। পেশোয়ার, মারদান, সোয়াত উপত্যকায় পঞ্চাশের অধিক ইসলামি স্কুলের সূচনা করা হয়। এই স্কুলগুলোতে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার মৌলিক অংশ শেখানো হতো। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ছিল ছয় রুপি।

হাজি সাহেব ইসলামি স্কুলের শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে তাঁদের বেতন সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের চেয়েও বৃদ্ধি করেন। অধিকাংশ ইসলামি স্কুল মসজিদের সঙ্গে লাগোয়া হুজরাখানা অথবা মসজিদেই পরিচালিত হতো। স্কুলগুলোর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন দীনদার মুসলমানরা।

তখনকার পরিস্থিতি ছিল এমন—মিশনারিরা দম্ভভরে সমগ্র উপমহাদেশে খ্রিষ্টবাদ প্রচার করে বেড়াত। ডাক্তার ক্লার্ক ও ডাক্তার পিনালের মতো চতুর প্রাচ্যবিদ তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারণা জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছিল। এরা ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখত। যেমন : কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস ইত্যাদি। এসব বিষয়ে তারা কিছু জটিল প্রশ্ন জনগণের সামনে ছুড়ে দিত এবং কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে ইচ্ছামতো অনুবাদ করত। এরপর হজরত ইসা আ.-এর ফজিলত বয়ান করে জনগণকে খ্রিষ্টবাদে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত। তারা জনগণকে বোঝাত, আল্লাহ তাআলা সবসময়ই তাঁর প্রিয়ভাজনদের ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। খ্রিষ্টধর্ম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উভয়েই এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়, যার কারণে তাদের ধর্ম ও রাজনীতিকে সমগ্র বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ!

হাজি সাহেব ওয়াজ-নসিহত, তাবলিগ এবং ইসলামি মাদরাসা ও স্কুলের মাধ্যমে এসব অপপ্রচারের জবাব দিতে থাকেন। একপর্যায়ে জনগণের মধ্যে থেকে খ্রিষ্টানদের প্রভাব

দূর হয়ে যায়। সচেতন হয়ে ওঠে আপামর জনতা। মিশনারিরা বহু বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সীমান্ত অঞ্চলে তেমন কোনো ফায়দা অর্জন করতে না পেরে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়।

ইংরেজদের এই ধর্মপ্রচারের মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর সীমান্তপ্রদেশের নেতাদের মধ্য থেকে সাহেবজাদা আবদুল কাইয়ুম সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে পেশোয়ারে একটি ইসলামিক কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় তিনি হাজি সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি এবং অর্থসহায়তা গ্রহণ করার পর হাজি সাহেবের মাধ্যমে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়া মূলত ব্রিটিশদের আক্ষরিক পরাজয়ের ইঙ্গিত বহন করেছিল। ঐতিহাসিক এই ঘটনার তিন বছর পর শায়খুল হিন্দ রাহ. তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র জিহাদের সূচনা করেন। হাজি সাহেবের মতো ব্যক্তিদের মাধ্যমেই সীমান্তপ্রদেশজুড়ে এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শুরু হয়।

শায়খুল হিন্দের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র জিহাদি আন্দোলন

শায়খুল হিন্দ রাহ. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং এই আন্দোলনের পেছনে দীর্ঘ সময়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় পেরিয়ে তিনি এই অবস্থানে উপনীত হয়েছিলেন। মোক্ষম সময় ও সুযোগের জন্য তাঁকে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। হাজি সাহেব তাঁর এই আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি ছাড়া আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, যাঁরা সমগ্র হিন্দুস্থান থেকে শায়খুল হিন্দের সহযোগিতা করে আসছিলেন। অত্যন্ত সংগোপনে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি কয়েক দশক ধরে তাঁর এই মহান আন্দোলনের পথ-পরিক্রমা পেরিয়ে এসেছিলেন। শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান, মাওলানা হাসরত মুহানি ও ডাক্তার মুখতার আহমাদ প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে পৃথক সংগঠন পরিচালনা করতেন। তবে সবাই গোপনে গোপনে শায়খুল হিন্দের তত্ত্বাবধানে একটি বৃহৎ আন্দোলনের জন্য কাজ করে গেছেন। শায়খুল হিন্দ যখন তাঁর সশস্ত্র জিহাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন সবাই তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন সফল করার মিশনে নেমে পড়েন। এমনকি বিধর্মী কিছু নেতাও এই আন্দোলনে অংশ নেন। এদের মধ্যে রাজা মাহেন্দ্র প্রতাপ সিংয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জমিয়তে হিজবুল্লাহ

শায়খুল হিন্দ রাহ. নিজেও একটি গোপন সংগঠন তৈরি করেছিলেন। বাহ্যিকভাবে এর নাম ছিল জমিয়তে হিজবুল্লাহ।[১১] সংগত কারণে এই দলের তেমন প্রচার করা হয়নি। কেননা, এটি ছিল একটি গোপন বিপ্লবী সংগঠন। সাধারণ জনতাকে সম্পৃক্ত করার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না। শুধু নিকটজন, যোগ্য ব্যক্তি এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরই এই গোপন সংগঠনের সদস্য করা হয়েছিল। কয়েক দশক ধরে গোপনে শায়খুল হিন্দ এবং অন্যান্য নেতা এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এরপর সেই সময় এসে যায়, যখন সংগঠনকে জনসমক্ষে এনে জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা জরুরি হয়ে পড়ে। এটি তখনকার ঘটনা, যখন তুরস্কের খিলাফত রাশিয়া ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি খিলাফত তারাবুলুস বা ত্রিপোলি অর্থাৎ, বর্তমান লিবিয়া নিজেদের শাসন থেকে হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী বছর বলকানের যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তি খিলাফতকে পরাজিত করলে ইউরোপেও মুসলিমরা গণহত্যার শিকার হন। খিলাফত হারিয়ে ফেলে তার শত বছরের ঐতিহ্যময় বলকান অঞ্চল। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাজয় এ সময় খিলাফতকে পতনের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছিল। এমন একটি মুহূর্তে শায়খুল হিন্দের গোপন সংগঠনকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা ছিল সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দাবি।

শায়খুল হিন্দের পেরেশানি

শাইখুল হিন্দ রাহ. এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর উদ্‌বেগের মাত্রা অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁর যোগ্য শিষ্য শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ. এ সময়ের কিছু স্মৃতি এভাবে তুলে ধরেছেন,

> *বলকান ও তারাবুলুসের (ত্রিপোলি) যুদ্ধে খিলাফতের পরাজয় হলে মাওলানা মুসলমানদের ভবিষ্যৎচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আমি তাঁকে সর্বদা উদ্‌বিগ্ন ও পেরেশান হয়ে থাকতে দেখতাম। এ সময় সাধ্যের সবটুকু দিয়ে প্রধান উসতাজ মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম সাহেব এবং আমাদের হজরত মাওলানা মুসলমানদের মধ্যে চাঁদা উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। মাদরাসাগুলো তাঁরা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ধনী মুসলমানদের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে ছাত্রদের পাঠিয়েছেন। কিছু*

[১১] হাজি সাহেব তুরাঙজাই এ সময় তুরস্কের সুলতান মুহাম্মাদ পঞ্চমের কাছে একটি চিঠি পাঠালে সেটি ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে যায়। আজও এই চিঠি ইন্ডিয়া অফিস লন্ডনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এই চিঠিতে শায়খুল হিন্দকে জমিয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।

ছাত্র ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও বেরিয়ে পড়তেন। এভাবে সম্ভাব্য সকল পন্থায় অর্থনৈতিক জোগান দিয়ে খিলাফত রক্ষায় চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা বিরাট অঙ্কের অর্থ তুর্কি খিলাফতের কাছে পাঠান। খিলাফত রক্ষায় মুসলমানদের সব ধরনের সহযোগিতা করা ফরজ— এই মর্মে তাঁরা ফাতওয়াও প্রকাশ করেন। নিজের পয়সা দিয়ে ফাতওয়া ছেপে বিলি করেন। বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ-নসিহত করে মুসলমানদের উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকেন; কিন্তু এতকিছু করেও তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। বলকানের যুদ্ধে পরাজয় খিলাফতের পতনকে প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল। ইউরোপের মাটি থেকে ইসলামকে আবারও আন্দালুসের মতো গুটিয়ে ফেলা হবে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে অবশেষে ঢিমেতালে জ্বলতে থাকা শেষ প্রদীপটুকুও একসময় দপ করে নিভে যায়।[12]

শায়খুল হিন্দ রাহ. এই পরিস্থিতিতে বরেণ্য আলিম মাওলানা আবদুর রাহিম রায়পুরি ও মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরির সঙ্গে ধারাবাহিক গোপন বৈঠক করেন। অবশেষে তাঁরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান। পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল, তুরস্ক ও আফগানিস্তানকে হিন্দুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাতে হবে। একইসঙ্গে আবনাউল বিলাদ অর্থাৎ, সমগ্র উপমহাদেশের স্থানীয় জনগণকে সশস্ত্র জিহাদের ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে হবে। ইংরেজরা চতুর্দিক থেকে শুরু হওয়া এ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না। এতে করে তারা অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হবে। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে উপনিবেশ উঠিয়ে নিতে হবে তাদের।

এভাবে হিন্দুস্থানের ওপর একযোগে হামলার ফলে ঔপনিবেশের অধীনে থাকা সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে স্বাধীন করা সম্ভব। তা ছাড়া তুরস্কের খিলাফত এবং হিন্দুস্থানের বৃহত্তর মুসলিম জনতার মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন হবে। এই বন্ধন খিলাফতকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হারিয়ে ফেললেও আফগানিস্তান ও উপমহাদেশ খিলাফতের অধীনে চলে আসবে। এতে করে নতুন আরেকটি পরাশক্তির আবির্ভাব ঘটবে। পরিকল্পনার বিস্তারিত কর্মপন্থা তৈরি করে ফেললেও এটা তাঁরা কাউকে খুলে বলেননি। তবে আন্দোলনের গোপনীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্যকে শুধু তাঁর কাজটুকু বুঝিয়ে দেওয়া হতো। পুরো পরিকল্পনা কখনো কারও সামনে উপস্থাপিত হয়নি।

---

[12] *সফরনামা আসিরে মালটা* : ০৯, ১০।

হিজরতের পথে হাজি সাহেব

পরিকল্পনার প্রথম অংশ ছিল হিন্দুস্থান থেকে ব্রিটিশদের সামরিক শক্তিকে আফগানিস্তানে ব্যস্ত করে তোলা। এ জন্য আফগানিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা ঘটাতে হবে। এরপর আফগানিস্তান ও তুরস্কের শাসকদের কাছে আনুষ্ঠানিক সাহায্য চেয়ে তাদেরও যুদ্ধে শরিক করা হবে। আফগানিস্তান ও তুরস্কের খিলাফতের সহায়তা গ্রহণের আগেই জিহাদ শুরু করার একটি উদ্দেশ্য ছিল এমন—স্থানীয় জনগণ জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ কি না এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে রাজি কি না, তা জানা ছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে সহায়তা আসা বেশ কঠিন ছিল। এ জন্য তাঁরা গোত্রীয় সদস্যদের মাধ্যমে জিহাদের সূচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা সামনে রেখে বহু দিন আগে থেকেই স্বাধীন গোত্রীয় অঞ্চলগুলোকে প্রস্তুত করা হয়। হাজি সাহেবও বহু বছর ধরে শায়খুল হিন্দের একটি ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন।

শায়খুল হিন্দ রাহ. ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে পেশোয়ারে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় মাওলানা আজাদ ও হাজি সাহেবের মধ্যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানার পক্ষ থেকে শায়খুল হিন্দের গোপন চিঠি হাজি সাহেব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতি হুকুম ছিল, তিনি যেন গোত্রীয় অঞ্চলগুলোকে সশস্ত্র জিহাদের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করেন। কেননা, জিহাদের সময় সন্নিকটে। এখন যেহেতু সেই সময় এসে পড়েছে, তাই শায়খুল হিন্দ হাজি সাহেবের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশদের অধীন অঞ্চল থেকে ইয়াগিস্তান অর্থাৎ, স্বাধীন ইসলামি অঞ্চলের দিকে হিজরত করেন। সেখান থেকে জিহাদের ঘোষণা করতে হবে। হাজি সাহেব এতদিন তাঁর পরিবার-পরিজন ও বংশসূত্রে পেশোয়ার অঞ্চলে বসবাস করে আসছিলেন। এখন যেহেতু শায়খুল হিন্দের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আদেশ এসে গেছে, তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরিবার-পরিজন রেখে তিনি মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে ইয়াগিস্তানের দিকে এগিয়ে যান।

হাজি সাহেবের অনুপস্থিতিতে ইংরেজবাহিনী তাঁর পরিবার-পরিজন ও বংশধরদের ওপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। তারা শুধু এটা জানতে চায় যে, হাজি সাহেব কোন পরিকল্পনা নিয়ে ইয়াগিস্তানের দিকে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাজি সাহেবকে আল্লাহ তাআলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের একজন অগ্রগামী নেতা হিসেবে কবুল করেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় অভিযান ও পরিকল্পনার কথা কাউকেই বলেননি। পরিবারের ওপর অকথ্য জুলুমের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলেও তিনি শায়খুল হিন্দের আদেশ মাথায় রেখে কাজ করে যান। ইয়াগিস্তান পৌঁছে স্বাধীন গোত্রীয়

সমাজ থেকে তিনি জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। জিহাদের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ার অল্প দিনেই হাজার হাজার যুবক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ইয়াগিস্তানে এসে একত্রিত হয়।

বুনিরের ময়দানে হাজি সাহেব

হাজি সাহেব প্রথমে বুনিরকে তাঁর জিহাদি ঘাঁটি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। ৮০ বছর আগে এখানেই সাইয়িদ আহমাদ শহিদ তাঁর জিহাদি আন্দোলন পরিচালনা করেন। সাইয়িদ সাহেবের অগণিত শিষ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে জিহাদি স্পৃহা ও উদ্দীপনাকে সঞ্চারিত করে গিয়েছিলেন। তাই তাঁদের সঙ্গে মিলে তিনি এই বরকতময় অভিযান শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে নিকটস্থ অঞ্চলের ইংরেজদের সেনাফাঁড়িতে আক্রমণ শুরু হয়। আক্রমণগুলো অধিকাংশই গেরিলাপদ্ধতিতে করা হতো। ১৬ আগস্ট ১৯১৫। রুস্তম দুর্গের আট মাইল দূরে মুজাহিদরা একটি পাহাড়ি ছাউনিতে অবস্থান করছিলেন। চার দিন পর রুস্তম দুর্গ আক্রমণ করা হয়। দুর্গে নিয়োজিত ইংরেজ সেনারা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। প্রতিদিন আহত ও নিহত ইংরেজ সেনাদের চারপায়ায় বহন করে মারদান শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো।

কিছুদিন পর ইংরেজ অফিসাররা বুঝতে পারে, যদি আক্রমণের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তাহলে রুস্তম দুর্গ ইংরেজ সেনাদের কবরস্থানে পরিণত হবে। ২৫ আগস্ট তারা তাদের সকল সামরিক শক্তি একত্রিত করে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। এবার তাদের লক্ষ্য ছিল মুজাহিদদের ছাউনি। ইংরেজবাহিনীতে সে সময় কমপক্ষে ৫ হাজার সেনা ছিল। তারা তিন দিক থেকে মুজাহিদদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে; কিন্তু পাহাড়ি এই সন্তানদের তাঁদেরই ভূমিতে ঘিরে ফেলা এতটা সহজ ছিল না। মুজাহিদরা হিন্দুকুশ পাহাড়ের প্রতিটি ইঞ্চি ভালোভাবে চিনতেন। তাঁরা এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন।

রাত ৯টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত ঐতিহাসিক এই যুদ্ধ চলতে থাকে। সকালে ইংরেজরা তাদের ৬০০ লাশ মাটিতে ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অপরদিকে মুজাহিদদের ১০ জন শহিদ আর ছয় জন আহত হন।

কাবুলের শাসককে জিহাদের আমন্ত্রণ

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সংবাদ গোপন সূত্রের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছে যেত। যখন মুজাহিদদের অবস্থান কিছুটা শক্তিশালী হতে শুরু করে, তখন অনুভব করেন পরিকল্পনা মোতাবিক এই জিহাদে শাসকদের সম্পৃক্ত করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুলে

পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য ছিল, আমির হাবিবুল্লাহ খানকে বিশ্বময় এই জিহাদি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো। একইসঙ্গে চলমান জিহাদে মুজাহিদদের অর্থ ও জনবল দিয়ে সহযোগিতা করার ব্যাপারে তাকে উদ্‌বুদ্ধ করা। মাওলানা সিন্ধির কাবুল সফরের ঘটনা আমরা নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

এদিকে হাজি সাহেব হাবিবুল্লাহ খানের কাছে আগেই একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন। একজন আফগান সরদার হয়ে আফগান শাসকের কাছে আবেদন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাবিবুল্লাহ খানকে তিনি ব্রিটিশবিরোধী জিহাদে সর্বাত্মক অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। মূলত খানের কাবুলের শাসক হিসেবে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কেননা, এ সময় পেশোয়ার থেকে দিল্লি পর্যন্ত ইংরেজরা ইসলামি ফাতওয়া নিজ দায়িত্বে প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। তাদের কিছু দরবারি, উচ্ছিষ্টভোগী এবং অনুগত আলিম এসব ফাতওয়া তৈরি করে এবং সেগুলো প্রচারে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। সেসব ফাতওয়ায় লেখা ছিল, 'আমির ছাড়া জিহাদ ইসলামের জিহাদ নয়'; অথচ সে সময় হিন্দুস্থানের অধিকাংশ শাসককে ইংরেজরা তাদের অনুগত দাস হিসেবে ব্যবহার করছিল। এগুলো সবই ছিল তাদের পিঠ বাঁচানোর প্রচেষ্টা!

শায়খুল হিন্দ ও হাজি সাহেব উভয়ে পরামর্শ করে কাবুল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা পেতে আশাবাদী ছিলেন; কিন্তু আমির হাবিবুল্লাহ খান অত্যন্ত সুকৌশলে দু-পক্ষকেই সন্তুষ্ট রেখে নিজের অবস্থান নিরপেক্ষ রাখতে চাচ্ছিলেন। কেননা, সরাসরি ইংরেজবিরোধিতায় নামার মতো সাহস ও ইমানি শক্তি তার মধ্যে ছিল না।

মৃত্যুপথযাত্রীরা, জেগে ওঠো

এদিকে হাজি সাহেব তাঁর স্বাধীন অঞ্চলে মুজাহিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন হামলার ছক তৈরি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন হিন্দুস্থানি মুজাহিদদের আমির নিয়ামতুল্লাহ সাহেব অবস্থান করছিলেন। তিনি মেহমান্দ অঞ্চলের গোত্রীয় সদস্যদেরও এই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। একইভাবে গানদাব অঞ্চলে পৌঁছতে পৌঁছতে মুজাহিদদের সংখ্যা ১৮ হাজারে উপনীত হয়। এই মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মোল্লা বাবরা।

জিহাদের বার্তা এ সময় ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। হাজি সাহেবের পক্ষ থেকে সীমান্তপ্রদেশে একটি আহ্বানপত্র তৈরি করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়। তাতে লেখা ছিল,

> *মৃত্যুর প্রেমিকরা উঠে দাঁড়াও! প্রভাত ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহর লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি হিন্দুস্থান ও স্বাধীন আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাবান*

অসমসাহসী যুবকদের জিহাদের জন্য কবুল করেছেন। সমগ্র হিন্দুস্থান ফিরিঙ্গিমুক্ত করতে তাঁরা এই মুহূর্তে সীমান্তপ্রদেশে জিহাদরত। অসহায় মুসলিম জনতাকে জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য এ মুহূর্তে আপনাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে যারা হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, মুবারক এই জিহাদি কাফেলায় শরিক হতে চান, আমাদের সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন।

পাশাপাশি একটি সাবধানবাণীও আমরা উচ্চারণ করছি, সীমান্তপ্রদেশের কেউ যদি হিন্দুস্থান স্বাধীনতার এই জিহাদি অভিযানের বিরোধিতা করে, তাহলে মনে রাখবেন মুজাহিদরা তাকে বা তাদের কখনোই ক্ষমা করবে না।

শবে কদরের যুদ্ধ

গানদাবের গিরিখাত দখলের পর মুজাহিদরা ইংরেজদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেন। ইংরেজরা শবে কদর দুর্গ ও গানদাবের গিরিপথের মধ্যে অবস্থিত সংকীর্ণ অঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এ সময় তারা নিজেদের রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। মুজাহিদরা এগিয়ে এলে তারা কামানের গোলা নিক্ষেপ করে মুজাহিদদের ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। এভাবে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া অব্যাহত থাকে। একইসঙ্গে ব্রিটিশবাহিনীর ১১টি যুদ্ধবিমান মুজাহিদদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল।

এই যুদ্ধ তিন দিন তিন রাত ধরে চলমান থাকে। ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় মুজাহিদরা শুধু নামাজ পড়ার সময় পেতেন। টানা তিন দিন ঠিকভাবে খাওয়াদাওয়া করার সুযোগও তাঁদের হয়নি। তিন দিন পর ইংরেজরা পিছু হটে শবে কদর দুর্গভ্যন্তরে নিজেদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের আশেপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুজাহিদরা দখল করে ফেলেন। এই মুহূর্তে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। বহু দিন যাবৎ পেশোয়ার থেকে দিল্লি, পাঞ্জাব থেকে বাংলা সমগ্র হিন্দুস্থানে ইমান-বিক্রেতা তথাকথিত কিছু দরবারি আলিম ইংরেজদের নির্দেশে জিহাদবিরোধী ফাতওয়া প্রচার করে যাচ্ছিল। তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মুজাহিদ ও সমর্থকদের একটি বড় সংখ্যা জিহাদ ত্যাগের কথা ভাবতে বসে। এর পেছনে বড় একটি কারণ ছিল, ইংরেজরা উপমহাদেশে এই আলিমদের বড় বড় পদ-পদবি আর বিশেষজ্ঞ আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ করে তুলছিল, যার কারণে সাধারণ শিক্ষিত যুবকরা ব্রিটিশদের এই ষড়যন্ত্রে ঘায়েল হতে থাকে। একপর্যায়ে শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদ জায়িজ নয়— এই ফাতওয়ায় বিভ্রান্ত কিছু যুবক জিহাদের ময়দান ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সীমান্তপ্রদেশে জিহাদরত মুজাহিদদের মধ্যেও এ ধরনের মাসআলা নিয়ে শুরু হয়ে যায় তুমুল বিতর্ক।

জটিল এই মুহূর্তে শায়খুল হিন্দ ও হাজি সাহেব অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাবুল শাসককে আনুষ্ঠানিকভাবে জিহাদে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শায়খুল হিন্দ তখন একটি বড় পরিকল্পনা হাতে নেন। সমগ্র বিশ্বে জিহাদি আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হলে এই মুহূর্তে তাঁকে খলিফাতুল মুসলিমিনের দরবারে পৌঁছতে হবে। খলিফার পক্ষ থেকে একবার ফাতওয়া বেরিয়ে এলে ঔপনিবেশবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে পড়বে। তাদেরকে দখলকৃত সব অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। মূলত আগে থেকেই শায়খুল হিন্দ কাবুলের শাসক ও তুরস্কের খলিফাকে জিহাদে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেখেছিলেন। শুধু কাঙ্ক্ষিত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। শায়খুল হিন্দের পরিকল্পনা ছিল, তিনি নিজে সফর করে ইসতাম্বুল পৌঁছাবেন এবং খলিফার স্বাক্ষরিত ফাতওয়া সমগ্র বিশ্বে কপি করে ছড়িয়ে দেবেন। এতে করে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠবে।

যাইহোক, বর্তমান পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা একটি চিঠিতে লিখে হাজি সাহেব শায়খুল হিন্দের কাছে পাঠান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই শায়খুল হিন্দ এ সময় হিজাজ এবং সেখান থেকে ইসতাম্বুল সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সফরের আগে তিনি কৌশলগত কারণে এ কথা ছড়িয়ে দেন যে, এ বছর তিনি হজের নিয়ত করেছেন।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ রাহ. আলিমদের একটি বড় কাফেলার সঙ্গে হিজাজের পথে রওনা হন। মাওলানা মুহাম্মাদ রাসুল ভাগলপুরি, মাওলানা উজায়ের গুল, মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া ও মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ প্রমুখের মতো আলিম তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকার তাঁর গতিবিধির ওপর কঠোর দৃষ্টি রাখছিল। ছায়ার মতো গোয়েন্দারা তাঁর পেছনে লেগে থাকত। তবে শায়খুল হিন্দ রাহ. বহাল তবিয়তে মক্কায় পৌঁছে যান। এ সময় তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে উচ্চপদস্থ তুর্কি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন।

তুর্কি অফিসারদের সমর্থন

শায়খুল হিন্দ রাহ. হিজাজের গভর্নর গালিব পাশার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ পান। গালিব পাশা ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে মুক্ত করতে গৃহীত জিহাদি আন্দোলনের এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি শায়খুল হিন্দের মতো মহান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। এ সময় তিনি উসমানি খিলাফতের পক্ষ থেকে আন্দোলনের পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক সমর্থননামাও লিখে দেন। তাতে লেখা ছিল,

দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মাহমুদ হাসান। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। হিন্দুস্থানে তিনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ইসলামি ব্যক্তি। বিশ্বময় ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুসলিমদের মুক্ত করতে, বিশেষ করে হিন্দুস্থানের মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ব্রিটিশমুক্ত করতে তিনি জিহাদি আন্দোলন শুরু করেছেন। আমরা তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি।

আপনাদের প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই, তাঁকে আপনারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। জানমাল, অস্ত্রশস্ত্র এবং যে ধরনের সহযোগিতা তাঁদের প্রয়োজন, সব ধরনের সহযোগিতা আপনারা করবেন বলে আশা করি। সর্বোপরি আমরা উসমানি খিলাফতের পক্ষ থেকে এ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

এরপর শায়খুল হিন্দ রাহ. এই চিঠি মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াসহ কয়েকজন আলিমের মাধ্যমে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেন। তিনি এ সময় নিজে মদিনার দিকে এগিয়ে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় উসমানি খিলাফতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনোয়ার পাশার সঙ্গে। আনোয়ার পাশা বিখ্যাত সামরিক ব্যক্তি ছিলেন। শায়খুল হিন্দের পরিকল্পনা শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। হিন্দুস্থানের মতো অনুন্নত অঞ্চলের একজন মাদরাসাশিক্ষক কীভাবে বিশ্বময় জিহাদের ব্যাপারে এত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এটা ভেবেই তিনি বিস্মিত হচ্ছিলেন। সবকিছু শোনার পর তিনি এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

এ সময় তিনি একটি লিখিত চিঠি ও সমর্থননামা লিখে দেন। সমগ্র বিশ্বের সকল মুজাহিদ এবং উসমানি খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলের যুবকদের জন্য এই খোলা চিঠিতে হিন্দুস্থানের জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাতে আনোয়ার পাশা শায়খুল হিন্দকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, হিন্দুস্থানের জনগণ মুজাহিদদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের উসমানি খিলাফতের মহান সেনাবাহিনী হিন্দুস্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে তুর্কি সেনাবাহিনী নৌপথে হিন্দুস্থান আক্রমণের মতো অবস্থায় ছিল না। কেননা, ব্রিটিশ নৌবাহিনী এ সময় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু স্থলপথে তুর্কি সেনাবাহিনী হিন্দুস্থানে প্রবেশ করতে পারত; আর এই প্রবেশপথের জন্য আফগানিস্তানই সবচেয়ে মোক্ষম দরজা। এ জন্য রাজনৈতিকভাবে আফগানিস্তানকে এই মহান গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

এই লক্ষ্যে আনোয়ার পাশা কাবুলের শাসকের নামে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে কাবুলের শাসককে মুজাহিদদের যথাযথ সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। এ

ছাড়া তুর্কি সেনাবাহিনী যখন এগিয়ে আসবে, তখন যেন তাদের পথ দেখিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। শায়খুল হিন্দ রাহ. স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ এ চিঠিটি নিজের একান্ত আস্থাভাজন সঙ্গীদের মাধ্যমে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেন।

কাবুলে মাওলানা সিন্ধি

এই ঘটনাপ্রবাহের অব্যবহিত আগে শায়খুল হিন্দের বিখ্যাত শিষ্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রাহ. ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে কাবুলে পৌঁছান। আফগানিস্তানের প্রধান বিচারপতি মাওলানা আবদুর রাজ্জাক খান দারুল উলুম দেওবন্দের সূর্যসন্তান ছিলেন। এ ছাড়া মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহ. তাঁর হাদিসের উসতাজ। তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহকে এই গোপন মিশনে সর্বোচ্চ সহায়তা করেন। সরদার মাহমুদ বেগ তারজি মাওলানা সিন্ধিকে কাবুলের আস্থাভাজন ও উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেন।

কাবুলে পৌঁছার প্রায় দুই মাস পর ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মাওলানা সিন্ধিকে আমিরে কাবুল হাবিবুল্লাহ খান সাক্ষাতের সুযোগ দেন। মাওলানা সিন্ধি রাহ. শাসকের দরবারে শায়খুল হিন্দের পরিকল্পনা সবিস্তারে খুলে বলেন। আমির হাবিবুল্লাহ খান পুরো পরিকল্পনা শোনার পর মোটামুটি ইতিবাচক মন্তব্য করেন; কিন্তু তাৎক্ষণিক কোনো সহায়তার প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। এই ঘটনার কিছুদিন পর শায়খুল হিন্দ রাহ. মুসলিমবিশ্ব, হিন্দুস্থান ও আফগানিস্তানের মুসলিম শাসকদের নামে তুরস্কের খিলাফতের পক্ষ থেকে জারি করা চিঠিগুলো হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেন। আনোয়ার পাশা ও গালিব পাশার চিঠি দুটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সীমান্তপ্রদেশে হাজি সাহেবের কাছে পৌঁছানো হয়। এরপর সেগুলোর শত শত কপি তৈরি করে সমগ্র সীমান্তপ্রদেশে বিলি করা হয়। এতে করে শাসকদের পক্ষ থেকে জিহাদি আন্দোলনে সমর্থন থাকার বিষয়টি জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চিঠিগুলোর মাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে চলা বিভ্রান্তির নিরসন হয়। ইংরেজরা সমগ্র হিন্দুস্থানে কয়েক বছর যাবৎ জিহাদবিরোধী যে ফাতওয়া প্রচার-প্রসার করছিল, তার প্রভাব একদম হারিয়ে যায়।

গোপন চিঠি

আনোয়ার পাশার সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোপন চিঠি, যেখানে তিনি তুরস্কের উসমানি খিলাফতের পক্ষ থেকে কাবুল শাসকের কাছে হিন্দুস্থানের জিহাদি আন্দোলনে সমর্থন, সহযোগিতা এবং তুরস্কের সেনাবাহিনীকে হিন্দুস্থানে প্রবেশের পথপ্রদর্শনের আদেশ জারি করেছিলেন, সেটি ছিল এই ধারার সবচেয়ে গোপন ও স্পর্শকাতর চিঠি।

এ জন্য শায়খুল হিন্দ রাহ. হিজাজ থেকে অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে একটি রেশমের রুমালে চিঠিটি অঙ্কিত করে ফেলেন। এরপর নির্ভরযোগ্য একজন কাপড়ের ব্যবসায়ীর মাধ্যমে আফগানিস্তানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। সফরের প্রতিটি ফাঁড়িতে শক্তভাবে তল্লাশি চালানো হলেও অত্যন্ত সুকৌশলে অঙ্কিত এই চিঠি ইংরেজ সেনারা জব্দ করতে ব্যর্থ হয়।

ধারাবাহিক পরিকল্পনা

শায়খুল হিন্দ রাহ. ও তুর্কি অফিসারদের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া চুক্তিতে আন্দোলনের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল এভাবে :

১. ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের জন্য আফগান প্রশাসন তুর্কি সেনাবাহিনীকে হিন্দুস্থানে প্রবেশের পথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এ আন্দোলনের জন্য সমর্থন গ্রহণে পাঠানো চিঠিটি রেশমি রুমালে অঙ্কিত করে কাবুল শাসকের কাছে পৌঁছানো হবে।

২. আফগান প্রশাসনের ঐকমত্য এবং কাবুলের আমির চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে সেটি পুনরায় গোপনীয়তার সঙ্গে তুরস্কে ফেরত পাঠানো হবে।

৩. তুর্কি শাসকদের কাছে কাবুল প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত চিঠি পৌঁছলে তুর্কি সেনাবাহিনী জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যেই চিঠি আদানপ্রদানের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

৪. ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি তুর্কি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আফগান প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে—কবে, কোন পথে তুর্কি সেনাবাহিনী অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

৫. ১ ফেব্রুয়ারি কাবুল থেকে রেশমের রুমালটি দিল্লিতে মুজাহিদদের কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হবে। মুসলিমবিশ্বের শক্তিশালী শাসকদের স্বাক্ষরিত চিঠি হাজার হাজার কপি করে স্বাধীনতাকামী জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এতে করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুস্থানে জিহাদের আগুন জ্বলে উঠবে।

৬. পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তুর্কি সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করবে। ঠিক একই দিনে হিন্দুস্থানের সাধারণ জনতা সর্বজনীন জিহাদের জন্য প্রতিটি অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে নেমে আসবে।

কাবুলে মুজাহিদদের প্রতিনিধিদল

ধারাবাহিক এই পরিকল্পনার প্রথম দুটি ধাপ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শায়খুল হিন্দের পক্ষ থেকে মাওলানা হাদি হাসান জান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তুর্কি অফিসারদের এই গোপন চিঠি হিজাজ থেকে হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন। ইংরেজদের অত্যন্ত কড়াকড়ি আর ধারাবাহিক তল্লাশি সত্ত্বেও বহুকষ্টে চিঠিগুলো নিয়ে তিনি সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হন। সেখানে হাজি সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এরপর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। মুজাহিদদের এই প্রতিনিধিদল কাবুলে পৌঁছার পর তুরস্ক ও আফগানিস্তানের মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির কাছে সোপর্দ করেন। মাওলানা সিন্ধি প্রতিনিধিদল সঙ্গে নিয়ে প্রথমে নাসিরুল্লাহ খান, আমানুল্লাহ খান ও ইনায়েতুল্লাহ খানের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি তাদের আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র বোঝাতে সক্ষম হন। তারা তিন জন এই মর্মে উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে আশ্বস্ত করেন যে, তুর্কি-আফগান ঐতিহাসিক সামরিক জোট গঠনের ব্যাপারে তারা কাবুলের আমিরকে যেভাবেই হোক রাজি করাবেন।

সেই দিনগুলোতে আমির হাবিবুল্লাহ খান কিছুটা দ্বিচারিতা প্রদর্শন করছিলেন। তিনি আফগানিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশে ঘোষণা করেন,

> ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হলে নিজেদের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সুসজ্জিত ও সামরিকভাবে বিন্যস্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি। একজন সর্বজনীন নেতা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে তেমন কোনো ফলাফল অর্জন করা যাবে না। আমি আপনাদের সহযোগিতায় তাদের বিরুদ্ধে অচিরেই জিহাদ শুরু করব। তবে আমার পক্ষ থেকে ঘোষণা আসার আগে আপনারা স্বেচ্ছায় কেউ এই পথে পা বাড়াবেন না। এতে করে জিহাদের মহান ইবাদতে শৃঙ্খলা ও বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পাশাপাশি তিনি এ সময় সীমান্তপ্রদেশের মুজাহিদদের মধ্যে বহু অর্থ খরচ করেন। মুজাহিদদের কাছ থেকে কাবুলের আমিরের নামে লিখিত বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। অনেক মুজাহিদ তখন ভাবছিলেন, আমিরে কাবুল সশরীরে উপস্থিত হতে না পেরে হয়তো মুজাহিদদের সম্মানার্থে এই সহযোগিতা প্রদান করছেন। এ সময় আমির হাবিবুল্লাহ খান অত্যন্ত কৌশলী একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মুজাহিদদের সঙ্গে যোগাযোগ, তাঁদের সহায়তাপ্রদান ইত্যাদি কাজে সরদার নাসিরুল্লাহ খানকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। সরদার নাসিরের আন্তরিকতা ও ইখলাসের ব্যাপারে কারও কোনো প্রশ্ন ছিল না। ফলে তাঁর উপস্থিতি আমির হাবিবুল্লাহ খানের অন্তরের বক্রতাকে সাময়িকভাবে লুকিয়ে ফেলেছিল।

গোত্রীয় সরদার ও যুদ্ধবাজ যুবকরা দলে দলে আমির হাবিবুল্লাহ খানের নামে বায়আত প্রদান করে যাচ্ছিল। ঘুণাক্ষরেও কেউ এ কথা ভাবেনি যে, আমির হাবিবুল্লাহ খান এই আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আফগানিস্তান, সীমান্তপ্রদেশ এবং স্বাধীন গোত্রীয় সমাজে মুজাহিদদের হিন্দুস্থানের মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন থেকে পরোক্ষভাবে বিমুখ করে চলেছেন। তাঁরা তো শুধু এ কথা ভাবছিলেন, জিহাদের জন্য আমিরে কাবুলের অনুমতি যেন সবাই গ্রহণ করে। অর্থাৎ, মুসলমানদের সততা এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির হাবিবুল্লাহ খান তাঁদেরকে আনুগত্যের শক্তিশালী বন্ধনে বেঁধে নিরস্ত্র করে ফেলছিলেন।

যেহেতু আমির হাবিবুল্লাহ খান নিজে কখনো জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; বরং ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাকেই তিনি মসনদ সুসংহত রাখার একমাত্র মাধ্যম মনে করতেন, তাই জিহাদের প্রতি এক অর্থে তিনি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। অন্যকথায়, তিনি নিজে তো জিহাদ থেকে দূরে ছিলেনই, পাশাপাশি জিহাদরত মুজাহিদদের জিহাদবিমুখ করার গোপন পরিকল্পনায় তাঁদের থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছিলেন; অথচ জনগণের কাছে তার আচরণ থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হচ্ছিল, আমির হাবিবুল্লাহ খান জিহাদের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী একজন শাসক। শুধু মোক্ষম সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় তিনি কালক্ষেপণ করছেন। সময়-সুযোগ পেলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন।

হাজি সাহেবের হুমকি

হাজি সাহেব আমির হাবিবুল্লাহ খানের নিয়তে ঘাপলা থাকার বিষয়টি আগেই ধারণা করে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ধারণা বাস্তবে রূপ নেয়। এ জন্য তিনি প্রথমে আফগান প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জিহাদের ব্যাপারে সমর্থন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একইসঙ্গে আমিরে কাবুলের নামে একটি সতর্কতামূলক চিঠি পাঠান, যেখানে লেখা ছিল,

> *যদি আফগান প্রশাসন তুর্কি-আফগান চুক্তিপত্রে সমর্থন না দেয়, তাহলে মুজাহিদরা আফগান প্রশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।*

এই হুমকি প্রাথমিকভাবে কাজে আসে। আমিরে কাবুল বাধ্য হয়ে জিরগা আহ্বান করেন। সেখানে গোত্রীয় সরদার, উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার এবং প্রশাসনের শীর্ষ গভর্নররা একত্রিত হয়েছিলেন। শায়খুল হিন্দের প্রতিনিধিদলও এই মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। শায়খুল হিন্দের পক্ষে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি এবং হাজি

সাহেবের পক্ষে মাওলানা বশির আহমাদ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজন প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে জিরগায় উপস্থিত হন। জিরগার প্রথম প্রহরে নায়িবে সালতানাত সরদার নাসরুল্লাহ খান ও আমানুল্লাহ খান অত্যন্ত প্রভাববিস্তারক বক্তব্য রাখেন। তাঁরা শেষপর্যায়ে বুঝতে পেরেছিলেন, জিহাদের ঘোষণা দিতে দেরি হওয়ার মূল কারণ আমিরে কাবুলের বিশুদ্ধ নিয়তের অভাব। এ জন্য তাঁরা আমিরকে সঠিক রাস্তা দেখাতে কিছুটা বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করেন। এতদিন ধরে মুজাহিদ ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে জিহাদের ওপর গৃহীত বায়আতের পূর্ণতা যেন কাবুলের আমির করতে পারেন, এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অতিরিক্ত দেরি পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করবে। এ জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকার মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

জিরগার এই আলোচনাসভা চার ঘণ্টা ধরে অব্যাহত থাকে। উপস্থিত সবাই সরকারিভাবে জিহাদ ঘোষণার পক্ষে মত দিচ্ছিলেন। শুধু ইনায়েতুল্লাহ খান আমিরের স্বাধীন মতামতের অপেক্ষায় নীরবতা অবলম্বন করেন। জিহাদের পক্ষে সেদিন সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন আমানুল্লাহ খান ও নাসরুল্লাহ খান। তাঁরা দুজনেই দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'ইতিহাসের এই নাজুক মুহূর্তে আফগানিস্তানের উচিত সরকারিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা।' তাঁদের ইমানদীপ্ত কণ্ঠে উজ্জীবিত হয়ে উপস্থিত সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর সবাই আমির হাবিবুল্লাহ খানের দিকে চাতকপাখির মতো তাকিয়ে থাকেন। আমির সবার চাওয়া দেখে ভড়কে যান। কেননা, ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি শত্রুতা প্রদর্শনের মতো সাহস তার ছিল না। অপরদিকে সমগ্র জাতি এবং ইসলামের বিরোধিতা করার মতো পরিস্থিতিও তখন তার পক্ষে ছিল না।

আমির হাবিবুল্লাহ খানের সিদ্ধান্ত

কাবুলের আমির উপস্থিত সবাইকে বোঝাতে শুরু করেন, সামরিক দিক থেকে আফগানিস্তান অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম একটি রাষ্ট্র। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পরাশক্তি গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কিন্তু উপস্থিত সবার চাহনি ও অবস্থান দেখে মনে হচ্ছিল, জিহাদের ঘোষণা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। অবশেষে তিনি এমন একটি উপায় অবলম্বন করেন, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসন এবং ভৌগোলিকভাবে আফগানিস্তান সর্বনিম্ন ক্ষয়ক্ষতি এবং চ্যালেঞ্জের শিকার হবে। তিনি জিরগার মধ্যে আইনত বহাল থাকা নিজের বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন,

তুর্কি-আফগান চুক্তিপত্র এই শর্তের অধীনে গ্রহণ করা হচ্ছে যে, আফগান প্রশাসন ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযানে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখবে। যদি আফগান জনগণের মধ্যে কেউ মুজাহিদদের সঙ্গ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে এটি তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তুর্কি সেনাবাহিনী আফগানিস্তান হয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশের অনুমতি পাবে। তবে এখানে একটি কৌশল সবাইকে মাথায় রাখতে হবে। সেটি হলো, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে আফগান প্রশাসনকে এই প্রশ্ন করা হয়, আপনাদের ভূমি ব্যবহার করে তুর্কিবাহিনী কীভাবে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করল? তখন আনুষ্ঠানিক জবাব হবে, যেসব অঞ্চল ব্যবহার করে তারা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছে, সেসব অঞ্চলের জনগণ মূলত বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তারা আফগান প্রশাসনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। অর্থাৎ, নানা দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে আফগান সরকার এই মুহূর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তবে গোপনে মুজাহিদদের সহায়তা এবং তুর্কিবাহিনীকে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব আফগান সরকার অনানুষ্ঠানিকভাবে পালন করে যাবে।

আমির হাবিবুল্লাহ খানের এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাদের কাছে চূড়ান্ত আনন্দের কিছু ছিল না। তবে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ও হাজি সাহেবের প্রতিনিধিদল, সরদার নাসরুল্লাহ খান প্রমুখের আনন্দ ছিল দেখার মতো। এ বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছিল যে, আনুষ্ঠানিক জিহাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন নায়িবে সালতানাত নাসরুল্লাহ খান। চুক্তিপত্রটি অত্যন্ত সুকৌশলে লেখার পর আমিরে কাবুলের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এরপর সরদার নাসরুল্লাহ খান, সরদার আমানুল্লাহ খান ও ইনায়েতুল্লাহ খান এই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

রেশমি রুমালের প্রস্তুতি

বাহ্যত যদিও আফগান প্রশাসককে মুজাহিদদের সমর্থনে আন্তরিক মনে হচ্ছিল না; কিন্তু প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীলদের চাপে আমির হাবিবুল্লাহ খান তুর্কি-আফগান ঐক্যজোট গঠনে একমত প্রকাশ করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করেন। পরবর্তী ধাপ ছিল মুজাহিদদের দায়িত্বে। আন্দোলনের সবচেয়ে কঠিনতম পর্যায় ছিল এটি। যদিও মৌলিকভাবে মুজাহিদরা মূল লক্ষ্যটি পেরিয়ে এসেছিলেন, তুর্কি ও আফগান শাসকদের জিহাদের ব্যাপারে আগ্রহী এবং তাদের সমর্থন আদায় করা, যা ইতিমধ্যে সফল হয়েছে। দুটি বৃহৎ মুসলিম শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে অবশ্যই মুজাহিদরা শক্তিশালী হয়ে

উঠবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমির হাবিবুল্লাহ খান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেও সরাসরি জিহাদ ঘোষণায় সমর্থন দেননি। তবে আমানুল্লাহ খান ও নাসরুল্লাহ খান উভয়ই মাওলানা সিন্ধিকে আশ্বস্ত করছিলেন, উপযুক্ত সময়ে তাঁরা সরকারের পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা প্রদান করবেন। তবে শর্ত হলো, জার্মানি যদি তুর্কিবাহিনীর সঙ্গে এশিয়ায় আক্রমণ করে, শুধু সে ক্ষেত্রে তারা সরকারিভাবে জিহাদ ঘোষণা করবেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও ব্রিটেন দুটি ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছিল। এই দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে প্রথমে লড়াই শুরু হয়। সেখান থেকে আঞ্চলিক শক্তিগুলো পক্ষ গ্রহণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা ঘটে। এ জন্য জার্মানি চাচ্ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশগুলোকে হয় তারা স্বাধীন করবে; অথবা ব্রিটিশদের সেখান থেকে বের করে দেবে। এ ক্ষেত্রে যদি জার্মানি, তুর্কি ও আফগানশক্তি একত্রিত হয়ে হিন্দুস্থান আক্রমণ করে এবং হিন্দুস্থানের মুসলমানরাও যদি অভ্যন্তরীণভাবে বিদ্রোহ করে বসেন, তাহলে চতুর্মুখী এই শক্তির সামনে ব্রিটিশদের এক দিনও টিকে থাকা সম্ভব হবে না। এমনকি সমগ্র বিশ্ব থেকে তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে পশ্চিম-ইউরোপের গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপে ফিরে যেতে হবে।

এ সময় প্রতিটি দিন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি কাবুল ও তুর্কি শাসকদের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামাটি অত্যন্ত সযত্নে নিজের কাছে রাখেন। এখন সময় এসেছিল চুক্তিনামাটি জায়গামতো পৌঁছে দেওয়া। তিনি তখন রেশমি সুতার অভিজ্ঞ একজন কারিগর দিয়ে ৩ বাই ৩ ফিট একটি রেশমি রুমালে চুক্তিনামাটি অঙ্কন করান। রুমালের মধ্যে কারিগর কারুকাজ দিয়ে এমনভাবে চুক্তিনামাটি ডিজাইন করে যে, বাহ্যদৃষ্টিতে তা কারও চোখে পড়বে না। এই নকশার মধ্যে দিন-তারিখ এবং পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছিল। চুক্তিনামায় বিশুদ্ধ আরবি ভাষা ব্যবহার করা হয়। এর নিচে আমিরে কাবুল, নায়িবে সালতানাত আমানুল্লাহ খান ও ইনায়েতুল্লাহ খানের স্বাক্ষরও অঙ্কন করা হয়েছিল। রেশমের রুমালটি ছিল গোলাপি রঙের। এটি প্রস্তুত করার পর পুনরায় এর ওপর উচ্চপদস্থ তিনজন প্রশাসকের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। গোলাপি রং দিয়ে তারা স্বাক্ষর করেছিলেন। মোটকথা, রুমালটি অতি সাধারণ একটি রেশমি রুমালের মতো দেখাচ্ছিল; অথচ এর ভেতরে লুকানো ছিল বিশ্বমানচিত্র পরিবর্তনের এক মহাপরিকল্পনা।

তাকদিরের ফায়সালা

হিজাজে পাঠানোর জন্য রুমাল প্রস্তুত। এখন একে দ্রুতগতিতে জায়গামতো পৌঁছে দিতে হবে, যাতে করে আফগান প্রশাসনের সমর্থন এবং প্রমাণসহ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের

স্বাক্ষর তুর্কি প্রশাসনের কাছে উপস্থাপিত হয়। এই চুক্তির ওপর নির্ভর করছিল হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ। আন্দোলনের একজন গোপন কর্মী শায়খ আবদুল হকের কাছে রুমালটি তুলে দেওয়া হয়। তিনি একজন নওমুসলিম কিন্তু জিহাদি চেতনায় উদ্দীপ্ত ইমানদার ছিলেন। তাঁর থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

শায়খ আবদুল হককে বলা হয়েছিল, তিনি রুমালটি নিয়ে হায়দারাবাদে আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আবদুর রাহিমের হতে পৌঁছে দেবেন। আবদুর রাহিমের দায়িত্ব ছিল, তিনি রুমালটি সযত্নে মদিনায় শায়খুল হিন্দের হাতে পৌঁছে দেবেন। এই ছিল রুমালটির কাবুল থেকে হিজাজ সফরের পূর্ণ চিত্র। এভাবে এই চুক্তিনামা তুর্কি কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু তাকদিরের ফায়সালা ছিল ভিন্ন। এত সূক্ষ্ম ও গোপন পরিকল্পনার পরও আন্দোলন মাঝপথে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যায়। মূলত ইংরেজরা বেহিসাবে অর্থ খরচ করছিল। মুজাহিদদের গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগণিত গোয়েন্দা তারা ছড়িয়ে রেখেছিল। এমনকি তাদের সংবাদ প্রদানের ওপর রেখেছিল লোভনীয় অঙ্কের অর্থ পুরস্কার। এই লালসায় পড়ে বহু মানুষ ইংরেজদের গোয়েন্দা হতে রাজি হয়। মুজাহিদদের প্রতিটি পদক্ষেপের সংবাদ এ জন্য ইংরেজদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে যেত। যদিও এখন পর্যন্ত রেশমি রুমাল এবং তুর্কি-আফগান সামরিক জোটের ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের কোনো ধারণা ছিল না; কিন্তু তারা এটা আভাস পাচ্ছিল যে, আফগানিস্তান ও উসমানি খিলাফতকেন্দ্রিক বড় কিছু ঘটতে চলেছে। হিন্দুস্থানের আলিম ও মুজাহিদরা বড় কোনো বিষয় নিয়ে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। এরপর হঠাৎ এক দিন এমন আসে, যে দিন সম্পূর্ণ চিত্র পালটে যায়। ইংরেজরা সমগ্র পরিকল্পনা জেনে ফেলে। হিন্দুস্থানি মুজাহিদদের জিহাদি পরিকল্পনা তাদের সামনে খোলা মানচিত্রের মতো এসে পড়ে।

কিন্তু এগুলো কীভাবে ঘটেছিল? আজ পর্যন্ত এর কূলকিনারা করা যায়নি। ইতিহাসবিদরা এ বিষয় নিয়ে নানাভাবে তাদের মত ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই বলেছেন, গোপন চিঠি কোনোভাবে ইংরেজদের হাতে চলে গিয়েছিল; কিন্তু প্রশ্ন হলো, কার মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটেছিল? এ ব্যাপারে বেশ কিছু মত পাওয়া যায়। মাওলানা উবায়দুল্লাহর কাবুল অবস্থানের ওপর একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেখান থেকে জানা যায়, আবদুল হক নামে যে লোককে রুমালটি হায়দারাবাদে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনিই এটা করেছেন। তিনি এই গোপন পরিকল্পনা এবং রুমালটি হক নাওয়াজ নামের এক আফগানের হাতে তুলে দেন। সে খুব দ্রুত এটি পাঞ্জাবে ইংরেজ গভর্নর ডায়ারের[১৩] (General Reginald

[১৩] কুখ্যাত এই ব্রিটিশ সেনা অফিসার ব্রিটিশ ভারতের কসাই হিসেবে প্রসিদ্ধ। অমৃতসরের কসাই নামে ডাকা হয় তাকে। জালিয়ানওয়ালা বাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ড তার আদেশেই সংঘটিত হয়েছিল।

Dyer) কাছে পৌঁছে দেয়। এভাবে সমগ্র পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়।

কিন্তু এটি ঘটনার মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এর পেছনে বড় কোনো শক্তি অবশ্যই কাজ করছিল। মূলত তাদের ইন্ধনেই মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি গাদ্দার এবং মুনাফিক তৈরি হয়। সেই শক্তিমান লোকদের খুঁজে বের করা ইতিহাসবিদদের কাজ। আগামী দিনে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন আসুন, এরপর কী হয়েছিল, আমরা সে বিষয়ে ইতিহাস অধ্যয়ন করি।

পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন

পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ইংরেজদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। তারা অতি দ্রুত ব্রিটেনে এই পরিকল্পনার সার্বিক তথ্য পাঠায়। হিন্দুস্থান থেকে শুরু করে ব্রিটেন পর্যন্ত ইংরেজদের সকল উপনিবেশ ও সেনাছাউনি তৎপর হয়ে ওঠে। তুরস্ক ও হিজাজে ইংরেজরা দ্রুতগতিতে তাদের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তি ব্যবহার করা শুরু করে। হিন্দুস্থানে শত শত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়। আফগান সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে সেখানে অবস্থানরত মুজাহিদদের গ্রেপ্তার করানো হয়। একইসঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তারা কালবিলম্ব না করে ইরানে অবস্থিত তুরস্ক ও আফগানিস্তানকে সংযোগকারী পথগুলো বন্ধ করে দেয়। এ সময় সেখানে তারা সতর্কতা হিসেবে কয়েক প্লাটুন সেনা মোতায়েন করে।

এরপর উসমানি খিলাফতের ওপর ইংরেজরা সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। সম্মিলিত ইউরোপীয় শক্তিকে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তুর্কি সেনাবাহিনীর ওপর। তুরস্ককে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, কোনোভাবেই যেন সুবিশাল তুর্কি সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের দিকে মার্চ করার সুযোগ তৈরি করতে না পারে। শুধু তা-ই নয়; বরং মুজাহিদদের বিশ্বময় এই জিহাদি আন্দোলনকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে ইংরেজরা হিন্দুস্থানে বিদআতি ও দরবারি আলিমদের গণহারে ফাতওয়া লিখতে আদেশ করে। এই মুহূর্তে ইংরেজবিরোধী জিহাদ ইসলামে হারাম মর্মে ফাতওয়া লেখা হয়। ইংরেজ সরকার এই ফাতওয়াগুলো ব্যাপকভাবে সমগ্র হিন্দুস্থানে নিজ দায়িত্বে প্রচার করতে থাকে। তুর্কি খলিফা জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করে কাফির হয়ে গেছেন, ফাতওয়ায় এটাও উল্লেখ করা হয়। এ সময় অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বেরেলবি ও আহলে হাদিস ঘরানা থেকে ইংরেজদের সমর্থনে অধিক পরিমাণে ফাতওয়া তৈরি হয়েছিল। ইতিহাসে আজও সেসব রেকর্ড মজুদ রয়েছে।

হিন্দুস্থানে ইংরেজদের শাসনকে 'দারুল ইসলাম' বলে প্রচার করে বেরেলবি মাসলাক। আরব উপদ্বীপে লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া নামে বিখ্যাত এক ইংরেজ গুপ্তচর ও কূটনীতিবিদকে

পাঠানো হয়। বছরের পর বছর সেখানে আরবের গোত্রগুলোকে আরব জাতীয়তাবাদ নামে নতুন একটি জাহিলি মতবাদ সে শেখাতে থাকে। উসমানিদের সঙ্গে আরবদের জাতি, ভাষা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বড় করে তুলে ধরে এই গোয়েন্দা কূটনীতিক। ফলে সুবিশাল আরব উপদ্বীপ তুর্কি খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তারা নিজেরাও নানা গোত্র-উপগোত্র এবং ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একসময়ের আরব উপদ্বীপ পরে এক ডজন ক্ষুদ্র ও অক্ষম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

শায়খুল হিন্দের গ্রেপ্তারি

মক্কার প্রশাসক শরিফ[১৪] এ আন্দোলনের প্রবর্তক শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি, মাওলানা উজায়ের গুল ও অন্য সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে ফেলে। এরপর ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তাদের হাতে এই মহান ব্যক্তিদের তুলে দেওয়া হয়। ইংরেজরা সাধারণ কোনো জেলখানায় তাঁদের আবদ্ধ করে রাখতে ভয় পাচ্ছিল, তাই ভূমধ্যসাগরের জনমানবশূন্য দ্বীপ মালটায় তাঁদের নির্বাসিত করা হয়। সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর শাস্তি আর অমানবিক পরিবেশের জেল ছিল মাল্টার[১৫] কারাগার।

এদিকে হিন্দুস্থানে আন্দোলন পরিচালনাকারীদের মধ্যে মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরিকে ননিতাল জেলে বন্দি করা হয়। এভাবে বিশ্বময় পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হিন্দুস্থানি এই জিহাদি আন্দোলন শেষ মুহূর্তে এসে সম্ভবত আল্লাহর বিশেষ হিকমতের কারণে নস্যাৎ হয়ে পড়ে। তবে মহান ব্যক্তিদের আত্মত্যাগ এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জিহাদি আন্দোলনের মাধ্যমে একসুতোয় গেঁথে দেওয়ার পরিকল্পনাটি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক থেকে মালদ্বীপ সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ইমানি চেতনা ও জিহাদি জজবা জেগে ওঠে। একে অপরকে সাহায্য করা এবং ঔপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করার প্রেরণা লাভ করে সবাই। বিগত ৪০ বছর ধরে ঝিমিয়ে পড়া হিন্দুস্থানি মুসলিমসমাজকে এই আন্দোলন আবারও জাগিয়ে তুলেছিল। আফগানিস্তানের মাটিতে আরেকবার জিহাদের দামামা বেজে উঠেছিল। এই আন্দোলনের ফলেই দোদুল্যমান শাসক আমির হাবিবুল্লাহ খানের

[১৪] হুসাইন ইবনু আলি (১৮৫৩-১৯৩১)। মক্কার শাসক ছিলেন। আরব জাতীয়তাবাদের নামে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তিনি। আঞ্চলিক শাসকদের হয়ে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। ইতিহাস তাকে খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত করেছে।

[১৫] ভূমধ্যসাগরের বুকে সিসিলি ও উত্তর-আফ্রিকার উপকূলের ঠিক মধ্যখানে ক্ষুদ্র এই দ্বীপের অবস্থান। সমকালীন বিশ্বের নিকৃষ্টতম কারাগার ছিল এটি। আজকের হিসেবে বললে সেটি ছিল সময়ের গুয়ান্তানামো বে। আল্লাহর কী শান! গুয়ান্তানামো থেকে মাল্টা, মাল্টা থেকে আন্দামান; কালের বর্বরতম প্রতিটি জুলুমি প্রকোষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও মুজাহিদিনে ইজাম আবাদ করে গেছেন।

পতন ঘটে। পরবর্তীকালে আফগান সরকারি বাহিনী এবং মুজাহিদরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরেক দফা জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নির্মম পরিণতি

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ হিন্দুস্থানি আলিমদের জন্য সম্ভাবনাময় একটি বছর হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, বিশ্বময় জিহাদি আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া এবং তুরস্কে খিলাফত ও আফগানিস্তানকে হিন্দুস্থানের মাটিতে নিয়ে আসার ফলে এ বছর সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটবে। হিন্দুস্থান পুনরায় স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বছর মুসলমানদের জন্য আরও করুণ সংবাদ নিয়ে আসতে শুরু করে। রেশমি রুমাল আন্দোলন এ বছরেই সমাপ্ত হয়ে যায়। হিন্দুস্থানের প্রবীণ রাজনীতিক ও আলিম সবাই বন্দি হয়ে যান।

গ্রেট ব্রিটেন ও তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া ইউরোপীয় সামরিক জোট প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করে। এ সময় আমেরিকা একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইউরোপে এসে খবরদারি করার চেষ্টা করে। ব্রিটেন ও আমেরিকার দীর্ঘদিনের শত্রুতা এ সময় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি একত্রিত হয়ে গেলে জার্মানি ও উসমানি খিলাফত যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে।

১৫ আগস্ট ১৯১৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার পরিণতিতে এসে পৌঁছায়। এই যুদ্ধের পরিণাম মুসলিমবিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। উসমানি খিলাফতের প্রায় ৯৫ ভাগ বেদখল হয়ে যায়; অথচ এই যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত পক্ষের প্রথম অংশীদার ছিল; কিন্তু তাদের মাত্র ৫ শতাংশ বেদখল হয়। তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত উসমানি খিলাফতকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি এ অঞ্চলগুলোকে নিজেদের উপনিবেশ হিসেবে ভাগ করে নেয়। অবশেষে তুরস্ককে একটি ন্যক্কারজনক সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে ব্রিটেন ইসতাম্বুল থেকে তাদের সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়। খলিফা আবদুল ওয়াহিদ খান[১৬] তখন নামেমাত্র খলিফা হিসেবে থেকে যান।

হাবিবুল্লাহ খানের স্বস্তি প্রকাশ

এই পরিস্থিতিতে মুসলিমবিশ্বের শাসকদের অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু আফগানিস্তানের শাসক আমির হাবিবুল্লাহ খান উলটো স্বস্তি প্রকাশ করেন। তুরস্কের উসমানি খলিফার মৃত্যুসংবাদ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন তিনি!

[১৬] শেষ উসমানি খলিফার নাম ছিল ওয়াহিদুদ্দিন খান (১৮৬১-১৯২৬)। মুহাম্মাদ ষষ্ঠ হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত। তবে লেখক এখানে আব্দুল ওয়াহিদ খান লিখেছেন। হতে পারে ভুলবশত। তাকে জানানো হয়েছে।

কেননা, খলিফার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উসমানি খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমনটাই ছিল সবার ধারণা। আমির হাবিবুল্লাহ খান নিজেকে মুসলমানদের আমিরুল মুমিনিন হিসেবে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এ সময় তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ও অন্যান্য নেতাকে একটি ভবনে গৃহবন্দি করে রাখেন। নিশ্ছিদ্র পাহারা বসানো হয় ভবনের চারপাশে। মাওলানা সিন্ধিসহ অন্য নেতৃবৃন্দ বহির্বিশ্বের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ রাখতে পারছিলেন না। এরপর যখন তুরস্কের পতন হলো, তখন হাবিবুল্লাহ খানের তোষামোদকারীরা মাওলানা সিন্ধিকে খিলাফত পতনের সংবাদ শুনিয়ে দেয়। এ সময় তাদের চোখে-মুখে ছিল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। মাওলানা সিন্ধিকে তখন সরকারি এক কর্মকর্তা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে ওঠে, 'আইনা তুর্কি তামাম সুদ' অর্থাৎ, এই যে দেখো, তুরস্কের খেল খতম হয়ে গেছে!

মাওলানা সিন্ধির সঙ্গে সেখানে জাফর হাসান নামের একজন নেতাও অবস্থান করছিলেন। তাঁর ভাষ্যমতে, মাওলানা সাহেব এই সংবাদ জানার পর এত বেশি উদ্‌বিগ্ন ও পেরেশান হয়ে ওঠেন যে, সেই অবস্থা বর্ণনার ভাষা আমার নেই।

কিছু অপ্রিয় সত্য এবং প্রশ্ন

আমরা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কিছু প্রশ্ন হয়তো সবার মনে জেগে উঠেছে। প্রশ্নগুলো সম্ভবত এমন :

১. আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে কেন তিনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন?

২. রেশমি রুমাল কীভাবে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েছিল? নওমুসলিম আবদুল হক অথবা হক নাওয়াজ তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করছিল কি?

৩. রেশমি রুমাল ধরা পড়ার পর ব্রিটেন হিন্দুস্থানের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সবাইকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। উসমানি খিলাফতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল; কিন্তু কাবুলের প্রশাসক আমির হাবিবুল্লাহ খানকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেনি। এর নেপথ্য কারণ কী ছিল?

তবে আমির হাবিবুল্লাহ খানের আচার-আচরণ ও কর্মপন্থার ওপর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে। অবোধ্য অংশ আর শূন্যস্থানগুলো চেষ্টা করলে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে এ জন্য আমাদেরকে আরও কিছু বিষয় জেনে নিতে হবে।

প্রকৃত গাদ্দার কে ছিল

এটা তো নিশ্চিত যে, কাবুলের প্রশাসক স্বেচ্ছায় জিহাদি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেননি; বরং তার দরবারের উজির-নাজির, সিপাহসালার এবং হাজি সাহেবের বার বার চাপ প্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেওয়ার মতো করে বোঝা যায়, গোপনে কার পক্ষে ইংরেজদের কাছে এই পরিকল্পনার সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব ছিল? আবদুল হক অথবা হক নাওয়াজদের মতো সাধারণ কর্মীদের হুমকি-ধমকি দিয়ে নিজের আদেশ পালনে বাধ্য করা অথবা বিরাট অঙ্কের লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে দলভুক্ত করা, কোনোটিই অসম্ভব ছিল না। এ ছাড়া তাদের সাহায্য ছাড়াই ইংরেজদের কাছে এই পরিকল্পনা ফাঁস করা উচ্চপদস্থ কারও জন্য কঠিন কিছু ছিল না। তবে সে সময়ের লিখিত ইতিহাসে সুনির্দিষ্টভাবে কারও প্রতি প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়নি; কিন্তু অসংখ্য তথ্যের মধ্যে তৈরি হওয়া শূন্যস্থান পূরণ করা খুব কঠিন কিছু মনে হচ্ছে না।

এর বিপরীতে এ কথা বিশ্বাস করা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং কঠিন যে, আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সামরিক জোট তৈরিতে রাজি হয়েছিলেন। ইতিহাসে প্রমাণিত, তিনি জিরগায় ইংরেজদের বিপক্ষে সামরিক জোট তৈরিতে অস্বীকৃতি ও অমত জানিয়েছিলেন।

এ কথাও বলা হয়, আমির হাবিবুল্লাহ খান তার জীবনের শেষ বছরগুলোতে ইয়াহুদিদের কুখ্যাত সংগঠন ফ্রিম্যাসনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। যদি তথ্যটি সঠিক হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতায় গিয়ে সামরিক জোট গঠন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত, তুরস্ক পরাজিত হওয়ার পর আমির হাবিবুল্লাহ খান আনন্দিত হয়েছিলেন এবং মুসলমানদের খলিফা হতে মানসিকভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন।

এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তিনি ফ্রিম্যাসনের এজেন্ট হিসেবে কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছিলেন। রেশমি রুমাল আন্দোলনকে মূলত তিনিই নস্যাৎ করেন। সম্ভবত ইয়াহুদিরা তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল, যদি হিন্দুস্থানি মুজাহিদদের এই অপ্রতিরোধ্য বাঁধকে কোনোভাবে আমরা রুখে দিতে পারি, তাহলে তুরস্ককে এক ঝটকায় পরাজিত করা সম্ভব; আর ঠিক তার পরেই আমির হাবিবুল্লাহ খানের জন্য খলিফা হওয়ার রাস্তা সুগম হয়ে পড়বে। এখন আপনাদের কাছে এমন একটি ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরব, যা এসব শূন্যস্থানকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে মিলিয়ে দেবে।

রেশমি রুমাল আন্দোলনের পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার আগে তুরস্ক ও জার্মানির একটি

প্রতিনিধিদল আফগানিস্তানে এসেছিল। তুরস্ক ও জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একই কাতারে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। এই দুই পরাশক্তি চাচ্ছিল, আফগানিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সঙ্গে সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করুক। একই স্থানে তারা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। আমির হাবিবুল্লাহ খান তাদের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে বলেন, 'আপনাদের সম্মিলিত বাহিনী আফগান সীমান্তে এসে পৌঁছালে আমি সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানে জিহাদ ঘোষণা করব'; কিন্তু বাস্তবতা কি এমনই ছিল? আমির হাবিবুল্লাহ খান বিদেশি প্রতিনিধিদলকে মূলত মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন। এর প্রমাণ হলো, পরবর্তী সময়ে তারা যেন আবারও তার সঙ্গে দেখা করতে না পারে, সে জন্য তাদের পাসপোর্ট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই হাবিবুল্লাহ খান গোপনে ইংরেজদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তিনি তুরস্ক ও জার্মানির সঙ্গে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যে চুক্তি করেছেন, তা ইংরেজদের জানিয়ে দেন। ইংরেজরা তাদের প্রধান প্রতিপক্ষের গোপন পরিকল্পনা জেনে যাওয়ায় তুরস্ক ও জার্মানির জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে ওঠে। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটেন পারস্য উপসাগর হয়ে ইরাকে হামলা করে। ইরাকের আরব ও অনারব অংশের মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। এভাবে আমির হাবিবুল্লাহ খানের গাদ্দারির কারণে মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে হিন্দুস্থানের সংযোগ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নস্যাৎ হয়ে যায় বিশ্বজুড়ে জিহাদি ও সামরিক তৎপরতা।[১৭]

এই তিক্ত সত্য সামনে রাখলে সব শূন্যস্থান পূরণ করা অত্যন্ত সহজ। আমির হাবিবুল্লাহ খান অত্যন্ত কৌশলে দু-পক্ষের হয়ে কাজ করেন।[১৮] এভাবে ইংরেজদের কাছে রেশমি রুমাল আন্দোলনের পরিকল্পনা পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি কী অর্জন করেছিলেন, তা আমরা জানি না। তবে ইতিহাসে তিনি প্রশংসনীয় কোনো স্থান পাননি, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দুইয়ে দুইয়ে চার এখানেই মিলে যায়

রেশমি রুমাল আন্দোলনের পরিকল্পনা ফাঁস করার পেছনে আমির হাবিবুল্লাহ খানের হাত ছিল—এ কথা যদি নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে পাশাপাশি আরেকটি বড় প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসবে। সেটি হলো, আমির হাবিবুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কোনো পদক্ষেপ তো দূরের কথা, জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি কেন; অথচ এই আন্দোলনের সঙ্গে দূরতম সম্পর্ক রেখেও কেউ সে সময় রেহাই পায়নি। যেই আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে একসময়

[১৭] *সার গুজাশতে কাবুল*, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি : ১৭২।

[১৮] সরকারপ্রধান হিসেবে ডাবল এজেন্ট হওয়ার এমন রেকর্ড সম্ভবত একদম বিরল।

উথলা হয়ে থাকত, সেই তাকেই কেন শেষ বয়সে এসে তার ভাই ও পুত্ররা ইংরেজদের এজেন্ট এবং একজন গাদ্দার মুনাফিক হিসেবে গণ্য করতেন? কেন তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে পরিবারের লোকেরাই এগিয়ে এসেছিলেন? এ বিষয়গুলো সামনে রাখলে পূর্ববর্তী সকল প্রশ্নের জবাব আশা করি পাঠক নিজেরাই বের করে নিতে পারবেন।

মুনাফিকির শেষ পর্যায়ে খিলাফত ঘোষণা

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ আর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে আমির হাবিবুল্লাহ খান বিলাসিতা এবং দুনিয়াপ্রেমে মগ্ন হয়ে পড়েন। বলা যায় বিলাসিতার শেষ সীমা এ সময় তিনি অতিক্রম করছিলেন। ইসলামি জীবনাচরণ এবং হুকুম-আহকামের কোনো তোয়াক্কা তিনি করতেন না। তিনি রাজমহলে অগণিত অবৈধ নারীকে স্থান দিয়েছিলেন। এই নারীদের সঙ্গেই তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত। দরবারের উজির-নাজির ও মন্ত্রীরা এসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় সামান্য সময় অতিবাহিত না করেও আফগানিস্তান স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ভেবে তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভাবতেন, সূর্য অস্ত না যাওয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে যখন আফগানিস্তানকে যুক্ত করতে পেরেছেন, তখন এই ক্ষমতা আর কখনো অস্তমিত হবে না।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি। আমির হাবিবুল্লাহ খান জুমুআর নামাজে নিজেকে খলিফা হিসেবে দাবি করে বসেন। নিজের জন্য 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তুরস্কের খলিফাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাঁকে কাফির ঘোষণা করেন! তুর্কি খলিফার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে দাবি করে নিজেকে মুসলমানদের সার্বিক উপদেষ্টা ও অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

হাবিবুল্লাহ খান এ সপ্তাহে ইংরেজদের কাছ থেকে তার কৃতকর্মের পুরস্কার গ্রহণের জন্য একটি প্রতিনিধিদল পেশোয়ারে পাঠান। তিনি ভেবেছিলেন, ইংরেজরা বিরাট অঙ্কের অর্থ ও অমূল্য সম্পদ পুরস্কারস্বরূপ তার জন্য পাঠাবে, যাতে শেষ জীবন তিনি আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে কাটিয়ে যেতে পারেন; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সময় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তার সবচেয়ে নিকটতম দেহরক্ষী তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

আততায়ীর হামলা এবং আমিরের শেষ সময়

এ সময়ে আত্মমর্যাদাশীল কিছু ব্যক্তি আমির হাবিবুল্লাহ খানের বিরোধিতা শুরু করেন। তাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল, তার চারিত্রিক অধঃপতন। আমিরের গোপন

বাসনা চরিতার্থ করতে দরবারের কিছু কর্মকর্তা ও অফিসার সম্ভ্রান্ত নারীদেরও রেহাই দিত না; তাদের ধরে নিয়ে আসত। অবশেষে একসময় এই সংবাদ মহলের রানি—যাকে উলিয়া হজরত বলা হতো—তাঁর কানে পৌঁছে যায়। তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল একজন নারী ছিলেন। তাঁর পক্ষে এমন সংবাদ শুনে ধৈর্য ধরা সম্ভব ছিল না।

আমানুল্লাহ খান এই নারীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমানুল্লাহ নিজেও পিতার এমন গর্হিত ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের কারণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। পাশাপাশি ইংরেজদের সঙ্গে দহরম-মহরম আর রেশমি রুমাল আন্দোলনের ব্যর্থতা সবকিছু মিলিয়ে পিতার প্রতি ভীত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রধান সেনাপতি নাদির খান ও মাহমুদ খান তারজি উভয়ই আমানুল্লাহ খানের অত্যন্ত নিকটজন ও সমচিন্তার সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা সবাই একত্রিত হয়ে একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাবুলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় আমির হাবিবুল্লাহ খানের ওপর গুলি চালানো হয়; কিন্তু এ দফা তিনি বেঁচে যান। পরে সরকারিভাবে এই হামলার তদন্ত করা হয়—কারা হামলা করেছিল, কাদের উসকানি ও সাহায্যে হামলা হয়েছিল, এসব নিয়ে ব্যাপক তল্লাশি ও ধরপাকড় শুরু হয়।

এ সময় অর্থমন্ত্রী আমির হাবিবুল্লাহ খানকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে জানায়, এসব ঘটনার পেছনে আমানুল্লাহ খানের হাত রয়েছে; কিন্তু হাবিবুল্লাহ খান বিষয়টি আমলে না নিয়ে সেখানেই ভুলে যান।

এদিকে আমানুল্লাহ খান তাঁর মা মালিকা উলইয়া খানমকে বলেন, 'আপনি যেভাবেই হোক বাবাকে ঘৃণ্য এই পাপাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন। নাহয় পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।' পুত্রের পরামর্শ অনুযায়ী হাবিবুল্লাহ খানকে একদিন নিভৃতে তার স্ত্রী উলইয়া খানম বিষয়গুলো বোঝাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই হাবিবুল্লাহ খানের মস্তিষ্ক তৎপর হয়ে ওঠে। পুত্রের উসকানিতে মা তাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছে, এ কথা তার মনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এরপর তার আরও স্মরণ হয়, অর্থমন্ত্রী তাকে আগের হামলার ব্যাপারে আমানুল্লাহ খানের হাত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। ধীরে ধীরে হাবিবুল্লাহ খানের কাছে সন্দেহগুলো সত্যে পরিণত হতে থাকে।

হাবিবুল্লাহ খানের হত্যাকাণ্ড

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি। হাবিবুল্লাহ খান শিকারের উদ্দেশ্যে জালালাবাদের পাশে একটি উপত্যকায় পৌঁছেছেন। শিকার করতে করতে তার মাথায় একটি সিদ্ধান্ত উঁকি দেয়। এবার কাবুলে ফিরে পূর্ববর্তী হত্যাচেষ্টায় সম্পৃক্ত সবাইকে আচমকা গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেবেন, যাতে করে পরে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস কেউ দেখাতে না

পারে। কিন্তু বিপ্লবীরা ইতিমধ্যেই তার পরিকল্পনা জেনে ফেলেন। শিকারের সময় প্রধান সেনাপতি নাদির খানের অধীনে থাকা একটি দেহরক্ষী দল অবস্থান করছিল। নাদির খান নিজেই ছিলেন বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা।

২০ ফেব্রুয়ারি রাতে আমির হাবিবুল্লাহ খান তার তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাত ১২টার দিকে হঠাৎ করে কে যেন তাঁবুতে প্রবেশ করে। এরপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বুকে কয়েকটি বুলেট বিদ্ধ হয়। সময়ের শাসক পরক্ষণেই পরপারের যাত্রী হয়ে যান। আততায়ী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়ামাত্র চারদিক থেকে সেনারা আমিরের তাঁবুতে এসে জড়ো হয়। একজন দেহরক্ষী ভেতর থেকে বাইরে এসে ঘোষণা করে, 'আমির সাহেব শহিদ হয়ে গেছেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমির হাবিবুল্লাহ খানের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দেহরক্ষী দলের প্রধান অলি খান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সেখানে পৌঁছে সে প্রথমেই দারোয়ানকে হত্যা করে ফেলে। এরপর দ্রুতগতিতে জালালাবাদ পৌঁছে সেখান থেকে কাবুলে ফোন করে আমানুল্লাহ খানকে পুরো ঘটনা খুলে জানায়। জবাবে আমানুল্লাহ খান বলেন, 'ফাহমিদ' অর্থাৎ, বুঝে গিয়েছি। এরপর ফোন রেখে দেন।

হাবিবুল্লাহ খানের হত্যাকাণ্ডের রহস্যের জট আর কখনো খোলা সম্ভব হয়নি। এই প্রশ্ন রয়ে যায়, তাকে হত্যার পেছনে মূলত কার হাত ছিল? এত কঠিন প্রহরার মধ্যেও কীভাবে একজন আততায়ী এসে রাতের আঁধারে আমিরকে হত্যা করে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পেরেছিল! স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছিল, আমিরের নিকটতম ব্যক্তিদের যোগসাজশ ও সহায়তা না থাকলে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

হাবিবুল্লাহ খানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কিছু কথা

জাফর হুসাইন আইবেক—যিনি হাবিবুল্লাহ খানের মৃত্যুর সময় কাবুলে উপস্থিত ছিলেন—এই ঘটনার বর্ণনা এবং সার্বিক পরিস্থিতি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

> আমির হাবিবুল্লাহ খান মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে জুমুআর খুতবায় নিজেকে 'আমিরুল মুমিমিন' ও 'খলিফাতুল মুসলিমিন' দাবি করেছিলেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রাহ. এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বোঝা যাচ্ছিল, আমির হাবিবুল্লাহ খান বহু দিন ধরে তুরস্কের উসমানি খলিফাদের পতনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে 'আমিরুল মুমিনিন' দাবি করে বসেন। নিশ্চিত ছিল, এই মুহূর্তে আফগানিস্তান থেকে আমিরুল মুমিনিন ঘোষণা আসায় মুসলিমবিশ্বে

বিভক্তি ছড়িয়ে পড়বে। এই ঘটনার পরবর্তী সপ্তাহে তিনি বিরাট একটি খচ্চরের দল নিয়ে পেশোয়ার যান। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাদের পক্ষে কাজ করতে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ও উপহার গ্রহণ করবেন। যেহেতু উসমানি খিলাফত, জার্মানি ও হিন্দুস্থানের মুজাহিদদের সম্মিলিত জিহাদি আন্দোলনকে তিনি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং ব্রিটিশদের হিন্দুস্থানে আরও পাকাপোক্তভাবে টিকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ জন্য আমির নিজেকে পুরস্কারের দাবিদার ভাবছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য নির্ধারিত সময় এসে পড়েছিল। খলিফাতুল মুসলিমিন হওয়ার স্বপ্ন চিরতরে হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে। ইংরেজদের পক্ষ থেকেও আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করতে পারেননি। অবশেষে ইতিহাসের একটি ঘৃণ্য চরিত্র হিসেবে সারা জীবন স্মরিত হওয়ার মতো একটি অধ্যায় রচনা করে পরপারে যাত্রা করেন ঘৃণিত এই শাসক।[১৯]

তথ্যসূত্র

১. *তারিখে তাজজিয়া শাহানশাহি আফগানিস্তান,* আল্লামা আবদুল হাই হাবিবি।

২. *আফগানিস্তান দার মাসিরে তারিখ,* মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।

৩. *মাওলানা উবায়দুল্লাহ* সিন্ধি কি সার গুজাশতে কাবুল, ড. গোলাম মুসতাফা খান।

৪. *আসিরানে* মাল্টা, মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া।

৫. *হাজি সাহেব তুরাঙজাই,* আজিজ জাবেদ।

৬. *আপবিতি,* জাফর হাসান আইবেক।

[১৯] *আপবিতি* : ১/১৩৮।

২১ তম অধ্যায়

বারেকজাই পরিবারের শেষ শাসক

আমানুল্লাহ খান

আমির হাবিবুল্লাহ খানের হত্যার পর সে রাতেই শিকারের জায়গায় নতুন বাদশাহ নিয়োগের ব্যাপারে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। হাবিবুল্লাহ খান জীবিত থাকাবস্থায়ই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী সহজ-সরল ছেলে ইনায়েতুল্লাহ খানকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। এ জন্য অধিকাংশ আমির বাদশাহ হিসেবে তাঁর চাচা নায়িবে সুলতান নাসরুল্লাহ খানের নাম প্রস্তাব করেন। ইনায়েতুল্লাহও পরিস্থিতি বুঝে চাচার পক্ষে নিজের বাদশাহির দাবি প্রত্যাহার করে নেন।

ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল জালালাবাদের শিকারস্থলে। কারণ, আফগানিস্তানের আমিরগণ শীতকালে সাধারণত জালালাবাদেই বসবাস করতেন। তবে আমির হাবিবুল্লাহ খানের ছোট ছেলে, কাবুলের গভর্নর আমানুল্লাহ খান এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে নিজেই বাদশাহির ঘোষণা দিয়ে দেন। এভাবে চাচা-ভাতিজার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। তবে কাবুলের সকল নেতাসহ দেশের অধিকাংশ গভর্নর আমির আমানুল্লাহর পক্ষে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমানুল্লাহ বিজ্ঞোচিত একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিস্থিতির মোড় নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন। তিনি উল্লেখযোগ্য হারে সেনাবাহিনীর বেতন বাড়িয়ে নেন। জালালাবাদের সেনারা এমন সংবাদ পেলে তারাও নাসরুল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে আমানুল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। এভাবে আমানুল্লাহ কোনো রক্তপাত ছাড়াই পুরো আফগানিস্তানের শাসক হিসেবে বরিত হন।

তবে আফগানিস্তানে তখন যেহেতু টেলিফোনের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যবর্তী যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। তিনি কাবুল থেকে জালালাবাদের প্রতিমুহূর্তের সংবাদ জানতে পারছিলেন। হাবিবুল্লাহ খানের নিহত হওয়ার পরদিন এসব ঘটছিল। অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ আমানুল্লাহ আফগানিস্তানের শাসক হিসেবে শাহি মসনদে আসীন হন।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা

আমানুল্লাহ খান ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই জাতির আবেগ-অনুভূতির মর্যাদা দিতে এবং নিজের আত্মমর্যাদার প্রকাশ ঘটাতে বহিঃশক্তির অধীনতা থেকে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

অভিষেকের বিভিন্ন রীতি সম্পন্ন হওয়ার পর কাবুলে থাকা ব্রিটিশ কূটনীতিককে ডেকে বলেন,

> আজ থেকে আফগানিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে কারও নাক গলানো সহ্য করা হবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা তোমাদের সরকারকে জানিয়ে দিতে পারো।

এরপর আমির আমানুল্লাহ জাতিকে আশ্বস্ত করতে এই ফরমান জারি করেন,

> আমার আত্মমর্যাদাবান জাতি, আমার বাহাদুর সঙ্গীগণ, আমি আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা করছি। আজ থেকে আমাদের দেশ অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সবধরনের সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন। আজ থেকে আফগানিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের সেসব অধিকার থাকবে, যা পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের রয়েছে।

আমির আমানুল্লাহ কর্তৃক আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল বিংশ শতাব্দীর আফগান ইতিহাসের একটি নতুন মোড়।

তিন প্রজন্ম ধরে কোনো-না-কোনোভাবে ইংরেজদের অধীনে থাকা আফগান জনগণের জন্য এ ছিল এক মহা আনন্দের মুহূর্ত। শাহ সুজা থেকে আমির হাবিবুল্লাহ খান পর্যন্ত যেসব আত্মবিক্রিত শাসকের দুর্বল নীতি আফগানিস্তানকে কালো জিঞ্জিরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, আমির আমানুল্লাহর এই ঘোষণার মাধ্যমে তা এক ঝটকায় ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির মুক্তি

ইংরেজদের মনস্তুষ্টির লক্ষ্যে সাবেক শাসক হাবিবুল্লাহ খান মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিসহ তাঁর কতিপয় সাথিকে কারাবন্দি করে রেখেছিলেন। আমানুল্লাহ খান ক্ষমতাসীন হতেই তাঁরা মুক্তি পেয়ে যান। আমানুল্লাহ স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর এই ঘোষণাও দেন, সকল বিদেশি নাগরিককে তাদের দেশে চলে যেতে হবে, নতুবা তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। ঘোষণাটি শুনে মাওলানা সিন্ধি—যিনি কাবুল থেকে

জালালাবাদ এসেছিলেন—হিন্দুস্থানের আজাদ গোত্রের দিকে রওনার প্রস্তুতি শুরু করে দেন। আমানুল্লাহ সংবাদটি জানতে পেরে দ্রুত কিছু লোক পাঠিয়ে তাদের বলে দেন, 'যেভাবেই হোক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে কাবুলে নিয়ে আসবে।' কারণ, আমানুল্লাহ খান মূলত মাওলানা সিন্ধির দীনি ও রাজনৈতিক খিদমতের আবেগ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তা স্বীকারও করতেন।

মাওলানা উবায়দুল্লাহ প্রথমবার যখন কাবুলে পৌঁছান, তখন সরদার মাহমুদ খান তারজির বাসায় এক ভোজসভায় আমানুল্লাহ খানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে তাঁদের মিশন নিয়ে কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। মাওলানা সিন্ধি জানতেন যুবরাজ হচ্ছেন ইনায়েতুল্লাহ খান; কিন্তু আমানুল্লাহ খানের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার পর তাঁর অভিজ্ঞতা বলছিল, এই শাহজাদাই হতে যাচ্ছেন আফগানিস্তানের পরবর্তী বাদশাহ। সুতরাং তিনি ওই মজলিসসহ পরবর্তী সব সাক্ষাতে আমানুল্লাহকে এমন শব্দে সম্বোধন করতেন, যাতে মনে হতো তিনি আমানুল্লাহ খানকেই আফগানিস্তানের যুবরাজ হিসেবে গণ্য করছেন। সিন্ধির এই আচরণে আমানুল্লাহর আন্তরিকভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই মাওলানা সিন্ধি তাঁর অন্তরে জায়গা করে নেন। মাওলানা সিন্ধি রাহ. প্রথম সাক্ষাতে আমানুল্লাহকে লক্ষ করে বলেছিলেন,

من بجز شما کسے را لائق نمی دانم کہ والی افغانستان باشد

> আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আফগানিস্তানের শাসক হওয়ার উপযুক্ত মনে করি না।

কথাটি আজীবন আমানুল্লাহর স্মরণে ছিল। তাই ক্ষমতায় বসেই তিনি মাওলানা সিন্ধিকে পাশে পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। তাঁকে জালালাবাদ থেকে সম্মানের সঙ্গে আমিরের কাছে নিয়ে আসা হয়। আমানুল্লাহ তাঁর সঙ্গে উষ্ণভাবে মিলিত হন। আমানুল্লাহ তখন তাঁকে তাঁর অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, 'من ہمو ستم—আমি তো সেই ব্যক্তি, যাকে আপনি যুবরাজ বলতেন!'

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব

আমির আমানুল্লাহ মাওলানা সিন্ধির ব্যাপারে এতটাই আসক্ত ছিলেন যে, তিনি আফগানিস্তানের বড় বড় নেতাকে রেখে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব ছিল একধরনের বাদশাহি। কারণ, তাঁকেই পুরো দেশের শাসনব্যবস্থা দেখাশোনা করতে হতো; কিন্তু মাওলানা সিন্ধি রাহ. ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে একটি

মুসলিমরাষ্ট্রের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে প্রস্তাবটি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি প্রস্তাবের বিপরীতে বলেন, 'আমি কোনো প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, আমি প্রধানমন্ত্রী হলে আফগান নেতৃবৃন্দ খুশি হবেন না। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। আমি মনে করি, এই পদ কোনো আফগান নেতাকে দেওয়া হোক। এটাই হবে আফগানিস্তান ও আফগানজাতির জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত। কথা দিচ্ছি, আমি আপনাকে ও প্রধানমন্ত্রীকে সবসময় পরামর্শ দিয়ে যাব।'

আমির আমানুল্লাহ খান মাওলানার দূরদর্শী এই জবাব শুনে আরও প্রীত হন। এর পর থেকে সিন্ধি রাহ. যত দিন আফগানিস্তানে ছিলেন, তত দিন তিনি সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

পিতৃহত্যার তদন্ত

আমানুল্লাহ খান ক্ষমতার বাগডোর হাতে নেওয়ার পর আমিরদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে সাবেক শাসক তাঁর পিতা হাবিবুল্লাহ খানের হত্যার তদন্ত শুরু করেন। জালালাবাদে হাবিবুল্লাহ খান নিহত হওয়ার দায়ে নাসরুল্লাহ খান ও ইনায়েতুল্লাহ খানকে নজরবন্দি করেন। একইভাবে আফগান সেনাপ্রধান নাদির খানকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আমানুল্লাহ খান তাঁর চাচা নাসরুল্লাহ খানকে পিতৃহত্যার জন্য অভিযুক্ত করছিলেন। অপরদিকে সাধারণ সেনা ও সামরিক কর্মকর্তারা সেনাপতি নাদির খানকে দায়ী মনে করছিলেন। সরদার মাহমুদ খান তারজিকেও অভিযুক্তদের তালিকায় গণ্য করা হচ্ছিল। কারণ, তিনি হাবিবুল্লাহ খানের ইংরেজতোষণের কারণে আমিরের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। এরা সবাই আফগানদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে নিয়ে আসার স্বার্থে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

রেজা আলিশাহর ফাঁসি

হত্যামামলার তদন্তের ফল দাঁড়ায়—মেজর সাইয়িদ রেজা আলিশাহকে মূল অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, যে রাতে আমির হাবিবুল্লাহ নিহত হন, সে রাতে তিনিই ছিলেন তাঁর প্রধান নিরাপত্তারক্ষী। আদালতে তাঁর নামে অভিযোগ উঠলে ফাঁসির সিদ্ধান্ত আসে এবং দ্রুত সে রায় বাস্তবায়ন করা হয়। এভাবেই আমানুল্লাহ জাতির সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে দেখান। তিনি জাতিকে বলেছিলেন, 'যেকোনো মূল্যে তিনি তাঁর পিতার হত্যাকারীকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাবেন। খুব সম্ভব জনগণকে শান্ত করতে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট হতো; কিন্তু বিশেষ শ্রেণির মানুষ মনে করছিল, যদি

আদালতি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চাপমুক্ত পরিবেশে সংঘটিত হতো, তাহলে নাদির খানসহ খোদ আমানুল্লাহকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো। অধিকাংশ জনগণ আমানুল্লাহকেও এর জন্য দায়ী মনে করত। মোটকথা, রেজা আলিশাহকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অর্থ ছিল বাকি অভিযুক্তরা নির্দোষ। তাই হত্যার অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের ছাড়াও রাজমসনদের উত্তরাধিকারী ইনায়েতুল্লাহ খান ও সেনাপতি নাদির খানকেও কিছুদিন পর মুক্তি দেওয়া হয়। তবে নাসরুল্লাহ খান যথারীতি নজরবন্দি থাকেন।

মাওলানা সিন্ধির প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ

আমানুল্লাহ খান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল ইংরেজদের সহ্যসীমার বাইরে; কিন্তু তারা তখন হিন্দুস্থানিদের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থায় ছিল। তাই তাৎক্ষণিক কোনো প্রদক্ষেপ গ্রহণ তাদের সাধ্যে ছিল না। তারপরও বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আফগানিস্তান ও ব্রিটিশদের মধ্যকার আরেকটি যুদ্ধ ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে। তখন ছাইচাপা অঙ্গারগুলো ধক ধক করে জ্বলছিল। যেকোনো মুহূর্তে তা বিশাল শিখা মেলে জ্বলে উঠতে পারত।

এই অবস্থাকে সামনে রেখে আমির আমানুল্লাহ খান শাসকশ্রেণি, আলিমসমাজ এবং সেনা-কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সমাবেশ আয়োজন করেন। সমাবেশের এজেন্ডা ছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে, নাকি অন্য কোনো উপায়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। মাওলানা সিন্ধির পরামর্শ ছিল—যুদ্ধের আগে হিন্দুস্থানি জনসাধারণের সহায়তা চেয়ে তাদেরকে হিন্দুস্থানে ইংরেজবিরোধী অভ্যুত্থানে উৎসাহী করে তোলা হোক। যদি এভাবে হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে শায়খুল হিন্দের পরিকল্পনামতো দেশান্তরীণ মুজাহিদরা হিন্দুস্থানে এসে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তখন আফগানিস্তান তাদের থেকে পূর্ণ সহায়তা লাভ করতে পারবে।

কিন্তু পরামর্শসভার সকল নেতা যুদ্ধের সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরও আমির আমানুল্লাহ মাওলানা সিন্ধিকে একান্তে ডেকে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর অভিমত জানতে চান। মাওলানা সিন্ধি তাঁকে বলেন, 'আফগানিস্তান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করুক, তবে আফগানরা যেন যুদ্ধের ঘোষণা না দেয়। আমার অভিমত হচ্ছে, সীমান্তে সেনাসমাবেশ ঘটানো হোক, তবে প্রথমে যেন তাদের ওপর হামলা করা না হয়; বরং ইংরেজরা আগে হামলা চালাক। ইংরেজদের পক্ষ থেকে তোপ ও গুলি চললে বিশ্ববাসীকে এটা জানিয়ে দেওয়া হবে যে, ইংরেজরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে বলেই আমরা বাধ্য হয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে নেমেছি।'

মাওলানা সিন্ধির উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে শুধু শক্তি এবং সামরিক পরিকল্পনার ওপর ভরসা করে বসে থাকতে নেই, সমকালীন বিশ্বের রাজনীতিও মাথায় রাখতে হয়। বিশ্বের জনসমর্থন নিজের দিকে টেনে নিতে হয়। বিশ্ববাসী যখন এটা জানবে যে, আফগানরা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগ্রাসন চালাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার, তখন অবশ্যই এর মাধ্যমে বিশ্বসমাজে আফগানদের অবস্থান প্রশংসিত হবে এবং ব্রিটিশদের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাওলানার এই প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ শুনে আমির আমানুল্লাহ অত্যন্ত আনন্দিত হন।

পাঠক, দারুল উলুম দেওবন্দের চাটাইয়ে বসে ইলম অর্জনকারী আলিমরা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে কতটা দূরদর্শী ও সজাগ ছিলেন, এখান থেকে তা কিঞ্চিৎ হলেও অনুমান করা যায়। সময়ের বাদশাহগণ রাজনীতির পদে পদে যাঁদের অনুগ্রহ স্বীকারে বাধ্য ছিলেন।

যুদ্ধের আগুন : হিন্দুস্থানবাসীর উদ্দেশে পয়গাম

একসময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মাওলানা সিন্ধি রাতেই একটি প্রেস থেকে উর্দু ভাষায় একটি লিফলেট ছাপিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেন। সেই লিফলেটে হিন্দুস্থানিদের কাছে আবেদন রাখা হয়, তারা যেন এই মুহূর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। আফগানদের যেন অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করে। আফগান অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার রুটগুলো যেন বন্ধ করে দেয়। তাদের যোগাযোগব্যবস্থা যেন ছিন্ন করে ফেলে। তারা যেন সেই মুক্তিকামী সেনাদের হাত ও পা হিসেবে কাজ করে যায়, যারা নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। মাওলানা সিন্ধির দুজন বিশ্বস্ত লোক তাঁর এই আবেদন-বার্তা নিয়ে হিন্দুস্থান অভিমুখে রওনা হন।

মাওলানা সিন্ধি ও কাবুলের আমিরের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আগে এই আবেদন হিন্দুস্থানের জনগণের কাছে পৌঁছেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। এটাও নিশ্চিত করা দরকার যে, স্থানীয় লোকজন ব্রিটিশদের সঙ্গে মিলে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে কি না। এরপরই ইংরেজদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। (কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি, এর আগেই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়। যদি সিন্ধির পরিকল্পনা মোতাবেক সব কাজ সম্পাদিত হতো, তাহলে হিন্দুস্থানের ভাগ্য বদলে যেত।)

তিনটি রণক্ষেত্র

আমানুল্লাহ খান যুদ্ধের জন্য তিনটি রণক্ষেত্র নির্বাচন করেন :

১. সরকারি বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ মুহাম্মাদ সালিহ খান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে চৌকস বিগ্রেড নিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র, কামানসহ জালালাবাদ হয়ে খাইবার গিরিপথ অভিমুখে অগ্রসর হবেন, যাতে লান্ডি কোতাল হয়ে ইংরেজদের পেশোয়ার ছাউনিতে আক্রমণ চালাতে পারেন।

২. দ্বিতীয় ক্ষেত্র ছিল ওয়াজিরিস্তান। যেখানে সরদার শাহ অলি খান ও সরদার শাহ মাহমুদ খান তাঁদের বড় ভাই নাদির খানের সঙ্গে সেনা নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। তিন ভাইয়ের কাছেই পৃথক তিনটি সেনাদল ছিল।

৩. তৃতীয় রণক্ষেত্র ছিল কোয়েটা। প্রধানমন্ত্রী আবদুল কুদ্দুস খান একটি বাহিনী নিয়ে কান্দাহার থেকে কোয়েটা অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

বাহিনীত্রয়ের কমান্ডারদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যেন নিজ নিজ স্থানে নীরবে শিবির স্থাপন করে বসে থাকেন। কাবুল থেকে নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত যেন আক্রমণ শুরু না করা হয়।

বড় দুর্বলতা

আফগানবাহিনীর বড় দুর্বলতা ছিল—তিনটি রণক্ষেত্রই ছিল একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে। তা ছাড়া যুদ্ধপরিচালনার কেন্দ্রভূমি রাজধানী কাবুল থেকে ক্ষেত্রত্রয়ের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। এ ছাড়া বাহিনী তিনটির সঙ্গে যোগাযোগের শক্তিশালী কোনো ব্যবস্থা ছিল না; অথচ এমন চতুর্মুখী যুদ্ধের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিল সহজ যোগাযোগব্যবস্থা। এই দুর্বলতার পরিণতিতে তিন জায়গার তিন প্রধান নেতার মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগ দুর্বল থাকায় প্রত্যেক কমান্ডারই নিজ নিজ বিবেচনাবোধ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য ছিলেন। ওদিকে ইংরেজরা তাদের পেশাগত শৃঙ্খলা এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম নিয়ে আফগানবাহিনীর মোকাবিলায় এগিয়ে আসে। এমনকি প্রথমবারের মতো তারা আফগানযুদ্ধে যুদ্ধবিমান নিয়ে উপস্থিত হয়।

মুহাম্মাদ সালিহের পরাজয়

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র ছিল লান্ডি কোতাল। সেখানে মুহাম্মাদ সালিহ ৪ হাজার সেনা ও আটটি কামান নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযাগ না থাকায় তিনি মারাত্মক একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মে তাঁর বাহিনী নিয়ে লান্ডি কোতাল থেকে এগিয়ে আফগান ও ইংরেজদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়েন। সেখানে পৌঁছে তোরখামের 'আইশখিল' এলাকা (একটি ঝরনার পাশে

অবস্থিত জায়গা) দখল করে নেন। এভাবে মূলত তিনিই যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়ে ফেলেন। সালিহের এই সিদ্ধান্ত ছিল মাওলানা সিন্ধি ও আমির আমানুল্লাহ খানের পরিকল্পনার বিপরীত। ইংরেজরা তাদের জঙ্গিবিমান দ্বারা আফগানদের অবস্থানে নির্বিচার গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুহাম্মাদ সালিহ আহত হয়ে তৎক্ষণাৎ ময়দান ছেড়ে ডাক্কার দিকে পালিয়ে যান। সেনারাও তখন নেতৃত্বহীন হয়ে যে যেভাবে পারে, পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ইংরেজদের এক প্লাটুন সেনা মুহাম্মাদ সালিহকে ধাওয়া করে ডাক্কাতে এসে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

জালালাবাদে আইনশৃঙ্খলার অবনতি

আমির আমানুল্লাহ খানের কাছে মুহাম্মাদ সালিহের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছার পর জালালাবাদ থেকে এই খবর আসে যে, সেখানে কাবুলের রাজমসনদ পালটে যাওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে; আর এই সুযোগে গুন্ডা প্রকৃতির লোকজন ভয়ভীতি ছাড়াই লুটতরাজে মেতে উঠেছে। এ ছিল এমন এক ভয়ানক মুহূর্ত, ইংরেজরা যদি তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখত, তাহলে সহজেই জালালাবাদ দখল করে নিতে পারত; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তারা জালালাবাদের এই অস্থির পরিস্থিতির ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপরদিকে আমির আমানুল্লাহ অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করে সেনাপতি নাদির খানকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন দ্রুত ওয়াজিরিস্তান হয়ে হিন্দুস্থান সীমান্তে আক্রমণ করেন, যাতে ইংংরেজরা তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কোনোভাবেই তারা যেন জালালাবাদের এই অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। নাদির খান সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রাহ. তাঁকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন তাঁর একজন সাথিকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সিন্ধির পরামর্শ অনুযায়ী নাদির খান জাফর আইবেক নামের সিন্ধির অভিজ্ঞ সাথিকে সঙ্গে নিয়ে যান। বাহিনীতে জাফর আইবেককে যুক্ত করা খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল।

ঠল অঞ্চলে হামলা

সেনাপতি নাদির খান তাঁর বাহিনী নিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে এমন একজায়গায় অবস্থান করেন, যেখান থেকে মিরানশাহ ও ঠলের ইংরেজ ছাউনি মাত্র এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। নাদির খানের কাছে তখন বড় যে প্রশ্ন ছিল সেটি হচ্ছে, আগে মিরানশাহে হামলা করবেন নাকি ঠলে। অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, গুরুত্বপূর্ণ ছাউনি ঠলে প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করবেন। আগ্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মিরানশাহ ছাউনিতে হামলা পরিচালনার প্রয়োজন

ছিল বেশি; কিন্তু প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ঠলে আক্রমণ ছিল অপরিহার্য।

প্রকৃত অবস্থা ছিল মিরানশাহে আক্রমণ চালালে বান্নুর রাস্তা আফগানদের কর্তৃত্বে এসে যেত। ফলে পাঞ্জাবে প্রবেশ তাদের জন্য হয়ে যেত একেবারে সহজ। তবে এদিকে আক্রমণ পরিচালনা করলে তাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কেননা, এমতাবস্থায় কোহাটে অবস্থিত ইংরেজবাহিনীর জন্য ঠল ও কুররমের পথ ধরে পেওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অতি সহজ হয়ে যেত; আর পেওয়ারের উঁচু পাহাড় থেকে কাবুলের দূরত্ব ছিল মাত্র তিন দিনের। অতএব, রাজধানীর নিরাপত্তার লক্ষ্যে জরুরি ছিল যেকোনো মূল্যে পেওয়ারের কর্তৃত্ব আফগানদের দখলে রাখা। এই বিবেচনায় ঠলে আক্রমণ পরিচালনা ছিল অপরিহার্য। ঠল আফগানদের দখলে চলে এলে কোহাটের ছাউনিতে থাকা ইংরেজবাহিনী এদিকে এগিয়ে আসার সাহস করবে না। এসব বিবেচনায় নিয়ে নাদির খান ঠলে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

যুদ্ধের চাল

নাদির খান ইংরেজদের ধোঁকায় ফেলার জন্য একটি চালও চালেন। ইংরেজরা যেন মনে করে আক্রমণ মিরানশাহ ছাউনিতে হতে যাচ্ছে, এই উদ্দেশ্যে কর্নেল আবদুল কাইয়ুমের নেতৃত্বে অল্প কিছু সেনা মিরানশাহ অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কর্নেল আবদুল কাইয়ুম সেখানে পৌঁছেই প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু করে দেন। এতে ইংরেজবাহিনী আতঙ্কিত হয়ে ফাঁড়িগুলো ছেড়ে কেল্লাবন্দি হয়ে পড়ে।

স্পর্শকাতর মুহূর্ত

নাদির খান সেনাদলের বড় অংশ সঙ্গে নিয়ে ঠলের দিকে এগিয়ে যান; কিন্তু পথে থাকতেই সংবাদ পান, ছোট যে বাহিনীকে মিরানশাহে হামলার জন্য পাঠিয়েছিলেন তারা ইংরেজদের জবাবি হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের কামান নষ্ট হয়ে গেছে। কামানচালকও আহত হয়ে পড়েছে। নাদির খান তখনো এই সংবাদ হজম করে উঠতে পারেননি, ইতিমধ্যে সংবাদ পান ইংরেজদের একটি অশ্বারোহীবাহিনী কুররম নদী পার হয়ে মিরানশাহ আক্রমণকারী বাহিনীকে ঘেরাও করতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তখন নাদির খানের সঙ্গে হাতে গোনা কয়েকজন সেনা ছিল। তাঁর মূল বাহিনী তখনো তিন ঘণ্টার দূরত্ব পেছনে ছিল। সেনাপতির এই অস্থিরতা দেখে জাফর আইবেক দুজন আফগানি সেনাসহ ইংরেজ অশ্বারোহীবাহিনীকে থামাতে কুররম নদীর দিকে দ্রুত দৌড়ে যান। তাঁরা নদীর তীরবর্তী উঁচু একটি টিলায় উঠে দেখতে পান, কী এক অজানা ভয়ে ইংরেজদের অশ্বারোহীবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে।

জাফর আইবেকের বর্ণনামতে, 'ইংরেজ অশ্বারোহীবাহিনী যদি একটু সাহস করে এগিয়ে আসত, তাহলে সেনাপতি নাদির খানসহ তাঁর সঙ্গের ছোট দলটিকে বন্দি করা তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না।'

জার্মান কামানের কারামতি

এদিন বিকেলে আফগানবাহিনীর বড় অংশটি যুদ্ধের ময়দানে এসে পৌঁছায়। এ পর্যায়ে সেনাপতি নাদির খান জার্মানি থেকে আমদানিকৃত অত্যাধুনিক কামান একটি উঁচু জায়গায় মোতায়েন করে ঠল কেল্লায় গুলিবর্ষণ শুরু করেন; কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল তাঁদের অস্ত্রভান্ডারে ওই কামানের গোলা ছিল মাত্র সাতটি। তা ছাড়া কামানচালক এই কামানের টেকনোলজি সম্পর্কে ছিল অনভিজ্ঞ। ফলে তার নিক্ষিপ্ত প্রথম দুটি গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। জাফর আইবেক তখন কামানের গাইডবুক হাতে নিয়ে সেটি পড়ে দুরবিনের সাহায্যে দূরত্বের সঠিক পরিমাপ লাগিয়ে কামানের কৌণিক অবস্থান ঠিক করে নেন। এরপর গোলা চালাতেই গোলাটি কেল্লার মধ্যখানে থাকা ইংরেজদের অস্ত্রগোদামে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। এর ফলে কালো ধোঁয়ার মেঘ আকাশ অভিমুখে উত্থিত হতে থাকে। তখন কেল্লায় থাকা ইংরেজবাহিনী জ্বলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে এসে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। আফগানবাহিনীর পরবর্তী গোলাটি তাদের তাঁবুগুলোর ঠিক মধ্যখানে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এ অবস্থা দেখে ইংরেজবাহিনী সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়। এ ছিল অস্ত্র সমর্পণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

সংঘাতের ধারাবাহিকতা

এ পর্যায়ে মুজাহিদবাহিনীর সাহস কয়েকগুণ বেড়ে যায়; কিন্তু তাঁরা যখন কেল্লার দখল নিতে অগ্রসর হন, তখন পুনরায় তাঁদের ওপর গোলাবৃষ্টি শুরু হয়। এমতাবস্থায় জার্মান তোপ আরেক দফা গর্জে ওঠে। ফলে ইংরেজরা মাঠ ছেড়ে আবারও পালিয়ে যায়।

মুজাহিদরা তখন ঠল শহরের কাছে ইংরেজদের কয়েকটি ফাঁড়ি দখল করে নেন। কয়েক দিন ধরে ইংরেজ ও আফগানদের মধ্যে থেমে থেমে যুদ্ধ চলতে থাকে। ইংরেজরা আরেকবার কেল্লাবন্দি হয়ে পড়ে।

যুদ্ধে আফগানদের পাল্লা ভারী থাকলেও ইংরেজরা দ্রুত সাহায্য পৌঁছার আশাবাদী ছিল। অবশেষে জালিয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যার খলনায়ক কুখ্যাত জেনারেল ডায়ার সাহায্যবাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছায় আরেকবার ইংরেজদের পা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ওই যুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হলেও বিপুল শক্তি ও সরঞ্জাম নিয়ে

যুদ্ধে নামা ইংরেজদের পক্ষে আফগান সীমান্তে ঢুকতে না পারাই ছিল তাদের বড় পরাজয়। বড় কথা হচ্ছে, নাদির খানের কৃতিত্বের ফলে ইংরেজরা পেওয়ার পৌঁছতে পারেনি। এতে কাবুল সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকে যায়।

বিশ্বজনমত ব্রিটিশদের বিপক্ষে

এদিকে ইংরেজদের ওপর বহির্বিশ্বের চাপ ক্রমাগত বাড়ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র আফগান বাদশাহ ওয়ারলেসের মাধ্যমে রাশিয়া, ইরান, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোকে জানিয়ে দেন, ইংরেজরা কোনো ঘোষণা ছাড়াই আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে, ফলে বাধ্য হয়ে আমরা প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। এদিকে লন্ডন থেকে ইংরেজ ভাইসরয় এর বিপরীত রিপোর্ট দেয়। সে বিশ্ববাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করে, আফগানরাই আগে হামলা চালিয়েছে; কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাদের জোটবদ্ধ দেশগুলোকে শান্ত করতে পারেনি। তারা ইংরেজদের ওপর প্রচণ্ড অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে থাকে। তারা বলে, বিশ্বযুদ্ধের ঘা শুকানোর আগেই তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ ছাড়া এমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া তাদের জন্য মোটেও উচিত হয়নি।

দক্ষিণ সীমান্তের দুর্গগুলো ইংরেজদের আধিপত্যে

দক্ষিণ-আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহে ইংরেজরা আগ্রাসী হামলা চালায়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ মে ইংরেজ কমান্ডার জেনারেল হার্ডি আফগান সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানকার দুর্গগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে। দুর্গগুলোতে আফগানদের সেনাসংখ্যা ছিল অতি অল্প। তারপরও তারা বুক চিতিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। লাগাতার সাত ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর ইংরেজদের কামান দুর্গের দেয়াল ভেঙে দেয়। এরপর তারা দুর্গে ঢুকে পড়লে হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধ শেষে সেখানকার ৩০০ সেনার মধ্যে ১৫০ জন শাহাদাতবরণ করেন এবং ১৫০ জনকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়।

আবদুল কুদ্দুস খানের আগমন

সীমান্তবর্তী কেল্লাগুলো ইংরেজদের দখলে চলে গেলে আফগানিস্তানজুড়ে ভয়াবহ অস্থিরতা শুরু হয়। আমির আমানুল্লাহ খানের পক্ষ থেকে ওই রণক্ষেত্রের জন্য যে বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল, তারা প্রধানমন্ত্রী আবদুল কুদ্দুস খানের নেতৃত্বে কাবুল থেকে কান্দাহার অভিমুখে এগিয়ে আসছিল; কিন্তু ওই বাহিনী যথাসময় পৌঁছতে পারেনি। ফলে দক্ষিণ সীমান্তের দুর্গগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই আবদুল কুদ্দুস খান কান্দাহার পৌঁছে যান। কান্দাহারের জনগণ যুদ্ধের জন্য

প্রচণ্ড উৎসাহী ছিল। আবদুল কুদ্দুস খান সেখান থেকে মাথায় কাফনের কাপড়-বাঁধা মুজাহিদদের নিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যান। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাজার হাজার গোত্রীয় মুজাহিদও এগিয়ে যেতে থাকে।

শিয়া-সুন্নি সংঘাত বাধানোর অপচেষ্টা

ইংরেজবাহিনীর কমান্ডার এ সংবাদ জানতে পেরে অনুভব করতে পারে, সে এখানে আক্রমণ চালিয়ে প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে। এখন তার জন্য প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচাও মুশকিল। এমবস্থায় আফগানবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করতে মরিয়া চেষ্টা চালায় তারা। এ লক্ষ্যে সে একটি ঘৃণ্য চাল চালে।

ইংরেজরা তাদের সেনাদের মাধ্যমে এলাকার একজন সুন্নি হানাফি যুবককে হত্যা করিয়ে লাশটি কিজিলবাশ গোত্রের একটি সরাইখানায় ফেলে রাখে। কিজিলবাশের অধিকাংশ মানুষ ছিল ধর্মবিশ্বাসে শিয়া। ইংরেজরা রাতের আঁধারে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, কিজিলবাশের অধিবাসীরা শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুবককে হত্যা করেছে।

সংবাদটি মুহূর্তেই কান্দাহারকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। বাস্তবতা না জেনেই শিয়া-সুন্নিরা সাম্প্রদায়িক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের কয়েকজন মারা যায়। এদিকে কান্দাহার থেকে সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসা আবদুল কুদ্দুসের বাহিনীতে থাকা ইংরেজ গোয়েন্দারা এই পরামর্শ দেয়, যেহেতু এই মুহূর্তে কান্দাহারে গৃহযুদ্ধ চলছে এবং সেখানে হাজারের মতো মানুষ মারা পড়েছে, তাই এমতাবস্থায় সীমান্ত অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—এই গুজবের মাধ্যমে মুজাহিদবাহিনীকে তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত করে তোলা, যাতে তাঁরা ওদিকে অগ্রসর না হয়ে কান্দাহারে ফিরে যান। তবে আফগান মুজাহিদরা তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। একদিকে যেমন কান্দাহারবাসী মূল ঘটনা দ্রুত জেনে যায় এবং তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করে নেয়, অপরদিকে বাহিনীর মুজাহিদরাও তাঁদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ থাকেন। তাঁরা তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। স্বভাবজাত চিন্তার পরও তাঁরা জিহাদের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেনি। এরপর তারা বিশ্বস্ত মাধ্যমে জানতে পারেন, কান্দাহারের অবস্থা আসলেই তেমন গুরুতর নয়, যেটুকু ইতিপূর্বে তাঁদের কানে পৌঁছেছে। এখন সেখানকার অবস্থা অনেকটাই স্বাভাবিক।

সীমান্তের ওপারে

আফগানবাহিনীর অগ্রযাত্রা দেখে ইংরেজরা ফিরে যাওয়ার মধ্যেই তাদের প্রাণের

নিরাপত্তা খুঁজে পায়। সুতরাং তারা সীমান্তের দখলকৃত দুর্গগুলো খালি করে বেলুচিস্তানের পথ ধরে। এরপরও আবদুল কুদ্দুস খান তাদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রাখেন। তিনি তাদের ধাওয়া করে সীমান্তের ওপারে চলে যান। ব্রিটিশবাহিনী প্রাণপণ প্রচেষ্টায় চমন পৌঁছে সেখানকার ফাঁড়ি ও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া আশ্রয়ে গিয়ে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলে। আবদুল কুদ্দুস খান ডুরান্ড লাইন অতিক্রম করে বাগরা নামক একটি গ্রামে এসে শিবির স্থাপন করেন। ওখানে পৌঁছে তিনি পানির মজুতের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেন। ইংরেজরা তখন এ নিয়ে ভীত হয়ে ওঠে যে, আফগানবাহিনী অগ্রসর হতে হতে কবে যে কোয়েটা পর্যন্ত চলে আসে, কে জানে!

যুদ্ধবিরতির ঘোষণা

ব্রিটিশদের দুঃখজনক আগ্রাসী তৎপরতা এরপর লজ্জাজনক পশ্চৎপদতা দেখে পুরো বিশ্ব হতচকিত হয়ে যায়। তারা দেখতে পাচ্ছিল, আফগান জনতা এক অভূতপূর্ব ঐক্যের প্রদর্শনী ঘটিয়ে শত্রুকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। এ সময় কাবুলের মহাসড়কে একটি বিশাল প্রতিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এতে জনসাধারণসহ আফগান শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে। বিক্ষোভ সমাবেশে 'আফগানিস্তান জিন্দাবাদ' আর 'ইংরেজ মুর্দাবাদের' স্লোগান দেওয়া হয়। সেই বিক্ষোভের আওয়াজ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ও তাদের জোট দেখতে পায়, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে এতে তাদের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তাই তারা অস্ত্র ফেলে আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য হয়। আলেচনার তিন দিন আগে উভয় বাহিনী যুদ্ধবিরতির ঘোষণা জারি করে।

ব্রিটিশরা আলোচনার আগেই এই আশ্বাস দিতে বাধ্য হয় যে, তারা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। শেষপর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার শুরু হয়। ব্রিটেন চূড়ান্ত আলোচনার আগে পেওয়ার থেকে আফগান সেনাদের প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছিল; কিন্তু সরদার নাদির খান এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি খালি করতে সাফ অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন। কারণ, তাঁর আশঙ্কা ছিল ইংরেজরা গাদ্দারি করে ওই ঘাঁটির দখল নিয়ে কাবুলে আক্রমণ করতে পারে।

রাওয়ালপিন্ডি চুক্তি

এই দফায় আমানুল্লাহ খান ইংরেজদের কূটনৈতিক চাপ ও চাল সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। এই সাফল্যের পেছনে দেশপ্রেমিক ধীমান নেতৃবৃন্দ, উপদেষ্টাবৃন্দ, নাদির খান, মাহমুদ তুরজাইসহ উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ও জাফর আইবেকের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। ধারাবাহিক কয়েকটি চিঠি আদানপ্রদান ও আলাপ-আলোচনা শেষে ৮

আগস্ট ১৯১৯ রাওয়ালপিন্ডিতে ব্রিটিশ-আফগান চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সীমান্ত এলাকার জনগণের নিরাপত্তার অঙ্গীকার আদায় করা হয়। আফগানদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অন্য কারও সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ না হওয়ার জামানত নেওয়া হয়। এই চুক্তির ফলে অতীতের অনেক চুক্তি রহিত হয়ে যায়। তারপরও কিছু চুক্তি যথাযথ বহাল থাকে। বহাল থাকে ডুরান্ড লাইন চুক্তি। অবশ্য চুক্তির কিছু ধারা ছিল আফগানদের স্বার্থবিরোধী। যেমন : আরব সাগর হয়ে আফগানদের ট্রানজিট ব্রিটিশদের কর্তৃত্বে থেকে যায়। এর ফলে ব্রিটেন যেকোনো সময় ওই পথে অস্ত্র আমদানিতে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য রাখত।

আফগানদের অভূতপূর্ব বিজয়

মূলত রাওয়ালপিন্ডি চুক্তি ছিল আফগানদের এক মহাবিজয়ের স্মরণিকা আর ব্রিটিশদের লজ্জাজনক পরাজয়। কেউ ধারণাও করেনি যে, বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি এক পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাকানিচুবানি খেয়ে এভাবে হীনতামূলক চুক্তিতে বাধ্য হবে। তুর্কি সালতানাত ও জার্মানির মতো পরাশক্তিকে যুদ্ধমাঠ এবং আলোচনার টেবিলে অসহায়-করা ব্রিটিশরা আফগানদের মোকাবিলায় উপযাচক হয়ে আলোচনার টেবিলে বসাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় পরাজয়।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের এই যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তান বিশ্বমঞ্চে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপর থেকে ব্রিটিশরা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখলেও আফগানদের দিকে নজর দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়নি। কারণ, এখানে তারা কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। এরপর ৮২ বছর তারা আফগানিস্তানের ব্যাপারে অনাগ্রহী থাকে। অবশেষে এই ব্রিটিশরাই আবারও ৯/১১ আগের অভিজ্ঞতা ভুলে আমেরিকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরও আফগানদের পদানত করতে না পেরে এখন অতীতের কথা স্মরণ করছে। এখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট পরাজয় পুনরায় হাতছানি দিচ্ছে।[২০]

নজরবন্দি নাসরুল্লাহ খান

নাসরুল্লাহ খান—যিনি আমানুল্লাহ খানের পিতা হাবিবুল্লাহ খানের যুগে নায়িবে সুলতান ছিলেন—আমানুল্লাহ খান ক্ষমতাগ্রহণের পরপরই পিতৃহত্যার অভিযোগে

[২০] ১৫ আগস্ট ২০২১ রাজধানী কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে তালেবানরা আবারও আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পায়। ইতিমধ্যে তাঁরা সরকার ঘোষণা করেছেন। এর মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে মার্কিনরা দীর্ঘ ২০ বছরের অসম লড়াইয়ে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান থেকে পরাজয়ের তিলক এঁটে বিদায় নেয়।

তাঁকে নজরবন্দি করে রাখেন। এর বড় কারণ ছিল তাঁর বহুবিধ যোগ্যতা ও নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা। হাবিবুল্লাহ খানকে হত্যার অপরাধে মেজর আলি রেজাকে ফাঁসি প্রদানের পর হত্যামামলায় অভিযুক্ত ইনায়েতুল্লাহ খানসহ সরদার নাদির খানকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। নাসরুল্লাহ খানও মনে করছিলেন, আমানুল্লাহ তাঁর সঙ্গেও অনুরূপ উদার আচরণ করবেন; কিন্তু তা হয়নি। তিনি নজরবন্দিই থেকে যান। একপর্যায়ে নাসরুল্লাহ খান অতিষ্ঠ হয়ে আমানুল্লাহর কাছে আবেদন করেন, তাঁকে যেন হিজাজে দেশান্তর করা হয় অথবা নিজ ঘরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি আজীবন নিজ ঘরেই থাকবেন; কিন্তু আমানুল্লাহ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

কিছুদিন পর আমানুল্লাহ খান তাঁকে নিজ মহলে থাকার অনুমতি দেন এবং জীবনধারণের সব সুযোগ-সুবিধাও সরবরাহ করেন। তাঁর স্ত্রীকেও প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকার অনুমতি দেন। এরপর দেশের ওপর তাঁর আধিপত্য পূর্ণতায় পৌঁছে গেলে আমানুল্লাহ তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

নাসরুল্লাহ খানের ইনতিকাল

কিন্তু তাকদিরের লেখা ছিল ভিন্ন। আফগানদের মধ্যে যারা জিহাদি তৎপরতার কারণে নাসরুল্লাহ খানকে মর্যাদার চোখ দেখত, তাদের কাছে একপর্যায়ে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আমির আমানুল্লাহ ময়দানের এই মহান মুজাহিদকে নজরবন্দি করে রেখে তাঁর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। গুজবটি আফগান জনতাকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। তারা আমির আমানুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করার স্লোগান দিয়ে ময়দানে বেরিয়ে আসে; কিন্তু এই আন্দোলন সফল হতে পারেনি। সরকারি বাহিনী সহজেই এই আন্দোলন পর্যুদস্ত করে দেয়; তবে এর ফলাফল ভোগ করতে হয় নিরপরাধ নাসরুল্লাহ খানকে। আমানুল্লাহ খান তখন তাঁকে মুক্ত করার চিন্তা থেকে ফিরে এসে আবারও রাজমহলের গোপন একটি কক্ষে বন্দি করে রাখেন। এর কিছুদিন পর নাসরুল্লাহ খান এই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। এটি ১৩৩৮ হিজরির ২ রমজান জুমুআর রাত—১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মের ঘটনা।

নাসুরুল্লাহ খানের মৃত্যুর সময় আমানুল্লাহ কাবুলে ছিলেন না। তিনি এক সরকারি সফরে পাগমানে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে দ্রুত কাবুলে চলে আসেন। চাচার লাশ দেখে শীতল একটি নিশ্বাস ছেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিংশ শতাব্দীর আফগান ইতিহাসের মহানায়ক, উম্মাহর প্রতি দরদি মহাপুরুষ, সত্যিকার মুমিন আমির নাসরুল্লাহকে পবিত্র রমজানের পবিত্রতম রাতে 'কওলচাকান' কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

আমানুল্লাহ খানের লক্ষ্য

রাওয়ালপিন্ডির চুক্তির পর আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর সময় এসেছিল আফগান জনগণ দেশকে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করবে, একে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলে অতীতের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবে। আমনুল্লাহ খানও মনেপ্রাণে তা চাইতেন। এই চেতনা ও আবেগ হৃদয়ে লালন করতেন। ধ্বংসপ্রায় দেশকে উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আফগানিস্তানের স্বাধীনতার এই সক্রিয় ও দৃঢ়প্রত্যয়ী নেতা কালপরিক্রমায় চিন্তার বক্রতার শিকার হয়ে পড়েন। ইতিহাসে এমন অসংখ্য শাসক দেখতে পাওয়া যায়, যাদের শাসনকালের শুরু ছিল বিশাল বিশাল বিজয়গাথা ও অপার সম্ভাবনাপূর্ণ; কিন্তু শেষ দিকটা ছিল বোকামি আর পরাজয়ে পরিপূর্ণ। আমানুল্লাহ খানকেও আমরা সে ধরনের শাসকদের মধ্যে গণ্য করতে পারি।

মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনগণের হৃদয়রাজ্যে মর্যাদার যে আসন পেতে নিয়েছিলেন, তা তাঁকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছিল। জনগণ তাঁকে গাজি অভিধায় ভূষিত করে। ফলে তিনি মনে করছিলেন, জনগণের এই গ্রহণযোগ্যতা ও আবেগ নিয়ে দেশকে যে দিকে ইচ্ছা, সে দিকে পরিচালিত করতে পারবেন।

আতাতুর্কের পদাঙ্ক অনুসারী আমানুল্লাহ

আমানুল্লাহ যখন আফগানজাতিকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখছিলেন, তখন তুর্কির উসমানি সালতানাত ইতিহাসের উপাদান হয়ে গিয়েছিল। মুসতাফা কামাল পাশা নামের তুর্কি এক সেকুলার নেতা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পদ কেড়ে নিতে উথলা হয়ে উঠেছিল। গ্রিস-বুশ-আরমেনিয়ার আগ্রাসনের বিপরীতে কামালের সামরিক বিজয় তাকে সরল-সহজ তুর্কি জাতির কাছে হিরো বানিয়ে দিয়েছিল। ফলে তুর্কিকে উন্নতির নতুন পথে নিয়ে যেতে তার ইসলামবিরোধিতা ও মুজাহিদদের প্রতি শত্রুতার বৈধতার সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। আমানুল্লাহ খান ইংরেজদের ভয়ে প্রথমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এবং পাশাপাশি বিশ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে তুলতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে নতুন বিশ্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে মুসতাফা কামাল পাশা কর্তৃক ভীষণভাবে প্রভাবিত হতে থাকেন।

মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে প্রথমে তিনি মধ্য-

এশীয় রাষ্ট্রগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগানিস্তানের অনেক সরকারি প্রতিনিধিদল মধ্য-এশিয়ায় সফর করে। সেখানকার সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। মধ্য-এশীয় ওই সরকারের রাজধানী ছিল বুখারা। যদিও এ রাষ্ট্রটি ছিল আধা-স্বাধীন তথা রাশিয়ার অধীন, তথাপি তখন পর্যন্ত সেখানে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করার এবং ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসমতে ইবাদত-বন্দেগি করার স্বাধীনতা ভোগ করছিল। তবে লেনিনের কমরেডরা এখানে কমিউনিজমের চাষাবাদের জন্য উদগ্রীব ছিল।

আমির আমানুল্লাহ খান ইরান ও তুরস্কের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা দৃঢ় করে নেন। অনুরূপ ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তুরস্কের সঙ্গে একটি সম্প্রীতিচুক্তি করেন। এর ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য আফগান ও তুরস্কের ছাত্রদের আসা-যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। তুরস্কের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কের গভীরতা এ থেকেই অনুমান করতে পারবেন যে, তুর্কি সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নেতা জামাল পাশা, জিয়া বেগ, বদরি বেগ ও জেনারেল কাজিম পাশা অনেকদিন আফগানিস্তানের সরকারি বিভিন্ন পদে সেবা প্রদান করেছিলেন।

রুশ-আফগান সম্পর্কের নতুন যুগ

এ ছিল ঠিক সে সময়ের কথা, যখন রাশিয়ায় বলশেভিক আন্দোলন ঝড়োগতিতে ব্যাপ্ত হচ্ছিল, যার ফলে মধ্য-এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলোর অর্ধস্বাধীন অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়ে যায়। তখন ধর্মহীন চিন্তাচেতনার ধূলিমেঘে ঐতিহ্যের বুখারা ও সমরকন্দের আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিল, শ্রমিক ও কৃষক-মজুরদের স্বার্থের নামে জেগে ওঠা এই ঝড় মধ্য-এশিয়াকে তছনছ করে আফগানিস্তান অভিমুখে মোড় নিতে যাচ্ছে।

এ জন্য এখানে জরুরি মনে হচ্ছে—রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস, লাল বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, রুশ-আফগান সম্পর্ক ও বলশেভিক আন্দোলনের প্রভাবে আফগানিস্তানের প্রভাবিত হওয়ার প্রাথমিক যুগ নিয়ে একটা ধারণা লাভ করি। তবে এটা বুঝতে হলে শুধু আমির আমানুল্লাহর যুগ থেকে অবস্থা আমাদের পর্যালোচনা করলে চলবে না; বরং কয়েক শতাব্দী-প্রাচীন রাশিয়ার উত্থান-পতনের ইতিহাসের দিকে হালকা হলেও নজর দিতে হবে।

রাশিয়া হচ্ছে স্লাভ জাতির আদিনিবাস। প্রায় পৌনে দুই সহস্রাব্দ থেকে ওরা সেখানে বসবাস করে আসছিল। শত শত বছর ধরে মস্কোভা (মস্কো) তাদের রাজধানী ছিল। সেখানকার বাদশাহদের উপাধি ছিল 'জার'। তখন মুসলিমবিশ্বের উত্তর দিকে অবস্থিত এ রাষ্ট্রটি ছিল সভ্য পৃথিবীর বাইরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সপ্তম হিজরি—ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বর্বর তাতাররা মুসলিমবিশ্বকে উজাড় করার পর রাশিয়ার দিকে মনোযোগী হয়। একপর্যায়ে তাদেরও তছনছ করে ফেলে। তখন থেকে মস্কো তাতারদের করদরাজ্যে পরিণত হয়। আড়াই শতাব্দীব্যাপী তারা ওই অবস্থায়ই থাকে। পরে ধীরে ধীরে যখন তাতাররা দুর্বল হয়ে আসতে থাকে, তখন ১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মস্কো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। করাশ্রিত শাসকরা স্বাধীন হয়ে গেলেও তারা তাদের প্রভু তাতারদের হিংস্রতা ও পাশবিক স্বভাব শতভাগ সুপ্ত রাখে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে।

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দিকে রাশিয়া একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখনকার যুগে মস্কো ও এর পার্শ্ববর্তী কিছু ভূখণ্ডকে রাশিয়া বলা হতো। ওখানকার শাসকশ্রেণি ধর্মবিশ্বাসে ছিল খ্রিষ্টান। প্রথম রুশ শাসক ভ্লাদিমির ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। সে-ই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা শুরু করেছিল। তাতারদের পতনের পর ভ্লাদিমিরের স্বপ্ন ও লক্ষ্য সামনে রেখেই রুশ শাসকশ্রেণি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নেশায় মেতে ওঠে। তারা পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি হাত বাড়াতে শুরু করে।

স্মর্তব্য যে, মস্কো তিনটি নদীর মধ্যখানে অবস্থিত। পশ্চিমে নেপার (Dnieper), দক্ষিণে ডন এবং পূর্বে ভলগা। রুশরা নদী তিনটিকে উত্তমভাবে ব্যবহার করে তাদের বিজয়ধারা চালিয়ে যায়। তারা নেপারের মাধ্যমে ফিনল্যান্ড, ডনের সাহায্যে কৃষ্ণসাগর, ক্রিমিয়া (বর্তমানের ইউক্রেন) ও ভলগার মাধ্যমে কাস্পিয়ান সাগর ও উত্তর-ইরানে আধিপত্য বিস্তার করে নেয়। এই বিজয়গুলো রাতারাতি অর্জিত হয়নি; বরং তা অর্জনে তিন শতাব্দী লেগে যায়। তবে নিয়ামক ছিল এই তিন নদীর অস্তিত্ব।

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ আইভান রাশিয়ার রাজমসনদে বসে নিজের জন্য 'জার' উপাধি ধারণ করে। এরপর তিন শতাব্দীব্যাপী এই উপাধিধারী শাসকরা রাশিয়া শাসন করতে থাকে। এ সময় তারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী তৎপরতাও চালিয়ে যায়। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা নওমুসলিম তাতার জাতির রাজধানী আস্ত্রাখান দখল করে নেয়। ফলে তাদের জন্য মধ্য-এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলোসহ ইরান পর্যন্ত পৌঁছার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশাল সাইবেরিয়াও তাদের সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। তখন রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে উসমানি সাম্রাজ্যের মজবুত ঘাঁটি ক্রিমিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপগুলো দখলের জন্য একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

রাশিয়া ও তুরস্ক

১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে রুশ সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে মুসলিমবিশ্বের ওপর হামলার সূচনা করে, যা থেমে থেমে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রাশিয়া তুর্কির গুরুত্বপূর্ণ আজফ শহর দখল করে নেয়। তখনকার রুশরা ছিল উগ্রবাদী খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় প্রভাবিত। 'জার'-পরিবারও ছিল খ্রিষ্টবাদে বিশ্বাসী। পিটার দ্য গ্রেট তার বাহিনীকে ইউরোপের সামরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে মুসলিমরাষ্ট্রসমূহ দখলের নীলনকশা প্রণয়ন করে। ইতিপূর্বে ইউরোপীয়রা ক্রুসেডে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে মার খেয়ে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল; কিন্তু এ পর্যায়ে রাশিয়া খ্রিষ্টবাদের পতাকা হাতে ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি সেজে মুসলিমবিরোধিতায় নেমে আসে। এটাই ছিল রাশিয়া ও মুসলিমবিশ্বের মধ্যকার অব্যাহত লড়াইয়ের সূচনাকাল।

১৭১১ থেকে ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের অধিকৃত ভূখণ্ড দখলের জন্য একর পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে। উসমানিরা বেশ কয়েকটি যুদ্ধে রাশিয়াকে চরম শিক্ষা দিলেও অব্যাহত চক্রান্তের ফলে উসমানি সালতানাত যতই দুর্বল হয়ে আসছিল, রাশিয়ার আগ্রাসী তৎপরতাও ততই বাড়ছিল। ফলে ১৭৬৪ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত বলকান অঞ্চলের যুদ্ধে রুশরা ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পায়। এই সফলতার পর রাশিয়া মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসা তাতার মুসলিমদের ওপর জাতিগত নির্মূল অভিযান চালায়। এই ধারাবাহিকতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত উসমানিদের প্রধান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। এরপর ১৫ বছরের মধ্যে তুর্কিদের আরও কিছু সীমান্ত অঞ্চল তাদের দখলে চলে যায়। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী প্রায় এলাকা রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর ফলে তুর্কিদের প্রতিরক্ষাশক্তি একেবারে ভঙ্গুর ও অক্ষম হয়ে পড়ে।

মধ্য-এশিয়ায় রুশ আগ্রাসন

পরবর্তী শতাব্দীতে রাশিয়া মধ্য-এশিয়ার দিকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করে এবং একের পর এক মুসলিম রাজ্য দখলে নিতে থাকে। রুশদের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা প্রথম তুলে ধরেন দাগিস্তানের ইমাম গাজি মুহাম্মাদ। পাঁচ বছর জিহাদ পরিচালনার পর তিনি শাহাদাতবরণ করলে হামজার বে জিহাদের পতাকা তুলে ধরেন। তাঁর পরে জিহাদের এই ধারা এগিয়ে নিয়ে যান ইমাম শামিল রাহ.। তিনি জিহাদি

তৎপরতায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটান। পুরো ককেশাস অঞ্চলের জনগণকে রুশবিরোধী অবস্থানে নিয়ে আসেন। বছরের পর বছর ধরে চলা এই জিহাদ বহির্বিশ্বের সাহায্য-সহায়তা না পাওয়ায় একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

এরপর রাশিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ট্রান্স অক্সিয়ানা[21] (Transoxiana) অঞ্চলের মুসলিম রাজ্যগুলো গিলে ফেলতে থাকে। এই রাজ্যগুলো তখন বুখারা, তাশকন্দ, খিভা ও মার্ব নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে তুর্কিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কিরগিজিস্তান নামক জাতিরাষ্ট্রের জাহিলি চেতনাভিত্তিক যেসব রাষ্ট্রসীমা দেখতে পাওয়া যায়, ইসলামি শাসনামলে এসবের অস্তিত্ব ছিল না। রাশিয়া ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের পর মুসলিম জাতিসত্তাকে বহুভাগে বিভক্ত করার চক্রান্ত নিয়েই এগুলোকে এভাবে বিভক্ত করে ফেলেছিল। ইমাম শামিলের জিহাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর রাশিয়া ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তাশকন্দ, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বুখারা, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খিভা এবং ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মার্ব সালতানাত দখল করে নেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন

তখন চির লাঞ্ছিত ইয়াহুদিরা বিশ্বদখলের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। তারা রাশিয়াকে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করে সেদিকে দৃষ্টি দেয়। সেখানে এমন এক শাসনব্যবস্থার সূচনা ঘটানোর প্রয়াস পায়, যা বাহ্যত তাদের রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য না হলেও পরিচালিত হবে তাদের স্বার্থেই। এ জন্য ইয়াহুদিদের ধীমান মস্তিস্কগুলো ধর্মহীনতাকে (Atheism) কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র বা সমাজবাদের পোশাক পরিয়ে বিশ্বদরবারে নিয়ে আসে। ইয়াহুদিবাদী চিন্তাবিদদের মাথার মুকুট ছিল মার্কস। সে-ই *দাস ক্যাপিটাল* নামক গ্রন্থ রচনা করে অর্থনৈতিক সাম্যবাদের ওপর সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দাঁড় করায়। লেনিনের নাম এ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে যে, সে-ই প্রথম কার্ল মার্কসের নীতির ওপর সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে জন্ম দিয়েছিল। সাত দশকব্যাপী বিশাল এ সাম্রাজ্যটি আল্লাহর বান্দাদের জন্য সাক্ষাৎ গজব হয়ে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকে।

সমাজবাদের দ্বিতীয় জনক লেনিন ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার সিমবির্স্ক (Simbirsk) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সে পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে আইনশাস্ত্রে

[21] মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত ভূখন্ডকে ট্রান্স অক্সিয়ানা নামেও ডাকা হয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে বর্তমান দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দক্ষিণ কিরগিজিস্তান মিলে সুবিশাল সমভূমিকে ট্রান্স অক্সিয়ানা বলা হয়। আধুনিক সময়ে এই অঞ্চলকে সেন্ট্রাল এশিয়া বা মধ্য এশিয়া এবং মুসলিম সভ্যতায় এই অঞ্চলকে মা ওয়ারাউন নাহার নামে ডাকা হয়।

স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে। এরপর দুনিয়ার নিপীড়িত মানবতার জন্য বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়ে নেয়। রুশ 'জার' তার ক্রমাগত বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তা লক্ষ করে নিজ ক্ষমতার জন্য আশঙ্কা মনে করে তাকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার বন্দিখানায় পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু সে পালিয়ে ইউরোপে চলে আসে।

লেনিন জার্মানি ও ইংল্যান্ডে অবস্থান করে তার বৈপ্লবিক চিন্তাচেতনার প্রচারকাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তার শুরুর দিকের আহ্বানের সারাংশ ছিল—বিশ্বের অবহেলিত শ্রেণি অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে জেগে উঠুক এবং ধর্মীয় চেতনা পেছনে রেখে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়াক। এরপর ধীরে ধীরে ধর্মহীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে তার অনুসারীদের চরম ধর্মবিরোধী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। সে এই সময় এমন এক মতবাদের জন্ম দেয়, যেখানে আল্লাহ, রাসুল ও ঐশীমতবাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যেখানে মানুষ তাদের বিপ্লবী দল ছাড়া অন্য সবকিছুকে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করত; আর এটা এমন এক অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো, যার কোনো ক্ষমা ছিল না।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক তৎপরতা

যেহেতু রাশিয়ার জনগণ জারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, তাই লেনিনকে তারা নিজেদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর দ্রুতই কৃষক-মজদুররা তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা জারের স্বৈরশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। নৌবাহিনীর সদস্যরা কৃষক ও মজদুরদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ২২ জানুয়ারি পিটার্সবার্গের সরকারি সেনারা শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। অস্ত্রের দাপটে বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দেয় সরকার। তবে এই অত্যাচারই শেষপর্যন্ত আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। এরপর থেকে অব্যাহত বিক্ষোভ ও ধর্মঘট চলতে থাকে। অবশেষে জার নিকোলাস জনগণকে শান্ত করতে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে সম্মতি দেয়। বিপ্লবীরা তার অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট না হলেও কিছুদিনের জন্য আন্দোলন থেমে যায়। তবে এ ছিল এক মহা বিস্ফোরণের পূর্বাভাস। তখন আগ্নেগিরির ভেতর লাভা টগবগ করে ফুটছিল।

সোশালিস্ট পার্টি

এদিকে লেনিন সোশালিস্ট পার্টি গঠন করে প্যারিস চলে যায় এবং অল্পদিনেই তার অনুসারীরা খোদ রাশিয়ার পিটার্সবার্গ শহর থেকে *প্রাভদা (Pravda)* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করে। কমিউনিস্টদের এই পত্রিকা ধর্মকে পেছনে রেখে শুধু

পার্থিব অধিকারকে প্রধান্য দেওয়ার পাশাপাশি পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি জোর প্রচারণা চালাতে থাকে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লেনিন প্রাগে 'বলশেভিক কনফারেন্স' নামক একটি সামবেশ আহ্বান করে। এই কনফারেন্স ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর।

এর কিছুদিন পরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই মহাযুদ্ধের ফলাফল পরাজিতদের পাশাপাশি বিজয়ীদেরও বিরাট সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। রাশিয়ার মতো শক্তিধর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নড়ে ওঠে। লেনিনের মতো ধূর্ত রাজনীতিবিদের জন্য সময়টা ছিল সুবর্ণ এক সুযোগ। সে তার ভাষণ ও কলমের মাধ্যমে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে সে বিশ্ববাসীর কাছে একজন শান্তিবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত বিপ্লব

এই পর্যায়ে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে লেনিন ছদ্মবেশে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে এসে জারের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকে। ২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই আন্দোলন জারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়। এরপর ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্রেমলিনকে রাজধানী ঘোষণা করে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটানো হয়। সমাজবাদীরা তখন দেশব্যাপী কমিউনিজমের ঢোল পেটাতে থাকে। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত লেনিনের বিরুদ্ধে জারের অনুগত এবং সেসব মুসলমানের প্রয়াস অব্যাহত থাকে, যারা লেনিনের প্রকৃত চেহারা চিনতে পেরেছিল। লেনিনের নিকটতম বন্ধু প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক লুই ফিশার তার বিখ্যাত *লাইফ অব লেনিন* গ্রন্থে লেখেন, আমি স্পষ্টতই বলতে পারি, লেনিন ছিলেন একজন ইয়াহুদি। ইয়াহুদিবাদীরাও তাকে নিজেদের লোক হিসেবে জানত। তার স্ত্রীও ছিলেন একজন ইয়াহুদি। এটাও সুস্পষ্ট বিষয় যে, সমাজতন্ত্রকে ইয়াহুদিরা শুধু উৎসাহই জোগায়নি; বরং তারা এর পেছনে প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছে।

মধ্য-এশিয়ায় আনোয়ার পাশার প্রচেষ্টা

কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আনোয়ার পাশার কৃতিত্ব চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আনোয়ার পাশা ছিলেন উসমানি সেনাবাহিনীর একজন বিশিষ্ট জেনারেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের পরাজয়ের পর 'জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কি'র কতিপয় নেতার মতো তিনিও দেশ ছেড়ে ইউরোপ চলে যান; কিন্তু মধ্য-এশিয়ায় কমিউনিস্টদের বিপ্লব দেখে আর নীরবে বসে থাকতে পারেননি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে

তিনি মধ্য-এশিয়ায় চলে আসেন। কমিউনিস্টদের পাঞ্জামুক্ত করে এখানে তুর্কিস্তানি মুসলিমদের অঞ্চলে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ঐতিহাসিক সমরকন্দকে কেন্দ্র বানিয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা শুরু করেন। তখন মধ্য-এশিয়ায় খানাত অফ বুখারা ছিল মুসলমানদের আশা-ভরসার শেষ প্রতীক, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ছিল ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের উত্তরাধিকার। ছিল মুসলিম মা-ওয়ারাউন নাহারের ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষাকবচ।

আনোয়ার পাশার চেষ্টা ছিল, যেকোনো মূল্যে সমরকন্দ ও বুখারাকে কমিউনিস্টদের কবল থেকে রক্ষা করা; কিন্তু বুখারার আধা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী মুসলিম শাসক উসমান খাজা ও আনোয়ার পাশার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৫ আগস্ট ১৯২২ রুশদের এক ভয়াবহ আক্রমণে আনোয়ার পাশা শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার প্রতিরোধবাহিনী সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। এরপর খুব অল্প সময়ে কমিউনিস্টরা ঐতিহ্যের বুখারা দখল করে নেয়। বুখরার আমির পালিয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয়প্রার্থী হন। রুশ ভল্লুকরা মুসলিম মধ্য-এশিয়ার প্রতিরোধশক্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ ধ্বংস করতে সেই বর্বরতার আশ্রয় নেয়, যা সাত শতাব্দী আগে বর্বর চেঙ্গিস খানের মোঙ্গলবাহিনী করেছিল।

ধর্মদ্রোহীতার প্লাবন

লেনিনের পক্ষ থেকে জনগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকার মরুর মরীচিকায় পরিণত হয়। ধর্মের অস্তিত্ব সমূলে উপড়ে ফেলার যাবতীয় আয়োজন জোরেশোরে চলতে থাকে। সমকালীন বিখ্যাত নওমুসলিম চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আসাদ—যিনি ইসলামগ্রহণের আগে মধ্য-এশিয়া সফর করেছিলেন—তাঁর আত্মজীবনী *রোড টু মক্কা* গ্রন্থে লেখেন, 'সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আমার অন্তরে প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল মার্ভের রেলস্টেশন থেকে। সেখানে একটি বিশাল পোস্টার টানানো ছিল। তাতে ছিল শ্রমিকের পোশাক পরিহিত এক যুবকের ছবি, যে মেঘলা আকাশ থেকে ইসলামি পোশাক আবা পরে বেরিয়ে আসা এক ব্যক্তিকে লাথি মারছিল। দৃশ্যটির ক্যাপশনে লেখা ছিল—সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা এভাবেই আল্লাহকে ঊর্ধ্বলোক থেকে নামিয়ে দূরে ছুড়ে মারছে! (নাউজুবিল্লাহ)

এই পোস্টার প্রচার করছিল গণপ্রজাতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের ধর্মবিরোধী সমাজতান্ত্রিক পার্টি। সরকারের অনুমতি নিয়ে ছাপা হওয়া এসব পোস্টার পাবলিক প্লেস এবং মহাসড়কে দেখা যাচ্ছিল। এমনকি কোনো কোনো উপাসনালয়ের দেয়ালেও

টানিয়ে রাখা হয়েছিল। তুর্কিস্তান অঞ্চলে মসজিদের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। এগুলোর চরম অসম্মান করা হয়। যদিও মসজিদগুলোতে নামাজ পড়া তখনো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি, নিয়মিত নামাজ আদায় হচ্ছিল; কিন্তু মানুষকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রাখার সব উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। বুখারা ও তাশখন্দের লোকজন আমাকে বলেছেন, মসজিদে উপস্থিত হয়, এমন সকল মানুষকে পুলিশের সিআইডিরা তাদের কালো তালিকায় ঢুকিয়ে নিচ্ছিল।'[২২]

মসজিদগুলো ক্রন্দসী

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রাহ.—যিনি তখন রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য রাশিয়া গিয়েছিলেন—সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে লেখেন, 'বুখারার বড় মসজিদগুলোকে পার্ক বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এককভাবে কেউ এসে আজান দিয়ে নামাজ আদায় করে চলে গেলে কোনো অসুবিধা ছিল না। একই অবস্থা ছিল গির্জাসমূহেরও। সামগ্রিকভাবে জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র ছিল একনায়কতন্ত্রের উলঙ্গ প্রচারণা। যে মসজিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদা মুসল্লি ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সরগরম থাকত, তা হয়ে যায় শিশুকিশোরদের খেলার জায়গা। চারদিকে ধ্বংস ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। নারী ও দাসীদের গুন্ডা-বদমায়েশরা জনসমাবেশে যেতে বাধ্য করত। অভিজাত লোকজন নিজ নিজ ঘরে বন্দিজীবন কাটাচ্ছিল। শহরগুলো হয়ে গিয়েছিল কবরস্থানের মতো নীরব সুনসান। প্রতিসপ্তাহে সোনারুপা ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কারে বোঝাই একটি গাড়ি বুখারা থেকে মস্কোতে রওনা হতো। এগুলো ছিল বুখারার সম্পদ।

লোকজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, যে দিন থেকে বুখারা তাদের দখলে চলে যায়, সে দিন থেকে সম্পদ পাচারের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এক রুশ অফিসার আমার কাছে স্বীকার করেছে, যদি বুখারা জয় করতে না পারতাম, তাহলে হয়তো আমরা ক্ষুধায় মরে যেতাম। এই সোনারুপা দেখিয়েই আমরা এখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স থেকে তরিতরকারিসহ দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করছি।'[২৩]

মাওলানা সিন্ধি রাহ. এই অবস্থা দেখে হতাশা প্রকাশ করে লেখেন, এত সম্পদ থাকার পরও বুখারার জনগণ সামসময়িক জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বুখারার যুবকরা যদি সামসময়িক জ্ঞানবিজ্ঞানে দক্ষতা লাভ করত, তাহলে তারা পুরো তুর্কিস্তানের হর্তাকর্তা বনে যেত। এরা জাতিতে ছিল তুর্ক। যখন রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল এবং রুশরা জাতিগতভাবে অসহায় অবস্থা থেকে উন্নতির পথে যাত্রা

[২২] *তুফান সে সাহিল তাক : উর্দু তরজমা, রোড টু মক্কা।*

[২৩] *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি কি সারগুজাশতে কাবুল।*

শুরু করেছিল, তখন তুর্কিস্তানের বুখারা ও সমরকন্দ ছিল জাগতিক জ্ঞানশূন্য। বুখারার যুবকরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তখন নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষাই শুধু নয়; বরং রাশিয়া থেকেও দ্বিগুণ বড় একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারত। লাঞ্ছনা ও গোলামির এই জীবন তাদের স্পর্শ করত না। কিন্তু অঢেল সম্পদের অধিকারীরা নিজেরা যেমন মরেছে, তেমনি পুরো জাতিকেও ডুবিয়ে মেরেছে। তাদের গলায় পরিয়ে দিয়েছে লাঞ্ছনার হার। যদি এই তুর্কি যুবকরা উপযুক্ত নেতৃত্বের ছোঁয়া ও পর্যাপ্ত অর্থ-সহায়তা হাতে পেত, তাহলে রুশরা কখনো তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না।

আনোয়ার পাশা যখন সমরকন্দে এককভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এরা যদি তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত, তাহলেও হয়তো কিছুটা আশার কিরণ দেখা যেত; কিন্তু জ্ঞানান্ধ এই সম্পদলোভীরা তাঁকে কোনো সাহায্য না করে সম্পদ নিয়ে ঘরের কোণেই নীরব বসে থাকে। ফলে গোলামি তাদের লালাট-লিখন হয়ে যায়। আমি এই হতাশাজনক অবস্থা দেখে লাগাতার তিন দিন কান্নার মধ্যে কাটিয়ে দিই। শেষপর্যন্ত ক্ষোভে-দুঃখে বলে উঠি, এমন সম্পদের অধিকারীদের জন্য গোলামিই হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিদান!'[২৪]

সোভিয়েত রাশিয়ায় নতুন সরকার-ব্যবস্থাপনা

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। লেনিন ছিল জননেতা আর ইয়াহুদিবাদি রাজনীতিবিদ ট্রয়স্কি ছিল দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাদের উভয়ের ইচ্ছা ছিল, যত দ্রুত সম্ভব পুরো বিশ্বকে সমাজতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসা। বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে 'জার' আমলের সব চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে। তারা জানিয়ে দেয়, মানুষ এক নতুন জীবনব্যবস্থার অধীনে জীবন ধারণ করুক। অতীতকে ভুলে নতুন যুগের অংশীদার হয়ে নতুন ধারায় কাজ চালিয়ে যাক। রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপ ধারণ করে অতীতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। তখন থেকে তারা বিশ্ববাসীকে তাদের নতুন জীবনব্যবস্থা শেখাতে তৎপর হয়ে ওঠে, যা ছিল মূলত ধর্মহীন জীবনব্যবস্থারই অপর নাম।

---

[২৪] ইতিহাসজুড়ে ঘটে যাওয়া ঘটনপ্রবাহ একটি শিক্ষা বার বার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কোনো অঞ্চলের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যতই হিজরত করে আসা মুজাহিদিন নিজেদের শ্রম ব্যয় করুন না কেন, অঞ্চলের স্থানীয় আপামর মুসলিম জনতা যদি আনসার হিসেবে নিজেদের মেলে ধরতে না পারে, জান না হোক মাল-সম্পদ দিয়েও যদি তারা এগিয়ে না আসে; ইতিহাস সাক্ষী, সেখানে কখনোই পরিবর্তনের দেখা মেলেনি। হাবশা থেকে শুরু করে খাওয়ারিজম, খাওয়ারিজম থেকে ইয়াগিস্তান, ইয়াগিস্তান থেকে পূর্ব-তুর্কিস্তান, তুর্কিস্তান থেকে আরাকান সবখানের ইতিহাস একই কথা বলে।

আফগানিস্তান ও সোভিয়েত রাশিয়া

সোভিয়েত রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী ও গুরত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানই ছিল তাদের প্রথম টার্গেট। তবে রুশরা আফগানিস্তানকে তাদের ফাঁদে ফেলতে অত্যন্ত ধীরেসুস্থে এগোতে থাকে। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, ইরান ও আফগানিস্তানের আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সম্মান জানানো হবে।

তখন ছিল বাদশাহ হাবিবুল্লাহ খানের শাসনকাল। সোভিয়েতের এই মনোভাব তার জন্য ছিল বেশ স্বস্তিদায়ক। এরপর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে আমানুল্লাহ খান ক্ষমতাসীন হয়েই লেনিনকে চিঠি লিখে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপানের চেষ্টা চালান। লেনিন তাঁর এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নেয়; আর এভাবে সোভিয়েত রাশিয়াই সবার আগে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রাশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমানুল্লাহ খান একে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে আখ্যা দেন। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে, আমির আবদুর রাহমান ও হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজঘেঁষা ছিলেন, পক্ষান্তরে আমির আমানুল্লাহ ছিলেন ইংরেজবিরোধী এবং কিছুটা রুশঘেঁষা। রুশঘেঁষা থাকার কারণেই দ্রুত আফগানিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যে চুক্তি লেনিন নিজ হাতে লিখেছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির মূল বিষয় ছিল কেউ কারও ওপর আক্রমণ করবে না। উভয় রাষ্ট্র নিজ নিজ অবস্থানে নিরপেক্ষ থাকবে।

আমানুল্লাহ খান ও লেনিন

কতিপয় মানুষের ধারণা, আমানুল্লাহ শুধু ইংরেজদের থেকে নিজেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই রাশিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। নতুবা ব্যক্তিগতভাবে তিনি লেনিন ও তার লাল বিপ্লব সমর্থন করতেন না। এ ধারণা এ জন্য সঠিক মনে হয় যে, আমানুল্লাহ ক্ষমতাসীন হয়েই মধ্য-এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলছিলেন, যেগুলো অচিরেই সোভিয়েত রাশিয়ার দখলে যাওয়ার পথে ছিল। এরপর যখন রাশিয়ার লাল ফৌজ ওই রাজ্যগুলোর ওপর হামলে পড়ে এবং গাজি আনোয়ার পাশা সমরকন্দ থেকে ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন, তখন আমির আমানুল্লাহ সমরকন্দ ও বুখারাবাসীকে সহায়তার জন্য গোপনে কিছু সেনাও পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া অর্থসাহায্য করতেও ত্রুটি করেননি। তবে তা এতটাই গোপনে করেছিলেন, যার ফলে আফগান ও রুশ সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়েনি। এরপর যখন মধ্য-এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলো রুশদের কবলে

চলে যায়, তখনো মুহাজির মধ্য-এশীয় রাজনীতিকদের আশ্রয় দেন। এত কিছুর পরও তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলার মধ্যেই দেশের জন্য কল্যাণ মনে করেছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়া কিন্তু কখনো আফগানিস্তানের প্রতি সৎ উদ্দেশ্য রাখত না। তবে লেনিন যত দিন বেঁচে ছিল, তত দিন রাশিয়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করেনি।

আফগান-সোভিয়েত প্রথম দ্বন্দ্ব

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পরের বছরই রাশিয়া মধ্য-এশীয় করদ রাজ্যগুলোর মাধ্যমে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির আওতায় থাকা ইতিপূর্বের সব অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আচমকা আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে বসে। কমিউনিস্টরা আফগান সেনাদের পোশাক পরে আমু দরিয়া অতিক্রম করে 'আরতাত গাই' নামের নদীমাতৃক দ্বীপ দখল করে নেয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের চুক্তির ভিত্তিতে আমু দরিয়া ছিল আফগানিস্তান ও রাশিয়ার (মধ্য-এশীয় রাজ্যগুলোর) মধ্যকার সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত; কিন্তু রাশিয়া নদীর দুটি শাখার মধ্যবর্তী ১৬০ মাইল দীর্ঘ এই দ্বীপ সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ বলে দাবি করে দখল করে নেয়। এই ঘটনার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আফগান জনগণের সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। রাশিয়া নামকাওয়াস্তে একটি রেফারেন্ডাম প্রকাশ করে এই দাবি করে যে, এ দ্বীপের অধিবাসীরা আফগানদের শাসনব্যবস্থায় অতিষ্ঠ; তারা সোভিয়েত নীতির সমর্থক। ফলে আমানুল্লাহ খান ওই সময় দীপাঞ্চলটি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। তারপরও তিনি দেশের উত্তর সীমান্তে সেনা উপস্থিতি বাড়িয়ে দেন। আফগানরা তখন রুশি হামলার ভয়ে তটস্থ থাকত।

পাগমান চুক্তি

মস্কো দ্রুতই তাদের ভুল উপলব্ধি করতে পারে। কারণ, দ্বীপটি তাদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি চরিতার্থ করার কাজে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; অথচ এর মাধ্যমে আফগানদের সজাগ করার কারণে তাদের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা অনেকখানি দুষ্কর হয়ে ওঠে। সুতরাং ২৭ নভেম্বর ১৯২৬ তারা দ্বীপ থেকে নিজেদের সেনা সরিয়ে নেয়। তবে সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঠপুতুল সরকার দাঁড় করিয়ে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিকেই পাগমান চুক্তি হিসেবে স্মরণ করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয় রাষ্ট্র বৈশ্বিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবে। কেউ কারও স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করতে যাবে না।

এশিয়া ও ইউরোপের দরজা

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আমির আমানুল্লাহ খান হিন্দুস্থান, ইরান, মিসর, তুরস্ক, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানিসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ সফর করেন। ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে যেহেতু তিনি একজন গাজি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাই সেসব রাষ্ট্রে তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহও তাঁকে অভূতপূর্ব সম্মান ও মর্যাদা দেখায়। জার্মানি তাঁকে ইংরেজবিরোধী শক্তি হিসেবে খুব মূল্যায়ন করে। সেখানকার পত্রপত্রিকার কলামগুলো তাঁর স্তুতিতে ভরে ওঠে; কিন্তু আফসোস! ইউরোপীয়রা তাঁর বিগত জিহাদি জীবনের কারণে তাঁকে যে পরিমাণ মর্যাদা দিচ্ছিল, তিনি এরচেয়ে বেশি তাদের জাগতিক উন্নতি দেখে অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তাঁর সমকালীন তুর্কি অধিপতি কামাল পাশা কর্তৃকও বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইউরোপের এই সফর তাঁর আধুনিক চিন্তাধারাকে অধিক শাণিত করে। তিনি নিজ অবস্থান নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকেন। তাই আফগানিস্তান এসেই দ্রুত নতুন কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। তাঁর ধারণামতে, এই পদক্ষেপগুলো পশ্চাৎপদ এশীয়দের ইউরোপীয়দের কাতারে পৌঁছে দেবে।

আমানুল্লাহ খানের আধুনিক ধ্যানধারণার সুফল-কুফল

তাঁর এই আধুনিকতাবাদী চিন্তাচেতনা কিছু সুফলও বয়ে আনে। যেমন :

১. ইউরোপ থেকে আফগানিস্তানের জন্য আধুনিক অস্ত্র আমদানির দ্বার উন্মুক্ত হয়। আমির তাঁর ওই সফরে ৫৪ হাজার অত্যাধুনিক রাইফেল, ১৬০টি কামান, আটটি যুদ্ধবিমান, ছয়টি ট্যাংকসহ আরও কিছু অস্ত্র কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

২. আফগানিস্তানে 'দারুল মাসাকিন' 'দারুল মাজ্জানিন' ও 'দারুল আজিজাহ' নামক দরিদ্র, মানসিক রোগী এবং লা-ওয়ারিশ বৃদ্ধদের জন্য তিনটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মহিলাদের জন্য পৃথক হাসপাতাল নির্মাণ করেন। বৃহৎ পরিসরে দুটি জাতীয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলারও ঘোষণা দেন।

৩. সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতাসহ তাদের ভ্রমণ-খরচ বাড়ান।

৪. দেশে দীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল।

৫. আফগানিস্তানের যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রেললাইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং এর জন্য জার্মানির একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

তারপরও পশ্চিমা সংস্কৃতির আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা কখনো শরিয়ত ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা আফগান রীতিনীতির অনকূলে ছিল না। সেগুলোর কয়েকটি ছিল নিম্নরূপ :

১. নারীদের জন্য পর্দাপালনের রীতি উঠিয়ে দেওয়া হয়। পর্দাহীনতাকে উৎসাহ জোগানো হয়। প্রথমবারের মতো নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তুরস্কে পাঠানো হয়। তবে স্মর্তব্য যে, সেই পর্দাহীনতা কিন্তু এই পর্যায়ের ছিল না, যা আজ ইউরোপ ও আধুনিক দেশগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। সেই পর্দহীনতার মধ্যেও মাথা ও পুরো শরীর ঢেকে রাখার বাধ্যবাধকতা ছিল। শুধু চেহারাটুকুই খোলা থাকত। তারপরও আত্মমর্যাদাবান আফগানরা এতটুকু পর্দাহীনতা সহ্য করতে পারেননি। ইউরোপ সফরকালে তাঁর স্ত্রী রানি সুরাইয়াও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনিও সেই সফরে তাঁর চেহারা খোলা রাখেন। এই অবস্থায় ফরাসি ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তাঁর ছবি তোলে। এসব ছবি আফগানিস্তানে পৌঁছলে আফগান জনগণ তাদের ইমানি চেতনাবোধে প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করেন।

২. মেয়েদের বিয়ের জন্য ন্যূনতম ১৮ বছর আর ছেলেদের জন্য ২২ বছর বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

৩. সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য একের অধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়।

৪. সমাজে আলিম ও গোত্রীয় নেতাদের সম্মান অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়।

জনতার অসন্তোষ

আমিরের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে। জনগণের ওপর তাঁর আধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পায়। তাঁর নামে 'মহান গাজি'র যে ডাকঢোল পেটানো হচ্ছিল, তা নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরা উপহাসে মেতে ওঠার সুযোগ পেয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হতে থাকে।

গণতন্ত্রের ধোঁয়া

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন বিদেশ সফর থেকে ফিরেই আমির আমানুল্লাহ খান তাঁর পরিকল্পিত সংস্কারকাজ শুরু করে দেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুলাই সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র *আমানে* রানি সুরাইয়ার নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, ওই নিবন্ধে তিনি নারীদের জন্য পুরুষদের সমানাধিকার প্রদানের ওপর জোর দেন।

২৮ আগস্ট আমানুল্লাহ একটি বৃহৎ পরিসরের জিরগা (আফগান জাতীয় পরামর্শসভা)

আহ্বান করেন। এতে নারী সদস্যসহ আফগানিস্তানের প্রায় ১ হাজার নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই জিরগায় আমানুল্লাহ খান এক নতুন আফগানিস্তানের রূপরেখা উপস্থাপন করেন। ১৫০ সদস্যের জাতীয় সংসদ তৈরি করে একে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের গণতন্ত্রের আদল দেওয়ার প্রয়াস চালান।

বিরোধী দলসমূহ ও আলিমদের কৃতিত্ব

আমিরের এই নতুন নীতির বিরুদ্ধে আফগান জনমত দ্রুতই প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। কোহিস্তানের মোল্লা আবদুল আহাদ ও কাবুলের কাজি আবদুর রাহমানের মতো ধর্মীয় নেতারা আমিরের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে পুরো আফগানিস্তানে ঝড় বইয়ে দেন। এই পরিবেশ থেকে আমিরের বিরোধীদের মধ্য থেকে শের আগা, গুল আগা ও মাসুম প্রমুখ খুব উপকৃত হন। তারা চার শতাধিক আলিমের স্বাক্ষর-সংবলিত একটি প্রচারপত্র তৈরি করে আমিরের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকেন। সরকারের নিরাপত্তাবাহিনী তখন দ্রুত মাঠে নেমে আসে। তারা গুল আগাকে গ্রেপ্তার করে। একইভাবে কাবুল, খোস্ত ও কোহিস্তানের ৪০ জন আলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাজি আবদুর রাহমানসহ কতিপয় আলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আগুনে বাতাস দিচ্ছিল ব্রিটিশরা

ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের এই অরাজক পরিস্থিতি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল—যে আফগানিস্তান প্রায় খালি হাতে তাদের পদর্যুস্ত করে ছেড়েছিল, তারা আজ বিভক্তপ্রায়। একসময় যে আমানুল্লাহ খান একজন খাঁটি মুমিনের মতো জিহাদ করে তাদের খুলি উপড়ে ফেলেছিলেন, আজ তিনিই ইউরোপীয়দের গোলামের ভূমিকা পালন করে নিজের জনগণের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছেন। ব্রিটিশরা তাদের লজ্জাজনক পরাজয়কে কোনোভাবেই ভুলতে পারছিল না। তারা এ ব্যাপারেও আমানুল্লাহর ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল যে, কেন তিনি তাদের অস্তিত্বের শত্রু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে গেলেন। রাশিয়া ও ব্রিটেন ছিল একে অপরের প্রাণের শত্রু। তাই রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা ছিল ব্রিটেনের জন্য সহ্যের বাইরে। এ জন্য ব্রিটেন আন্দোলনের পালে বাতাস দিতে এবং আমানুল্লাহ খানকে অধিকতর বদনামি করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নামে।

বলা হয়ে থাকে, ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক ওঠানো রানি সুরাইয়ার ছবি ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পনা করে আফগানিস্তানে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, জনগণকে আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। এ ছাড়া আমানুল্লাহ খান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোও আফগান জনগণকে খেপিয়ে তুলতে যথেষ্ট ছিল।

প্রতিটি অঞ্চল থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চলছিল। মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে এসব সংঘটিত হয়েছিল।

তখনকার বিদগ্ধ চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবিরা আমানুল্লাহ খানের এই আধুনিকতাবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে খোলামেলা কলম পরিচালনা করতে থাকেন। নাজফ আলি নামের একজন কবির নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আফগানিস্তানজুড়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরছিল,

শাহ আমানুল্লাহর যুগে উলঙ্গ ও উদ্ধত নারীরা
গোবি মরুভূমির হরিণীদের মতো যত্রতত্র ঘোরাফেরা করছিল।

মোজার উপর দিয়ে তাদের পায়ের নলা দেখা যাচ্ছিল
তাদের ফ্যাশনের ওপর প্যারিস আর লন্ডনও আত্মাহুতি দিচ্ছিল।

তারা লজ্জা ও সম্মানকে পদতলে পিষ্ট করে ছাড়ছিল
আর আফগানি জাতির সংস্কৃতি ধারণে লজ্জা পাচ্ছিল।

এই ফিরিঙ্গি দূষিত আবহাওয়া ও ভাইরাসে
কাবুল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষগুলো ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল।

বেদনাদায়ক এই দৃশ্য দেখে প্রতিটি আফগান মুসলমান
বাদশাহর আহাম্মকির ওপর অশ্রু ঝরাচ্ছিল।

তারা হতাশায় দাঁতে আঙুল কামড়ে বলছিল,
'হে পাহাড়ের বাদশাহ, ইসলামি চেতনাবোধ তোমার অবস্থা দেখে হতবাক।'

যুবকরা 'মাতৃভূমি' শব্দটিকে এমনভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে,
যেন দীন ও ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো বন্ধন নেই।

শাহ আমানুল্লাহ গাজি গাফলতির নিদ্রায় বিভোর
তিনি যেন দিনরাতের চক্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।

ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহীরা আসর জাঁকিয়ে বসেছে
এই অবিশ্বাসীরা তো কমিউনিস্টদের ঔরষে ভূমিষ্ট।

অনুরূপ ফ্যাশনপ্রিয় আধুনিকতাবাদী সামরিক অফিসারদের কুৎসায় রচিত হয়েছিল,

যদি কোনো ক্লীবের গায়ে সামরিক উর্দি চাপিয়ে দেওয়া হয়,
তাহলে সে যুদ্ধমাঠে কী-ই-বা ভূমিকা পালন করবে?

ফ্যাশনযুক্ত উর্দি পরে আমানুল্লাহর বাহিনী কেমন বীরত্ব দেখাবে?
এরা তো চোর-ডাকুদেরও প্রতিরোধ করার সামর্থ্য রাখে না!

বাচ্চা সাকার আত্মপ্রকাশ

আমানুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে জনগণের এই প্রতিবাদ চলাকালে আফগান রাজনীতিতে হাবিবুল্লাহ নামে সম্পূর্ণ অচেনা যুদ্ধবাজ এক নেতা আবির্ভূত হয় এবং দেখতে দেখতেই নামটি সবার শীর্ষে চলে আসে। হাবিবুল্লাহ 'বাচ্চা সাকা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। বিরোধী রাজনীতিক ও আলিমদের অবস্থান শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুতরাং সে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে যতটা সম্ভব স্বার্থ আদায়ের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। তার দল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তারা কাবুলগামী প্রতিটি কাফেলার ওপর নজরদারি শুরু করে। একপর্যায়ে সরকারি সেনারা তাদের মোকাবিলায় অসহায় হয়ে পড়ে। বাচ্চা সাকার দল তাদের লুটতরাজের একটা অংশ গরিব জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিত। এর মাধ্যমে তারা জনগণের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন গড়ে নেয়। তারা সাধারণত ডুরান্ড লাইনের ওপারে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলেই তাদের লুটতরাজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। একবার সে সেখানকার স্থানীয় নেতাদের হাতে বন্দি হয়ে বছরখানের বন্দিজীবন কাটায়।

যখন আফগানিস্তানে আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে ওঠে, ঠিক তখনই বাচ্চা সাকা মুক্তি পেয়ে আফগানিস্তান চলে আসে। সে কাবুলের উত্তর দিকে অবস্থিত কাপিসা ও পারওয়ানের রাস্তাগুলো অনিরাপদ করে সরকারের জন্য প্রচণ্ড মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। ইংরেজদের বন্দিত্ব থেকে তার আচমকা মুক্তি এবং ইংরেজবিরোধী বাদশাহ আমানুল্লাহর বিরোধিতার কারণে আমানুল্লাহর অনুসারীরা তাকে ইংরেজদের এজেন্ট হিসেবে প্রচার করতে থাকে; কিন্তু বাদশাহর বিরোধীদের দৃষ্টিতে সে ছিল একজন দেশপ্রেমিক মুজাহিদ।

ব্রিটিশদের আরেকটি চাল

এদিকে ব্রিটিশ এজেন্টরা এই উত্তপ্ত আগুনকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করতে বাতাস দিয়েই যাচ্ছিল। তারা রানির এমন একটি ছবি প্রকাশ করে আফগানিস্তানে ছড়িয়ে দেয়, যেখানে রানিকে অর্ধউলঙ্গ হিসেবে দেখা যাচ্ছিল। ছবিটি যে কাটাছেঁড়া—সাধারণ জনতা তা বুঝতে সক্ষম ছিল না। আফগানিস্তানের সর্বত্র এই ছবির পোস্টার ছেয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। তারা যেকোনো মূল্যে সরকারের পতন ঘটাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিছুদিন পর চক্রান্তকারীরা এই গুজব রটিয়ে দেয় যে, রানি সুরাইয়াকে হত্যা করা হয়েছে। এতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এদিকে কাবুলের উত্তর দিকে বাচ্চা সাকা এক বিরাট শক্তি নিয়ে অবস্থান করছিল। সে-ও আমানুল্লাহ খানের রাজমসনদ উলটে ফেলার ধান্দায় ছিল। তার দল তখন

পাঞ্জশিরের সরকারবিরোধী এক আলিমকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়া একদল সরকারি সেনাকে পিটিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

ডাকাত নাকি মুজাহিদ

যদিও সরকার বাচ্চা সাকাকে একজন নিরেট ডাকাত হিসেবে প্রচার করছিল; কিন্তু তার পেছনে আলিমদের একটি দলের সমর্থনও দেখা যাচ্ছিল। অনেকে তাকে একজন মুজাহিদ হিসেবে গণ্য করত। তার সম্পর্কে সে নিজেই একবার এক জনসভায় বলেছিল, 'আমি বাদশাহ আমানুল্লাহ খানের ভয়ে আমার মামাতো ভাই সিকান্দার ও সামানদারকে সঙ্গে নিয়ে পেশোয়ারে পালিয়ে যাই। সেখানে থাকাকালে চা বিক্রি করে জীবন ধারণ করতাম। সুযোগ পেয়ে যখন আফগানিস্তান অভিমুখে রওনা দিই, তখন পথিমধ্যে জুমুআর নামাজের জন্য একটি মসজিদে প্রবেশ করি। সেখানে একজন মোল্লা জিহাদের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। নামাজ শেষে আমি ওই মোল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে দুআ চাই। তিনি আমাকে দুআ দিয়ে বলেন, 'পথে অমুক গাছে যা পাবে সব নিয়ে নেবে।' আমি সেই গাছে কিছু অস্ত্র ও ১ হাজার মুদ্রা পাই। ওগুলো সঙ্গে নিয়ে চলে আসি।

এরপর আফগানিস্তানের পাহাড়ি ও পাহাড়তলি অঞ্চলের আলিমরা আমানুল্লাহকে হত্যার জন্য আমাকে উত্তেজিত করতে থাকেন। আখুন্দজাদাহ মোল্লা হামিদুল্লাহর মতো শীর্ষ আলিম এবং গোলাম মুহাম্মাদ খানের মতো দেশের স্তম্ভ আমাকে এ কাজের জন্য তৈরি করে তোলেন। পারওয়ানের খানরা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এভাবেই আমি কাবুলে আক্রমণ চালাতে সাহস পাই।'

আলিমদের থেকে দূরত্ব

আমানুল্লাহ খানের মন্দ দিনগুলো ছিল সমাগত। এ জন্য তাঁর থেকে ক্রমাগত বোকামি প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি নিজেই নিষ্ঠাবান আলিমদের দূরে ঠেলে দেন। এভাবে দেশের তরে তাঁদের কল্যাণকর সিদ্ধান্ত থেকে তিনি বঞ্চিত হয়ে পড়েন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিও আফগানিস্তান থেকে হিন্দুস্থানের কোনো স্বার্থ আদায় হবে না দেখে সেখান থেকে রাশিয়ায় চলে যান।

আমির আমানুল্লাহ খান তখন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা থেকেই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। আলিমদের বিরোধিতা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তিনি নুরুল মাশায়িখ ফজল উমর মুজাদ্দিদি রাহ.-এর মতো বুজুর্গ ব্যক্তিকেও দেশান্তরের দণ্ড প্রদান করেন। মহান এই বুজুর্গ তখন ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে কোয়েটা এরপর ডেরা ইসমাইল খানে পৌঁছান; কিন্তু আমানুল্লাহ আফগান সীমান্তের পাশেও তাঁর

উপস্থিতি সহ্য করতে পারেননি। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেন। অবশেষে ওই বুজুর্গ মুম্বাইয়ে এসে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এভাবেই আমানুল্লাহ আলিমদের শত্রুতা কেনে নিচ্ছিলেন। ফলে তিনি জনতার আস্থা থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে তাদের আক্রোশের কেন্দ্রে পরিণত হন।

শিনওয়ারিদের আন্দোলন ও দাবিদাওয়া

সেই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে জালালাবাদ ও এর আশেপাশে বসবাসরত গোত্রগুলো সরকার গৃহীত নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে। সরকারের ধর্মহীন রাজনীতির বিরোধিতা ছাড়াও তাদের দাবি ছিল—বিনা অপরাধে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং এই হত্যাকাণ্ডে সরকারের বাহিনী গুন্ডাদের সহায়তা দিয়েছে। শিনওয়ারিরা সরকারের ইনসাফ থেকে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিল। জালালাবাদের মুহাম্মাদ ইলম খান শিনওয়ারিদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা ডাক্কা এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে সরকারি বাহিনীকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর খুগানি ও চাপরহারি গোত্র দুটিও তাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেয়।

আমানুল্লাহ খান উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। তাঁর ভয় ছিল যদি মেহমান্দ গোত্রও শিনওয়ারিদের পক্ষে চলে যায়, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রক্ষমতা হাত থেকে চলে যাওয়া হবে সময়ের ব্যাপারমাত্র। এমতাবস্থায় তিনি শিনওয়ারিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার প্রয়াস চালান। ভাবনা মোতাবেক তাঁর প্রতিনিধিদল শিনওয়ারিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে।

শিনওয়ারিদের অধিকাংশ দাবিদাওয়া ছিল ইসলামি শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং আফগান সভ্যতা-সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে। তাদের কতিপয় দাবি ছিল নিম্নরূপ :

১. আমানুল্লাহ খান রানি সুরাইয়াকে তালাক দেবেন।
২. বালিকা বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেবেন।
৩. উচ্চশিক্ষার জন্য যে-সকল মেয়েকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনবেন।
৪. সরকারি করের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন।
৫. ইউরোপীয় পোশাক পরিধানের আইন রহিত করবেন।
৬. পর্দাপ্রথা পুনরায় বাধ্যতামূলক হিসেবে চালু করবেন।
৭. সরকার পরিচালনায় আলিমদের যুক্ত করবেন।
৮. ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করবেন।

সরকারি বাহিনীর পরাজয়

আমির আমানুল্লাহ খানের জন্য ওই জটিল মুহূর্তে অন্তত রাজনৈতিক স্বার্থে হলেও নমনীয় ভূমিকা পালন জরুরি ছিল; কিন্তু আফসোস! তিনি অবস্থা পরিবর্তনের শেষ সুযোগটিও খুইয়ে বসেন। গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থ হন। পুনরায় শক্তিপ্রয়োগে অবস্থা সামাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। এরপর তিনি একের পর এক সেনাদল জালালাবাদ অভিমুখে পাঠাতে থাকেন। এটা ছিল তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামি। এর ফলে কাবুলের প্রতিরক্ষা একদম শূন্য পর্যায়ে চলে যায়।

শিনওয়ারিদের বিরুদ্ধে পাঠানো বাহিনী ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ নভেম্বর পরাজয় বরণ করে। বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের হাতে বন্দি হয়ে পড়েন। বিজয়ী শিনওয়ারিয়া স্বাধীনভাবে সরকারি দপ্তরগুলোতে লুটতরাজ চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র হাতে পেলে তাদের শক্তি আরও বেড়ে যায়।

বাচ্চা সাকার সঙ্গে সন্ধি

রাষ্ট্রের ওপর আমানুল্লাহর কর্তৃত্ব দিন দিন দুর্বল হয়ে আসছিল। এই অবস্থায় বাচ্চা সাকার মতো সুযোগসন্ধানী লোকটি উপকৃত হতে তৎপর হয়ে ওঠে। সে কাবুলের উত্তরের হাইওয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করে কাবুলের দিকে এগিয়ে আসে। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ও ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে কাবুল দূরদূরান্তের শহর থেকে সাহায্য পাচ্ছিল না। এ জন্য বাচ্চা সাকা ভয়ডরহীনভাবে কাবুলের উপকণ্ঠে এসে শিবির স্থাপন করে। এ পরিস্থিতিতে আমানুল্লাহ খান ও তাঁর দলবল ভীত হয়ে বাচ্চা সাকার সঙ্গে সংলাপ চালাতে রাজি হয়ে যান; কিন্তু বাচ্চা সাকা আলোচনার প্রস্তাব একবাক্যে ফিরিয়ে দেয়। সে লুটতরাজ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের টার্গেট করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। জালালাবাদ শিনওয়ারিদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে আমানুল্লাহ খান মনে করছিলেন, একযোগে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই না করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এক পক্ষকে শান্ত রেখে অপর পক্ষকে দেখে নেবেন। এ লক্ষ্যেই তিনি শেষপর্যন্ত বাচ্চা সাকার মতো ভয়ংকর প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করেন। তবে এই সন্ধিটি ছিল সরকারের পরাজয়ের দলিল। সন্ধির প্রতিটি দফা সরকারের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছিল। আমানুল্লাহ খান বাচ্চা সাকাকে সন্তুষ্ট করতে তাকে সম্মানসূচক সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্তি দেন। পাশাপাশি তাকে ৪ লাখ মুদ্রা, অগণিত রাইফেল এবং বিপুল পরিমাণ কার্তুজ প্রদান করেন। তার দলের প্রত্যেক সদস্যকেও আর্থিক সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। এরপর তাকে কাবুলের উত্তর দিকের কাপিসা ও পারওয়ানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে সরকারি বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সিদ্ধান্ত

হয়, ওই অঞ্চল বাচ্চা সাকা তার নিজের মতো করে শাসন করবে।

কাবুলে বাচ্চা সাকা

কিন্তু এরপর যা সংঘটিত হয়, তা ছিল আমানুল্লাহ খানের আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাচ্চা সাকা মোল্লা উয়াইস উদ্দিন দুর্গে সরকারবিরোধীদের একটি সম্মিলিত সমাবেশ আয়োজন করে। ওই সমাবেশে তাকে আফগানিস্তানের বাদশাহ হিসেবে সম্বোধন করা হয়। এ ছিল সরকারের সঙ্গে সুস্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা। এরপর সে সরকারের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেরি করেনি।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর সে কাবুলে আক্রমণ করে। সরকারি বাহিনী বেশ কিছু স্থানে লড়াই চালিয়ে গেলেও বাচ্চা সাকার দলকে অবদমিত করতে পারেনি। আমানুল্লাহ খান পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধী গুল আগা ও মাসুমকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর কতিপয় বিতর্কিত সংস্কারকর্মসূচিও রহিত বলে ঘোষণা দেন। পাশাপশি আলিমদের সঙ্গেও আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত অবস্থার ভয়াবহতা দেখে তিনি বিমানযোগে তাঁর পরিবারকে কান্দাহারে পাঠিয়ে দেন।

আমানুল্লাহ খানের শেষ প্রচেষ্টা

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের নতুন সূর্য এমতাবস্থায় উদয় হয় যে, কাবুলের চারপাশ ছিল বাচ্চা সাকার দখলে। ওই সময় আমানুল্লাহ খান জনতার সহায়তা অর্জনের লক্ষ্যে একটি লিফলেট ছাপিয়ে বিতরণ করেন। সেই লিফলেটে সরকারের সংস্কারমূলক কয়েকটি পদক্ষেপের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। জনগণেকে আশাব্যঞ্জক কিছু অঙ্গীকারও প্রদান করা হয়। ঘোষণা করা হয় :

- মদপান শাস্তি উপযোগী বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।
- আগের মতো শুক্রবারকে সরকারি ছুটির দিন সাব্যস্ত করা হবে।
- নারীরা হাত ও মুখ ঢেকে রাখা এবং ইউরোপীয় পোশাকের পরিবর্তে বোরখা পরতে বাধ্য থাকবে।
- মানুষ শায়খদের হাতে বায়আত গ্রহণ করতে পারবে।
- দীনি শিক্ষা দিতে আলিমদের জন্য সরকারি অনুমতিপত্রের কোনো প্রয়োজন থাকবে না।
- রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ-বিভাগে আলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

- ঘুস-প্রথার লাগাম টেনে ধরা হবে।
- আনজুমানে হিমায়াতে নিসওয়ান (নারী-উন্নয়ন পরিষদ) বাতিল ঘোষণা করা হবে।

কিন্তু পানি অনেক দূর গড়িয়ে যাওয়ার ফলে সুন্দর সুন্দর এসব বুলি তখন কোনো কাজে আসেনি।

একদিন আমানুল্লাহ আকস্মিকভাবে বাচ্চা সাকার মোকাবিলায় একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়ে বসেন। বাচ্চা সাকা তখন মুরাদ বেগ দুর্গে মোর্চাবন্দি অবস্থায় ছিল। সরকারি বাহিনীর গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যেতেই তার সাহস বেড়ে যায়।

১৪ জানুয়ারি ১৯২৯

তুষারপাতের মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাবুলের জনগণ নিজ নিজ ঘরে বসে আগুনের পরশ নিচ্ছিল। ১৩ ও ১৪ জানুয়ারির মধ্যরাতে ভীষণ তুষারপাত হচ্ছিল। প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে পাহাড়, বিল্ডিং ও রাজপথ সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সর্বত্র যেন আটার গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। চারদিকে ছিল সুনসান নীরবতা। তখন ছিল রাতের শেষ প্রহর। বাচ্চা সাকা তার দলবল নিয়ে 'মুরাদ বেগ' দুর্গ থেকে বেরিয়ে 'কোতল খায়েরখানা' পর্যন্ত চলে আসে। সুবহে কাজিবের[২৫] কিছু আগে রাজধানী কাবুলের বিভিন্ন এলাকায় ফায়ারিংয়ের আওয়াজ এমনভাবে গর্জে ওঠে, যা শুনে সরকারের দায়িত্বশীল লোকজনসহ সেনাবাহিনী একেবারে হতবাক বনে যায়। এরপর এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, শিনওয়ারিরা নাঙ্গারহারিদের সঙ্গে মিলে কাবুল দখল করে ফেলেছে। এ সংবাদ শুনে সরকারি কর্মকর্তাদের সাহস তলানিতে চলে যায়। তারা 'কোতল খায়েরখানা' ছেড়ে 'দাহ কাপাক কাবুলের' দিকে পেছাতে থাকে। বাচ্চা সাকার জন্য তখন কাবুলের পথে অগ্রসর হতে আর কোনা বাধা থাকেনি।

ভয়ংকর এই রাতের পর এক উদাস সূর্যের উদয় ঘটে। শাহ আমানুল্লাহ খান বরফের চাদর পরা কাবুলের দিকে হতাশ নয়নে চেয়ে থাকেন। তিনি নিশ্চিত হন, আর যদি একদিন তিনি এই শহরে অবস্থান করেন, তাহলে এই শহরই হবে তার গোরস্থান। সকাল ৯টার দিকে তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে একবার রাজপ্রাসাদের দরজা ও দেয়ালগুলো দেখে নেন। এরপর নিজের গাড়িতে চেপে বসেন। কোনো নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই তাঁর গাড়ি কান্দাহার অভিমুখী রাজপথে এগিয়ে চলে। সকাল ১০টায় সাবেক বাদশাহর এক প্রতিনিধি দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের জমায়েত করে বাদশাহর এই সংক্ষিপ্ত ফরমান পাঠ করে শোনায়—

---

[২৫] সুবহে সাদিকের আগ মুহূর্ত।

দেশের জন্য এটাই কল্যাণকর মনে করছি যে, আমি আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিই। কেননা, সব রক্তপাত ও অরাজকতা মূলত আমাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হচ্ছে।

ওই ফরমানে তিনি তাঁর ভাই ইনায়েতুল্লাহকে নিজের স্থালাভিষিক্ত ঘোষণা করেন।

তিন দিনের বাদশাহ ইনায়েতুল্লাহ

ওই দিন অর্থাৎ, ১৪ জানুয়ারি ১৯২৯ ইনায়েতুল্লাহর অভিষেক হয়। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত দুর্বল ব্যক্তি। ক্ষমতায় বসেই তিনি বাচ্চা সাকার সঙ্গে সন্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর প্রতিনিধিদল যখন বাচ্চা সাকার সঙ্গে আলোচনা করতে যায়, তখন বাচ্চা সাকা তাদের মুখের ওপর বলে দেয়, 'আমি কাবুলের বাদশাহ হতে যাচ্ছি।'

সন্ধি আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই সরকারবাহিনী কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই পথঘাট থেকে সব ব্যারিকেড উঠিয়ে নেয়। এরপর বিকেল হতে না-হতেই ফাঁড়িগুলোতে যে-সকল সেনা অবস্থান করছিল, তারাও নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে শহরে চলে যায়। এই সুযোগে সে দিন বিকেলেই বাচ্চা সাকা তার দলবল নিয়ে কাবুলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। রাজপ্রাসাদ ঘিরে অবস্থান নেয় তার বাহিনী। তারা পুরো শহরে স্লোগান দিয়ে ফিরছিল 'আমির গাজি হাবিবুল্লাহ, খাদিমু ইবনি রাসুলিল্লাহ'।

শাহ ইনায়েতুল্লাহ তখন নিজ প্রতিরক্ষার ব্যাপারে হতাশ হয়ে ১৬ জানুয়ারি ১৯২৯ প্রাণের নিরাপত্তার শর্তে বাচ্চা সাকার হাতে ক্ষমতা তুলে দেন। পরদিন পরিবার-পরিজনসহ বিমানযুগে কাবুল থেকে পেশোয়ার চলে যান। এভাবেই প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী আফগানিস্তান শাসনকারী বারেকজাই-পরিবারের শাসনক্ষমতার অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র

১. *তারিখে তাজজিয়ায়ে শাহানশাহি আফগানিস্তান,* আল্লামা আবদুল হাই হাবিবি।

২. *আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ,* মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।

৩. *Encyclopedia of Islam.* Vol-1

৪. *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি কি সারগুজাশতে কাবুল,* ড. গোলাম মুসতাফা খান।

৫. *আপবিতি,* জাফর হাসান আইবেক।

৬. *সাইরে আফগানিস্তান,* আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদবি রাহ.।

২২ তম অধ্যায়

বাচ্চা সাকা, নাদির খান এবং শেষ বাদশাহ জহির শাহ

এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের শাসনভার বাচ্চা সাকার হাতে। এক গ্রাম্য, নিরক্ষর, মূর্খ আর গোঁয়ার প্রকৃতির লোক—ক্ষমতার ব্যাপারে যার ন্যূনতম ধারণাও নেই, যে আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকা আর ঝরনায় খাদে গুটিকয়েক যুদ্ধবাজ নিয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নাকানিচুবানি খাইয়ে চলছিল, শতবর্ষী বারেকজাই-পরিবারের বাদশাহি পদদলিত করে আজ সে সাদাকালোর প্রতিভূ। সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কারিশমা ছাড়া একে আর কী-ই-বা বলা যায়।

ক্ষমতাগ্রহণের কিছুদিন পর সে তার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে। সেখানে স্থান পায় কতিপয় গ্রাম্য ও মূর্খ। মূলত এরা তাকে আগে থেকেই সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছিল। তাই ওরা ছিল তার কাছে সীমাহীন বিশ্বস্ত। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনা দূরে থাক, এদের অনেকে স্বাক্ষরটুকু পর্যন্ত জানত না।

রাশিয়া থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত

আমানুল্লাহ খানের পতন এবং বাচ্চা সাকার ক্ষমতাগ্রহণের পরই আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সরাসরি হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়ে ওঠে, যা ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে লাল ফৌজের (রেড আর্মি) আমু দরিয়া পেরোনোর মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌঁছায়। ঘটনার প্রেক্ষাপট থেকে জন্ম নেওয়া বাচ্চা সাকার সরকার ছিল খুবই নড়বড়ে; নিশ্চিতভাবেই বাইরের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া যার টিকে থাকা সম্ভাবনা ছিল না।

বাচ্চা সাকার অধিকাংশ সাথি ছিল তাজিক-উজবেক বংশোদ্ভূত, যাদের গোত্রগুলো রুশ-আফগান সীমান্তে বসবাস করত। সে ক্ষমতাসীন হয়ে সাবেক সরকারের নীতি বর্জনের ঘোষণা দিলে শক্তির জোরে কাবুলের মসনদে আসা সরকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মস্কোয় রুশ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের একটি পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাচ্চা সাকার সরকার আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি চাষের উপযুক্ত কামলা হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়।

এদিকে আমানুল্লাহ খান তাঁর ক্ষমতার বৈধতার দাবি প্রত্যাহার করেননি। তিনি ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কান্দাহারকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে ওঠেন। ইঙ্গ-আফগানযুদ্ধের নায়ক জেনারেল নাদির খানকে কান্দাহারে ডেকে নিজের সঙ্গা দিতে উৎসাহী করে তোলেন আমানুল্লাহ। বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী করার অঙ্গীকার দেন তাঁকে। আমানুল্লাহ খান তখন একইসঙ্গে দুই বড় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার জন্য জেনারেল নাদির খান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বোম্বে (মুম্বাই) পৌঁছে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময় করছিলেন, অপরদিকে গোলাম নবি ও গোলাম সিদ্দিক মস্কোয় সোভিয়েত রাশিয়ার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ট্যালিন ও প্রাইম গফের মতো সমাজবাদী নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তারা।

আফগান ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়েই নিজেদের পাল্লা ভারী করতে সোভিয়েত রাশিয়ার শরণাপন্ন হয়। বিষয়টি এটাই প্রমাণ করছিল, রাশিয়া তখন আফগান রাজনীতিতে কতটা প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলেছিল।

লাল ফৌজ আমানুল্লাহ খানের পক্ষে

উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা আপনাপন অবস্থান তুলে ধরলে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য তুলনামূলক পর্যালোচনা করা সহজ হয়ে ওঠে। তারা বাচ্চা সাকা ও আমানুল্লাহকে সহজেই তুলনা করে ফেলে। অবশেষে স্বাভাবিকভাবেই আমানুল্লাহ খানকে সহায়তার সিদ্ধান্ত নেয় সোভিয়েত রাশিয়া। কেননা, আমানুল্লাহ আগে থেকেই ব্রিটিশবিরোধী এবং রুশপন্থি হিসেবে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর সহায়তায় সোভিয়েত রাশিয়া এত দূর এগিয়ে যায় যে, প্রয়োজনে তারা বাচ্চা সাকাকে সরিয়ে তাঁকে ক্ষমতাসীন করতে সরাসরি আমু দরিয়া পেরিয়ে আফগানিস্তানে লাল ফৌজের অনুপ্রবেশ ঘটাতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। রাশিয়ার এমন সহায়তার আশ্বাস পেয়ে ২৫ মার্চ ১৯২৯ তিনি কান্দাহার থেকে কাবুল অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তখন হাজারা গোত্রের বড় একটি দল তাঁর সঙ্গা দিচ্ছিল।

এদিকে তার প্রতিনিধি গোলাম নবি মস্কো থেকে ফিরে এসে উত্তর-আফগানিস্তানে ৮ হাজার সেনার একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। রুশ জেনারেল প্রাইম গফ লাল ফৌজের সঙ্গে অবস্থান করছিল। ৩০ এপ্রিলে গোলাম নবি মাজার-ই-শরিফ দখল করে কাবুল অভিমুখে এগিয়ে যান। পথে খলম গিরিপথে বাচ্চা সাকার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে বাচ্চা সাকার বাহিনীর ৩ হাজার সেনা নিহত হয়।

আফগান জনগণ ততদিনে জেনে যায়, আমানুল্লাহর পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন রয়েছে। তাই বাচ্চা সাকা জনগণের আবেগ কাজে লাগিয়ে তার সরকারের নিরাপত্তা এবং

আমানুল্লাহ খানের সহযোগীদের মোকাবিলার জন্য জনগণের উদ্দেশে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা আমানুল্লাহর ওপর অভিশাপ ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছেন। সে ইহ ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্তই থাকবে। আপনারা দাঁড়িয়ে যান। মদখোর বেদীন গোলাম নবিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করুন।'

আমানুল্লাহর হতাশা ও স্বেচ্ছানির্বাসন

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, আমানুল্লাহ খান যুদ্ধ জিতে যাচ্ছেন; কিন্তু বাচ্চা সাকার কথা 'সে সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে' সঠিক প্রমাণিত হয়। তিনি ধারাবাহিক কয়েকটি বিজয়ের পর গজনিতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তিনি পরাজয়বরণ করেন। এই পরাজয়ে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েন যে, আফগানিস্তানকে চিরবিদায় জানিয়ে ২৩ মে কান্দাহার হয়ে হিন্দুস্থানে চলে যান। হঠাৎ করে এভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করা ছিল তাঁর বালকসুলভ একটা সিদ্ধান্ত। কেননা, তখনো উত্তর দিকে তাঁর সহযোগী গোলাম নবি ও রুশ জেনারেল সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তেমনি তাঁর নির্ভরযোগ্য জেনারেল নাদির খানও পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তানে একটি বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। তিনি দেশ ছাড়তেই তাঁর পক্ষে লড়াইকারীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গোলাম নবি হতাশ হয়ে প্রথমে মাজার-ই-শরিফ, এরপর সেখান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় চলে যান।

আফগান রাজনীতির নবনক্ষত্র জেনারেল নাদির খান

ওই যুগসন্ধিক্ষণে জেনারেল নাদির খান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। তিনি আমানুল্লাহ খানের প্রতিনিধি হিসেবে হিন্দুস্থান গিয়েছিলেন এবং ব্রিটেনকে আস্থায় এনে ৮ মার্চ আফগানিস্তান ফিরে আসেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিল তিনি খানের জন্য কাবুল পদানত করতে চাইছেন; কিন্তু কিছু কার্যকারণ প্রমাণ করছিল কাবুল দখল করে তিনি নিজেই ক্ষমতার মঞ্চে বসতে চাচ্ছেন। কেননা, তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে খান অথবা বাচ্চা সাকা কারও সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করে বরং তামাশা দেখে যাচ্ছিলেন। পরে গজনিতে পরাজিত হয়ে খান হিন্দুস্থানে পালিয়ে গেলে তিনি তার বাহিনী নিয়ে কাবুল অভিমুখে এগিয়ে যান। তখন পাক-আফগান সীমান্তের গোত্রগুলোর প্রচুর যোদ্ধা তাঁর সঙ্গ দেয়। সেখানকার জনগণ জেনারেল নাদির খানকে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদের বিজয়ী বীর হিসেবে মনে করত।

নিহত বাচ্চা সাকা : ক্ষমতার মঞ্চে জেনারেল নাদির খান

জেনারেল নাদির খান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন বাচ্চা সাকার বাহিনীকে পরাজিত করে

ধীরে ধীরে এগিয়ে ১৫ অক্টোবর কাবুলে ঢুকে পড়েন। ১৬ অক্টোবর তিনি কাবুলের রাজমসনদে আসীন হন। বাচ্চা সাকা তখন মাত্র নয় মাস ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করে পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে পালিয়ে যান। কিন্তু নাদির খান তাকে ক্ষমার প্রলোভন দেখিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করেন। এরপর তাকে তার উচ্চ পর্যায়ের নেতারাসহ কাবুলে ডেকে কামানে বেঁধে উড়িয়ে দেন।

ক্ষমতা সংহায়িত করতে নাদির খান একটি লয়া জিরগা আয়োজন করেন। জিরগায় ২৮৬ গোত্রপতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁকে শাসক হিসেবে মত দেন। এরপর সাবেক শাসক ও তাঁর আস্থাভাজনদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন নাদির খান। ফলে আমানুল্লাহ খানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেও বিধিনিষেধ আরোপ করেন তিনি। তাঁর স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। হত্যা করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নেতাকে। আর তাই আমানুল্লাহ খান কিছুদিন হিন্দুস্থানে অবস্থান করে ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হন এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন।

নাদির খানের মন্ত্রিসভা

জেনারেল নাদির খান এখন শাহ নাদির খান। তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধে যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে শুধু আফগান জনগণ নয়; বরং ডুরান্ড লাইনের ওপারের সীমান্ত-এলাকার কাবায়েলি ও হিন্দুস্থানি মুসলিমসমাজও তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। তাঁর ওপর আফগানদের উচ্চাশা ছিল অপরিসীম। তিনিও যথাসাধ্য তা পূরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে নাদির শাহর শাসনামল ছিল শান্ত ও নিরুপদ্রব; তবে সাবেক শাসকদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে যারা তাঁর সরকারের বিরোধী ছিল, তাদের ওপর তিনি ছিলেন ভীষণ খড়গহস্ত। হ্যাঁ, আমানুল্লাহ খানের বংশের যারা তাঁকে সহযোগিতা দিচ্ছিল, তাদের তিনি যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে কসুর করেননি। যেমন : আমানুল্লাহ খানের সৎভাই শাহজাদা আসাদুল্লাহ খানকে শাহি বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ দেন। এ ছাড়াও সাবেক সরকারের আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যেমন : সরদার শাহ মাহমুদ খানকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সরদার আহমাদ খানকে রাজসভা-বিষয়ক মন্ত্রী, সরদার ফয়েজ মুহাম্মাদ খানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মির আতা মুহাম্মাদ খান সংসদ-সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেন। এই সংসদ মূলত সরকারের রাজসভা তথা মজলিসে শুরা বা আমাদের পরিভাষায় পার্লামেন্টের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। তবে এ সকল মন্ত্রী আর নেতার থেকেও সবচেয়ে বড় তথা প্রধানমন্ত্রীর পদে নাদির শাহ তাঁর ভাই সরদার হাশিম খানকে আসীন করেন। এ ছাড়া যাবতীয় কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ মূলত তাঁর হাতের মুঠোয়ই থাকে। বর্তমানের ইউরোপের যেকোনো

প্রেসিডেন্টের অধিকার থেকে তার অধিকার তখন মোটেও কম ছিল না।

নাদির শাহ সে-সকল যোগ্য-অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও উপদেষ্টা বানাতে কার্পণ্য করেননি, যারা নিকট-অতীতে আফগানিস্তানে এসে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ১১ জন শিক্ষার্থী সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে আফগানিস্তানে চলে এসেছিল। তাদের মধ্যে আল্লাহ নাওয়াজ খান নামের একজনকে নাদির শাহ জনকল্যাণমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন। তিনি বাচ্চা সাকার বিরুদ্ধে নাদির শাহর সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একইভাবে হিন্দুস্থানের আবদুল্লাহ ওরফে শাহজি আফগান সামরিক বাহিনীর উপ-সেনাপ্রধান ছিলেন। নাদির শাহর ভাই শাহ অলি খানও ছিলেন প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বে।

নুরুল মাশায়িখের প্রত্যাবর্তন

নাদির শাহর প্রশংসিত একটি পদক্ষেপ ছিল—তিনি সাবেক সরকারের আমলে নির্বাসিত খ্যাতিমান সুফি নুরুল মাশায়িখ ফজল উমর মুজাদ্দিদিকে কাবুলে ডেকে নিয়ে আসেন। নুরুল মাশায়িখ দেশান্তরের শিকার হওয়ার পর কিছুদিন বোম্বাই (মুম্বাই) অবস্থান করেন। সেখানে থাকাকালে 'মুল্লায়ে শোর' নামে খ্যাত হন তিনি। নাদির শাহ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদায় ফিরিয়ে আনার পর আইন ও বিচার-মন্ত্রণালয়ে অধিষ্ঠিত করেন। ব্যক্তিগতভাবে নাদির শাহ তাঁর প্রতি ছিলেন দারুণ অনুরক্ত। কারণ, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের জিহাদে নুরুল মাশায়িখ কাবায়েলি যোদ্ধাদের ইংরেজবিরোধী যুদ্ধে উৎসাহী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ছাড়া অভিযান পরিচালনার সময়ও তিনি নাদির শাহর সঙ্গে ছিলেন।

নাদির শাহর কর্মনীতি

নাদির শাহ আমানুল্লাহ খানের শরিয়তবিরোধী প্রগতিবাদী সেসব নীতিকে বাড়তে দেননি, যেগুলোর বিরুদ্ধে আফগান আলিম ও জনসাধারণ প্রতিবাদী ছিলেন। তবে এমন কিছু বিষয়, যেগুলো সাবেক শাসকদের যুগ থেকে সরকারি নিয়মনীতিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল, যেগুলো হুট করেই পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না, সেগুলো তিনি আপন অবস্থায়ই রাখেন।

ব্যক্তিগতভাবে নাদির শাহ ছিলেন উত্তম চরিত্রবান, ইসলামপ্রিয়, স্বদেশপ্রেমী এক নিষ্ঠাবান মানুষ। কিন্তু তাঁর কাছে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য নির্ধারণের মতো দক্ষ জনবল ছিল অনুপস্থিত। আফগানিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করলেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একঝলক

তখন কাবুলের বিখ্যাত মাদরাসা ছিল 'দারুল উলুম আরাবি'। এখানে দূর-অতীতের শিক্ষাকারিকুলাম তথা দারসে নিজামির আলোকে শিক্ষা দেওয়া হতো। এ ছাড়া আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তখন বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেসব প্রতিষ্ঠানে শিল্প, সংস্কৃতি, স্বাবলম্বিতা অর্জন, কৃষি, চিকিৎসা, মুক্তি, ওষুধ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো ব্যবস্থাপনা ছিল। আফগানিস্তানে তখন মাকতাব (প্রতিষ্ঠান) বলে কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান বোঝানো হতো; প্রাইমারি পর্যায়েরগুলো নয়।

বাচ্চাদের কুরআনুল কারিম হিফজ করানোর জন্য ছিল দারুল হুফফাজ। আর মাকতাবে সানায়ে নাফিসা মূলত কলাবিজ্ঞান ও আর্টের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে গালিচা তৈরি, তাতে নকশা করা, চিত্রাঙ্কণ ও মিস্ত্রির কাজ শেখানো হতো। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল আমানুল্লাহ খানের প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন কলেজ তথা মাকতাবে হাবিবিয়া হাবিবুল্লাহ খানের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাকতাবে ইসতিকলালে ফরাসি এবং মাকতাবে নাজাতে জার্মান ভাষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কলেজদুটো ছিল বাদশাহ আমানুল্লাহ খানের স্মৃতিস্মারক। কাবুল ও পাগমানের মধ্যখানে অবস্থিত মাকতাবে জারাআত তথা কৃষি-কলেজ ছিল বাগান ও কৃষি-উন্নয়নের কেন্দ্র। আর মাকতাবে দারুল মুআল্লিমিন তথা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজটি টিচার্স ট্রেনিং একাডেমি হিসেবে ব্যবহার হতো।

মেডিক্যাল ও মিলিটারি কলেজ

মাকতাবে তিব্বি তথা মেডিক্যাল কলেজটি শাহ নাদির খান তাঁর শাসনামলে প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটি পর্যায়ক্রমিক উন্নতির মাধ্যমে বর্তমান কাবুল মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির রূপ পরিগ্রহ করেছে। শুরু থেকেই এই কলেজের শিক্ষামান উন্নত বিবেচিত হয়ে আসছিল। এ ছাড়াও তিনি 'নাদিরি ইয়াতিমখানা' নামে ইয়াতিমদের জন্য উন্নতমানের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যেখানে আবাসিক ব্যবস্থাও ছিল।

সামরিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি মাকতাবে হারবিয়া তথা মিলিটারি কলেজের ভিত্তি রাখেন। এর জন্য তিনি সাদ্দুজাই শাসকদের কেন্দ্রীয় দুর্গ 'বালা হিসার'-কে চয়ন করেন। বালা হিসার ছিল কাবুলের প্রাচীনতম দুর্গের একটি। চেঙ্গিস খানের আক্রমণের সময়েও এটি বিদ্যমান ছিল। ১৩৯৬ হিজরি—৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা কাবুলে হামলা চালালে কামানের গোলার আঘাতে দুর্গটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন একে পাথরের স্তূপ আর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছিল না। নাদির শাহ একে নতুনভাবে নির্মাণের লক্ষ্যে এখানে মিলিটারি কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। আফগানিস্তানের জাতীয় দিবসে তিনি নিজ হাতে সেখানে কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করেন। এরপর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও সাধারণ জনতা কোদাল আর বেলচা দিয়ে ধ্বংসাবশেষকে সমতলে পরিণত করে। কিন্তু এতসবের পরও নাদির শাহ জীবদ্দশায় এর নির্মাণকাজ শুরু করতে পারেননি।

ক্ষতিকর দিক

শিক্ষাব্যবস্থার উল্লিখিত দিক বিবেচনায় স্পষ্ট হয়, নাদির শাহ ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ আর উপদেষ্টাদের মনমস্তিষ্কে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার আবেগ থাকলেও এর জন্য সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট কোনো কর্মপন্থা তাঁদের ছিল না। অপরদিকে জার্মান, ফরাসি আর ইংরেজি ভাষা শেখানোর কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি চলে যাচ্ছিল। পরে তাদের অধিকাংশই সেখানকার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সরকারপর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিই ছিল দেশের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

সংবাদমাধ্যম

সময়টা ছিল মিডিয়াযুদ্ধের প্রারম্ভিক দিকের। ঘরে ঘরে পত্রিকাচর্চা ও রেডিয়ো দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠছিল। তবে নাদির শাহর যুগে আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যম দুয়েকটি পত্রিকাতেই সীমিত ছিল। হাবিবুল্লাহ খানের শাসনামলে *সিরাজুল আখবার*, আমানুল্লাহ খানের সময়ে *আমানে আফগান*, বাচ্চা সাকার *হাবিবুল আখবার* এবং নাদির শাহর আমলে *ইসলাহ* নামক পত্রিকাই জনপ্রিয় পত্রিকা গণ্য হতো। তবে নাদির শাহ প্রেসব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেন। জার্মানি থেকে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিনারিজ নিয়ে আসেন। ফলে আফগানের প্রেসব্যবস্থাপনা এতদঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম প্রেসব্যবস্থাপনা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। *ইত্তিফাকি ইসলাম*, *তুলুয়ি আফগান*', *বেদার*, *মাজাল্লায়ি কাবুল* এবং *হাইয়া আলাল ফালাহ*'র মতো মানসম্পন্ন সাময়িকী ও পত্রিকা নাদির শাহর শাসনামলেই প্রকাশিত হতে থাকে।

আলি আবাদের দারুস সিহহাত

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজিত করার সম্মাননাস্বরূপ আমানুল্লাহ খান নাদির শাহকে কাবুল ও পাগমানের মধ্যবর্তী আলি আবাদ নামক জায়গিরটি প্রদান করেন। নাদির শাহ তাঁর শাসনামলে জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে এখানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় অবস্থান নিয়ে ফুসফুসের সমস্যাজনিত রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠত।

সরকারি পোশাক

হাবিবুল্লাহ খানের যুগ থেকেই আফগান শাসকশ্রেণি, সরকারি কর্মকর্তা, নেতা ও অফিসাররা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির মিশেলে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। তারা মাথা ছাড়া পুরো শরীরে ইউরোপীয় পোশাক তথা কোট, টাই পরতেন। খোদ নাদির শাহর পোশাক-পরিচ্ছদও এ ধরনেরই ছিল। সমাজের উঁচুশ্রেণির অনুকরণে সাধারণ নাগরিকজীবনেও নেমে এসেছিল পশ্চিমা সংস্কৃতির ব্যাপক অনুকরণপ্রিয়তা। সরকারি চাকরিজীবী থেকে শুরু করে সেনা, পুলিশ, ড্রাইভার এমনকি চৌকিদার পর্যন্ত এ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

যাতায়াতব্যবস্থা

সীমিত উপকরণ থাকার পরেও নাদির শাহ তার শাসনামলে যোগাযোগব্যবস্থায় বিশেষ দৃষ্টি দেন। কাবুল থেকে মাজার-ই-শরিফ এবং একইভাবে পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়। সাধারণত সড়কগুলো ছিল নিরাপদ। চুরি-ডাকাতির ঘটনা তখন অনেকখানি হ্রাস পায়। ফলে এক জাপানি পর্যটক মোটরগাড়ি চালিয়ে পুরো আফগানিস্তান ভ্রমণশেষে নিরাপত্তা-পরিস্থিতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

নাদির শাহর পররাষ্ট্রনীতি ছিল নিরপেক্ষ, সংযমী এবং পারস্পরিক সহাবস্থাননীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সাবেক সরকারদের যুগে ব্রিটিশ ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা আর জুলুমবাজি দেখার পাশাপাশি তাদের মানোবাসনা সম্পর্কেও ছিলেন সম্যক অবহিত। নাদির শাহ জানতেন, বহুকাল ধরে চলমান বিদ্রোহ আর যুদ্ধের মারখাওয়া আফগানিস্তান যতদিন-না নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছে, ততদিন সে নতুন কোনো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। এ জন্য তিনি ব্রিটেন ও রাশিয়ার সঙ্গে আগের চুক্তির ওপর শ্রদ্ধাশীল থাকেন। ২৪ জুন ১৯৩১ নাদির শাহ রাশিয়ার সঙ্গে আমানুল্লাহ খান কর্তৃক ১০ বছর আগে সম্পাদিত সেই চুক্তি নবায়ন করেন, সোভিয়েত বিপ্লবের জনক লেনিন যার খসড়া তৈরি করেছিল। এ যেন ছিল ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত চুক্তির সত্যায়ন। ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশবিরোধী হলেও ব্রিটেনকে তিনি শান্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। ক্ষমতাসীন হওয়ার কয়েক মাস পর ৬ মে ১৯৩০ ব্রিটেনের সঙ্গে সেই চুক্তি নবায়ন করেন, যেটি ১২ অক্টোবর ১৮৯৩ আমির আবদুর রাহমান ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। এটি সেই চুক্তি, যার ফলে হিন্দুস্থান ও আফগান সীমানার মধ্যখানে ডুরান্ড লাইনের জন্ম হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতির ক্ষতিকর কিছু দিক

শাহ নাদির খান আফগানিস্তানের ইতিহাসে তথাকথিত শেষ 'পশ্চাৎপন্থি বাদশাহ' হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মডার্নিজমের ঘোর বিরোধী। তাই আমানুল্লাহ খানের আধুনিকায়ন-চেষ্টার স্থলে আফগানিস্তানকে তার পুরানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আমানুল্লাহর সহযোগীদের অবদমিত করে রাখার প্রচেষ্টায় সফল হন।

যেহেতু বিগত শতাব্দীকাল ধরে আফগানিস্তান শাসনকারী বারেকজাই-পরিবারের হাড়ের ভিত্তির ওপর তার রাজপ্রাসাদ রচিত হয়েছিল, তাই অনিবার্যভাবে তিনি ওই পরিবার ও তাদের সহযোগীদের থেকে শত্রুতার বেশি আশঙ্কা করছিলেন। এই আশঙ্কায়ই তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তবে এই প্রচেষ্টাই তাঁর সরকারের দ্রুত পতনের কারণ হয়ে ওঠে। তাঁর শাসনামল দীর্ঘায়িত হলে তিনি একজন সফল শাসক প্রমাণিত হতেন। কিন্তু তাঁর মেয়াদ ছিল খুবই অল্প। তা ছাড়া ভালো উপদেষ্টা আর অভিজ্ঞ সাথিও তিনি পাননি। ফলে তাঁকে তাঁর ভাই শাহ অলি উল্লাহ, শাহ মাহমুদ এবং সরদার হাশিমের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল। আর তাঁর তিন ভাইই ছিলেন সামরিক ব্যক্তি, তাই স্বভাবতই তাঁরা ছিলেন কঠোরনীতির পক্ষে। রাষ্ট্রের পুরো নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতেই ছিল। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই নাদির খানের শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়নি।

রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্ত-দ্বন্দ্ব

নাদির খানের শাসনামলের কিছুদিন রাশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত-সমস্যার পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। কারণ ছিল—ইবরাহিম নামের উত্তরাঞ্চলের এক গোত্রপতি বার বার সোভিয়েত সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালাত। সে আফগানিস্তানকে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছিল। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের জুনে সোভিয়েতবাহিনী তাকে ধাওয়া করে আমু দরিয়া পেরিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে। এভাবেই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত-দ্বন্দ্বের শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়ার অনুরোধে আফগান সরকার ইবরাহিম বেগকে আফগান সীমান্ত থেকে বিতাড়িত করে রাশিয়ার শাসনাধীন এলাকায় তাড়িয়ে দেয়। রুশরা তখন তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে ফেলে। আর এভাবেই সীমান্ত-দ্বন্দ্ব শেষ হয়।

নাদির শাহর শাসনের পরিসমাপ্তি

মৌলিকভাবে নাদির খান ছিলেন পাক্কা মুসলমান। আকাবিরে দেওবন্দের সঙ্গে ছিল

তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জুফর হাসান আইবেক তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, 'নাদির খান মাওলানা রাশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির হাতে বায়আত ছিলেন। কিন্তু আফসোস। এই সুযোগ্য শাসকের শাসনকাল মাত্র চার বছর স্থায়ী হয়।'

তাঁর শাসনামলের শেষদিকে আমানুল্লাহ খানের অনুগত চারখি গোত্রটি তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে। এদিকে নাদির খানের অনুগত গোত্র মুসাহিবান ওদের বিরোধিতায় নেমে আসে। উভয় গোত্রের পারস্পরিক সংঘাত দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির জন্ম দেয়। এ সময় মডার্নিজমের দাবিদার লোকেরাও নাদির শাহর বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দিতে চেষ্টা চালায়। তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর 'দিলকুশা মহলে' ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন নাদির খান। ওই অনুষ্ঠানে এক ছাত্র গুলি চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলে। এভাবেই জাতি দ্রুত একজন সুযোগ্য শাসকর সেবা-বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁর পরে পশ্চিমা চিন্তাধারা লালনকারী ইসলামবিদ্বেষী অযোগ্য শাসকদের ক্ষমতায় আসা-যাওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়, যা আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎকে গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

জহির শাহ ওরফে জাহিরি শাহ

নাদির শাহর পর তাঁর তরুণ ছেলে জহির শাহকে রাজমসনদে আসীন করা হয়। রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর কোনো পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না। এসবের সবকিছু তাঁর তিন চাচা শাহ মাহমুদ, শাহ অলি ও সরদার হাশিমই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। জহির শাহ—যিনি আদতে ছিলেন জাহিরি শাহ (বাহ্যিক বাদশাহ)—এ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, চাচারা রাষ্ট্রপরিচালনা করে তাঁকে এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত করে রাখছেন। চাচাদের পর তিনি চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি সরদার দাউদ খানের ওপরই বেশি নির্ভর করতেন। তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পালনের চেয়ে আনন্দভ্রমণ, বিনোদন ও শিকারের প্রতি বরং বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর শাসনামলের শুরুর দিকে বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে এই মুহূর্তে তেমন কিছু আশা করছিল না। কেননা, তখন স্ট্যালিন পূর্ব-ইউরোপের দিকে বেশি মনোযোগী ছিল। এদিকে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিও তখন নিরপেক্ষ ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

জহির শাহর ক্ষমতারোহণের ষষ্ঠ বছরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। জার্মানির শাসক এডলফ হিটলার পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী তৎপরতা এবং অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া তার বিরুদ্ধে চলে গেলে যুদ্ধটি

বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। পরে জাপান জার্মানির সাহায্যে যুদ্ধমাঠে ঝাঁপিয়ে পড়লে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া এই ভয়ংকর যুদ্ধ দেড় কোটি মানুষের মৃত্যু এবং কয়েক ডজন রাষ্ট্রের অর্থনীতি তছনছ করে দিয়ে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মানবেতিহাসে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে জাপানকে চরম ধাক্কা দেওয়ার মাধ্যমে তার পরিণতিতে পৌঁছায়। ওদিকে রাশিয়ায় তুফানের গতিবেগে প্রবেশকারী হিটলারও বিভীষিকাময় শৈত্যপ্রবাহের কারণে পেছাতে বাধ্য হয়। পরে সে আত্মহত্যা করে মারা যায়।

হিন্দুস্থান থেকে ব্রিটিশদের বিদায়

ছয় বছরব্যাপী চলা এই বিশ্বযুদ্ধ পুরো বিশ্বে এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব রেখে যায়। যুদ্ধে জড়িত ও তাদের সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি একেবারে দেউলিয়া হয়ে যায়। তবে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকায় আফগানিস্তান বড় রকম ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। এরপর ব্রিটিশরা হিন্দুস্থান থেকে তাদের গাঁটরি গোল করে নিলে আফগানিস্তান অস্বাভাবিক নিরাপত্তা পেয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত ওই পরাশক্তিকে আর 'আমার দেশে কখনো সূর্যাস্ত হয় না' বলে গর্ব করার উপযোগী রাখেনি। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশরা হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে যায়, তখন আফগান সীমান্তের দখলকৃত এলাকাও ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে আফগানিস্তান তার পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে ব্রিটিশভীতি থেকে চিরমুক্তি পায়।

সীমান্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ

তবে এর পরপরই সীমান্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক নতুন সমস্যা দেখা দেয়। খায়বারপাস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত, যা ১৩ নভেম্বর ১৮৯৩ 'ডুরান্ড লাইন' চুক্তির নামে আফগানিস্তান থেকে পৃথক করা হয়, ওই বিস্তৃর্ণ এলাকা বংশীয়, ভাষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল আফগানিস্তানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। তাই আফগানরা চাচ্ছিল ব্রিটিশ সরকার চলে যাওয়ার পর তারা ওই এলাকা পুনরায় পেয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিটেন বলছিল, চুক্তির ফলে আফগানিস্তান ওই এলাকার মালিকানা হারিয়ে ফেলেছে। আমির আবদুর রাহমানের পর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে হাবিবুল্লাহ খান, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে আমানুল্লাহ খান এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে শাহ নাদির খান এই চুক্তি নবায়ন করেছেন; তাই আফগানিস্তান এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখে না।

উপমহাদেশ বিভাজনের আগে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা রেফারেন্ডাম বা গণভোটের

আয়োজন করেছিল। আফগানিস্তান চাচ্ছিল রেফারেন্ডাম এই প্রশ্নের সমাধানে হোক—সীমান্ত-এলাকার মানুষ আফগানিস্তানের সঙ্গে একীভূত হতে চায়, নাকি স্বাধীন সার্বভৌম নতুন একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটাতে চায়? কিন্তু ব্রিটিশরা আফগান সরকারের দাবি নাকচ করে রেফারেন্ডামে প্রশ্ন রাখে, আপনারা অখণ্ড হিন্দুস্থানের, নাকি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চান?

সীমান্ত প্রদেশের আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমরা মুসলিম লিগের আন্দোলনে প্রভাবিত ছিলেন। তখন খান আবদুল গাফফার খানের জনপ্রিয়তা কমে এসেছিল। তাই সীমান্ত-এলাকার পাখতুনরা প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়।

পাক-আফগান সম্পর্কে টানাপোড়েন

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান অস্তিত্বে আসে। আফগানিস্তানের পূর্ব সীমান্ত প্রায় শতাব্দীকাল পর একটি মুসলিম সরকারের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। কিন্তু আফগান শাসক জহির শাহ পাখতুন এলাকা পাকিস্তানের অঙ্গীভূত থাকাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর তিনি ডুরান্ড লাইন চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে মনে করে সীমান্ত প্রদেশকে নিজেদের অঞ্চল দাবি করা অব্যাহত রাখেন। এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই পাক-আফগান সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। বাস্তবতা হলো, এই তিক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট ছিল ব্রিটিশদের তৈরি। যেভাবে তারা চলে যাওয়ার সময় কাশমির ইস্যু নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতকে জ্বলন্ত আগুনে রেখে যায়, একইভাবে পরিকল্পিত চিন্তাধারার আওতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ পাখতুন অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশের ব্যাপারটিও অমীমাংসিত রেখে যায়, যাতে বিষয়টি প্রতিবেশী দুই মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদের কারণ হয়ে থাকে।

দুঃখজনকভাবে পাকিস্তান সরকার থেকে হিতকামনার চিরাচরিত আবেগ প্রদর্শন করা হলেও আফগানিস্তানকে আস্থায় নিয়ে আসার কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কয়েক দশক পর্যন্ত পাক-আফগান সম্পর্ক উন্নত না হয়ে বরং অবনমনের দিকে এগিয়ে যায় এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে দুই রাষ্ট্র সীমান্ত নিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে পাকিস্তান আফগানিস্তানের জন্য বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তের ফলে আফগানিস্তানের অর্থনীতি ও বাণিজ্য চরম মার খায়। তখন বাধ্য হয়ে তাকে আবারও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়।

রুশ-আফগান নতুন সম্পর্ক

অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে যে আফগানিস্তানের ওপর রাশিয়ার মনোযোগ হ্রাস

পেয়েছিল; বিশেষ করে রাশিয়ার শক্ত প্রতিপক্ষ ব্রিটিশরা এ অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার পর পুনরায় তা রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে পাক-আফগান সীমান্ত সংঘর্ষের পর পাকিস্তান আফগানিস্তানের জন্য তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিলে ওই বছর আফগানিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি ছিল রাষ্ট্র দুটির নৈকট্যের জন্য মাইলস্টোন। পরে দিন দিন এই সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। এভাবে আফগানিস্তান তার অবস্থান হারিয়ে পরিপূর্ণভাবে রুশ ব্লকে ঢুকে পড়ে। এদিকে স্বাধীনতার পর পাকিস্তান আমেরিকার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। পাকিস্তানকে তখন মার্কিন ব্লকের মধ্যে গণ্য করা হতে থাকে। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের প্রভাব পাক-আফগান সম্পর্কে প্রতিফলিত হতে থাকে এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বও দিন দিন বাড়তে থাকে।

সাহায্য ও উন্নতির আড়ালে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন আফগানিস্তান সফরে আসে। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের মতো পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহে কমিউনিজমের উত্থান ঘটানো। তবে সাহায্য ও বিশেষ সুবিধার সোনালি জাল দ্বারা রাশিয়া শিকার ধরার চেষ্টা করছিল। ওই সফরে আফগানিস্তানকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি আফগানিস্তানে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন-প্রকল্প চালুর ঘোষণাও দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ব্রিজ ও মহাসড়ক নির্মাণের পাশাপাশি হিন্দুকুশ অতিক্রমকারী সালাং গিরিপথে টানেল নির্মাণ এবং বাগরাম বিমানবন্দর নির্মাণপ্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলত এসব উন্নয়ন-প্রকল্পের আড়ালে আফগানিস্তান দখলের চিন্তা ৫০-এর দশক থেকেই রুশ শাসকদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

রাশিয়া—যারা জার শাহির রূপে অতীতে মুসলিমবিশ্বের ওপর তলোয়ার হয়ে ঝুলছিল, বিংশ শতাব্দীতে কমিউনিজমের পতাকাবাহী হিসেবে আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাচেতনা লালন করছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লব, যা মধ্য-এশিয়াকে দুমড়ে-মুচড়ে আফগান সীমান্তে এসে থেমে গিয়েছিল, এবার সকল সীমা পেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আফগানিস্তানে চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো এই বিপ্লবের পথই সুগম করছিল মূলত। সুচিন্তিত লক্ষ্য সামনে রেখে রাশিয়া ব্রিজগুলো এত সুদৃঢ় ও প্রশস্ত আকারে তৈরি করছিল, যাতে এগুলোর উপর দিয়ে অনায়াসে বড় বড় ট্রাক, ট্যাংক আর ভারী যুদ্ধাস্ত্রবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে পারে। বাগরাম ও শিন্দান্দে এত সুপ্রশস্ত বিমানবন্দর তৈরি করা হয়, যাতে রুশ বিমানবাহিনী এগুলো সহজে ব্যবহার করতে পারে।

কয়েক বছর পর রাশিয়া আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে একটি পদক্ষেপ নেয়। তারা আফগান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তাদের ওখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। ইতিপূর্বে আফগান সামরিক অফিসারদের জার্মানি অথবা তুর্কি অফিসাররা সামরিক প্রশিক্ষণ দিত। এবারই প্রথমবারের মতো আফগান বীর সেনারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে এমন একটি দেশে যাচ্ছিলেন, যাদের ইসলামবিরোধিতা কারও কাছে গোপন বিষয় ছিল না। আফগান অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের এ পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েত সরকার ও জহির শাহর ডান হাতখ্যাত সরদার দাউদ খানের মস্তিষ্কজাত। জহির শাহ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তিনি আসলে এসব ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি শুধু বাদশাহি পরিচালনা ও ভোগবিলাসিতা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন।

সরদার দাউদ ও জহির শাহ

সরদার দাউদ খান ছিল শাহি সেনাদলের কমান্ডার। জহির শাহ তার যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ওপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। সে আফগান রাজনীতিতে তখন সামনে আসে, যখন জহির শাহ ক্ষমতাগ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন। দাউদ তখন পুরোপুরিভাবে তার সঙ্গ দেয়। এরপর বিগত ২০ বছর ধরে নামকাওয়াস্তে ক্ষমতায় থাকা জহির শাহ ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সর্বময় ক্ষমতাধর শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সকল অধিকার নিজ হাতে তুলে নেন। এসব ছিল সরদার দাউদের কর্মপরাকাষ্ঠার ফসল। কিন্তু জহির শাহ সেসব অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। তিনি সরদার দাউদের অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ তাকে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে নিজে আগের মতো রাজনৈতিক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যান! এভাবে দাউদ খান রাষ্ট্রের সাদা-কালো সবার ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে।

সরদার দাউদ খান ছিল জহির শাহের চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি। গোলগাল চেহারা, কেশহীন মাথা, মোটা ঠোঁট এবং ভারী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি দেখতেও কিছুটা বিশ্রী ছিল। তবে তার মস্তিষ্ক ছিল খুবই তেজোদীপ্ত। সে ছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং একজন পাঁড় রাশিয়াভক্ত। সে-ই ছিল প্রথম ব্যক্তি, যে আফগানিস্তানের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করে একে সোভিয়েত ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সে তার মন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় বছর তথা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আফগান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে রুশ শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া শুরু করে। জনসাধারণ এই পদক্ষেপ সন্দেহ ও শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখছিল। কেননা, ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে রুশদের চাকরি দেওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে এড়িয়ে যাওয়া হতো। কিছুদিন পরে সরদার দাউদ সামরিক অফিসারদের

উচ্চতর প্রশিক্ষণের নিমিত্তে রাশিয়ায় পাঠানোর পরিকল্পনায়ও মনজুরি দেয়। রুশ শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদান এবং সামরিক অফিসারদের রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষণগ্রহণ পরবর্তীকালে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়া অধিকাংশ অফিসার মনের অজান্তেই কমিউনিজমের পূজারি হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্বস্ত হয়ে রাশিয়ার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নেয়। ১৯৭৩ ও ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এই অফিসারদের ব্যবহার করেই অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। ফলে রাশিয়া জন্য আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনার সব দরজার পাট একটা একটা করে খুলে যায়।

দাউদ খানের অপসারণ

প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান তার প্রধানমন্ত্রিত্বের ১০ বছর মেয়াদে আফগানিস্তানকে একটি রুশ কলোনিতে পরিণত করার সবরকম চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আত্মমর্যাদাশীল আফগানজাতি সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিটি মন্দ পদক্ষেপের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। তার বিরুদ্ধে জনতার ঘৃণা ক্রমশ বাড়ছিল। খোদ বাদশাহ জহির শাহ দেখতে পাচ্ছিলেন পানির লেবেল দিন দিন উঁচু-নিচু হতে চলেছে। তখন প্রথমবারের মতো তিনি তাঁর কর্তৃত্ব ব্যবহার করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে সরদার দাউদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বড় কারণ ছিল— জহির শাহর উপদেষ্টারা মনে করছিলেন, দাউদ এতটাই ক্ষমতা সংহত করে নিয়েছে যে, ভবিষ্যতে সে বাদশাহর জন্যও হুমকি হয়ে উঠতে পারে। জহির শাহ নিজেও তার কর্মকাণ্ডগুলো আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখে আসছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি এক নিকটাত্মীয়কে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের কাছে পাঠিয়ে সেনাবাহিনী তাঁর অনুগত আছে কি না, সে ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চান। সেখান থেকে ইতিবাচক উত্তর এলে তিনি সরদার দাউদকে ডেকে নিজ সিদ্ধান্ত তথা বরখাস্তের ব্যাপারটি জানিয়ে দেন।

সিদ্ধান্তটি দাউদ খানের জন্য ছিল বজ্রপাতের মতো। হঠাৎ করে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছিল। তাই সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'আপনি নিজে যেমন রাষ্ট্রপরিচালনা করতে পারবেন না, তেমনি আমাকেও সরিয়ে দিতে পারবেন না। কেননা, সেনাবাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণাধীন।' তার কথা শুনে বাদশাহ ফোনের রিসিভার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'এই নাও! তোমার অনুগত সেনা-অফিসারদের ফোন করে আমাকে গ্রেপ্তার করতে বলো।'

সরদার দাউদ চট করে ফোন হাতে নিয়ে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার অনুগত অফিসারদের ফোন করতে থাকে। কিন্তু একজন অফিসারও তাকে সহায়তার আশ্বাস দেয়নি। দাউদ তখন অনুভব করতে পারে, কমিউনিজমের উত্থান ঘটাতে তার এতদিনের প্রয়াস কোনো

সুফল বয়ে আনেনি। আফগানিস্তানে এখনো বহু শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমান কার্যকর। সামরিক বাহিনীতে এখনো ধর্ম, মাজহাব, দেশপ্রেম আর বাদশাহর প্রতি বিদ্রোহের অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। ফলে সে বাজি-হারা জুয়াড়ির মতো শাহিমহল থেকে বেরিয়ে যায়। জহির শাহ কমিউনিজমের পথে প্রতিবন্ধক হতে না পারলেও তার উপস্থিতিতে কমিউনিজম এতটা উন্নতি লাভ লাভ করতে পারেনি—দাউদ খান ও তার সোভিয়েত-প্রভুরা যতটুকু কামনা করছিল। সে দিন থেকেই দাউদ খান সিদ্ধান্ত নেয়, এখন থেকে সে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার আওতায় কমিউনিজমের উত্থান ঘটানোর কাজ করে যাবে এবং সধৈর্যে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকবে।

নতুন আইন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা

সরদার দাউদ বরখাস্ত হলে জনগণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারা জানত, জহির শাহর রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা নেই। তাই প্রশ্ন উঠেছিল, রাষ্ট্র এখন কীভাবে পরিচালিত হবে, কে চালাবে? উদ্‌বেগজনক এই পরিস্থিতিতে জহির শাহকে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হয়। জনগণকে আশ্বস্ত রাখতে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। ওই আইনের ফলে আফগানিস্তান প্রথমবারের মতো পার্লামেন্ট ও উচ্চসভার রূপ দেখতে পায়। এগুলোকে উলসি জিরগা (সাধারণ পার্লামেন্ট) মুশারানু জিরগা (সংসদের উচ্চকক্ষ) নাম দেওয়া হয়। এরপর প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে তিনটি ভিত্তির ওপর রাষ্ট্রপরিচালনার স্তম্ভ দাঁড় করানো হয় : এক. নির্বাহী বিভাগ। দুই. প্রশাসনিক বিভাগ। তিন. বিচারবিভাগ।

এ সময় সরদার দাউদ গণতান্ত্রিক রাজনীতির ময়দানে পা রেখে জহির শাহর বিপরীতে সারি বিন্যাসের প্রয়াস চালায়। সে জনগণের কাছে জহির শাহকে পশ্চাৎপন্থি, অদূরদর্শী আর উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে তুলে ধরার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। আর রাজবংশের সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে সে জনগণের আস্থা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। এদিকে জহির শাহ দাউদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ করতে একটি আইন তৈরি করে নেন। আইনের একটি দফায় বলা ছিল, 'রাজপরিবারের কোনো সদস্য আগামী দিনে কখনো আফগান রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না!'

আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জহির শাহ ভেবেছিলেন, তিনি এবার দাউদকে রাজনীতির ময়দানে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সে আর পার্লামেন্টারি মাধ্যম ব্যবহার করে ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু সরদার দাউদ ছিল অত্যন্ত চতুর আর ধূর্ত। সে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থে পরিচালিত সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে থাকে। এরপর গোপনে জহির শাহর রাজমসনদ উলটে ফেলার পরিকল্পনা চালিয়ে যায়।

তখন আফগান রাজনীতিতে সক্রিয় কমিউনিস্টরা ভীষণ তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের সেক্রেটারি মনোনীত হয় নুর মুহাম্মাদ তারাকি। বাবরাক কারমালও এই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিল। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এই দলের বেশকিছু প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে বিরোধীদলের আসন দখল করে জহির শাহর জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরেকবার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবারও জহির শাহর ইচ্ছা সফল হয়। কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রধান বিরোধীদল হিসেবে সারা দেশে তারা শক্তিশালী একটা অবস্থান তৈরি করে নেয়।

খালক ও পরচম পার্টি

আফগানিস্তানের কমিউনিস্টদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে দুটি দল। একটি ছিল খালক পার্টি, যার নেতৃত্বে ছিল নুর মুহাম্মাদ তারাকি। দ্বিতীয়টি ছিল পরচম পার্টি। এর নেতৃত্বে ছিল বাবরাক কারমাল। খালক পার্টিতে পাখতুন আর পরচম পার্টিতে পারসিক ও অপাখতুনরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পার্টি দুটি 'খালক' ও 'পরচম' নামে নিজেদের দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করত। পত্রিকা দুটি জনগণের মন-মগজে কমিউনিজমের চাষাবাদের দায়িত্ব আদায় করে চলছিল।

জাতীয় পার্লামেন্টের অবস্থা

এদিকে সরকারে জহির শাহর নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছিল। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পক্ষ থেকে আয়োজিত জাতীয় নির্বাচনের ফলে ঘটিত পার্লামেন্ট জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। পার্লামেন্টের ৩৩% সদস্য ছিলেন অশিক্ষিত আর অনভিজ্ঞ। সমকালীন সমস্যাবলি সম্পর্কে তাদের কোনোই ধারণা ছিল না। তা ছাড়া অনেক সময় কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় পার্লামেন্টারি কার্যক্রম মুলতুবি করতে হতো। নামসর্বস্ব এই পার্লামেন্ট কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছিল। কেননা, যখনই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো, কমিউনিস্ট সদস্যরা অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়ে অশিক্ষিত সদস্যদের প্রভাবিত করে ফেলত। একইসঙ্গে কমিউনিস্টরা অলিগলির যুবকদের সংগঠিত করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি সংঘাত বাধানোর কাজে তৎপর থাকত। জহির শাহর কাছে এই অরাজকতার লাগাম টেনে ধরার মতো সুবিন্যস্ত কোনো কর্মসূচি ছিল না। তিনি যথাসময় অবস্থার ভয়াবহতা আন্দাজ করতে পারেননি, তাই কমিউনিস্টদের তৎপরতা প্রতিহত করতে কার্যকর

পদক্ষেপ নেননি। এভাবে দিন চলে যাচ্ছিল আর পার্লামেন্ট তার মেয়াদের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

দাউদ খানের ষড়যন্ত্র

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। জহির শাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ বছর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হবে। জনগণকে শান্ত মনে করে তিনি জুলাইয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দাউদ খান তার খেলা পূর্ণতায় পৌঁছানোর সুযোগ পেয়ে যায়। সে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রচুর পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করে। তাকে সাহায্য করতে সোভিয়েত রাশিয়াকেও সে প্রস্তুত করে ফেলে। রুশ-সহায়তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষণগ্রহণকারী সেনা অফিসাররা—যাদের সংখ্যা তখন অনেক বেড়ে গিয়েছিল—দাউদ খানের সঙ্গ না দিয়ে বসে থাকতে পারেনি। এ সময় দাউদ খান খালক আর পরচম পার্টিকেও তার সঙ্গ দিতে রাজি করিয়ে নেয়।

রাজমসনদ বঞ্চিত জহির শাহ

১৭ জুলাই ১৯৭৩ জহির শাহ সরকারি সফরে ইতালিতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তার কাছে সংবাদ পৌঁছায়, দাউদ তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আফগানিস্তানের মসনদে আসীন হয়ে গেছে। দাউদ ওই দিন সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের সহায়তায় কাবুলের সরকারি কিছু কেন্দ্র দখল করে নেয়। কোনো রক্তপাত ছাড়াই মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আফগানিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বাদশাহি শাসন বিলুপ্তির পথে কাউকে তখন প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র

১. *তারিখু আফগানিস্তান মিন কুবাইলিল ফাতহিল ইসলামি ইলা ওয়াকতিনাল মুআসির*, ফারুক হামিদ বদর।
২. *আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ*, মির গোলাম মুহাম্মাদ গুবার।
৩. *Encyclopaedia of Islam* V.1
৪. *তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান*, ড. এইচ বি খান।
৫. *আফগানিস্তান, এক কওম কা আলমিয়া*, আহমাদ শুজা পাশা।
৬. *Encyclopedia Britannica* (Afghanistan)

২৩ তম অধ্যায়

কমিউনিজমের ছায়া, গণতন্ত্র এবং সাওর বিপ্লব

জহির শাহর বাদশাহি অস্তাচলে সূর্য পশ্চিম আকাশে হারিয়ে যাওয়ার মতোই চুপচাপ নিঃশেষ হয়ে যায়। মূলত আফগানিস্তানের শেষ বাদশাহর প্রশাসনিক দুর্বলতা, অদূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞতা সাধারণ-অসাধারণ সব শ্রেণির মানুষকে হতাশ করে রেখেছিল। তাই বিপ্লবীদের জন্য তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। জনগণ ভাবছিল, এবার হয়তো গণতান্ত্রিক সূর্য আফগান-দিগন্তে আলোর কিরণ নিয়ে আসবে। বিপ্লবের প্রথমদিকে এমনটাই অনুমিত হচ্ছিল।

১৭ জুলাই ১৯৭৩ দাউদ খান ক্ষমতাসীন হয়েই জাতির উদ্দেশে দেওয়া বেতার-ভাষণে বলে, 'দেশ থেকে বাদশাহি সংস্কৃতি বিলুপ্ত করা হয়েছে। এখন থেকে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল "রিপাবলিক শাসনপদ্ধতি" প্রবর্তন করা হবে।' দাউদ খান তার ভাষণে জনগণকে সত্যিকার গণতন্ত্র, সমাজের সংস্কার, ন্যায়-ইনসাফ, সমৃদ্ধি ও শিক্ষাবিপ্লব নিয়ে আসার অঙ্গীকার প্রদান করে। দাউদের মূল এজেন্ডা গোপন ছিল না। সে ছিল কমিউনিজমের অনুসারী। আফগানিস্তানকে ওই রঙেই রাঙাতে সে বদ্ধপরিকর ছিল। রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হটিয়ে মূলত রাজনৈতিকভাবে আফগানিস্তানকে এক অস্থিরতার খাদে ঠেলে দিয়েছিল দাউদ।

পাকিস্তানবিরোধী বক্তব্য

সরদার দাউদ খানের শাসনামল শুরু হয় পাকিস্তানবিরোধী আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে। সে তার প্রথম ভাষণেই বলে, 'পাকিস্তানই বিশ্বে একমাত্র রাষ্ট্র, যার সঙ্গে আফগানিস্তানের বিবাদ রয়েছে।' এরপর একটি প্রেস কনফারেন্সে সে 'স্বাধীন পাখতুনিস্তান'-কে 'একটি অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা' হিসেবে তুলে ধরে।

১৭ আগস্ট ১৯৭৫ আফগানিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাবুলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানের আওয়ামি ন্যাশনাল পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা খান আবদুল

গাফফার খান, খান আবদুল অলি খানসহ কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতাকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে। এই নেতারা পাখতুনিস্তানের বিষয়টি সামনে এনে পাকিস্তান সরকারকে বেকায়দায় ফেলার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। নতুন আফগান সরকারও বিষয়টি সামনে নিয়ে আসতে চাচ্ছিল। এর কয়েকদিন পরে ২৬ আগস্ট ১৯৭৩ আফগানিস্তানের জাতীয় দিবসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে দাউদ ফের পাখতুনিস্তান ইস্যুকে আফগানিস্তানের জাতীয় ইস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশিক্ষণ দান

দাউদ খান শুধু বিবৃতিবাজিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সেখানে অরাজকতা আর অস্থিরতা সৃষ্টিরও প্রয়াস চালায়। পাকিস্তান সরকারের দাবিমতে, দাউদ খান ওই দুই প্রদেশে গণযুদ্ধ সংঘটনের লক্ষ্যে ১৫ হাজারের অধিক পাখতুন ও বালুচকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

জুলফিকার আলি ভুট্টোর জবাবি কূটনীতি

পাকিস্তান তখনো পূর্বপাকিস্তান হারানোর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বিধায় রুশ সমর্থিত আফগান সরকারের এসব কর্মতৎপরতা ছিল তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি। প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দাউদের মুখে লাগাম পরাতে রাজনৈতিক চাপ বাড়ানোর পাশাপাশি আফগানিস্তানের ইসলামপ্রিয় দলগুলোর সহায়তা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যান। তখন আফগানিস্তানের আলিমসমাজ ও দীনদার জনগণ দাউদ কর্তৃক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নাস্তিকতা বিস্তারের প্রয়াসকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন রাষ্ট্র ক্রমশ কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ার ফলে ইসলাম শঙ্কার মুখে পড়তে যাচ্ছে। তাই তারা সরকারের বিপক্ষে সশস্ত্রযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। দাউদের সরকার তখন অনেককেই গ্রেপ্তার করে এবং অনেককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারের রোষানল থেকে বাঁচাতে সীমান্তের ওপারে চলে আসেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, আফগানিস্তানের আকাশে কমিউনিজমের লাল বাদল ছেয়ে যেতে দেখে আফগানের কতিপয় জাতীয় নেতা ১৯৭৩ তথা জহির শাহর শাসনামলের শেষ দিকেই হাতে অস্ত্র তুলে নেন। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ঘোষণা দিয়ে তাঁরা পাহাড় ও উপত্যকাগুলোকে বানিয়ে নেন বাসস্থান। সময় সময় সরকারি লক্ষ্যবস্তুতে শুরু করেন হামলা। কিন্তু এসব হামলার তেমন কোনো প্রভাব পড়তে দেখা যাচ্ছিল না। তবে

তাদের এই তৎপরতা তখন একটি নিয়মের আওতায় চলে আসে, যখন ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউদের পাকিস্তানবিরোধী তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো দাউদের ভাষায় জবাব দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের বিচ্ছিনতাবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাওয়ার জবাবে সেই গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা প্রদান শুরু করেন, যারা আফগান সরকারের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। এসব দলের মধ্যে গুলবুদিন হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলামিসহ আরও কয়েকটি দলের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। এই দলগুলো আফগানিস্তানকে পুরোপুরি ইসলামি রাষ্ট্ররূপে দেখতে চাচ্ছিল।

ইসলামি দলগুলোর জিহাদি কার্যক্রম

জুলফিকার আলি ভুট্টোর কূটনৈতিক চাল সফল প্রমাণিত হয়। যখনই কাবুল থেকে পাকিস্তানবিরোধী বিবৃতিবাজি শুরু হতো অথবা পাখতুনিস্তান-সংক্রান্ত আওয়াজ ওঠানো হতো, তখনই ইসলামপন্থি দলগুলোর কর্মতৎপরতা বেড়ে যেত। ফলে দাউদ খানকে অস্থির হয়ে চুপ হয়ে যেতে হতো। এই দলগুলোর অনেক নেতা হিজরত করে পেশোয়ার চলে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার তখন তাদের আশ্রয় দেয়। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের বড় একটি অংশও সরকারি ধরপাকড় থেকে আত্মরক্ষার এবং দেশের ভেতর আন্দোলনকে সংগঠিত করার প্রস্তুতির লক্ষ্যে পেশোয়ারে চলে আসে। এসব দলের পক্ষ থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই দাউদের বিরুদ্ধে একটি বড় বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। পাকতিয়া থেকে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে সূচনা করা হয় এই কার্যক্রমের। দাউদ খান বড় রকম সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলেও তাকে তা দমন করতে প্রচুর ঘাম ঝরাতে হয়। দাঁত কামড়ে দৃঢ় থাকতে হয় নিজের অবস্থানে।

কায়া পালটে ফেলে দাউদ খান

দাউদ বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়া স্পষ্ট বোকামি ছাড়া কিছু হবে না। এ ছাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট করে শুধু সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়ানো কল্যাণকর হবে না। সে এটাও দেখতে পাচ্ছিল যে, পাকিস্তানবিরোধী তার একটি প্রয়াসও সফল হয়নি। কেননা, আফগানিস্তান ও কাবায়েলি এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী আলিমসমাজ পাকিস্তানকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তারা উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক দেখতে চান। ইউরোপীয় পত্রিকাগুলোর রিপোর্টও প্রমাণ বহন করে যে, সীমান্ত-এলাকার পাঠানরা পাখতুনিস্তান নিয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না।

এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখে দাউদ খান ধীরে ধীরে পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা আরম্ভ করে। ইরানের সঙ্গেও আফগানিস্তানের সম্পর্ক সুখকর ছিল না। তাই দাউদ ইরানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করে। এই মুহূর্তে সে 'সংঘাতহীন পারস্পরিক সহাবস্থান'-সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার চিন্তা করতে থাকে। পক্ষ তিনটি হবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান। এই ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় দাউদ তিনটি বিষয় নিষ্পত্তি করতে চাচ্ছিল :

১. ডুরান্ড লাইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। অথচ দাউদ নিজে এবং তার আগে জহির শাহও একে আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসেবে মানতে প্রস্তুত ছিলেন না।

২. পাকিস্তানি সরকার আওয়ামি ন্যাশনাল পার্টির নেতারাসহ অন্যান্য পাখতুন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে—যাদের আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে—মুক্ত করে দেওয়া হোক।

৩. ইরান আফগানিস্তানকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করুক।

শাহ ফায়সালের অমর কীর্তি

বলা হয়ে থাকে, দাউদ খানের মানসিকতায় এই ইতিবাচক পরিবর্তনের নেপথ্যে সৌদি বাদশাহ ফায়সালের ভ্রাতৃত্ববোধই কার্যকারী ছিল। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েন; এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের সীমান্তে সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ মরহুম ফায়সালকে মর্মাহত করে তুলছিল। সুতরাং তিনি উভয় পক্ষের ওপর কিছুটা চাপ প্রয়োগ করে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা চালান। ওই সমঝোতায় তৃতীয় প্রতিবেশী ইরানকেও অন্তর্ভুক্ত করা কল্যাণকর মনে করা হয়। তখন ইরানের শাসক ছিলেন রেজা শাহ পাহলবি। সমঝোতার ভিত্তিতে তিনি আফগানিস্তানকে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা দেন।

ইরানের হস্তক্ষেপ

ইরানের অর্থসহায়তা ছিল অনুন্নত আফগানিস্তানের জন্য বড় এক আশীর্বাদ। কিন্তু এই সহায়তার পেছনের ইরানের একটি অভিসন্ধি গোপন ছিল। একদিকে তো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার পানিবণ্টন সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, অপরদিকে যৌথ এশীয় বাজার প্রতিষ্ঠা, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে রেললাইন স্থাপন এবং এশীয় রাষ্ট্রগুলোকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ মহাসড়ক তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। কিন্তু একইসঙ্গে ইরান তার

গোয়েন্দাসংস্থা সাবাকের মাধ্যমে আফগানিস্তানে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়ে তোলে। সাবাকের এজেন্টরা আফগানিস্তানের ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে থাকে। এভাবে বহুকাল পর ইরান আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ পেয়ে যায়।

আফগানিস্তানকে রাশিয়ান ব্লক থেকে বের করার প্রচেষ্টা

আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানের এই ত্রিপক্ষীয় বন্ধুত্বের পেছনে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির ভয়ে শঙ্কিত আমেরিকারও অবদান ছিল। আমেরিকার পরিকল্পনা ছিল, যেকোনোভাবেই হোক সে আফগানিস্তানকে সোভিয়েত ব্লক থেকে বাইরে নিয়ে আসার প্রয়াস চালাবে। এ লক্ষ্যে আমেরিকা ইরানের শাহকে (যিনি আমেরিকার সহায়তাধন্য ছিলেন) প্রলুব্ধ করে, তিনি যেন আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করেন, তাদের অর্থসাহায্য দেন।

মোটকথা, বহির্বিশ্বের প্রচেষ্টার ফলে আফগানিস্তানে বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। দাউদ খান ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তার পররাষ্ট্রনীতিতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। ওই বছরের জুনে সে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে উভয় নেতা একে অপরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। দাউদ যেমন পাকিস্তানবিরোধী বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকে, ভুট্টো তেমনি ইসলামপন্থি গেরিলাদের আফগানবিরোধী কার্যক্রমে সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

দাউদ খান এখন কমিউনিস্টবিরোধী

এ দিকে দাউদ খান তার সরকার থেকে সোভিয়েতপন্থি লোকদের বাছাই করে পৃথক করা শুরু করে। সে দেখতে পাচ্ছিল, এরা কর্মদক্ষতায় একদম শূন্য। যেকোনো সময় এরা পক্ষ বদলে ফেলতে পারে। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ নতুন একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই সভায় সে তার বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষ করে সাবেক শাহি বংশের যোগ্যতর ব্যক্তিদের স্থান দেয়। সে একটি নতুন আইনও প্রণয়ন করে। ওই আইনে দেশে শুধু একটি রাজনৈতিক দল থাকার বিধান রাখা হয়। এর পরপরই সে নিজে 'কওমি ইনকিলাবি পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। আর খালক ও পরচম পার্টিসহ আগের রাজনৈতিক দলগুলো বিলুপ্ত করে দেয়।

এসব পদক্ষেপ থেকে অনুমিত হচ্ছিল, দাউদ খান বোধহয় সোভিয়েত রাশিয়া আর কমিউনিজমের বীভৎস চেহারা দেখে ফেলেছিল। ফলে যেকোনো মূল্যে সে তাদের ধোঁকার থাবা থেকে নিজেকেসহ দেশ ও জাতিকে বের করে আনতে হাত-পা ছুড়ছিল। সে তখন রাশিয়া ছাড়া গোটা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। রাশিয়ার ওপর

নির্ভরশীলতা হ্রাসের নিমিত্তে সেচ, টেক্সটাইল ও মিলব্যবস্থাপনা উন্নতির লক্ষ্যে চীন থেকে সাহায্যগ্রহণ শুরু করে। তেমনি আমেরিকা থেকেও সহায়তা লাভ করতে থাকে—যে আমেরিকা আফগানিস্তানকে সোভিয়েত বলয় থেকে বের করতে উদ্দীপ্ত করছিল।

ক্রোধান্বিত সোভিয়েত ইউনিয়ন

দাউদ গৃহীত পরিবর্তিত নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কপালে ভাঁজ পড়া ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। আফগানিস্তানের মন্ত্রিসভা থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার এবং পাকিস্তান ও ইরানের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি ছিল দাউদের এমন এক অপরাধ, যা মস্কোর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে দাউদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এ লক্ষ্য পূরণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যবহার করে। এই উদ্যোগের প্রথম লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দুটো তথা খালক ও পরচমকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর এই উদ্যোগ সফলও হয়। এরপর ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে খালক ও পরচম পার্টি দাউদ খানের ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিতে সর্বাত্মক প্রচষ্টা শুরু করে।

দাউদ খানের বিদেশ সফর

তখনো দাউদ খান তার নতুন নীতিতে অটল ছিল। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে পাকিস্তানে সামরিক বিপ্লব ঘটে। সেনাবাহিনী প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে নিরাপত্তা হিফাজতে নিয়ে নেয়; আর জেনারেল জিয়াউল হক চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আবির্ভূত হন। তবে এই পরিবর্তন পাক-আফগান সম্পর্ক নষ্ট না করে আরও সুসংহত করে। জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতাগ্রহণের তৃতীয় মাসে কাবুল সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র দুটোর মধ্যকার আস্থার পরিবেশ সুসংহত রাখা। এর কিছুদিন পর ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে দাউদ পাকিস্তান, ভারত, লিবিয়া, মিসর, তুরস্ক, যুগোস্লাভিয়া, সৌদি আরব ও কুয়েত সফর করে। সফর শেষে ঘোষণা দেয়, দ্রুতই সে আমেরিকা সফরে যাচ্ছে। মূলত সে ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারছিল, মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না তুললে তার ক্ষমতার চেয়ার যেকোনো সময় উলটে যেতে পারে; সোভিয়েত ইউনিয়ন যেকোনো মুহূর্তে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে।

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সৌদি আরব সফরকালে দাউদ সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একটি সমঝোতা-স্মারকে স্বাক্ষর করে। যেহেতু ইথিওপিয়া ছিল রাশিয়ার অনুগত এবং উগান্ডায় বসবাসকারী সোমালিয়ান মুসলিমদের অধিকার হরণকারী;

তাই দাউদের এ প্রয়াস ইথিওপিয়ার পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়াকেও অসন্তুষ্ট করে তোলে। ফলে রাশিয়া আফগানিস্তানে প্রতিপালিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোসহ সোবাহিনীর কমিউনিস্ট অফিসারদের দাউদ খানের সরকারকে উৎখাতের গ্রিন সিগন্যাল দেয়।

মির আকবরের হত্যাকাণ্ড, নতুন ষড়যন্ত্র

দাউদ খান সৌদি আরব থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ক্ষমতাচ্যুতির নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়ে যায়। এর প্রথম অঙ্ক প্রদর্শিত হয় ১৭ এপ্রিল। যখন কমিউনিস্ট পরচম পার্টির পত্রিকা *পরচমের* সম্পাদক মির আকবরকে কাবুলে হত্যা করা হয়, কমিউনিস্টরা মুহূর্তেই রাজধানীর সর্বত্র প্রচার করে ফেলে, খ্যাতিমান এই সাংবাদিককে দাউদ তার মার্কিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে হত্যা করিয়েছে। মির আকবর ছিল আফগানিস্তানের প্রভাবশালী শহুরে বাসিন্দা ও কমিউনিস্টদের এক বড় নাম। ফলে তার জানাজায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। জানাজা শেষে সমাবেশটি প্রতিবাদ-বিক্ষোভের রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীরা দাউদ ও আমেরিকাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছিল। তারা উভয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক স্লোগান দিচ্ছিল। মিছিল দিতে দিতে তারা মার্কিন দূতাবাসের সামনে এসে মুহুর্মুহু স্লোগানে পরিবেশ কাঁপিয়ে তুলতে থাকে।

ক্র্যাকডাউন

এ ঘটনার পর সাত-আট দিন যাবৎ দেশের অবস্থা স্থিতিশীল হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে ২৬ এপ্রিল দাউদ কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন শুরু করে। কেননা, তারাই মূলত সরকারবিরোধী আন্দোলনে উসকানি দিচ্ছিল। বাবরাক কারমাল ও নুর মুহাম্মাদ তারাকির সঙ্গে আরেক বড় কমিউনিস্ট নেতা হাফিজুল্লাহ আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে এখানে যে ভুলটি করা হয় সেটি হচ্ছে, সামরিক বাহিনীর কমিউনিস্ট অফিসারদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। ২৭ এপ্রিল সকাল ১০টায় দাউদ খান তার মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকে নতুন পরিস্থিতি নিয়ে সুচিন্তিত মতামত পেশের আহ্বান জানায়। বৈঠকে উত্তপ্ত ভাষায় আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু কেউ জানত না, সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের গভীরতা কতটুকু।

রাজপথে সেনাবাহিনী

মূলত কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই কমিউনিস্ট অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে আস্থায় নিয়ে এসেছিল। সুতরাং পরদিন পার্লামেন্ট-ভবনে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার এক ঘণ্টা আগেই কাবুলের পূর্ব দিক

থেকে সাঁজোয়া যানের ব্রিগেড সক্রিয় হয়ে ওঠে। ক্যাপ্টেন আসলাম ওয়াতান ইয়ার তাদের কমান্ড করছিল। ওদিকে কর্নেল আবদুল কাদির বাগরাম বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ক্যাপ্টেন আসলাম প্রথমে কাবুল বিমানবন্দর দখল করে। ১১টা বাজতেই তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ভবনও নিজেদের দখলে নিয়ে যায়। এরপর ১২টার দিকে পার্লামেন্ট-ভবনে প্রবেশ করে দাউদ খানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। তবে এখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা পালটা আক্রমণ শুরু করলে রক্তক্ষয়ী লড়াই বেধে যায়। গোলাগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাবুলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। বাজার বন্ধ হয়ে আসে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে পালানো শুরু করে। এই অবস্থাতেই দু-পক্ষের গোলাগুলিতে বেশকিছু বেসামরিক নাগরিক শাহাদাতবরণ করেন।

দাউদহত্যা

কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকে। দাউদ খানের ১ হজার ৮০০ রক্ষীবাহিনী প্রেসিডেন্ট-ভবন শূন্য করতে এবং অস্ত্রসমর্পণে রাজি ছিল না। ট্যাংক ব্যর্থ হলে তৃতীয় প্রহরের দিকে বিমানবাহিনীকে তলব করা হয়। ফলে মিগ-২১ বিমান প্রেসিডেন্ট-ভবনের ওপর অবিরাম বোমা বর্ষণ শুরু করে। এতে কয়েক শত সেনা নিহত হয় এবং প্রেসিডেন্ট-ভবন বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। আফগান বিমানবাহিনী যে দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট-ভবনে হামলা চালিয়েছিল, তা দেখে কাবুলে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল—এই বিমানগুলো আফগান পাইলটরা নয়; বরং রুশ পাইলটরা চালাচ্ছিল। কিন্তু কোনো সূত্রে ঘটনার সত্যায়ন সম্ভব হয়নি।

বিকেলের দিকেই বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তারকৃত কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্ত করে নেয়। তখন কাবুল রেডিয়ো থেকে বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়। দাউদ খান করুণ পরিণতির শিকার হয়। কমিউনিজমকে মুক্তির পথ এবং কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় নিয়ে আসা এই হতভাগা শাসক শেষপর্যন্ত কমিউনিস্টদের হাতেই মারা যায়। রাজমহলে অবস্থানকারী পরিবারের সকল সদস্য এমনকি নারী-শিশুরাও গণহত্যা থেকে রেহাই পায়নি। পরদিন কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানে 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠনের ঘোষণা দেয়। তারা দাবি করে, এই কাউন্সিলের ক্ষমতার উৎস হবে জনগণ। এই কাউন্সিল আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও চিরায়ত ইসলামি সংস্কৃতি রক্ষার জামানত বহন করবে।

সাওর বিপ্লব

এই বিপ্লবকে 'সাওর বিপ্লব' নামে নামকরণ করা হয়। বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে আফগানিস্তানের এই পরিবর্তন লক্ষ করছিল। কেউ কল্পনাও করতেও পারছিল না—

মৌলবাদীদের কেন্দ্রখ্যাত এ রাষ্ট্রটিই হয়ে যাবে কমিউনিজমের পতাকাবাহী। এমনকি আমেরিকারও এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। নইলে তারা আগে থেকেই এই বিপ্লব রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করত।

৩০ এপ্রিল ১৯৭৮ বিপ্লবী কাউন্সিলের পক্ষ থেকে নুর মুহাম্মাদ তারাকিকে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে আফগানিস্তানকে 'ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান' নাম দেওয়া হয়। বিপ্লবের আরেক কেন্দ্রীয় নেতা বাবরাক কারমালকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর আর হাফিজুল্লাহ আমিনকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে বসানো হয়।

কে এই তারাকি

আফগানিস্তানের প্রথম কমিউনিস্ট শাসক এই নুর মুহাম্মাদ তারাকি ছিল গজনির এক পাখতুন রাখাল-পরিবারের সদস্য। সে সগর্বে বলত, তার জন্ম সেই ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে, যে বছর বলশেভিক বিপ্লব সাফল্যের মুখ দেখেছিল। বাল্যকালে সে ফল আমদানি-রপ্তানিকারী একটি কোম্পানিতে চাকরি নেয়। পাশাপাশি নাইট-স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে। কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে অনেকবার মুম্বাই যাওয়ার সুযোগ পায়। সেখানে কতিপয় কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে রীতিমতো কমিউনিজমের অনুসারী হয়ে ওঠে।

দেশে ফিরে এসে বেশ কয়েক বছর সরকারি নিম্নপদের একটি চাকরিতে যোগ দেয়। তার মধ্যে অধ্যয়নের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। সে ছিল পশ্চিমা সাহিত্যের একজন সমজদার পাঠক। ৩১ বছর বয়সে 'বেদার নওজোয়ান' নামে একটি আন্দোলন গড়ে তোলে এবং *আঙ্গারা* নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলের মার্কিন দূতাবাসে চাকরি পেয়ে যায়। চাকরির পাশাপাশি বিপ্লবধর্মী লেখালিখি চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে সে আধুনিক শিক্ষিত কমিউনিস্টদের নেতা হয়ে ওঠে। কমিউনিজম ক্রমশ আফগানসমাজে শিকড় বিস্তার করতে থাকে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে তারাকি এর প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়। কিছুদিন পর বাবরাক কারমালের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন তারাকি খালক আর কারমাল পরচম নামে পৃথক পৃথক পার্টি গড়ে তোলে। পরে দাউদকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে পার্টি দুটি একযোগে কাজ করে। এভাবেই নবগঠিত সরকারে উভয় পার্টি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

তারাকির রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা

কমিউনিস্টরা শুরু থেকেই এই নীতি অনুসরণ করে আসছিল যে, কোনো এলাকায় তারা তাদের অবস্থান মজবুত করতে গেলে প্রথমেই জনগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকত।

জনগণকে দারিদ্র্য বিমোচন, সমৃদ্ধ জীবন এবং নতুন যুগের সুসংবাদ শোনাত। অনুরূপ প্রথমদিকে তারা ধর্মীয় ব্যাপারেও জনগণকে আশ্বস্ত করতে নিজেদের ধর্মপ্রাণ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চালাত। তবে ধীরে ধীরে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিক্যবাদ এবং তাদের নির্দিষ্ট মতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে জনগণকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিত। এরপরও যারা ধর্মে অটল থাকত, কমিউনিস্টরা তাদের সহ্য করত না, তাদের লোমহর্ষক শাস্তি দিয়ে মানুষের জন্য শিক্ষার উপাদান বানাত।

তারাকিও এসবের কোনো একটি দিক বাদ দেয়নি। সাওর বিপ্লবের মাত্র দুই সপ্তাহ পর ৭ মে সে ঘোষণা দেয়, 'ইসলাম হবে দেশের আদর্শিক ভিত্তি'। কিন্তু এর পাশাপাশি সাওর বিপ্লবের বীভৎস চেহারা আফগান জনগণের সামনে প্রকাশ পেতে থাকে। দেশের নানা স্থানে গ্রেপ্তার-অভিযান অব্যাহত থাকে। শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যা করা হচ্ছিল। দাউদ খানকে তার পুরো পরিবারসহ গুলিতে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর দাউদ খানের মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হয়। এদের সিংহভাগ ছিল সাবেক রাজপরিবারর সদস্য। মে মাসের প্রথম দশকে সাবেক সরকারের উচ্চপদস্থ শত শত কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। এদের মধ্যে সেনা-কর্মকর্তা, সিভিল অফিসার এবং দূতাবাসকর্মীরাও ছিল।

তারাকির প্রচেষ্টা ছিল, কমিউনিজমের চাষাবাদ পূর্ণতায় না পৌঁছা পর্যন্ত সে নবগঠিত সরকারে কমিউনিস্টের ছাপ পড়তে দেবে না; বরং তার সরকারকে নিরপেক্ষ হিসেবেই প্রদর্শন করে যাবে। তবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি কারও অজানা ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততাও কোনো রহস্যপূর্ণ বিষয় ছিল না। খালক ও পরচম পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের চোখের সামনেই ছিল। তাই আফগান জনগণ তার ধোঁকায় পড়েনি।

সোভিয়েতের সঙ্গে অন্তপ্রাণ সম্পর্ক

তারাকি সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল—সাওর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়াই সবার আগে নতুন আফগান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিনকে মস্কোতে দেখা যায়। সেখান থেকে সে ঘোষণা দেয়, 'আফগানিস্তান তার মহান প্রতিবেশী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সুতোয় বাঁধা।'

বোকামিসুলভ সংস্কারকর্ম

বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট সরকার নতুন কিছু সংস্কার চালায়। যেমন : ১৬ বছরের

কমবয়সি মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়। আফগানিস্তানে পতাকার রং সবুজ থেকে পরিবর্তন করে লাল করা হয়, যা স্পষ্টতই ছিল কমিউনিজমের পরিচায়ক। জনগণ এসব পরিবর্তনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। তবে কিছু সংস্কারকর্ম ছিল চিত্তাকর্ষক। যেমন : বিয়েতে যৌতুকপ্রথার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। জমিদারদের থেকে কৃষকদের গ্রহণকৃত ঋণ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ভূমিহীন কৃষকদের বলা হয়, তারা যেন বড় বড় জমিদারের জমি দখল করে নেয়। দখলদার কৃষকদের নামে মালিকানার হুকুম জারি করা হয়। তাদের হাতে মালিকানার বৈধ দলিলনামা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ কৃষক এসব কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। কেননা, তারা জানত, জোরপূর্বক কারও জমি দখল করা শরিয়ত-বিরুদ্ধ। কিন্তু কৃষকদের বাধ্য করা হলে কৃষিকাজ থেকে তারা হাত গুটিয়ে নেয়। নতুন সংস্কারনীতির আওতায় সাংস্কৃতিক ও জাতিগত দিকে দিয়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। যেহেতু কমিউনিস্টরা এসব পরিবর্তন নিয়ে আসছিল, তাই সাধারণ জনতা এসবকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

সংস্কার-প্রক্রিয়ার সিংহভাগ পরিবর্তন ছিল ইসলামি শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, অধিকাংশ যুক্তিযুক্ত নির্দেশের পেছনেও গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে, যার মাধ্যমে কমিউনিজমের ভিত গড়ার পথ মসৃণ করা যায়। যেমন : কৃষকদের জমি সরবরাহ করা এবং তাদের ঋণ মওকুফ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে কৃতজ্ঞ বানিয়ে কমিউনিজমের সাম্যবাদের প্রতি উৎসাহী করা। এরপর ধীরে ধীরে তাদের পাক্কা কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলা। অধিকাংশ ভূমি-সংস্কারনীতি কৃষকদের জন্য আকর্ষণীয় হলেও জমিদারদের জন্য ছিল প্রচণ্ড আঘাত। এর পরিণতি মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। জমিদারদের বৈধ অধিকার অপহৃত হয়। দেশে কৃষির প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়। অধিকাংশ জমিদার তাদের কৃষকদের সেসব সুবিধা বন্ধ করে দেয়, যা ইতিপূর্বে সরবরাহ করা হতো। যেমন : চাষের জন্য বীজ, কৃষিযন্ত্র, সেচপ্রকল্প ইত্যাদি। অথবা তারা কৃষিকার্যক্রম একেবারেই বন্ধ করে দেয়। ফলাফল দাঁড়ায়—কৃষির দিক দিয়ে দেশ কয়েক দশক পেছনে চলে যায়। একসময় তরিতরকারিতে স্বনির্ভর আফগানিস্তান ওই ক্ষেত্রে আমদানিকারক হয়ে ওঠে।

মিথ্যা আশ্বাস আর হুমকি-ধমকি

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ দিন দিন ফুঁসে উঠছিল। ইতিমধ্যে উরুজগান, নিমরোজ, হেলমান্দ ও ঘোরের দূরবর্তী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবাদের আগুন বিস্তার করতে দেখা যায়। তারাকি কাবায়েলি নেতাদের শান্ত করতে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

জুনের শেষ দিকে দেশের নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জমায়েত করে বলে, 'সরকারের সৃষ্টিশীল উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তাদের জন্য সরকারের সঙ্গ দেওয়া উচিত। কৃষক, মজুর থেকে শুরু করে জ্ঞানী ও আলিমসমাজ সবার জন্য বিপ্লবে সহযোগিতা করা দরকার।' পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে বলা হয়, 'আফগানিস্তান একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সাহায্যগ্রহণের অর্থ এটা নয় যে, আফগানিস্তান সোভিয়েত ব্লকে ঢুকতে যাচ্ছে। এটা ভুল ধারণা।' পাশাপাশি সে ইসলামপন্থিদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, 'যারা এরপরও সরকারের বিরোধিতা করবে, তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।'

বাবরাক কারমাল বরখাস্ত, নিত্যনতুন ধোঁকাবাজি

এসবের পাশাপাশি তারাকি তার আসন মজবুত করার এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে। সে পরচম পার্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে কারমালকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এভাবে অবস্থান সুদৃঢ় না হয়ে বরং তার বিরোধীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারাকি জানত, আফগানিস্তানে তাৎক্ষণিকভাবে রাশিয়ার মতো কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। তাই সে লেনিনের প্রবর্তিত অনেক নীতির বাস্তবায়ন মুলতুবি করে। সে এক নতুন ধরনের কমিউনিজমের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করানোর প্রয়াস পায়। তার কমিউনিজমকে বাহ্যত ইসলামবান্ধব দেখানো হচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে সে হালকা কিছু পদক্ষেপও নেয়, যা বাহ্যত ক্ষকিতর নয় এবং সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য উপযোগী দেখা যাচ্ছিল।

তারাকি কমরেড[২৬] শব্দটিকে উন্নত রূপ দিয়ে জনগণকে কমিউনিস্ট সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু জনগণকে এ ধরনের পরিবর্তন আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি প্রত্যক্ষ করে সে বার বার এই মর্মে ভাষণ দিচ্ছিল যে, আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে। এ পর্যায়ে সে আফগানিস্তানের পতাকার পুরানো সবুজ রং আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনে; কিন্তু সাধারণত সরকারি সকল ক্ষেত্রে লাল রঙের পতাকাই ব্যবহৃত হতে থাকে।

বাস্তবতা লুকোনো যায়নি

এটা স্পষ্ট যে, ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে এ ধরনের ধোঁকায় ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ, আফগান জনগণ মধ্য-এশিয়া থেকে আফগানিস্তানে হিজরত করে আসা হাজার হাজার তাজিক, উজবেক, তুর্কমান ও কিরগিজ মুহাজিরের অবস্থা সম্পর্কে ছিল

[২৬] কমরেড শব্দের শাব্দিক অর্থ বন্ধু হলেও কমিউনিস্টরা শব্দটিকে তাদের সমচিন্তার ও সমদৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, যাতে তারা যেকোনো সমাবেশে অকমিউনিস্টদের থেকে পৃথক বিবেচিত হয়।

সম্যক অবহিত। এরা সোভিয়েত রাশিয়ার লোমহর্ষক নির্যাতন আর ইসলামবিরোধী তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়েই হিজরত করে আফগানিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ওই মুহাজিররা আফগান আলিম ও জনগণকে তাদের ওপর বয়ে চলা নির্যাতনের দাস্তান শোনাচ্ছিল। তারা বলছিল, কমিউনিজমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো না গেলে আপনাদের অবস্থাও মধ্য-এশিয়ার অসহায় মুসলিমদের মতোই হবে।

মারমুখী অবস্থানে তারাকি

অবশেষে তারাকি তার আসল চেহারায় আবির্ভূত হয়। নিপরাধ মানুষের রক্ত বহানো তার জন্য এত সহজ ও বিনোদনের উপকরণ ছিল, যেমনটি ছিল নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টদের জন্য। ক্ষমতা হাতে পেয়েই সে সাবেক শাসক দাউদের হাজার হাজার অনুসারীকে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে খুন করিয়েছিল। এবার সে খোলামেলাভাবে দীনদার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে বসে। প্রথমেই তার সরকারের বিরোধিতাকারী আলিমদের চরিত্রহননে মেতে ওঠে। কিন্তু তার এ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উলটো জনগণ দীনের সম্মান ও দীনের প্রহরীদের ইজ্জত রক্ষায় রাজপথে বেরিয়ে এসে সরকারের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে থাকে। মারমুখো তারাকি তখন প্রতিবাদী জনতার মিছিলে গুলি চালিয়ে অনেক মানুষকে শহিদ করে।

জিহাদের নতুন মর্মার্থ

তারাকি জনগণকে আলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আরেকটি ফন্দি আঁটে। সে জনগণের ধর্মীয় আবেগকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে কাবুলে নামসর্বস্ব ধর্মীয় স্কলারদের একটি কাউন্সিল গঠন করে। এরপর তাদের মাধ্যমে এই ফাতওয়া জারি করায় যে, সরকারবিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে 'জিহাদ'!

সে সামরিক বাহিনী ও সাধারণ জনগণকে এই বার্তা দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের সহায়তায় যুদ্ধ চালিয়ে গাজি বা শহিদ হোন। কিন্তু তার এই প্রোপাগান্ডাও সমাজে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করেনি; বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আলিমরাও তখন কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধকে জিহাদ আখ্যা দিতে থাকেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের অলিগলিতে জিহাদের আওয়াজ পৌঁছে যেতে থাকে, যা মানুষ কয়েক দশক ধরে ভুলে গিয়েছিল।

প্রচণ্ড সংঘর্ষ

সরকার ও সাধারণ জনগণের মধ্যকার সংঘাত এবার কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে

উঠতে থাকে। প্রথমে কুনার ও পাকতিয়া প্রদেশে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু হয়। সরকারি বাহিনী ট্যাংক, সাঁজোয়া যান এবং কামান নিয়ে ওইসব জায়গায় প্রবেশ করে। ফলে সংঘাত ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। মুজাহিদরা মামুলি অস্ত্র নিয়ে গেরিলা ধাঁচে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উপত্যকা ও সংকীর্ণ পাহাড়ি পথে সেনা-কনভয় আটকিয়ে সেগুলোর ওপর পাথর ছুড়ে মারতেন অথবা দেশি বোমা দ্বারা আক্রমণ চালাতেন। এমন এক যুদ্ধে প্রায় ১০০ আফগান সেনা এবং তাদের সঙ্গের চারজন রুশ সামরিক উপদেষ্টা নিহত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, রাশিয়া বরাবরই আফগান সরকারকে শিক্ষা ও সঙ্গ দিয়ে আসছিল।

পরিস্থিতি প্রতিদিন খারাপের দিকে গড়াচ্ছিল। সীমান্তের নিকটবর্তী আফগান এলাকা থেকে মানুষ পাকিস্তান অভিমুখে হিজরত করছিল। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে ৩০ হাজার মুহাজির পাকিস্তানে পৌঁছায়।

ইরানি বিপ্লব

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। বছরটি তার আঁচলে নতুন সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। সে বছর ১৬ জানুয়ারি ইরানের বাদশাহ রেজা শাহ পাহলবি দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। কেননা, তখন আয়াতুল্লাহ খোমেনির বিপ্লব সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বিপ্লবীরা মুর্গ বার আমরিকা (আমেরিকা মুর্দাবাদ) স্লোগানে মুখর হয়ে সাবেক শাসকের সব চিহ্ন বিলীন করে ফেলছিল। রেজা শাহ ছিলেন আমেরিকার অতি পছন্দের সরকার। কিন্তু ওই পর্যায়ে আমেরিকা তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে এগিয়ে আসেনি। এমনকি তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতেও অস্বীকৃতি জানায়। বাধ্য হয়ে রেজা শাহ মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের কাছে আশ্রয় নেন। সেখানে থাকাকালেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরপরই ইরানের প্রাচীন বাদশাহি ধারা নিঃশেষ হয়ে যায়।

ইরান তখন এক নতুন অবস্থানে পৌঁছে যায়, যার প্রতি আরববিশ্বসহ কয়েকটি দেশ শঙ্কা বোধ করছিল। রেজা শাহের সরকার আমেরিকাঘেঁষা হলেও বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির সরকার রুশঘেঁষা হওয়ার সম্ভাবনা অসম্ভব ছিল না। সর্বোপরি তাদের সরকার ছিল কট্টর শিয়াপন্থি। তাদের বিপ্লবী চিন্তাধারায় আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

রাশিয়া রেজা শাহর মতো আমেরিকাবান্ধব শাসকের পতনে আনন্দিত ছিল। ফলে এবার সে দেখতে থাকে তার জন্য আফগানিস্তানসহ আরববিশ্বে তাদের লাল বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার পথ অনেকখানি সুগম হয়ে উঠেছে। আর এ লক্ষ্যে ইরানকে তার

সহযোগী বানানো তেমন কঠিন কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু ইরানের নতুন বিপ্লবী সরকারকে তাদের ভাষায় ইসলামি বিপ্লবের অগ্রদূত এবং শক্তির জোরে নিজেদের মতবাদ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং দেখা যায়, কদিন যেতে না-যেতেই ইরান শাতিল আরবের মালিকানাকে উপলক্ষ্য বানিয়ে প্রতিবেশী ইরাকের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপের দিকে নিয়ে যায়। এরপর দ্রুতই এই বিবাদ যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়। যুদ্ধটি লাগাতার আট বছর অব্যাহত থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহর সীমাহীন সম্পদ ও শক্তি ক্ষতির শিকার হয়।

উষ্ণ জলে পৌঁছার রুশীয় পরিকল্পনা

পরিস্থিতি ছিল রাশিয়ার জন্য খুবই অনুকূলে। তার জন্য আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান এবং তারপর আরব সাগরের উষ্ণ জলে পৌঁছার রাস্তা তৈরি সহজসাধ্য দেখাচ্ছিল। আর অনেক দিন থেকেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখে আসছিল তারা। এবার ইরানে আমেরিকা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলে পরিস্থিতিটা যেন তাদের জন্য সোনালি সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিশ্বস্ত এজেন্ট তারাকি মসনদে আসীন ছিল। যে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেকোনো উদ্যোগ কার্যকর করতে ছিল একপায়ে খাড়া। আর পাকিস্তানকে তাদের জন্য অলঙ্ঘনীয় কোনো বাধা মনে হচ্ছিল না। সর্বোপরি পাকিস্তানে বিদ্যমান রুশ লবি তখন মাত্রাহীন তৎপর হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য সেনাশাসকের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না।

দিন যতই যাচ্ছিল, আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি ততই বাড়ছিল। ওই বছর আফগান সেনাবাহিনীতে সোভিয়েত রাশিয়ার উপদেষ্টাসংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এই উপদেষ্টারা মূলত ছিল আফগান সেনাদের প্রভু। এদের উপস্থিতিতে সেনাবাহিনীর পেশাগত অবস্থান মারাত্মকভাবে ধ্বংসের শিকার হয়। ওদিকে জনসমাজে কমিউনিজমের প্রচার-প্রসার বহুগুণ বাড়ানো হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে জনগণকে তাদের চিন্তাচেতনার সারথি বানানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কর্মী ও দায়িত্বশীলরা জনসমাবেশগুলোতে ইসলামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ্যে উপহাসে মেতে উঠত। নামাজ-রোজাকে জংলি নীতি ও ডেসিয়াসি কর্মকাণ্ড আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। তারা জনগণকে বলত, ধর্মীয় গ্রন্থাবলির পরিবর্তে লেনিন ও কার্ল মার্ক্সের সাহিত্য পড়ুন। ছেলে ও মেয়েরা মিলেমিশে শিক্ষাগ্রহণ করুক। আত্মপ্রশান্তির জন্য কুরআন-সুন্নাহ মোতাবিক ইবাদতের পন্থা বাদ দিয়ে ওই পন্থা অবলম্বন করুন, যা কমিউনিস্টরা বাতলে দেয়।

জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের সংগঠন

এই নাস্তিক্যবাদী জীবনদর্শনের বিপরীতে আফগান আলিমদের প্রতিবাদও ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের আত্মমর্যাদাবান মুসলিমরা আলিম ও মুজাহিদ নেতাদের নেতৃত্বে নিজেদের মতো জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছিলেন। লাঘমান প্রদেশের নুরিস্তানি মুজাহিদরা তো ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রচণ্ড শীতমৌসুমে তাদের এলাকার সেনাফাঁড়িতে হামলা শুরু করে দেন। এরপর ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে কুনার প্রদেশে মুজাহিদরা বড় আকারের একটি আক্রমণ চালান। ৫ হাজার মুজাহিদ চাঘা সারায়ি অঞ্চলে সরকারের বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলেন। যদিও সময়টা ছিল প্রতিরোধযুদ্ধের সূচনাকাল এবং তা সাধারণত পাখতুন জাতি অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতেই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছিল; তারপরও মুজাহিদদের সারিতে মধ্য-এশিয়া থেকে হিজরত করে আসা উজবেক, তাজিক ও তুর্কমান মুসলিমদের সামনের সারিতে দেখা যাচ্ছিল। কারণ, এরা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার জুলুম-অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের প্রত্যক্ষদর্শী। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঘৃণা এদের শরীরের প্রতিটি ধমনিতে প্রবাহিত হচ্ছিল।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে আমরা মুজাহিদদের যেসব দলকে জিহাদে সক্রিয় দেখতে পাই, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদিন হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলামি, প্রফেসর বুরহান উদ্দিন রাব্বানির জমিয়তে ইসলামি, মাওলানা মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদির হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিসের হিজবে ইসলামি (খালিস গ্রুপ)। এ ছাড়াও প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি 'জাবহাতে নাজাতে মিল্লি আফগানিস্তান' নামে একটি দল গঠন করে জিহাদে সক্রিয় হয়েছিলেন। কিছুদিন পর কাবুলের দক্ষিণস্থ ওয়ারদাক প্রদেশের পির সাইয়িদ আলি গিলানির 'ইসলামি মাহাজ'-ও জিহাদের ঘোষণা দিয়ে দেয়। এভাবে কমিউনিস্ট সরকারের সমস্যা দিন দিন জটিল হয়ে উঠতে থাকে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত অপহরণ

পাহাড়, গ্রাম ও বনাঞ্চলে মুজাহিদদের আক্রমণের ধারা শুরু হওয়ার পর কাবুল শহরে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ফলে বিশ্ববাসী হতচকিত হয়ে পড়ে। তখন থেকে এই ধারণা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে যে, মুজাহিদরা শহরেও তাদের কার্যক্রম পরিচালনার পুরোপুরি যোগ্যতা রাখে।

ঘটনা হচ্ছে, মুজাহিদদের একটি দল মার্কিন রাষ্ট্রদূত এডলফ ডাবসকে (Adolph Dubs) অপহরণ করে ফেলে। প্রশাসন সেই হোটেল—যেখানে তাকে পণবন্দি করে রাখা হয়েছিল—ঘেরাও করে রাখলেও তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। দুদিক থেকে

তুমুল ফায়ারিং হচ্ছিল। আর এর মধ্যে কোনো এক পক্ষের গুলিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মারা যায়। উপস্থিতদের ভাষ্য অনুযায়ী সরকারি বাহিনীর এলোপাথাড়ি গুলির শিকার হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। মার্কিন সরকারও আফগান সরকারকে এর জন্য দায়ী করে; আর প্রতিবাদস্বরূপ তারা আফগানিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

হেরাত—শহিদের রক্তে রাঙানো ফুলবাগান

এ অবস্থা চলাকালেই আফগান জনগণ সরকারের কঠিন নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। মুজাহিদদের কর্মতৎপরতা বন্ধের ব্যর্থতার ক্ষোভ শহুরে নাগরিকদের ওপর ঝাড়তে শুরু করে।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সরকার সাওর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিল। সরকার যেখানে অত্যন্ত ধুমধামে উৎসব পালন করছিল, সেখানে হেরাতের জনসাধারণ একটি প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আয়োজন করে। তারাকির সরকার এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে কঠিনভাবে পর্যুদস্ত করতে সেনাবাহিনীকে অ্যাকশন নেওয়ার নির্দেশ দেয়। হেরাতে ৭০ তম ডিভিশনের সেনারা মোতায়েন ছিল। এই বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন ইসমাইল খান তোরোন ও ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিন এই অমানবিক নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়। এ ছাড়া ওই ডিভিশনের প্রায় ১০ হাজারের মতো সেনা বিক্ষোভকারীদের কাতারে যোগ দেয়। তারা সরকারি অস্ত্রাগার লুট করে সকল অস্ত্র বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। হাতে অস্ত্র পেয়ে অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভকারীরা হেরাত শহরে থাকা সোভিয়েত কমান্ডোবাহিনী ও সামরিক উপদেষ্টাদের অবস্থানস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। এরপর সেখানে আক্রমণ চালিয়ে তারা প্রায় ৬০০-কে হত্যা করে নেয়।

সংবাদটি শুনে সরকারের মন্ত্রিসভা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারাকি ও আমিন জানত, রুশদের হত্যা অমার্জনীয় অপরাধ। এখন পুরো হেরাতবাসীকে এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। সুতরাং কাবুল ও কান্দাহার থেকে কয়েক ডিভিশন সেনা হেরাতে পৌঁছে যায়। বিমানবাহিনীও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সাঁজোয়া যান আর কামান নিয়ে সেনাবাহিনী হেরাতে আছড়ে পড়ে। বিমানবাহিনীও লক্ষ্যহীন বোমাহামলা চালিয়ে যায়। প্রথমে হেরাতে বিদ্যমান সেনা-হেডকোয়ার্টারকে টার্গেট করা হয়। এরপর শহরজুড়ে এলোপাথাড়ি গোলাবর্ষণ শুরু হয়। এই পাশব তাণ্ডবে সেনাবাহিনীর লোক ছাড়াও ৫ হাজারের মতো সাধারণ মানুষ শহিদ হয়। এভাবেই লাল বিপ্লবের ধ্বজাধারীরা তাদের বিপ্লবোত্তর প্রথম বার্ষিকী জাতির রক্ত দ্বারা উদ্‌যাপন করে।

কিন্তু এসব অত্যাচার আফগান মুজাহিদদের দুঃসাহসে পানি ঢালতে পারেনি; বরং

তাঁদের আবেগ ও প্রতিশোধস্পৃহা আরও বাড়ে। তখন গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি, মৌলবি নবি মুহাম্মাদি এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুসের পাশে বিপ্লবী নেতা হিসেবে নতুন একটি নাম যুক্ত হয়। সে নামটি ছিল হেরাতের ক্যাপ্টেন ইসমাইল খান তোরোন। তিনিও এবার রীতিমতো মুজাহিদ নেতার রূপ ধারণ করে সরকারের জন্য অধিক মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেন। আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাবান মুসলিমরা রক্তের দাবি ক্ষমা করতে রাজি ছিল না। তাই এ ধরনের সবকটি ট্রাজেডি তাদের রক্ত গরম করে তুলত।

কুনার প্রদেশে গণহত্যা

হেরাতের বিভীষিকাময় ঘটনার কিছুদিন আগে ২০ এপ্রিল ১৯৭৯ কুনার প্রদেশে অনুরূপ এক হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রদেশের কেরালা নামক জেলায় ২০০ পুলিশ এবং ২০ সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টা এসে পৌঁছায়। তারা পুরো বস্তিবাসীকে একটি মাঠে জড়ো করে। তারা অভিযোগ তোলে, বস্তিবাসীরা মুজাহিদদের সহযোগী। এরপর লাইনে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে তাদের ঝাঁজরা করে দেয়। এখানে কমপক্ষে ১ হাজার ২০০ লোক শাহাদাতবরণ করে। এরপর বুলডোজারের মাধ্যমে ওই শহিদদের লাশ একটি গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। শহিদরা তাদের জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহু আকবারের স্লোগান দিচ্ছিলেন। তাদের ইমানি আবেগ ছিল সত্যিই দর্শনীয়।

মুজাহিদ নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান

দেশজুড়ে মুজাহিদ নেতাদের অবস্থান সংকীর্ণ করে নিয়ে আসা হচ্ছিল। মোল্লা শোর নামে সমধিক পরিচিত আফগান বুজুর্গ মোল্লা মুহাম্মাদ ইবরাহিম মুজাদ্দিদিকে তাঁর পরিবারবর্গ এবং বংশের ১০০ নারী-পুরুষ-শিশুসহ বন্দি করা হয়। মোল্লা সাহেবের ওপর নিষ্ঠুর ও লজ্জাজনক অত্যাচার চালানো হয়। পেশোয়ারে অবস্থানরত তাঁর পরিবারের আরেক নেতা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদির ওপর প্রাণঘাতী হামলা তথা তাঁর অবস্থানে বোমা নিক্ষেপ করা করা হয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।

ক্ষমতার জন্য পাগলপারা হাফিজুল্লাহ আমিন

তখন আফগানিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বরত হাফিজুল্লাহ আমিন ক্ষমতা হাতিয়ে নিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, তারাকি সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। কারণ, তারাকি দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর পদও আঁকড়ে রেখেছিল। তা ছাড়া সে আফগান মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তিদের পররাষ্ট্র মিশনে নিয়োগ দিয়ে বেকার বানিয়ে রাখছিল। যেমন : উপ-প্রধানমন্ত্রী বাবরাক কারমালকে চেকোস্লোভাকিয়া এবং ড. নাজিবুল্লাহকে ইরানে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দিয়ে কার্যত তাদের নিষ্কর্মা বানিয়ে রাখে। তাই আমিন তারাকির এই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া জরুরি মনে করে।

সে সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। সে হেরাতের গণহত্যাকে তার ক্ষতাগ্রহণের প্রথম সিঁড়ি হিসবে বেছে নেয়। ফলে দ্রুতই তাকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তখন তারাকি শুধু একজন প্রেসিডেন্ট। তথাপি মূল শাসক কিন্তু তখনো সে-ই ছিল। আমিন ছিল তার ডান হাত। এরপর দিন যত যাচ্ছিল, আমিনের ক্ষমতার পরিধি ততই বেড়ে চলছিল। ২৭ জুলাই ১৯৭৯ তাকে কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচন করা হয়। এর পরে সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বও পেয়ে যায়।

হাফিজুল্লাহ আমিনের অতীত

আমিনের অতীত হচ্ছে—তার জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলের নিকটবর্তী প্রদেশ পাগমানে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্নের পর শিক্ষকতা পেশা বেছে নেয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকার তাকে প্রশাসন-বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি MBA অর্জনের জন্য আমেরিকায় পাঠায়। ডিগ্রি অর্জন শেষে সেখানকার আফগান ছাত্রদের একটি সংগঠনের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে সাধারণ নির্বাচন চলাকালে দেশে ফিরে নির্বাচনে অংশ নেয়, তবে ফেল করে। কিছুদিন পর কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্লাটফর্ম পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দেয়। এরপর দ্রুতই আফগান রাজনীতিতে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে ফেলে।

আমিন রুশ ও কমিউনিস্টদের প্রিয়পাত্র হওয়ার পাশাপাশি আমেরিকার কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল। এ জন্য তারাকি তাকে খুব গুরুত্ব দিত। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের সাওর বিপ্লবে তার অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। মূলত সে-ই কমিউনিস্ট সেনা-অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দাউদের বিপক্ষে সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলেছিল।

তারাকি ও আমিনের দ্বন্দ্ব

হাফিজুল্লাহ আমিন আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছিল। এবার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় পৌঁছা তার জন্য তেমন কঠিন কাজ ছিল না। আমিনের বড় সফলতা ছিল, সে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট তারাকিকে সামান্যতম সন্দিহান হতে দেয়নি। তাকে পূর্ণ

আস্থায় রেখেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই তারাকি সরল বিশ্বাসে তার হাতে অনেক ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। তারাকির এই সরলতার সুযোগে আমিন তার স্বার্থ আদায় করে। সে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত করে। কাবুলের বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনায় তার ছবি সেঁটে দেয়। এভাবে নিজেকে সে তার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমসহ নিত্যনতুন পরিবর্তন তারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে থাকে। তবে হাফিজুল্লাহ আমিনের কোনো পরিকল্পনাই জনগণের ক্ষোভ দমাতে কার্যকর হয়নি।

তার ওই দৌড়ঝাঁপ কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার অগোচরে ছিল না। রুশরা তার চেয়ে তারাকিকেই বেশি বিশ্বাস করত। তারা হাফিজুল্লাহকে আমেরিকার প্রিয় হওয়ায় কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। তারা এটাও দেখছিল যে, সে এতটা ক্ষমতালাভের পরও জনগণের প্রতিরোধ দমনে এবং কমিউনিজমকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে তুলে ধরতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। সুতরাং ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তারাকি মস্কো সফরে গেলে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ (Leonid Brezhnev) একান্ত সাক্ষাতে আমিনের পরিকল্পনার ব্যর্থতার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে পদচ্যুতির প্রস্তাব দেয়।

১১ সেপ্টেম্বর তারাকি কাবুলে ফিরে এলে কমিউনিস্টরা বিমানবন্দরে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। পরদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রেসিডেন্ট আমিনের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে বরখাস্তের হুমকি দেয়। কিন্তু তারাকি তখনো জানত না, আমিন ততদিনে শুধু সামরিক বাহিনী আর পুলিশই নয়; বরং মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যকে তার দলে টেনে নিয়ে অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে।

আমি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠক ডেকে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিপক্ষের কজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে দেয়। এরপর সিদ্ধান্তটি যখন অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্টের টেবিলে যায়, তখন তারাকি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সে তখন স্পষ্ট বুঝতে পারে আমিন ক্ষমতা কতটুকু সংহত করে নিয়েছে। অবস্থা সামাল দিতে তখনই আমিনকে টেলিফোন করে। তারা তখন এই সিদ্ধান্তে আসে যে, রুশ রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে তারা প্রেসিডেন্ট-ভবনে বসে নিজেদের ঝামেলা মিটিয়ে নেবে। তারাকি ফোনে আমিনকে বলে দেয়, রুশ রাষ্ট্রদূত এখনই এসে পড়বেন, তুমিও দ্রুত এসে পড়ো। এটি ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বরের ঘটনা।

তারাকির হত্যা

এই আলাপই ছিল উভয় কমিউনিস্ট নেতার জীবনের শেষ বাতচিত। আমিন এরচেয়ে বেশি কথা বলতে-শুনতে প্রস্তুত ছিল না। তাই রুশ রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট-ভবনে পৌঁছার

আগেই আমিন প্রেসিডেন্ট-ভবন অবরোধ করে ফেলে। কিছুক্ষণ পর সে নিজে সেখানে পৌঁছে অভিযান শুরুর নির্দেশ দেয়। নির্দেশ হওয়ামাত্রই প্রেসিডেন্ট-ভবন মুহুর্মুহু গোলার আঘাতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আর কয়েক মুহূর্তেই তার ঘনিষ্ঠ তিন মন্ত্রী এবং পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানসহ তারাকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কতিপয় সূত্রমতে জানা যায়, তারাকি তখন নিহত হয়নি; বরং তাকে আহত অবস্থায় অপহরণ করে এক গোপন কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়। তিন সপ্তাহ পর ১৮ অক্টোবর ১৯৭৯ সেখানে তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়।

মোটকথা, আফগানিস্তানে কমিউনিজমের বিষাক্ত বীজ বপনকারী ইসলামের এই শত্রু মাত্র ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন ক্ষমতায় থেকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় মারা যায়। এর পরপরই হাফিজুল্লাহ আমিন আফগানিস্তানের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা দখল করে। প্রাথমিকভাবে তারাকির মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, অসুস্থাজনিত কারণে তারাকি পার্টির দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশে আরও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজুল্লাহ আমিনের শাসনকাল

আফগানিস্তানের ক্ষমতা এখন হাফিজুল্লাহ আমিনের হাতে। সে তারাকির মতো রাশিয়ার বিশ্বস্ত না হওয়ায় রাশিয়া তার সরকারকে স্বাগত জানায়নি। রাশিয়ার এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমিন আমেরিকার দিকে ঝুঁকতে থাকে। আমেরিকা শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ আফগানিস্তানকে সাহায্য প্রদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং একটি যাত্রীবাহী বিমান উপহার পাঠায়। এ দিকে অত্যাচার-অনাচারের ভূত আরেকবার আফগানিস্তানে তার রক্তক্ষুধা মেটাতে তৎপর হয়ে ওঠে। আমিনও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সাবেক প্রেসিডেন্টের সহযোগীদের নির্বিচারে হত্যায় মেতে ওঠে। তবে অল্পদিনেই আমিন বুঝতে পারে, একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অসন্তুষ্টি, অপরদিকে জনগণের ক্ষোভ সঙ্গে নিয়ে তার পক্ষে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু সে ছিল একজন ঝানু পরিকল্পনাবিধ, তাই একদিকে সোভিয়েত রাশিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, আফগানিস্তানে একমাত্র সে-ই কমিউনিজমের সংস্কার অব্যাহত রাখা, জনগণের ক্ষোভ প্রশমন এবং উন্নয়নকাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পুরোপুরি যোগ্যতা রাখে। অপরদিকে জনগণের রায় অর্জনের লক্ষ্যে সাহিত্যিক-সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি দল তৈরি করে তাদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের আশ্বাস দেয়। শুধু তা-ই নয়; বরং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকেও আশ্বস্ত করতে টাকায় কেনা

কিছু আলিমকে জড়ো করে 'জমিয়তে উলামা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। এর সদস্যদের 'উলুল আমর' উপাধি প্রদান করে। এরপর জনগণের সামনে আবেদন রাখে, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক 'উলুল আমর'দের আনুগত্য করুন। কিন্তু আমিনের এই চালবাজিও আফগান জনতাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সে ধর্মীয় প্লাটফর্ম থেকে 'উত্তম মুসলমান' প্রত্যয়ন অর্জন করতে পারেনি।

মস্কো আফগানিস্তানে আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুত

ওদিকে মস্কো আমিনের গতিবিধি গভীর পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তার বিকল্প নিয়ে চিন্তা করছিল। রাশিয়া দেখতে পাচ্ছিল আফগান পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। দাউদ খানের পর তারাকি, এখন হাফিজুল্লাহ আমিনও কমিউনিজমের বিরোধীদের পর্যুদস্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা দেখতে পাচ্ছিল আফগানিস্তানে ইসলামপ্রিয় জনতাকে কাবু করতে এখন সরাসরি তাদের হস্তক্ষেপের দরকার। সুতরাং তারা এ লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেয়। রুশবাহিনীর বিশাল একটি দল মধ্য-এশিয়ায় এসে পৌঁছায়। এখানে যেন তখন ট্যাংক, কামান ও যুদ্ধবিমানের মেলা বসে যায়।

রাশিয়া আফগানিস্তানে প্রবেশের আগে অন্য কয়েকটি বিরোধী দেশে সেনা মোতায়েনের প্রশিক্ষণ সেরে নেয়। তারা আফগানিস্তানে যথারীতি আগ্রাসন চালানোর আগে আন্তোনভ ২২ বোমারু বিমানের ছত্রছায়ায় ১০ হাজার সেনা দক্ষিণ-ইয়েমেন ও ইথিওপিয়াতে অবতরণ করায়। এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গোপনে সারা হয়। এমনকি আমেরিকার তৎপর গোয়েন্দসংস্থাও তা টের পায়নি। রুশ সরকার একদিকে হাফিজুল্লাহ আমিনকে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাচ্ছিল, অপরদিকে আমু দরিয়ার পাশে ৪০ তম বিগ্রেডের সেনাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিল।

তথ্যসূত্র

৪. *তারিখু আফগানিস্তান মিন কুবাইলিল ফাতহিল ইসলামি ইলা ওয়াকতিনাল মুআসির*, ফারুক হামিদ বদর।

৫. *তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান*, ড. এইচ বি খান।

৬. *আফগানিস্তান, এক কওম কা আলমিয়া*, আহমাদ শুজা পাশা।

৭. *উর্দু ডাইজেস্ট, জিহাদে আফানিস্তান*, এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৮৯।

৮. *Encyclopedia Britannica* (Afghanistan)

২৪ তম অধ্যায়

আফগান ভূমিতে সোভিয়েত আগ্রাসন

আফগানিস্তানে সোভিয়েতবাহিনীর দখলদারত্ব

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের আগেও আফগানিস্তানে রুশবাহিনীর উপস্থিত ছিল। তারাকি ও আমিন প্রয়োজনে তাদের ডেকে পাঠাচ্ছিল। এ ছাড়া অত্যাধুনিক অস্ত্র চালনার জন্যও তাদের ডাকা হতো। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন নাগাদ আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপদেষ্টাদের সংখ্যা ৮ হাজারে পৌঁছে যায়। এদের অর্ধেক ছিল সিভিলিয়ান উপদেষ্টা; আর অর্ধেক ছিল সামরিক উপদেষ্টা। এ ছাড়া ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ আগ্রাসন পরিচালনার আগে রাশিয়া ২৫ হাজারের মতো সেনা আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমিন জানত, সে মস্কোর কাছে পছন্দনীয় নয়। তাই রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করতে মুজাহিদদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে তাদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালায়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে সে পাকতিয়ায় মুজাহিদবিরোধী বড় ধরনের একটি অপারেশন চালায়। এ অপারেশনের ফলে ৪০ হাজার আফগান নাগরিক সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সরকারি বাহিনী তখন এই আত্মতুষ্টি নিয়ে ফিরে যায় যে, মুজাহিদরা পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু মুজাহিদরা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে পাকিস্তানি ক্যাম্পে রেখে পাকতিয়ায় ফিরে আসেন। এবার তাঁরা আগের চেয়েও জোরদার হামলা শুরু করেন।

তাগুতের সাহায্যের আশায় আমিন

এত শক্তিশালী আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র থাকার পরও পরিস্থিতি ক্রমশ আমিনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তারাকির শাসনামলের মতো তার শাসনকালেও বড় বড় শহরে কারফিউ জারি রাখা হচ্ছিল। সে এতটাই ভীত ছিল যে, রাজধানীতে সর্বক্ষণ বিপুল পরিমাণে সেনা মোতায়েন রাখা জরুরি মনে করত। এ পর্যায়ে আমিন রুশ তাগুতের সাহায্যের অপেক্ষা করতে থাকে। সুতরাং এক সংবাদপত্রকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলে, 'আমাদের ওপর হামলা হলে আমরা রাশিয়াকে ডাকতে বাধ্য হব।'

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য আমিনের ডাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না; তারা অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে আক্রমণ চালানোর স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল।

৪ লাখ মুহাজির

এ দিকে আফগানিস্তানের এই বেসামাল অবস্থায় পাকিস্তান মারাত্মক প্রভাবিত হচ্ছিল। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ পাকিস্তানে মুহাজিরদের সংখ্যা ৪ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এ পরিস্থিতি ছিল আমিনের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত এবং তার ব্যর্থতার স্বীকৃতির নামান্তর। এ কারণেই হাফিজুল্লাহ আমিন মুহাজিরদের দেশে ফিরে আসার এবং তাদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়। কিন্তু সে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটালে মুহাজিররা কোন বিশ্বাসে ফিরবে? তাই মৌলবি ইউনুস খালিস তার আবেদন সাফ প্রত্যাখ্যান করে দেন।

পাকিস্তানের শাসক জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক আফগানিস্তানে রাশিয়ার হামলার আশঙ্কা করে ডিসেম্বরের শেষ দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগা শাহিকে কাবুলে পাঠানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচণ্ড বরফপাতের ফলে তিনি যেতে পারেননি।

বড় ধরনের খেলা

ডিসেম্বরের শেষ দশকে রাশিয়া আফগানিস্তানে তার সেনাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ফেলে। এর জন্য বড় ধরনের একটি খেল খেলা হয়। রাশিয়া বিশ্ববাসীর সামনে এ বিষয়টি তুলে ধরে যে, তারা আফগানিস্তানে বড় পরিসরে সাহায্যসামগ্রী পৌঁছাতে মালবাহী জাহাজ ব্যবহার করছে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯ রাশিয়া নতুন কিছু ট্যাংক, অত্যাধুনিক অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ কাবুলে পাঠায়। এরপর এক উৎসবের নামে আফগান শাসকদের মস্কোয় ডেকে নিয়ে সেখানে তাদের রাশিয়ার বিশেষ মদ (ভদকা) দ্বারা আপ্যায়িত করে। সেখানে তাদের বলা হয়, রুশবাহিনী এখন থেকে আফগানিস্তানে সেনাসাহায্যও বাড়াবে।

আফগানিস্তানের মাটিতে ১ লাখ সোভিয়েত সেনা

২৩ ও ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে রাশিয়ার আন্তোনভ ও ইলিউশিন বিমানগুলো বাগরাম বিমানঘাঁটিতে রুশ সেনাদের নামাতে থাকে। হাফিজুল্লাহ আমিন, তার প্রশাসন এবং আফগান সেনারা এ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের কারও পক্ষে টুঁ শব্দটি করার সাহস ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমানগুলো এই কদিনে বাগরাম বিমানবন্দরে ৩৫০ দফা ওঠানামা করে হাজার হাজার সেনা নামিয়ে দেয়। বিমানবন্দরটি

কয়েক বছর আগে এমনতর কোনো উদ্দেশ্যেই রাশিয়া নির্মাণ করে দিয়েছিল।

২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ ১ লাখ সোভিয়েত সেনা আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে। আমিন তখন এক অজানা আশঙ্কায় ২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে চতুর্থ আর্মড বিগ্রেডের অফিসারদের একটি জরুরি মিটিং ডেকে তাদের অভিমত জানতে চায়। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়, এমন কোনো পদক্ষেপ যেন নেওয়া না হয়, যার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে; আর সাওর বিপ্লবের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হয়।

আফসোস! এই আত্মমর্যাদাহীন শাসক আর অফিসাররা যদি তাদের চোখ থেকে কমিউনিজমের চশমা সরিয়ে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করত, তাহলে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি পদক্ষেপ আফগানিস্তানের নিরাপত্তার জন্য বিষাক্ত বর্শা হিসেবেই দেখতে পেত। কিন্তু কমিউনিজমের পূজারিরা কি তাদের প্রভুদের ব্যাপারে এমনটি ভাবতে পারে? তারা তো ছিল আত্মতুষ্টির দুনিয়ায় দিওয়ানাপ্রায়।

রাশিয়ার আমিনবিরোধী অপারেশন

এ দিকে আফগান সেনাবাহিনীর অঘোষিত প্রভু সোভিয়েত রাশিয়ার হাজার হাজার উপদেষ্টা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা আমিনের সমর্থক অফিসারদের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে সেখানে তাদের বন্দি করে রাখে। বড় মাপের অনেক অফিসারের হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে তাদের নড়াচড়ার পথ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়।

আমিন কিছুদিন আগে সোভিয়েত উপদেষ্টাদের পরামর্শে কাবুলের নিরাপদ প্রেসিডেন্ট-ভবন ছেড়ে 'দারুল আমান' নামে আরেক ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেখানে রুশবাহিনীর পক্ষে তাকে সহজেই কাবু করা সম্ভব ছিল। কেননা, ওই প্রসাদোপম বিল্ডিং ছিল আবাসিক এলাকার বেশ বাইরে। ২৭ ডিসেম্বর দুপুর পর্যন্ত আমিন ভোগবিলাসের মধ্য দিয়ে নির্ভার সময় কাটাচ্ছিল। তবে মাঝেমধ্যে অন্তরে কেমন যেন একটি অজানা আশঙ্কা খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তৃতীয় প্রহরে রুশ যোগাযোগমন্ত্রী অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'সবকিছু যদি স্বাভাবিক নিয়মে চলে, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

বন্ধুত্বসুলভ এই আচরণের মাধ্যমে তারা আমিনকে যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত রাখতে চাচ্ছিল। কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসতেই কেজিবির একদল কমান্ডো দারুল আমানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তারা আমিনকে জীবিত গ্রেপ্তারের ইচ্ছা করছিল। তখন দারুল আমানের নিরাপত্তারক্ষীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু তারা আধুনিক যুদ্ধ-প্রশিক্ষিত কমান্ডোবাহিনীকে রুখতে ব্যর্থ হয়। তারা একের পর এক মারা যেতে থাকে। ওই সংঘর্ষ চলাকালে আমিনও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তার পরিবারের অনেক সদস্যও মারা পড়ে। কথিত আছে, তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর হত্যা করা হয়।

আমিনের কালো অধ্যায় এবং অশুভ পরিণতি

হাফিজুল্লাহ আমিন ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ পর্যন্ত মাত্র ১০২ দিন শাসনকাজ পরিচালনা শেষে মৃত্যুর ঠিকানায় পৌঁছে যায়। এই সংক্ষিপ্ততম মেয়াদে সে সাধারণ ও বিশিষ্ট আফগান নাগরিকদের ওপর যে পাহাড়প্রমাণ অত্যাচার চাপিয়ে দিয়েছিল, তার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। সে তার প্রত্যেক বিরোধীকে—চাই সমাজে সে যতবড় অবস্থানেই থাক না কেন—নির্দয়ভাবে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতো না। তার পূর্বসূরি তারাকির অনুসারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। আফগানিস্তানের বড় বড় ব্যক্তিকে জেলখানায় পচিয়ে মারছিল। তার নির্দেশে নিহতদের মধ্যে রাজনীতিবিদ, আলিম, বুদ্ধিজীবী, ব্যুরোক্রেট, সিভিল অফিসার, সেনা, কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণ সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ক্ষমতাগ্রহণের সময় সে অঙ্গীকার করেছিল, জেলখানা শূন্য করে দেবে; কিন্তু মাত্র কয়েক মাসে সে জেলখানায় দ্বিগুণ মানুষ ঠেসে দেয়।

সোভিয়েত আগ্রাসনের অন্তরালের উদ্দেশ্য

আফগানিস্তানের শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসাই শুধু রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল না; এ কাজ তো তারা তাদের এজেন্ট ও গোয়েন্দা-বিভাগের মাধ্যমেই সারতে পারত। রাশিয়া মূলত যুগ যুগ ধরে লালন করে আসা সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল; যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা দখল করেছিল মধ্য-এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো। তারা এখানকার জিহাদি জজবা গুঁড়িয়ে দিয়ে কমিউনিজমের অভিশাপ দাঁড় করাতে চেয়েছিল। এ ছাড়া এখানকার অমূল্য অঢেল খনিজ সম্পদ ডাকাতি করাও উদ্দেশ্য ছিল। আর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল, এতে করে তারা পাকিস্তানকে কাবু করে নেবে এবং সরাসরি ভারত মহাসাগরের পথ ধরে আরব দেশগুলোতে চড়াও হবে। মোটকথা, রাশিয়া আফগানিস্তান দখলের মাধ্যমে পুরো মুসলিমবিশ্বকে পরাজিত করার এবং বিশ্বে একক পরাশক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তারা জানত না, এমন এক ভূখণ্ডে তারা এসে প্রবেশ করেছে, যেখানকার আত্মমর্যাবান মুসলিমরা যুগে যুগে জীবনের বাজি রেখে তাদের ইমান, স্বাধীনতা ও সম্মানের হিফাজত করে গেছে।

চারটি বড় উদ্দেশ্য

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের অন্তরালের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। এ নিয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনাও শোনা যায়। তথাপি কয়েকটি বিষয় ছিল সুস্পষ্ট :

১. **কমিউনিজমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা :** রাশিয়া ছিল কমিউনিজমের প্রবক্তা। তারা বিশ্বময় নাস্তিক্যবাদী এই দর্শনের বিজয় দেখতে চেয়েছিল।

২. **ইয়াহুদিদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন :** কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও লেনিন উভয়েই ছিল ইয়াহুদি। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে রুশ জার শাহির পতন ঘটিয়ে মস্কোকে কমিউনিজমের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ইয়াহুদিরা ছিল সামনের সারিতে। ইবলিসের এই সহচররা সমগ্র বিশ্ব পদানত করার নাপাক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কমিউনিজমের চাদর পরে নিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর তাদের সামনে একমাত্র বাধা ছিল আফগানিস্তান। সুতরাং একে পদানত করতে না পারলে আধিপত্যবাদী ইয়াহুদিদের পরিকল্পনা অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়।

৩. **উষ্ণ জল পর্যন্ত পৌঁছার কামনা :** অনেক আগে থেকেই রাশিয়া গরম পানি পর্যন্ত পৌঁছার তীব্র আগ্রহী ছিল। তার লাখ লাখ বর্গমাইলের সুবিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও এমন একটি সমুদ্র ছিল না, যা পুরো বছরব্যাপী খোলা রাখা যায়। কারণ, তার সীমান্তের সব সমুদ্র শীতকালে বরফের চাঙ্গারে পরিণত হয়ে যায়। রাশিয়ার জার প্রথম পিটার তার অসিয়তনামায় গুরুত্বারোপ করে বলেছিল, 'আমাদের দেশের জন্য দক্ষিণে এগিয়ে উষ্ণ জলের সমুদ্রে পৌঁছা এবং সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন অপরিহার্য কর্তব্য।' এই অসিয়তনামা পরবর্তী রুশ শাসকরা সবসময় তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অংশ বানিয়ে রাখে। এ জন্য তারা দক্ষিণ দিকের বিজয়াভিযানকে গুরুত্ব দিয়ে আসে। আফগানিস্তানকে কবজা করা ছাড়া রাশিয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আফগান ভূখণ্ডটি দীর্ঘকাল থেকে তাদের টার্গেট হয়ে থাকে। তাদের বিজয়াভিযানের পরিকল্পনায় সবসময়ই এই ভূখণ্ড ছিল প্রথম কাতারে।

৪. **খনিজ সম্পদ দখল :** রাশিয়া কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদ ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এ ছাড়া তারা উপসাগরীয় মুসলিম দেশসমূহের তেলের ভান্ডার দখলের জন্যও অস্থির ছিল। ভূ-বিশেষজ্ঞদের মতে, আফগানিস্তানের ভূমির নিচে রয়েছে অঢেল তেল, গ্যাস, ইস্পাত, তামা এবং মূল্যবান পাথরের ভান্ডার। প্রাকৃতিক গ্যাসের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই আবিষ্কার হয়ে পড়েছিল। এ গ্যাস সোভিয়েত ইউনিয়নে রপ্তানি করা হচ্ছিল। বিশ্ববাজারে গ্যাসের নির্ধারিত মূল্য থেকে অনেক কম মূল্যেই তা বেচা হচ্ছিল। কিন্তু রাশিয়া এখন কোনো মূল্য ছাড়া সরাসরি নিজেরা উত্তোলন করতে উপসাগরীয় তেল-কূপগুলো দখলের ইচ্ছা পোষণ করে।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির সাক্ষ্য

এই ধারাবাহিকতায় রাশিয়া শুধু আফগানিস্তান নয়; বরং পাকিস্তানও দখল করা ছাড়া তাদের অভিযানকে অর্ধসমাপ্ত মনে করছিল। মহান কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি মাসিক পত্রিকা *আল-হক*-এর ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন সংখ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেন, 'এই অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার পরিকল্পনার প্রথম অংশ হচ্ছে, আফগানিস্তানকে পুরিপূর্ণভাবে পদানত করার পর পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান দখল করা। রাশিয়া এর মাধ্যমে উষ্ণ জলে পৌঁছতে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলের উৎসগুলো দখল করতে বদ্ধপরিকর।'

তাৎক্ষণিক কারণ

এগুলো তো ছিল ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একদিন না একদিন রাশিয়াকে আফগানিস্তানে পা রাখতেই হতো। দাউদ খান ও তারাকির মতো কমিউনিস্ট এজেন্টরা জেনেই হোক কিংবা না জেনে রাশিয়ার ওই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন রাশিয়া দেখতে পায়, তাদের ওই এজেন্টরা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে আর আফগান আলিম ও মুজাহিদরা জিহাদের ময়দানে নেমে তাদের কমিউনিজমবাদকেই শঙ্কার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, তখন তারা অনুধাবন করতে পারে, সময় থাকতেই যদি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ওদের দমানো না যায়, তাহলে আফগানিস্তান কমিউনিজমের ঘাঁটি হওয়ার পরিবর্তে জিহাদের ঘাঁটি হয়ে উঠবে। তাই তারা সর্বশক্তি নিয়ে আফগানিস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে কারও সমালোচনায় কান দেওয়ার গরজ অনুভব করেনি।

বেখবর বিশ্ব

২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ রুশ লাল ফৌজ আফগানিস্তানে ঢুকে পড়লে আফগানিস্তান পুরো বিশ্বের দৃষ্টির সামনে চলে আসে। কিছুদিন আগেও কেউ ভাবতে পারেনি যে, সোভিয়েত রাশিয়া এমন উলঙ্গভাবে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ার দুঃসাহস দেখাবে। এমনকি আমেরিকার সিআইএ-ও এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো আমেরিকান মিডিয়াগুলো সংবাদটি ২৮ ডিসেম্বর সকালে প্রচার করে। অন্যরা দূরে থাক খোদ প্রতিবেশী পকিস্তানও কিছুই অনুমান করতে পারেনি। জেনারেল জিয়াউল হক ভালো করেই আমিনের রুশবিদ্বেষ ও আমেরিকাপ্রীতির খবর জানতেন। তিনি আফগানিস্তানে রাশিয়ায় ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে চিন্তিতও ছিলেন। ফলে আমিনকে ভরসা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। এ লক্ষ্যেই তিনি ২৩ ডিসেম্বর তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগা শাহিকে

কাবুলে পাঠানোর ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সকাল হতেই তিনি সোভিয়েতবাহিনীর কাবুল দখলের সংবাদ পান। অন্যথায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো ঘুণাক্ষরেও তা আঁচ করতে পারলে ২৮ ডিসেম্বর আগা শাহির কাবুল সফরের সিদ্ধান্ত হতো না।

দাবার নতুন ঘুঁটি

কদিন ধরে বিশ্বেজুড়ে এ আলোচনাই হচ্ছিল, এখন আফগানিস্তানের নতুন শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিন্যাস কেমন হবে? কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন আগেই একটি ঘুঁটি তৈরি করে রেখেছিল, সে ঘুঁটির নাম ছিল বাবরাক কারমাল।

কমিউনিস্ট পরচম পার্টির নেতা কারমাল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে দুররানি গোত্রে জন্মগ্রহণ করে। তার বংশধারা আফগানিস্তানে অত্যন্ত সম্মানি হিসেবে বিবেচিত হতো। তার পিতা মুহাম্মাদ হুসাইন খান ছিলেন হেরাত ও পাকতিয়ার গভর্নর। তিনি আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী হলেও সাধারণ আফগানদের মতোই কমিউনিজমের প্রতি কোনো আগ্রহ রাখতেন না; প্রথাগত মুসলমান ছিলেন। জাতিগতভাবে পাখতুন হলেও তারা পশতু ভাষার পরিবর্তে দারি ভাষায় কথা বলতেন।

কারমাল কাবুলস্থ আমানিয়া হাইস্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করে। দেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বাদশাহ আমানুল্লাহ খান স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হাইস্কুল সমাপ্ত করে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও রাজনীতিতে ডিগ্রি অর্জন করে। তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া আফগান রাজনীতিতেও কমিউনিজমের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছিল। আর তা ছিল দাউদের সংস্কারনীতির প্রতিফল। কারমাল ওই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরপর একজন পাঁড় কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে। তার মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মির আকবার খানের হাত ছিল খুব অগ্রসর।

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক দলগুলো কাজের অনুমতি পেলে কারমাল নুর মুহাম্মাদ তারাকির সঙ্গে মিলে কমিউনিস্ট পার্টি পিডিএ (পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সে ছিল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। এরপর তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারাকি 'খালক' নামে আর কারমাল 'পরচম' নামে পার্টি গঠন করে। তবে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সংঘটিত সাওর বিপ্লবে উভয় পার্টি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। ফলে সরকার গঠনে কারমালের পার্টিও অংশ পায়। তারাকির পর তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তারাকি তাকে অকার্যকর করতে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। কারমাল তখন চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে অস্থিরতার জীবনযাপন করছিল।

রাশিয়ার কাঠপুতুল শাসক বাবরাক কারমাল

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর আগে এখানে তাদের কাঠপুতুলদের ওপর দৃষ্টি দিলে কারমালকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ মনে করে। তাকে তাদের ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কারমাল ক্ষমতার চিত্তাকর্ষক লোভে সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুগত্যের অঙ্গীকার জানিয়ে দেয়। মস্কোতেই তার মুখে সেই ভাষণ রেকর্ড করা হয়, যা আমিন-হত্যার পর ২৭ ডিসেম্বর রাতে কাবুল রেডিয়ো থেকে আফগানজাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। অথচ কারমাল তখনো আফগানিস্তান এসে পৌঁছায়নি। তার ভাষণের সারাংশ হচ্ছে,

> আমার বাহাদুর ও নির্ভিক দেশবাসী, আমি আপনাদের ওপর নির্ভরতা ছাড়া একমুহূর্ত বাঁচতে পারি না। আপনারা হাফিজুল্লাহ আমিনের যুগে অত্যাচার-অনাচার, জোরপূর্বক হিজরত, মানবতাবিরোধী নিপীড়ন ও নির্দয় হত্যাযজ্ঞ দেখেছেন। সরাসরি তার নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রক্তখেকো হিংস্ররা কসাইয়ের মতো নিরপরাধ মানুষকে কেটে টুকরো টুকরো করে মেরেছে। কেননা, সে ছিল মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থা সিআইএর এজেন্ট। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এই দোসর তার কাজের পরিণতি সেই জনসাধারণের হাতেই ভোগ করেছে, যারা তার অত্যাচারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

হাফিজুল্লাহ আমিন কি সিআইএর এজেন্ট ছিল

কারমালের এ ভাষণ ছিল মিথ্যা ও প্রতারণার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। বিশ্ববাসী জানত, আমিনের হত্যাকাণ্ডের পেছনে আফগান জনগণের কোনো হাত ছিল না। মানুষ তাকে অপছন্দ করত ঠিক; কিন্তু তাকে হত্যা করতে খোদ কেজিবি তার কমান্ডোদের পাঠিয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিল জেনারেল ভিক্টর প্যাপোটিন (Papotin)। অপারেশন চলাকালে এই জেনারেল নিজেও গুরুতর আহত হয় এবং কিছুদিন পর মারা যায়। মোটকথা, সোভিয়েত রাশিয়া ও তার এজেন্টরা বিশ্ববাসীকে এটা দেখানোর চেষ্টা করছিল—আমিনের হত্যাকাণ্ড মূলত স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষোভের ফসল। রুশ সংবাদমাধ্যমগুলো শুধু এই ভিত্তিহীন সংবাদই প্রচার করেনি; বরং এই নির্জলা মিথ্যাও প্রচার করে বেড়ায় যে, আমিন ছিল সিআইএর এজেন্ট। সে আমেরিকার ইঙ্গিতে ইসলামি দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের সাওর বিপ্লবের সব প্রভাব বিনষ্ট করার চেষ্টা করছিল। অথচ রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আমিন ক্ষমতায় এলে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

রাশিয়া আফগানিস্তানে ১ লাখ সেনা অনুপ্রবেশ ঘটানোর পর এই মিথ্যার বগলবাদ্যও

বাজাচ্ছিল—তারা নাকি আমিনের অনুরোধে এখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সে সিআইএর এজেন্ট হয়ে থাকলে রাশিয়াকে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানায় কীভাবে? আসলে আমিন ইসলামপন্থিও ছিল না, মার্কিন এজেন্টও ছিল না। সে ছিল একজন পাক্কা কমিউনিস্ট। তবে তারাকির চেয়ে কিছুটা নিম্নমানের। 'রাশিয়া আমিনের অনুরোধে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছে' কথাটা ছিল আসমন্ত প্রোপাগান্ডা। আমিন কমিউনিস্ট হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান চাপের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা ভীত ছিল। সে কোনো অবস্থায়ই রুশবাহিনীকে হস্তক্ষেপের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না। সত্যিই যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ডাকে সাড়া দিয়ে বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটাতে এখানে এসে থাকে, তাহলে এসেই প্রথমে তাকে যমালয়ে পাঠাবে কেন?

আসলে রাশিয়া ভয় করছিল—আমিন তো হচ্ছে তার অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষদর্শী, তাই সে যেন কাল বিশ্ববাসীকে এ কথা জানিয়ে না দেয় যে, সোভিয়েত সরকার আমাকে ধোঁকা দিয়ে আফগানিস্তানে এমন হস্তক্ষেপ করেছে—এ জন্য ওই চাক্ষুষ সাক্ষীকে তারা আগে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর বিশ্ববাসীকে জানায়, সে আমাদের হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছিল। তবে আফগান নাগরিকরা তাদের ওপর অত্যাচারের এবং মার্কিন দালালির প্রতিশোধ নিতে তাকে হত্যা করেছে।

প্রেসিডেন্ট-ভবনে বাবরাক কারমাল

আমিন-হত্যার চারদিন পর রাশিয়া তার পুতুলকে আফগানিস্তানে ডেকে আনে। কারমাল রাশিয়ার মোটর রাইফেল ডিভিশনের ৩৬০ নম্বর নিরাপত্তাবাহিনীর প্রহরায় ট্যাংকে চড়ে প্রেসিডেন্ট-ভবনে প্রবেশ করে। সে দিন ছিল ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি। এরপর রাতেই সোভিয়েতপন্থি একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভায় জেনারেল আবদুল কাদির, মেজর আসলাম ওয়াতান ইয়ার, আসাদুল্লাহ সারওয়ারি, ফয়েজ মুহাম্মাদ, মেজর শের জান মাজদুর ইয়ার, মুহাম্মাদ রাফি, সুলতান আলি কাশমাতান্দ এবং মুহাম্মাদ গুলাবজাইয়ের মতো কমিউনিস্টরা জায়গা পায়। মন্ত্রিসভায় খালক ও পরচম দুই কমিউনিস্ট দলে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে রাশিয়া উভয় দল থেকেই মন্ত্রিসভার সদস্য বাছাই করে।

আসাদুল্লাহ ও সুলতান আলি কামাতান্দকে উপ-প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয়। আনাবেতা রাতাবজাদকে (নারী) শিক্ষামন্ত্রী, মুহাম্মাদ রাফিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, মুহাম্মাদ গুলাবজাইকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দোস্ত মুহাম্মাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাজদুর ইয়ারকে যোগাযোগমন্ত্রী এবং ফয়েজ মুহাম্মাদকে কাবায়েলি এলাকার বিশেষ মন্ত্রিত্বের পদ অর্পণ করা হয়। কারমাল দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিপ্লবী কাউন্সিলের সভাপতি এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব নিজের

হাতে রাখে। অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ মূল দায়িত্বগুলো তার হাতেই সংরক্ষিত থাকে। এ ছাড়া 'খিদমতে দাওলাতি' বা 'খাদ' নামে নতুন একটি গোয়েন্দাসংস্থা গঠন করে। পরচমি কমিউনিস্ট ডাক্তার নাজিবুল্লাহকে এর প্রধান নির্বাচন করা হয়।

কারমালের পদক্ষেপসমূহ

কাবুলে আসার দুদিন পর ৩ জুন ১৯৮০ কারমাল এক প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য দিতে গিয়ে তার সরকারের নতুন কর্মসূচি তুলে ধরে। সে এই বলে জনগণকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পায় যে, তার সরকার দ্রুতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে। এ ছাড়া প্রত্যেক কমিউনিস্ট শাসকের মতো সে-ও অর্থমূল্যে বিক্রি হওয়া কিছু আলিমকে কিনে নিয়ে তাদের মাধ্যমে দীনদার শ্রেণির অস্বস্তি দূর করার অপচেষ্টা চালায়। তার পূর্ববর্তী শাসকদের অনাচার বন্ধের ঘোষণা দিয়ে প্রায় ৮ হাজার বন্দিকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু এসব ছিল তার ধোঁকামাত্র। মুক্ত বন্দিদের প্রায় সবাই ছিল কারমালের দলীয় লোক, যারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আমিন কর্তৃক জেলে গিয়েছিল। সাধারণ বন্দিদের জন্য এই 'ক্ষমা-সিন্ধুর' একবিন্দুও ভোগের সৌভাগ্য হয়নি।

কারমাল তার ব্যক্তিত্ব বাড়াতে পদে পদে আমিনের সমালোচনা করে যাচ্ছিল। সে এ কথাও প্রচার করে বেড়ায় যে, আমিন আফগানিস্তানের পাখতুন প্রদেশকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আফগান জনগণ এখন সেই দেশবিক্রেতা সরকারের স্থানে দেশপ্রেমিক সরকার দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এসব কথার ফুলঝুরি জনগণের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। তারা কেবল এটুকুই জানত যে, এক কমিউনিস্টের কার্যক্রম যদি রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তাহলে কদিন পর নতুন আরেকজনকে তার জায়গায় বসানো হবে। তাদের কাছে কারমালের চিত্তাকর্ষক এসব ভাষণ ছিল অর্থহীন প্রলাপের নামান্তর। তার চিত্তহারী কর্মসূচি ও পরিকল্পনাগুলো ছিল নষ্টের গোদাম। জনগণ তাকে কেবল এক কাঠপুতুলই মনে করত। আর এটাই ছিল শতভাগ বাস্তবতা। কারমাল সব দিক দিয়ে সর্বদা রুশদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তার ড্রাইভার, দেহরক্ষী, বাবুর্চি, চিকিৎসক সবাই ছিল রুশ। সোভিয়েত রাশিয়ার ইশারায় নাচা ছাড়া তার করার কিছুই ছিল না।

কারমালের পরিকল্পনা

জনগণকে তার পক্ষে আনতে সে যে খেলা খেলেছিল এবং ব্যর্থ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিল, তার একঝলক দেখে নেওয়া যাক :

১. একটি নতুন জাতীয় স্লোগান জনপ্রিয় করা। 'এগিয়ে আসুন, জাতির গঠনে হাতে হাত রাখুন।'

২. বলা হয়—জেল-জুলুম ও ফাঁসির আদেশ রহিত করে দেওয়া হবে।

৩. অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক সব রীতিনীতি সরিয়ে ফেলা হবে।

৪. ইসলামের পবিত্র বিধানসমূহ, আইন, মৌলিক নীতিমালা, ইনসাফ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্মান জানানো হবে।

৫. অর্থহীন ট্যাক্স মওকুফ করে দেওয়া হবে।

৬. দেশপ্রেমিক দল, গণ ও সামাজিক সংগঠনসমূহ, মুক্ত ও অবাধ গণমাধ্যম এবং ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার চর্চা করতে দেওয়া হবে।

কিন্তু এসব ছিল লোকদেখানো ব্যাপার। মুলত এখন আফগানিস্তানের মূল প্রভু ছিল সোভিয়েত উপদেষ্টারা, যারা উচ্চতর পদ, মন্ত্রিসভা, সেনাবিভাগ থেকে নিয়ে কৃষি, শিক্ষাসহ প্রতিটি শাখায় পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করছিল।

কমিউনিজমের ব্যাপক প্রচারণা

কারমালের নামসর্বস্ব সংস্কারকাজের আড়ালে দ্রুতগতিতে কমিউনিজমের প্রচারণা চলছিল। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোও সোভিয়েত নীতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য ছিল। রুশ দৃষ্টিভঙ্গির আদলে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিমাসে শত শত কিশোরকে মস্কো পাঠানো হচ্ছিল। ডেমোক্রেসির নামে যুবক আর পোটেনার্জ নামে যুবতিদের সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এরা নতুন প্রজন্মকে কমিউনিস্ট বানানোর প্রচেষ্টায় ছিল খুবই তৎপর। স্কুল-কলেজে নতুন শিক্ষাকারিকুলাম কার্যকর করা হয়। এই কারিকুলামে শিক্ষাব্যবস্থাকে কমিউনিজমে গুলে ফেলা হয়। ইংরেজির পরিবর্তে শিক্ষামাধ্যম হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয় রুশ ভাষাকে। সকল শিক্ষককে পরচম পার্টিতে যোগদানের আদেশ দেওয়া হয়; নাহয় তাদের বরখাস্তের হুমকি দেওয়া হয়। দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় কমিউনিস্ট শিক্ষকদের। সকল নিউজ-এজেন্সি, গণমাধ্যম, পত্রিকা, এমনকি ডাইজেস্টগুলোর সম্পাদকদের বাধ্য করা হয়, তারা যেন সোভিয়েত মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। কাবুল রেডিয়োকে সোভিয়েত মাধ্যম থেকে খবর সংগ্রহে বাধ্য করে। তখন আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রচারণা সোভিয়েত ট্রান্সমিটার থেকে করা হতো।

কমিউনিস্টদের হার

পাখতুন, তাজিক, উজবেক, পারসিক প্রভৃতি বড় বড় জাতিধারার আধুনিক শিক্ষিতদের বড় একটি অংশ কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছিল। তবে আফগানিস্তানের সিংহভাগ নাগরিক

যেহেতু অশিক্ষিত ছিল এবং আধুনিক শিক্ষিতদের সংখ্যা ছিল অনেক কম, তাই বলা যায় সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্টদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫%-ও ছিল না। দেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র রাজধানী কাবুলেই তাদের কিছুটা বেশি দেখা যেত। অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে তাদের অস্তিত্ব ছিল নামমাত্র। এ জন্যই দেখা যায় কমিউনিস্টরা কখনোই নির্বাচনের মাধ্যমে গণরায় নিয়ে সরকার গঠন করতে পারেনি। তারা প্রতিবার কেবল অস্ত্রবলেই ক্ষমতায় এসেছে। জনগণের সহায়তাবঞ্চিত থাকার কারণেই তাদের ইসলামবিরোধী নীতিকে জনগণ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। সত্যিই এটা ছিল এক বিরাট দুর্ঘটনা যে, মাত্র কয়েক শতাংশ কমিউনিস্ট কার্যত পুরো দেশের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল। রাজনীতি, শিক্ষা, সেনা, এককথায় সবর্ত্র তাদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। গুটিকতক মানুষ ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে অত্যাচারের টার্গেট বানাতে পেরেছিল।

পরচম ও খালক পার্টির বিরোধ

কারমাল ও তার প্রভুদের নাস্তিক্যবাদী পদক্ষেপের ফলে সাধারণ জনতার ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা শুধু এটাই চাচ্ছিল যে, জবরদখলকারী রুশরা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাক; আর দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য আলিম, কাবায়েলি নেতা ও নিষ্ঠাবান জাতীয় ব্যক্তিরা নির্ধারণ করুন। কারণ, রুশদের কাঁধে চড়ে কারমালের ক্ষমতারোহণকে তারা তাদের গালে চপেটাঘাত হিসেবে অনুভব করছিল। প্রতিটি উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর তারা ছিল ভীষণ ক্ষুব্ধ। এমনকি আফগান কমিউনিস্টদের মধ্যেও দেশপ্রেমিক একটি শ্রেণি রাশিয়ার এই হস্তক্ষেপে সন্তুষ্ট ছিল না। এর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ কারমাল ক্ষমতাসীন হওয়ামাত্রই সিভিল ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ শুরু করে। ঘটনা এ পর্যন্ত দাঁড়ায় যে, অনেক দেশে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূতরা পর্যন্ত স্ব স্ব পদ থেকে ইস্তফা দেয়। আফগানিস্তানের জাতীয় ক্রীড়াদলের বেশকিছু খেলোয়াড়—যারা তখন বিদেশে অবস্থান করছিল—দেশে ফিরতে অস্বীকৃতি জানায়।

অসন্তুষ্ট কমিউনিস্টদের সিংহভাগ ছিল খালক পার্টির সদস্য। কেননা, রুশ আগ্রাসন তাদের ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তবে পরচমিদের মধ্যেও অসন্তোষ একেবারে কম ছিল না। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ৩ হাজার অসন্তুষ্ট খালক ও পরচম পার্টির সদস্য সরকারি চাকরি ছেড়ে দেয়। কারমালের ক্ষমতার শুরুর দিকে খালক ও পরচমিদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করতে থাকে। খালক পার্টির সদস্যরা তারাকি ও আমিনের যুগে পরচমিদের দমিয়ে রেখেছিল। এবার জেলমুক্ত পরচমিরা খালক পার্টির সদস্যদের জীবন বিষিয়ে তোলে।

রুশ বাহিনী ও রাসায়নিক অস্ত্র

কারমালের সরকার ছিল একদম জনবিচ্ছিন্ন। তাই রাশিয়ার জন্য যেকোনো মূল্যে এই সরকারকে কর্মতৎপর রাখার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এ পর্যায়ে বাগরাম বিমানঘাঁটি, কাবুল বিমানবন্দর, সালাংপাসে প্রচুর রুশ সেনার উপস্থিতি দেখা যাচ্ছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সালাংপাসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে কাবুল পর্যন্ত সেনাবাহিনী পৌঁছানোর একমাত্র স্থলপথ ছিল এটি। এই হাইওয়ে ধরেই সোভিয়েতবাহিনী দ্রুত কুনার ও জালালাবাদে পৌঁছায়। জালালাবাদে একটি পূর্ণাঙ্গ রাইফেল ডিভিশন মোতায়েন করা হয়।

লাল ফৌজ আফগানে আসামাত্রই শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার নামে অত্যাচার-অনাচারের নতুন রেকর্ড গড়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রুশরা আফগান মুসলিমদের তাদের কঠিনতম শত্রু গণ্য করে আসছিল। আর সেই আত্মমর্যাদাবান মুসলিমরাই তাদের নেতাদের ভুলের কারণে আজ রাশিয়ার ছুরির নিচে পড়ে কাতরাচ্ছিল!

সোভিয়েতবাহিনীর আগমনের তিন সপ্তাহ গত হতে না-হতেই কয়েক জায়গা থেকে আফগানদের বিকৃত লাশ উদ্ধার হতে থাকে। ধারণা করা হয়, রাসায়নিক অস্ত্র দিয়ে এদের হত্যা করা হয়েছিল। মুজাহিদদের হাতে মারা যাওয়া রুশ সেনাদের আসবাবপত্রের মধ্যে গ্যাসমাস্কের উপস্থিতিও উন্মোচন করে দিচ্ছিল এই ঘৃণ্য অপরাধের রহস্য। পশ্চিমা মিডিয়ায় এই সংবাদ চাউর হয়ে যায় যে, রুশরা কেমিক্যাল অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক ইউনিট প্রশিক্ষিত সেনা আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছে।

নিন্দাপ্রস্তাব ও ব্রেজনেভের অবস্থান

সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই আগ্রাসন নিয়ে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এই অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়ানো এবং রুশ প্রভাব হ্রাসের জন্য অস্থিরপ্রায় ছিল। ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে ১০৪টি দেশ সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। রাশিয়ার পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ১৮টি। বিশ্ব-জনমতের চাপের জবাবে ব্রেজনেভ জানায়, তার বাহিনী আফগান সরকারের ডাকে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির চতুর্থ ধারামতে এমনটি করা বৈধ আছে। ব্রেজনেভ এ কথাও বলে, হস্তক্ষেপ করা না হলে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট সমস্যা দেখা দিত, যা আমরা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারতাম না।

সোভিয়েতের আশঙ্কা আসলে কী ছিল

এই ভয়ানক পরিস্থিতি কী ছিল, ব্রেজনেভ তা স্পষ্ট করেনি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে,

একের পর এক কমিউনিস্ট সরকারের ব্যর্থতা আর তাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সফল কার্যক্রম দেখে রাশিয়া এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে—কী জানি আফগানিস্তান নিয়ে তাদের পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়! কী জানি কমিউনিস্টদের স্থলে মুজাহিদ-সরকার প্রতিষ্ঠা পায়! এমনটি হলে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে তারা সোশালিজমের জন্য যে প্রাণপাত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, তার ওপর দিয়ে পানি বয়ে যাবে।

তখনকার পরিস্থিতির সুগভীর পর্যালোচনা, আফগান পরিস্থিতির নিরপেক্ষ অধ্যয়ন এবং ব্রেজনেভের এই বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আফগানিস্তানে বড় পরিসরে এভাবে আগ্রাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণটাই ছিল মুখ্য। যদিও এর পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। যেমন : উষ্ণ জলে পৌঁছার আগ্রহ, আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বৃত্ত সংকোচায়ন, কমিউনিজমবাদকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ ইত্যাদি।

বিশ্ব এই বুশ আগ্রাসনকে যা-ই বলুক, চাই একে আফগান সরকার ও মস্কোর আঁতাত বলুক, কিংবা বুশ-মার্কিন আধিপত্যের লড়াই বলুক; আফগানদের কাছে কিন্তু এ বিষয়টি পরিষ্কার ছিল যে, এই যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিক্যবাদের চিরন্তন যুদ্ধ। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আফগানিস্তানে যেন ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা না পায়। তারা জানত, রাশিয়া মধ্য-এশিয়ায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাম নেওয়ার ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে। মসজিদগুলো করে রেখেছে তালাবন্ধ। মাদরাসাগুলো করে দিয়েছে উজাড়-বিরান। এখন তারা আফগানিস্তানে সেই কিয়ামতের নাটক মঞ্চায়িত করতে চাচ্ছে। ফলে আফগানদের স্বভাবজাত ও দীনি মর্যাদাবোধ টগবগ করে ফুটে ওঠে। তাই অত্যন্ত দ্রুত স্থানীয় ধর্মনেতাদের অধীনে জিহাদের জন্য সক্রিয় হয় তারা। আর এভাবেই শুরু হয় আফগান জিহাদের সমুজ্জ্বল ইতিহাস, যা লিখতে গেলে একজন ইতিহাসবিদের কলম থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিটি শব্দ থাকে সম্মান-মর্যাদায় সিক্ত। কলম ঘোরানোর প্রতিটি ক্ষণে মুজাহিদদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধে মাথা হয়ে আসে আনত।

জেনারেল জিয়াউল হকের দুরদর্শিতা

এ বিষয়টি আগেই জানা হয়ে গেছে যে, রাশিয়ার পরিকল্পনা ছিল আফগানিস্তান দখলের পর আরব সাগরের গরম পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। অন্যকথায় পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের টার্গেট। ফলে বুশ আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের অস্থির হওয়া ছিল স্বাভাবিক বিষয়। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক যদিও দেশের গণতান্ত্রিক ধারায় ক্ষত সৃষ্টি করার এবং ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত আইনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসায় স্বদেশী রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনার পাত্র ছিলেন; কিন্তু এতে কোনোই সন্দেহ

নেই যে, তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তা ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের এক দীপ্তিময় অধ্যায়। তাঁর সামরিক দূরদর্শিতা রাশিয়ার দূরভিসন্ধি ও ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা ভালোভাবেই আঁচ করতে পেরেছিল। সুতরাং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা দেন, আফগানিস্তানের ওপর হামলা মূলত পাকিস্তানের নিরাপত্তার ওপর কঠিন আঘাত। আফগান মুজাহিদরা মূলত পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য লড়াই করছে। তাই বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য নিঃশর্তভাবে তাদের সাহায্য করা উচিত।

পাকিস্তান তার সীমান্ত খুলে দেয়

জিয়াউল হক তখন আফগান মুহাজির ও মুজাহিদদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেন। সীমান্ত প্রদেশের তাঁবুর বস্তিতে প্রতিদিনি আফগানিস্তান থেকে সর্বহারা লোকজন এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। পাকিস্তান সরকার যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করছিল। মুহাজিরদের দেশের যেকোনো প্রান্তে গিয়ে কাজের বিনিময়ে জীবিকা অর্জনের অনুমতি দেওয়া হয়। মুজাহিদ নেতারা পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে পাকিস্তানে প্রবেশ করতেন। তাদের গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হতো পেশোয়ারে। সেখানে মুজাহিদ সংগঠনগুলোর বেশ কয়েকটি দপ্তর ছিল।

পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও শীর্ষ কূটনীতিকদের বলে রেখেছিলেন, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যেকোনো বিশ্ব-ফোরাম বা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে যেন আফগান সমস্যাকেই প্রথম ইস্যু হিসেবে উত্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার সুবিধাকে পাত্তা দেওয়া না হয়। পাকিস্তানের এই প্রয়াসের ফলে খুব দ্রুত আরব দেশগুলো ওই শঙ্কা অনুভব করতে থাকে, যা তীক্ষ্ণধার ছুরির আকারে পুরো মুসলিমবিশ্বকে টুকরো টুকরো করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ফলে আরবের শায়খরা দিল খুলে আফগান মুজাহিদদের অর্থসাহায্য দিতে থাকেন।

বাস্তবতা সম্পর্কে আমেরিকার অজ্ঞতা

নিঃসন্দেহে মার্কিনরা এই যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিল। এ ছাড়া রুশবিরোধী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোও নিজ নিজ অবস্থান থেকে অংশ নিয়েছিল। তবে তাদের এই সহমর্মিতা ছিল শুধু নিজেদের স্বার্থ এবং লালিত দীর্ঘ রুশবিরোধিতার কারণে। আমেরিকা আফগানিস্তানকে অস্ত্রসাহায্য দিচ্ছিল। কেননা, এ অঞ্চলে রাশিয়াকে আটকে রাখা ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সাহায্যের ফলে মুজাহিদদের জিহাদি অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই যুদ্ধ মূলত কুফর ও ইসলামের সংঘাত হিসেবেই শুরু হয়েছিল এবং এভাবেই তা উপসংহারে পৌঁছেছে।

আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধের শুরুর দিকে বিশ্ববাসী আফগানদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই

জানত না। দাউদ ও তারাকির যুগে মুজাহিদরা রাইফেল, ভাঙা-টুটা বন্দুক এমনকি তলোয়ার আর বর্শা দিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রায় চার বছর বাইরের কোনো সহায্য ছাড়াই জিহাদ চালিয়ে গেছেন তারা। শুরু থেকে আফগান মুজাহিদ নেতাদের সঙ্গে জুলফিকার আলি ভুট্টোর সম্পর্ক থাকলেও আমেরিকার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ জন্যই আমেরিকার যুগের কলঙ্ক সিআইএর-ও এ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না।

চীনাবাদামের দানা

২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে ঢুকে পড়লে আমেরিকা তাদের গাফিলতির ঘুমের জন্য অনুশোচনায় ভুগতে থাকে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এমনকি তার ক্যাবিনেটের একজন সদস্যও মুজাহিদদের প্রতিরোধ কয়েক সপ্তাহের অধিক টিকবে বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না। দুই বছর পর্যন্ত মুজাহিদরা শুধু নিজদের শক্তিবলে এই কঠিনতম যুদ্ধে টিকে থাকে। এ দুই বছর এদিক দিয়ে ছিল খুবই বিভীষিকাময় যে, তখন সোভিয়েত রাশিয়া স্বাধীনভাবে গণহত্যা চালাতে পারছিল। এ কথায় মোটেও কোনো অতিশয়োক্তি নেই যে, তখন আফগানিস্তানে বয়ে চলছিল রক্তের নদী। প্রতিদিন ফাইটার জেটগুলো জায়গায় জায়গায় বোম্বিং করে যাচ্ছিল; কিন্তু বিশ্ববাসী নীরব দর্শকের ভূমিকায় হা করে তাকিয়ে দেখছিল শুধু। মুজাহিদদের কাছে না ছিল আধুনিক অস্ত্র, না ছিল যোগাযোগমাধ্যম, না ছিল চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, না ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তবে জেনারেল জিয়া বরাবর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, যাতে আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়িয়ে তোলে। মুজাহিদদের কাছে যেন আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে তারা রুশ অস্ত্রের জবাব দিতে পারে। কিন্তু মার্কিন ও পশ্চিমাদের বিশ্বাস ছিল, মুজাহিদ দলগুলো আজ না হোক কাল মাথা নত করতে বাধ্য হবে। তাই তারা এই অলাভজনক খাতে বিনোয়োগ করতে আগ্রহী ছিল না।

অনেক বলা-কওয়ার পর জিমি কার্টার আফগানিস্তানের জন্য সামান্য সাহায্য বরাদ্দ করেন। কিন্তু জিয়াউল তা চীনাবাদামের দানা আখ্যা দিয়ে ফিরিয়ে দেন। এখানে চীনাবাদামের দানা বলার পেছনে মজার একটি রহস্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ব্যক্তিগতভাবে চীনাবাদাম চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জেনারেল জিয়ার নীত

আফগান জিহাদের প্রেক্ষাপটে জেনারেল জিয়ার নীতি ছিল সময়ের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং সফল। তিনি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে বোধহয় দান হেরে যেতেন। কেননা, তখন ভারত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পেছন থেকে পাকিস্তানে

হামলা চালিয়ে বসত। তবে আফগান ইস্যুতে চুপ থাকাও ছিল একধরনের বোকামি। তাই তিনি সাবধানতামূলক পথ ধরে হাঁটেন। তিনি শুধু পুরো মুসলিমবিশ্বকে নয়; বরং পশ্চিমাবিশ্বকেও আফগানিস্তানের দুর্দশা এবং রাশিয়ার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অবহিত করিয়ে কূটনৈতিকভাবে রাশিয়াকে একঘরে করে ফেলেন। আফগান মুজাহিদ ও মুহাজিরদের জন্য তাঁর সাহায্য আদায়ের প্রচেষ্টা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি একদিকে যেমন পাকিস্তানকে মুজাহিদদের জন্য তাঁদের দ্বিতীয় বাড়ি বানিয়ে নেন, তেমনি বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আফগান জিহাদে যোগ দিতে আসা মুজাহিদদের জন্যও পাকিস্তানের দরজা খুলে ধরেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এতটা অগ্রগামী হওয়ার পরও জিয়া রুশ-পাক সম্পর্ক এমন দ্বন্দ্বমুখর হতে দেননি, যার ফলে রাশিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। পাকিস্তান রাশিয়ার প্রতিটি অনুযোগ আর প্রতিবাদের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। এসব জবাবে অনেকটা অপারগতার ভঙ্গি ছিল, উত্তেজনা ছিল না। তবে একেবারে আত্মমর্যাদা বিলীনকারী জবাবও ছিল না; বরং কথা ছিল স্পষ্ট ও রাখঢাকহীন। জেনারেল মরহুমের পুরো দল একই আঙ্গিকে কাজ করছিল। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, একবার রুশ রাষ্ট্রদূত সীমান্ত প্রদেশে আসে। সেখানে পৌঁছে প্রদেশের গভর্নর জেনারেল ফজলে হক বরাবরে আফগান মুহাজিরদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। রুশ রাষ্ট্রদূত দাবি করে, মুহাজিরদের আগমন যেন টেকিয়ে রাখা হয়। জেনারেল ফজলে হক সবার সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এটা আমাদের সাধ্যের বাইরে। আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত এতটাই বিস্তৃত যে, আমরা আমাদের সকল সীমান্তরক্ষী মোতায়েন করেও এই ঢল রুখতে পারব না। তা ছাড়া এমনটি করতে গেলে আমাদেরকে আমাদের জনসাধারণের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে। কেননা, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ স্বজাতিকে আটকে রাখার অনুমতি দেয় না।

রুশ রাষ্ট্রদূত আবারও তার দাবি উত্থাপন করলে জেনারেল ফজলে হক বলেন, আপনারা তো সুপার পাওয়ার। আপনারা আফগানিস্তানের বর্ডার সিল করে দেন না? তাহলে তো আমাদের এ ঝামেলা পোহাতে হয় না! রুশ রাষ্ট্রদূত এটা অসম্ভব বললে জেনারেল বলেন, আপনারা সুপার পাওয়ার হয়েও যদি তা করতে না পারেন, তাহলে আমাদের পক্ষে এমনটা করার সাধ্য কোথায়? এই জবাব পেয়ে রুশ রাষ্ট্রদূতকে চুপ হয়ে যেতে হয়।

আফগান জিহাদ : এক মহান ইসলামি জিহাদ

এ কথা বলা অত্যন্ত বোকামি যে, এই যুদ্ধ ছিল রুশ-আমেরিকার যুদ্ধ, এটি ছিল সমাজবাদ আর পুঁজিবাদের যুদ্ধ। ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, এই যুদ্ধ ছিল মুসলমান

জাতি-বংশ ধ্বংস করার, ইসলামি বিশ্বাস ও আদর্শ পদদলনের এবং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনাশের লক্ষ্যে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চলে আসা ইসলামবিরোধী যুদ্ধের ধারাবাহিকতামাত্র। রুশরা মধ্য-এশীয় মুসলিমদের জীবন্ত দাফন করে আফগানিস্তানেও একই নাটক রচনা করতে চাচ্ছিল। মুজাহিদরা যদি ওদের মোকাবিলায় প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে না তুলতেন, তাহলে রাশিয়া পাকিস্তানকে পদানত করার পর আরব উপসাগরের পথ ধরে প্রথমে উপসাগরীয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে, এরপর মধ্যপ্রাচ্যের সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে পদানত করে ফেলত। কারণ, পাকিস্তান থেকে মিসর পর্যন্ত এমন কোনো দেশ ছিল না, যেখানে কমিউনিস্টদের অস্তিত্ব ছিল না। যদিও সেসব দেশে মধ্য-এশীয় রাষ্ট্রসমূহের মতো কমিউনিজমের চাষাবাদ হচ্ছিল না, তবু রাশিয়ার পক্ষে মাঠ মসৃণ করে নেওয়া তেমন কোনো দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আফগানিস্তানের এই জিহাদকে ইসলামি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধগুলোর অন্যতম যুদ্ধ বলা যায়। এটি ছিল সেই চিরন্তন জিহাদসমূহের একটি, যেখানে সহায়-সম্বলহীন পিছিয়ে থাকা ক্ষুধাপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠী পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম শক্তির সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিল। যেখানে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুমিনরা একত্র হয়ে কুফরের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছিলেন। ফলে যেখানে প্রতি পদে পদে আল্লাহর সাহায্যের অপূর্ব ঝলক দেখা যাচ্ছিল, যা বদর ও আহজাবের স্মৃতি জাগিয়ে মুজাহিদদের মানসিক প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

জিহাদের চারটি পর্ব

কমিউনিজমবিরোধী আফগান মুসলিমদের এই জিহাদকে আমরা চারটি পর্ব অথবা চারটি কাল হিসেবে বিভক্ত করতে পারি :

১. জহির শাহর শাসনামলের শেষ দিক থেকে দাউদ খানের শাসনামল পর্যন্ত, যখন আলিমরা জিহাদের প্রয়োজন অনুধাবন করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন।

২. ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সূচিত সাওর বিপ্লব থেকে হাফিজুল্লাহ আমিনের হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত। এই পর্ব প্রচুর আত্মত্যাগ ও কুরবানি-সমৃদ্ধ।

৩. ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সরাসরি রুশ আগ্রাসন থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি রুশদের লজ্জাজনক সেনাপ্রত্যাহার পর্যন্ত।

৪. রাশিয়া পাততাড়ি গোটানোর পর নাজিব সরকারের সঙ্গে মুজাহিদদের লড়াই, যা ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদদের কাবুল দখলের মাধ্যমে শেষ হয়।

প্রথম পর্ব

আমরা দেখতে পাই সাওর বিপ্লবের আগে আফগানিস্তানে ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে সংঘাত চলে আসছিল। দাউদের অত্যাচার ও জবরদস্তি ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে। সে সময়ও কমিউনিস্টদের নাপাক উদ্দেশ্যের বিপরীতে ইসলামপন্থি কিছু দল তৎপর ছিল। তখন কিছু আলিম জেল-জুলুমের শিকার হন। অনেকে পাহাড়ি অঞ্চলকে তাঁদের আস্তানা বানিয়ে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

সাওর বিপ্লবের পর কমিউনিজম সরকার হিসেবে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসে। এর প্রতিক্রিয়ায় ২ জুন ১৯৭৮ ধর্মনেতা ও স্বাধীনতাকামীরা জিহাদের আওয়াজ তুলে ধরেন। তারাকি ও আমিনের সরকার এই আওয়াজ দমাতে অত্যাচারের প্রতিটি অস্ত্র প্রয়োগ করে; কিন্তু তাতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

এ পর্যায়ে এত বেশি জুলুম হয় যে, মানুষকে ভেড়া-বকরির মতো জবাই করা হতে থাকে, যা ছিল সত্যিই অবিশ্বাস্য। একবার গ্রামীণ জনপদ থেকে শত শত ব্যক্তিকে মুজাহিদদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে কাবুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের না কোনো আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়, না কোনো জেলখানায়; বরং চলন্ত ট্রাকের নিচে ফেলে শহিদ করে দেওয়া হয়। এরপর পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়! বাকিদের বুলডোজার দ্বারা একটি গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে সমান করে নেওয়া হয়। পরিহাস শুধু এটুকই নয়; বরং লোমহর্ষক এই অমানবিক ঘটনার দায় মুজাহিদদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হয়।

রাশিয়ার গোলাম এই জালিম শাসকদের প্রতিটি কাজেকর্মে রুশ হিংস্ররা অংশ নিত। ওই জালিমগুলো নিরপরাধ মানুষ দিয়ে জেলখানাসমূহ পূর্ণ করে রেখেছিল। আমিন ও তারাকির যুগে ৩০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরা হয়। সেখানে তাদের বেত্রাঘাতের পাশাপাশি নখ উপড়ে ফেলা, ঘুমুতে না দেওয়া, শরীর জ্বালিয়ে দেওয়া, এসব কমিউনিস্ট সরকারের কাছে যেন বিনোদনের মাধ্যম ছিল। বন্দিদের একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় হত্যা করা হতো। আলিম, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, প্রফেসর, ডাক্তার, শিল্পজীবী, ব্যবসায়ী, মজদুর ও কৃষক কেউই তাদের এই রক্তনেশা থেকে রেহাই পাননি। তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা কমিউনিজমের সহযোগী ছিলেন না, অথবা সরকারবিরোধী কারও সঙ্গে দূরতম সম্পর্ক ছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ইসলামকে কোরিয়ে কোরিয়ে মিটিয়ে ফেলা হচ্ছিল। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদটি শহিদ করে সেখানে হোস্টেল ও ডান্সক্লাব নির্মাণ করা হয়!

তখন ছিল সেই পরিবেশ, যখন আফগান জিহাদ তার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল। আফগান মুসলিমরা সব ধরনের অত্যাচার সহ্য করে চলছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের ইমান, সম্মান, সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে সওদাবাজি করেননি।

তৃতীয় পর্ব

এরপর ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে রুশ কমিউনিস্টদের আগ্রাসনের পর শুরু হয় জিহাদের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘতম অধ্যায়। এখন তাদের সামনে জাতির আদর্শের সওদাগর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আর সেনাই নয়; বরং তাদের সামনে ছিল রাশিয়ার পঙ্গপালসদৃশ বাহিনী, যাদের পৃথিবীর বৃহত্তম বাহিনী গণ্য করা হতো। তাদের কাছে ছিল সময়ের সেরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। কেউ কল্পনাও করতে পারছিল না, রুশবাহিনী কোথাও হামলা করে পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে। সুদীর্ঘ প্রায় তিন শতাব্দীর ইতিহাস বলছিল—রাশিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যেখানেই হামলা করেছে, কোথাও থেকে পরাজিত হয়ে ফেরেনি।

সোভিয়েত জুলুমের খোরোখাতা

সোভিয়েতবাহিনীর নীতি ছিল, তারা কোনো অঞ্চলে প্রবেশ করলে গণহত্যা ও পাশবিতার এমন লোমহর্ষক উদাহরণ রাখত, যা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে যেত। পৃথিবী যেন থরথর করে কেঁপে উঠত। হিংস্র রুশ ভল্লুকরা এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে দিত যে, কেউ তাদের মোকাবিলায় আসার সাহসটুকু পর্যন্ত করতে পারত না। এককথায় বর্বর আচরণের মাধ্যমে মানুষের মানসিক প্রতিরোধক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিত।

আফগানিস্তানে প্রবেশের পর সোভিয়েত রাশিয়া যে ভয়ংকর-বীভৎস জুলুমের রেকর্ড গড়েছিল, তা তুলে ধরতে হলে কয়েক খণ্ডের এক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। বাগরাম বিমানঘাঁটিতে নামার পর কিছুদিনের মধ্যেই সোভিয়েতবাহিনী শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আফগানের জাতীয় সেনাবাহিনী তখন কেবল তাদের সেবকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল। অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব রুশবাহিনীর হাতেই থাকত। মুসলিমদের রক্ত তাদের কাছে এতটাই সস্তা ছিল যে, নিছক হাসিতামাশা আর হৃদয়বৃত্তি পূরণের লক্ষ্যে রক্তের নদী বইয়ে দিত।

কুনার প্রদেশের চাঘা সারাই নামক গ্রামে একবার লাল ফৌজ গ্রামবাসীকে একটি সমাবেশে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। বলা হয় সেখানে একটি 'বিশেষ ঘোষণা' দেওয়া হবে। ডাক পেয়ে মানুষ জড়ো হলে কোনো সতর্ক-সংকেত ছাড়াই কয়েক দিক থেকে তাদের ওপর মেশিনগান গর্জে ওঠে। যতক্ষণ-না শেষ মানুষটির মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে বলে তাদের অনুমান হয়, ততক্ষণ ফায়ার চলতেই থাকে। একইভাবে ডাগার

নামে আরেক গ্রামে সম্মিলিত মানুষকে এমনভাবে শহিদ করা হয় যে, সেখানে লাশের টুকুরো, দলা পাকানো গোশত ও হাড়ের স্তূপ দেখা যাচ্ছিল।

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে লাঘমান প্রদেশের আলি শিংক গ্রামে ঘোষণা দিয়ে গ্রামবাসীকে একত্র করা হয়। সেখানে ৬৫০ জন লোক ছিল। তাদের সবাইকে মুজাহিদদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে দড়ি দিয়ে বেঁধে তিনটি বড় গর্তে জীবিত দাফন করা হয়! কদিন পর মুজাহিদরা সেখানে এসে গণকবরটি খনন করলে সেখানকার দৃশ্য দেখে তারা অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। শহিদদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তাঁর গর্দানে ছিল কুরআনের কপি ঝোলানো। বুকে আঁকড়ে ধরা ছিল এক দুগ্ধপোষ্য শিশু। এ ঘটনা থেকে অনুমিত হয়, রুশ হিংস্ররা বাচ্চা-বুড়ো মহিলা—কাউকেই ক্ষমা করত না। নিঃসন্দেহে তারা জাতিনির্মূলের এজেন্ডা নিয়ে এখানে এসেছিল। কেননা, এই ভূমি থেকে বার বার গজনি ও ঘোরির মতো সত্তা জন্ম নিয়ে অমুসলিমবিশ্বকে কাঁপিয়ে রাখে। আজ রুশ হিংস্ররা সেখানে ঢুকে তাদের শতাব্দীপ্রাচীন রক্তপিপাসা মেটাচ্ছিল।

জুলুম-অত্যাচারের বিভীষিকাময় দৃশ্য

সোভিয়েত সেনারা তাদের ভীতি ছড়িয়ে আফগান জনগণকে সন্ত্রস্ত রাখতে এবং তাদের প্রতিরোধক্ষমতা একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে ঠিক সে পন্থা অবলম্বন করে, যা কয়েক শতাব্দী আগে এখানে চেঙ্গিস খান বাস্তবায়ন করেছিল। সভ্যতার উন্নতির এ যুগেও আধুনিক চেঙ্গিসরা আফগানিস্তানে মানুষের মাথার খুলি দিয়ে মিনার তৈরি করছিল। রুশ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন এলাকায় লাশের টিলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তখন।

রাশিয়া হিংস্রতার সেই দৃশ্যেরই অবতারণা ঘটাচ্ছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম রেকর্ড গড়ছিল তারা। রুশ আগ্রাসনের প্রথম বছর শেষে যখন নিহত আফগানদের পরিসংখ্যান বের করা হয়, তখন অনুমিত হয়, প্রায় ৫ লাখ বনি আদম শাহাদাতবরণ করেছেন। এই জাতিনির্মূল অভিযানের পাশাপাশি মানবসভ্যতা ও সামাজিক-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হয়। জনপদগুলো বুলডোজার দিয়ে একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কূপগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। মসজিদগুলো শহিদ করা হয়। হাসপাতালগুলো পরিণত করা হয় ইটের স্তূপে। দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিরান করে ফেলা হয়। গ্রামাঞ্চলে স্কুল এবং সেখানে শিক্ষারত কচি কচি শিক্ষার্থীকে পর্যন্ত পাশবতার তাণ্ডব থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।

বিক্ষোভকারীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি

রুশ সেনাদের জুলুম-নির্যাতন শুধু গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং কাবুলের

মতো উন্নত শহরের সুসভ্য, সংস্কৃতিবান আর শিক্ষিতশ্রেণিও ওই বর্বরতার শিকার হয়। যেভাবে তারা গ্রামীণ জনপদে মানুষের সমাবেশে মেশিনগানের মুখ খুলে দিত, একইভাবে কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, গজনির মতো ঐতিহ্যবাহী শহরগুলোর নাগরিকদের সঙ্গেও সমান আচরণ করে। তাদের অন্তরে আন্তর্জাতিক সমালোচনার কোনো পরোয়া ছিল না। কারও কাছে জবাবদিহিতারও ভয় ছিল না। রুশদের আসার এক মাস পর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ বের করা হয়। তখন রুশ সেনারা কাবুল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদী জনতার ওপর মেশিনগানের নল খুলে ধরে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হয়।

'তোমরা আমাদের বোরকা পরে নাও'

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক এটাই ছিল রাজধানী কাবুলের সাধারণ নাগরিকদের দেওয়া কমিউনিজমের সাম্যবাদ ও মানবাধিকারের উপহার! ওই বর্বর জালিমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও রেহাই দেয়নি। তাদের পাশব আক্রমণ থেকে শুধু তারাই রক্ষা পেত, যারা ছিল স্বাধীন চিন্তাচেতনার অধিকারী এবং মুজাহিদদের সঙ্গে যাদের ছিল না দূরতম কোনো সম্পর্ক।

এপ্রিল ১৯৮০ একদিন কাবুলের হাইস্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস বয়কট করে রাজপথে নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। ছাত্রীরা তাদের স্লোগানে বলছিল 'রাশিয়ার গোলামরা, তোমরা আমাদের বোরকা পরে নাও; আমরা হাতে বন্দুক তুলে নেব।'

ছাত্রীরা ব্রেজনেভের বিরুদ্ধে আকাশফাটা স্লোগান দিচ্ছিল। কাবুল শহর 'ব্রেজনেভ নিপাত যাক, গাদ্দাররা নিপাক যাক', স্লোগানে কেঁপে উঠছিল। শত শত ছাত্রী শিক্ষামন্ত্রী আনাবেতা রাতাবজাদের বাসভবনের সমানে জড়ো হয়। সে ছিল এক নষ্ট-ভ্রষ্ট-নির্লজ্জ মহিলা। ছাত্রীরা স্লোগান দিচ্ছিল 'তুমি আফগানিস্তানের শিক্ষামন্ত্রণালয় চালানোর যোগ্য নও, তুমি এই পদ ছেড়ে চলে যাও।'

রক্তে আঁকা স্বাধীনতা

ছাত্র-ছাত্রীদের শান্ত বিক্ষোভকে ছত্রভঙ্গ করার গণতান্ত্রিক কোনো বৈধতা ছিল না। একান্তভাবে তা প্রতিহত করতে হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস বা বিকল্প কোনো পন্থা অবলম্বন করা যেত। কিন্তু যে রুশ হিংস্ররা এতদিন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সেকুলার মনে করে আসছিল, তাদের থেকে জাতিপ্রেমের এই বিক্ষোভ দেখে রাগে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর তারা কমিউনিস্ট পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলিবৃষ্টি শুরু করে। ফলে কয়েক ডজন ছাত্র-ছাত্রী

শহিদ হয়। অনেকে হয় আহত। ছাত্রীরা তাদের বান্ধবীদের গড়িয়ে পড়া রক্তে আঙুল চুবিয়ে নিজেদের গায়ের বোরকায় আজাদির স্লোগান লিখে নেয়।

ইসলামের পতাকা

কাবুলের সুরিয়া ও রাবিয়া হাইস্কুলের ছাত্রীরা এক বিক্ষোভে অতুলনীয় সাহসিকতা দেখায়। তারা একটুকরো সবুজ কাপড় বাঁশে বেঁধে ইসলামি পরচম বানিয়ে রাজপথে নেমে আসে। তখন তারা ইসলাম জিন্দাবাদ, রুশ এজেন্ট মুর্দাবাদ, ব্রেজনেভ মুর্দাবাদ, কারমাল মুর্দাবাদের স্লোগান দিচ্ছিল।

রুশ হিংস্ররা তাদের ওপর ফায়ার চালালেও তাদের পেছানো সম্ভব হয়নি। এক রুশ সেনা পতাকাবাহী এক মেয়ের হাত টার্গেট করে। ফলে মেয়েটির হাত গুঁড়ো হয়ে যায়। কিন্তু সে চট করে পতাকাটি তার বাম হাতে নিয়ে নেয়। রুশ পশুটি তার সে হাতটিও গুঁড়ো করে দেয়। কিন্তু গজনবির ওই কন্যা পতাকাটি ভূপাতিত হতে দেয়নি। সে পতাকাটি পড়ে যাওয়ার আগে আরেক ছাত্রীর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে, 'এটি ইসলামের পতাকা। এটি তোমাদের হাতে আমানত। তোমরা এটা পড়তে দেবে না।'

আরেকবার এক বিক্ষোভ চলাকালে কতিপয় ছাত্রী উচ্চপদস্থ এক সরকারি আমলার গাড়ি দেখতে পায়। তারা গাড়িটি ঘেরাও করে আক্রোশে ফেটে পড়ে। নিজেদের পায়ের জুতো খুলে গাড়িতে আঘাত হানতে থাকলে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। এ অপরাধে ওই সরকারি কর্মকর্তা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলেই বেশ কজন ছাত্রী নিহত হয়।

আমি একজন মুসলমান

একবার কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফার্মেসির সামনে একদল ছাত্রী বিক্ষোভ করছিল। সরকারি কর্মচারী ও রুশদের গুলিতে এক মেয়ের পা আহত হলে সে ওখানে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কমিউনিস্টদের একটি গাড়ি এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ছাত্রটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে চায়। কিন্তু ওই আত্মমর্যাদাবান মেয়ের জবাব ছিল, 'আমি একজন আত্মমর্যাদাবান মুসলিম। এখানে বুকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে মরে গেলেও কোনো কাফিরের গাড়িতে বসব না। তাদের কারও থেকে চিকিৎসা নেব না।'

কাবুলে কেউ সুরক্ষিত ছিল না

কাবুলের দীনদার প্রতিজন মুসলিম জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়। সরকারি দপ্তরসমূহ থেকে অনেক আগেই তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাবুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত নিরাপদ ছিল না। ভার্সিটির ইসলামপ্রিয় ছাত্রদের বাছাই করে হয়তো বহিস্কার অথবা

গুম করে ফেলা হয়। ভার্সিটির শরিয়া ফ্যাকাল্টিতে অধ্যয়নরত ৬৭ ছাত্রের মধ্যে মাত্র ছয়জনকে জীবিত পাওয়া যায়। বাকিরা ছিল লাপাত্তা। ধারণা করা হয়, হাজার হাজার মাজলুমের মতো তাদেরও অজ্ঞাত কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সোভিয়েতবাহিনীর আসার পর যুগের কলঙ্কখ্যাত পুলচারখি জেলে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১ লাখ মাজলুম জনতাকে নিয়ে আসা হয়। এরপর বেদনাদায়ক শাস্তি দিয়ে এদের শহিদ করা হয়। এদের মধ্যে ১২-১৩ বছরের কিশোর থেকে শুরু করে ৭০-৮০ বছরের বুজুর্গরা পর্যন্ত ছিলেন। এই শহিদদের অধিকাংশই ছিলেন আলিমসমাজের সদস্য, মসজিদের ইমাম, হাফিজ, মুআজ্জিন, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং ইসলামপ্রিয় সাধারণ নাগরিক।

কাবুলের বিখ্যাত দীনি মাদরাসা জামিয়াতুল হানাফিয়ার ৫০০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে গায়েব করে ফেলা হয়। এদের মধ্যে মাত্র ছয়-সাতজন ছাত্র জীবিত বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। বাকি সবাইকে শহিদ করে ফেলা হয়। মোটকথা, তখন কাবুলের একজন মুসলমানও নিরাপদ ছিল না।

আফগানযুদ্ধে সোভিয়েত অস্ত্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানযুদ্ধে বিশ্বের সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, যথাসম্ভব সেনামৃত্যুর হার কম রাখা এবং মুখোমুখি যুদ্ধ এড়িয়ে চলা। তাই রুশবাহিনী স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র প্রয়োগ করে চলছিল। সাধারণত রুশ কনভয়গুলো যেসব যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত থাকত, তার মোটামুটি একটি চিত্র প্রত্যক্ষ করা যাক :

- ট্যাংক : ৬২-১৫২।
- ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত গোলা নিক্ষেপে সক্ষম ১৫৫ মিলিমিটারের কামান।
- মাল্টিব্যারেল রায়েট, যা দিয়ে একইসঙ্গে ১৩-৪১ টি রকেট ছোড়া যায়।
- ভারী মেশিনগান।
- রকেট লাঞ্চার।
- ডজন ডজন প্রকারের ভূমিমাইন।
- মর্টার, তোপ ও গোলা।
- পুনর্ব্যবহারযোগ্য তোপ।
- মিগ-১৯ থেকে মিগ-২৯ বোমারু বিমান।
- দৈত্যাকৃতির মালবাহী বিমান, আন্তোনভ ১২/১২।
- বোমারু বিমান, ১৮.৫U; -২৫।
- গানশিপ হেলিকপ্টার এম ১-১৮ থেকে এম ১-২৪ পর্যন্ত।

এসব সমরাস্ত্র যেকোনো পরাশক্তির যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ছিল অপরিহার্য।

গানশিপ হেলিকপ্টার

এই অস্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ছিল গানশিপ হেলিকপ্টার। এগুলো যেকোনো স্থানে যেকোনো কৌণিক অবস্থান থেকে আঘাত হানতে পারত। ঢুকে পড়তে পারত দুই পাহাড়ের মধ্যখানে। সংকীর্ণ খাদেও নেমে যেতে পারত। জনপদগুলোর ওপর শূন্যে দাঁড়িয়ে থেকে বোমা নিক্ষেপে ছিল নিশানবাজ ইগলসদৃশ। এসব হেলিকপ্টারে থাকা মেশিনগানগুলো প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে বৃষ্টির মতো অসংখ্য গুলি ছুড়তে সক্ষম ছিল। ফলে মুহূর্তেই সজীব প্রান্তর, প্রাণময় গ্রাম মাটির স্তূপে পরিণত হয়ে যেত। আফগানিস্তানের আকাশে সব ধরনের ধ্বংসাত্মক হেলিকপ্টার ভয়ংকর বিভীষিকা হয়ে চক্কর দিত।

নাপামবোমা থেকে খেলনাবোমা

গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো শহর ও বস্তি এলাকায় নিত্যনতুন পন্থায় হামলা চালাত। অনেকসময় তারা নিষিদ্ধ নাপাম বোমা ব্যবহার করে মুহূর্তেই জনপদগুলো ঝলসে দিত। কখনো বস্তিগুলোতে ছুড়ে মারত ছোট ছোট ডিব্বা। ডিব্বাগুলোতে এমন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থাকত, যা ২০০ লিটার অগ্নি-উদ্দীপক উপকরণের বেশি ধ্বংস্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম ছিল। একটিমাত্র ডিব্বা থেকে নিঃসরণ হওয়া রাসায়নিক উপাদান ২০০ ফিট জায়গার অক্সিজেন শুষে নিতে পারত। ফলে সেখানকার মানুষ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে চটপট করতে করতে মারা যেত। এভাবে শত শত ডিব্বা ফেলে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় কবরস্থান বানিয়ে চলছিল।

গানশিপ থেকে খেলনাবোমাও ছোড়া হতো। চকোলেট, গাড়ি, টফি, অনিন্দ্যসুন্দর জন্তু আকৃতির এসব বোমা হতো ভয়ানক ধ্বংসাত্মক। মাসুম শিশুদের নির্দয়ভাবে হত্যার জন্য এ ছিল শয়তানি এক হাতিয়ার। অবোধ শিশুরা এগুলোকে খেলনা মনে করে হাতে ওঠাতেই বিস্ফোরণে তাদের দেহকায়া ঝলসে যেত, উড়ে যেত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। লাখ লাখ শিশু এসব খেলনাবোমার শিকার হয়ে আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। এ ছাড়া মাদরাসায় শিক্ষারত, পার্কে খেলারত এবং উপত্যকায় পশুপাল চড়ানো বালকদের শিকারের উদ্দেশ্যে বিশেষ এক ধরনের প্লাস্টিক মোড়ানো বোমা ফেলা হতো, ফলে অগণিত বালক পঙ্গু অথবা শহিদ হতে থাকে।

বিষাক্ত গ্যাস

সোভিয়েতবাহিনী ব্যাপকহারে কেমিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগ করছিল। বিষাক্ত গ্যাস ফসজিন

অক্সাইম ছিল তাদের একটি বিশেষ অস্ত্র। রুশবাহিনীতে রাসায়নিক অস্ত্রব্যবহারের জন্য আলাদা একটি ইউনিট কাজ করত। এরা গ্যাসমাস্ক পরে হামলা চালাত। এই গ্যাসবোমার শিকার লোকজন হয়তো মারা যেত, অথবা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করত। সামান্য পরিমাণ আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরেও দেখা যেত লাল লাল দাগ। এ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির নাক-মুখ দিয়ে রক্তপাত ঘটত।

আফগান সরকারের দৃষ্টিতে আফগান নারীর মর্যাদা

রুশ বর্বরতার নিকৃষ্টতম চিত্রটি ছিল—তারা প্রকাশ্যে আফগান নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। অগণিত আফগান নারী তাদের লালসার শিকার হয়ে শহিদ হন। এগুলো এত বেশি পুনরাবৃত হয় যে, এর সঠিক পরিসংখ্যান বের করাও অসম্ভব। রুশদের এমন লাম্পট্যপনার কারণ ছিল খোদ আফগান সরকারের এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। একবার রুশ অফিসাররা তাদের সন্দেহ দূর করতে আফগান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সেখানকার নির্বীর্য নরপশুগুলো তাদের প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে এর অনুমতি দিয়ে দেয়। পাশাপাশি এই ঘৃণ্য উত্তরও দেয়—সকল আফগান নারী আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য নিবেদিত।

ইজ্জতের খাতিরে

কাঠপুতুল সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করার পর রুশদের অনাচার থেকে বাঁচতে আফগান জনতা অভিনব পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। এ ছিল তাদের নিরুপায় অবস্থায় আত্মমর্যাদার সমুন্নত বহিঃপ্রকাশ। যখনই রুশরা কোনো জনপদ হয়ে অতিক্রম করত, তখন দ্রুত সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নারীদের চিলেকোঠা, ভূগর্ভস্থ কক্ষ অথবা গোপন কোনো ঘরে তালাবন্ধ করে রাখত। অনেক সময় এমন সুযোগ না থাকলে নারীরা গোসলখানা বা সংকীর্ণ কোনো ঘরে নিজেদের তালাবন্ধ করে নিত।

কখনো নারীরা নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে নিতেন। একবার কুনার প্রদেশের এক বস্তিতে এক রুশ সেনা একটি ঘরে ঢুকে পড়ে। নরপশুটি ঘরের মহিলার সম্ভ্রমে হামলা চালাতে উদ্যত হলে মহিলা হাতের কাছ থাকা কুড়াল দ্বারা তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। আরেক গ্রামে একবার এক রুশ সেনা এক বৃদ্ধার বাসায় অবস্থান করে তার যুবতিকে ফুসলানোর চেষ্টা করছিল। বৃদ্ধা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ঘরে জ্বালানি তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুনে যুবতিসহ রুশ সেনা ভস্ম হয়ে যায়। তিনি নিজেও রেহাই পাননি। কিন্তু শহিদ হতে হতে তিনি তার মেয়েকে রুশ সেনার নাপাক খায়েশের শিকার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নেন।

লুণ্ঠিত ইসলামের মেয়েগুলোর সম্ভ্রম

একবার একটি গ্রামে ছয়টি হেলিকপ্টার অবতরণ করে। রুশ সেনারা গ্রামবাসীকে বলে, মুজাহিদদের আমাদের হাতে তুলে দাও। অথচ এই গ্রামে মুজাহিদ থাকবে দূরে থাক, কোনো যুবকও ছিল না। সেখানে কেবল নারী, শিশু আর বৃদ্ধরা ছিল। রুশরা তখন রাগান্বিত হয়ে সকল নারীকে পর্দাহীন করে এদের থেকে ছয়জন সুন্দর যুবতিকে তুলে নেয়। বেশকিছুক্ষণ পর আবার গ্রামের আকাশে হেলিকপ্টারগুলো উদয় হয়। এরপর এক এক করে ওই ছয় যুবতিকে আকাশ থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। এই ধরনের নিষ্ঠুর ঘটনা আফগানিস্তানের বিভিন্ন জয়গায় হরদম ঘটে চলছিল। কোনো কোনো সময় হেলিকপ্টার থেকে যুবতিদের লাশের পরিবর্তে তাদের সেলোয়ার ফেলে দেওয়া হতো। এমন লাপাত্তা যুবতিদের সংখ্যা ছিল শত শত, যাদের পিতা-মাতারা বাকি জীবন ওদের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিতেন।

বিধ্বস্ত মসজিদ, বিরান মাদরাসা

মুসলমানদের আবেগ আহত করতে এবং তাদের ইসলামবিদ্বেষের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে রুশ পশুশক্তি ইসলামি নিদর্শনাবলির সম্ভ্রমহানিতে মেতে থাকত। তারা কুরআনের পবিত্র কপিগুলো আবর্জনায় ছুড়ে ফেলত। পাতাগুলো বুট দ্বারা পদদলিত করত। মসজিদ-মাদরাসাগুলো বুলডোজার চালিয়ে মাটির সমান করে দিত। বস্তিগুলোতে বোমা ফেলে নিমিষেই শত শত মানুষকে মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে দিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শানে প্রকাশ্যে অবমাননাকর কথা বলে বেড়াত।

তখন আফগানিস্তানের চারদিকে ছিল অন্ধকারের রাজত্ব। হাজার হাজার ভগ্ন মসজিদ কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল উজাড় মাদরাসাগুলো। নারীরা হচ্ছিল সম্ভ্রমহীন। শিশুরা হচ্ছিল জবাই। বুড়োদের শুভ্র দাড়ি রঙিন হচ্ছিল রক্তাশ্রুতে। মা-বোনদের আকাশ-কাঁপানো চিৎকারে ইসলামের এই দুর্গ হয়ে উঠছিল কান্নাসংগীতের কেন্দ্র। এই ছিল সেই 'শান্তি ও নিরাপত্তা', যা প্রতিষ্ঠার জন্য রুশরা এখানে এসেছিল। সে শোকসংগীত আজও সেখানকার আকাশে-বাতাসে বেদনার আবহ জাগায়।

রুশদের ভুল ধারণা

রুশ পশুদের ধারণা ছিল, তারা নির্মমতার ভয়াবহতা দেখিয়ে আফগানদের দমিয়ে রাখবে, তাদের প্রতিরোধশক্তি গুঁড়িয়ে দেবে। কিন্তু এ ছিল তাদের দিবাস্বপ্ন। আফগান মুসলিমরা তো ইমানি শক্তির সেই সাক্ষাৎ-নমুনা, কোনো কুফরি শক্তি কখনোই যাদের হিম্মতহারা করতে পারেনি। এরা অনেক সময় সাময়িকভাবে পরাস্ত হয়েছে ঠিক,

তবে কখনোই হার মেনে নেয়নি। মাঠ থেকে পিঠ দেখানো তাদের ঐতিহ্যে নেই। তারা নিঃশেষ হলেও লড়তে লড়তে এবং বুকে আঘাত খেতে খেতেই নিঃশেষ হয়। প্রতিটি আঘাত তাঁদের প্রতিশোধনেশা বাড়িয়ে দেয়। সাময়িক পরাজয় তাঁদের পৌরুষে ধরিয়ে দেয় আগুন। এই জাতির এক মর্দে মুমিন ছিলেন শিহাবুদ্দিন ঘোরি, যিনি পৃথ্বিরাজের সঙ্গে সাময়িক পরাজয়ের পর ঘরে ফিরে এসে পুরো একটি বছর বিছানায় গা লাগাননি; যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকেন। পরবর্তী বছর ভারতে ঢুকে পৃথ্বিরাজের মসনদ উলটিয়ে তবে স্বস্তির নিশ্বাস নেন।

আফগানদের মানসিকতা কখনোই কোনো জবরদখলকারীর সামনে মাথা নত হওয়ার অনুমতি দেয় না। তাঁদের কাছে হত্যা-অপরাধ কখনোই ক্ষমাযোগ্য নয়। তাঁরা বংশপরম্পরায় রক্তের প্রতিশোধের ব্যাপারটি স্মরণ রাখে। সুযোগ পেলেই জালিম থেকে প্রতিশোধ নিতে দেরি করে না। নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে তাদের ভীত করা সম্ভব নয়। চেঙ্গিস খানের নৃশংসতাও তাদের ভীত করতে পারেনি। নরপশুটি মাত্র এক সপ্তাহে হেরাতে ১৬ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল! কিন্তু তার পরও তাঁরা চেঙ্গিসের বাহিনীর মোকাবিলা করে গেছে—কখনো হেরাতের বীর শামসুদ্দিনের নেতৃত্বে আর কখনো জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহর নেতৃত্বে।

তথ্যসূত্র

১. *তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান*, ড. এইচ বি খান।

২. *আফগানিস্তান, এক কওম কা আলমিয়া*, আহমাদ শুজা পাশা।

৩. *উর্দু ডাইজেস্ট, জিহাদে আফানিস্তান*, এপ্রিল ১৯৮৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যা।

৪. *আল-মুসলিমুনা ফি আফগানিস্তান*, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আহমাদ।

৫. *তারিখু আফগানিস্তান মিন কুবাইলিল ফাতহিল ইসলামি ইলা ওয়াকতিনাল মুআসির*, ফারুক হামিদ বদর।

৬. *Encyclopedia Britannica* (Afghanistan)

২৫ তম অধ্যায়

আফগান জিহাদের বিখ্যাত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ

মুজাহিদ নেতাদের চারটি বৃত্ত

আফগান জিহাদের সোনালি পাতাগুলো ওলটানোর আগে আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় মুজাহিদ নেতা এবং তাঁদের সংগঠনগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত মনে করছি। কেননা, সামনে বার বার তাঁদের ও সংগঠনগুলোর নাম উচ্চারিত হবে। আমরা আফগান জিহাদে উজ্জ্বল ভূমিকার ধারক ব্যক্তিদের চারটি বৃত্তে বিভক্ত করতে পারি :

১. **আলিম** : এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস, মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি, মাওলানা আরসালান খান রাহমানি, মাওলানা নিজামুদ্দিন হাক্কানি ও মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুর প্রমুখ।

২. **সুফি ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি** : এখানে নকশবন্দি সিলসিলার মাওলানা মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি, প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি এবং কাদিরিয়া তরিকার বিখ্যাত বুজুর্গ সাইয়িদ আহমাদ গিলানি সুখ্যাত ছিলেন।

৩. **আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতসমাজ** : এঁদের মধ্যে গুলবুদিন হেকমতিয়ার, প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি, আহমাদশাহ মাসউদ, আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ প্রমুখ সামনের সারিতে ছিলেন।

৪. **আফগানবাহিনী থেকে চলে আসা ব্যক্তি** : এঁদের মধ্যে হেরাতের ফিল্ড কমান্ডার ইসমাইল খান তোরোন, খোস্তের কর্নেল আফজাল খান, পাকতিয়ার কর্নেল আহমাদ সায়িদ ও কমান্ডার জাবিত আকবর শাহ বিখ্যাত।

ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے

মিল্লাতের স্বাধীন সন্তানরা কী চমৎকার ধৈর্য-পথের পথিক হচ্ছে!

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিসকে আফগানিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের কাতারে গণ্য করা হয়। এ মহান মণীষার জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে নাঙ্গাহার প্রদেশে। অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, দুঃসাহসী আর স্পষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন ইবাদতগোজার খোদাভীরু। জীবনের সিংহভাগ সময় কেটেছে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও জ্ঞানসাধনার পেছনে। কাবুলের একটি পত্রিকার সম্পাদক এই মনীষা সাহিত্যিক আর সাংবাদিকও ছিলেন। মাওলানা ছিলেন নকশবন্দি সিলসিলার আধ্যাত্মিকতার ধারক। তাকওয়া ও পরহেজগারিতে ছিলেন ইসলামের সোনালি যুগের মানুষদের প্রতিচ্ছবি। চিন্তাচেতনায় প্রজ্ঞার ছটা ছিল দীপ্তিময়। পাশাপাশি ছিলেন কর্মতৎপর একজন নেতা। সব যুগেই তিনি শাসকদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণে ছিলেন নির্ভিক অকুণ্ঠ। জহির শাহ ও দাউদের যুগে রাজপথে আন্দোলনরত সাধারণ মুজাহিদ এবং সকল সংগঠন তাঁকে নিজেদের মুরব্বি মনে করত। তাঁর পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হতো। তাঁকে পুরো দেশব্যাপী উসতাজুল আসাতিজা মনে করা হতো।

মাওলানা ইউনুস খালিস নম্রতা ও ম্যধমপন্থা অবলম্বন করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলার অনুপম যোগ্যতা রাখলেও শরিয়তের বিধান পালনে কোনো প্রকার শৈথিল্য সহ্য করতেন না। তাঁর আমানত ও দীনদারি এতটাই সমুন্নত ছিল যে, আবদুর রব রাসুল সাইয়াফের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকাকালেও তিনি দীর্ঘদিন তাঁর দল 'ইত্তিহাদে ইসলামি'র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও বায়তুলমালের দায়িত্বশীল ছিলেন।

তারাকির যুগে এই মহান বুজুর্গ মুজাহিদ নেতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বুরহানুদ্দিন রাব্বানি, প্রফেসর সাইয়াফ, হেকমতিয়ার প্রমুখের সঙ্গে 'হিজবে ইসলামি'-তে যুক্ত থাকেন। এই সংগঠন দ্রুতই 'হরকত ইনকিলাবে ইসলামি' নামে বদলে যায়। তবে কিছুদিনের মধ্যে মুজাহিদ নেতাদের মতবিরোধ এবং মানসিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তা ভেঙে যায়। এগুলো হচ্ছে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তখন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুন খালিস পুরানো 'হিজবে ইসলামি'-কে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর ওপর ভরসা রেখে প্রায় ৩০ হাজারের মতো সশস্ত্র মুজাহিদ ওই দলে যোগ দেন। পরে ওই দল 'হিজবে ইসলামি খালিস গ্রুপ' নামে প্রসিদ্ধি পায়।

মাওলানা খালিস যশস্বী আলিম হওয়ার পাশাপাশি ময়দানের একজন মর্দে মুজাহিদও ছিলেন। সাংগঠনিক চক্রান্ত আর ধোঁকাবাজি থেকে দূরে থেকে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হন। বয়সে প্রবীণ হওয়ার পরও বহু বছর জিহাদের ময়দানে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সশরীরে মুজাহিদদের সঙ্গে কঠিন থেকে কঠিনতর যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে অংশ নিতেন।

নাঙ্গাহার, উরুজগান, পাকতিয়া, পাকতিকা, কান্দাহার, জাবিল, গজনি এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশসমূহে খালিস গ্রুপের খুব প্রভাব ছিল। ওই সংগঠনের সঙ্গে বড় বড় যোদ্ধা ও কমান্ডার সম্পৃক্ত ছিলেন। (পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশকারী বিশ্বখ্যাত তালেবান আন্দোলনের আমির মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহিমাহুল্লাহ এই দল থেকেই তাঁর জিহাদি সফর শুরু করেছিলেন। এখান থেকেই তিনি নিজ ভবিষ্যৎ ঝালিয়ে নিয়েছিলেন।)

মাওলানা খালিস মিডিয়া থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। কারণ, তাঁর সিংহভাগ সময় ময়দানে ব্যয় হতো। নিজেকে মিডিয়ায় প্রকাশ করা আর ক্ষমতার জন্য দৌড়ঝাঁপের চেয়ে উম্মাহর কল্যাণে সময় ব্যয়ই তাঁর কাছে প্রিয়তর ছিল।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির জন্ম পাকতিয়া প্রদেশের কারিজগাই জেলার উজি তহশিলে কান্ডাও গ্রামে, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর গোত্র জাদরান বীরত্ব ও যুদ্ধপ্রতিভায় ছিল সুখ্যাত। তাঁর প্রাথমকি শিক্ষা সমাপন হয় আফগানিস্তানের দীনি কয়েকটি মাদরাসায়। এরপর পাকিস্তানের আকুড়া খটক নামক সুখ্যাত দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'জামিয়া হাক্কানিয়া' থেকে উচ্চতর দীনি শিক্ষা সমাপন করেন। এখানে তিনি এক বছর শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেন।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানিকে যদি আফগান জিহাদের প্রবক্তা বলা হয়, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। তিনি তখনই কোমর বেঁধে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যখন মানুষ জিহাদের মর্ম ভুলে গিয়েছিল। সময়টা ছিল জহির শাহর শাসনামলের শেষ কয়েকটি বছর, যখন আফগান রাজনীতিতে কমিউনিস্টরা নিজেদের উটতি-শক্তি হিসেবে জানান দিচ্ছিল। আলিমসমাজ তখন থেকেই কমিউনিস্টদের নিয়ে শঙ্কাবোধ করে আসছিলেন; আর কমিউনিস্টরাও আলিমসমাজকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে সর্বশক্তি ব্যয় করছিল। তখন কমিউনিস্টদের এই উত্থান রুখে দাঁড়াতে যাঁরা মাথায় কাফন বেঁধে ময়দানে নেমে এসেছিলেন, মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি রাহ. ছিলেন তাঁদের অগ্রসারিতে।

যখন কমিউনিস্টদের খালক-পরচম পার্টি আর বিভ্রান্ত সেনাদের সহায়তায় সরদার দাউদ খান ক্ষমতার মঞ্চে আসে, তখনই মাওলানা হাক্কানি বুঝে ফেলেন, আফগানিস্তানে এখন রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে; আর তা বাঁচাতে হলে জিহাদের বিকল্প নেই। সুতরাং তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি, যিনি দাউদের ক্ষমতাগ্রহণের পরপরই সশস্ত্র জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। সরকারি বাহিনী তাঁর বাড়িতে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ঘরটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। তবে তিনি ছদ্মবেশে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হন। তখন

কিছুদিন পাকিস্তানে থাকেন। অবশেষে পরিবার-পরিজনকে পাকিস্তানে রেখে পুনরায় আফগানিস্তানে এসে দাউদের সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তানের আজাদ কাবায়েলি এলাকা থেকে কিছু রিভলবার, বন্দুক ও দেশে তৈরি বোমা কিনে এনে সরকারি স্থাপনা, সেনাক্যাম্প ও পুলিশফাঁড়িসমূহে হামলা শুরু করেন এবং বছরখানেকের মধ্যেই কমিউস্টিবিরোধী এক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

২৭ এপ্রিল ১৯৭৮ তারাকি 'ইনকিলাবে সাওর' নামে যথারীতি কমিউনিস্ট-বিপ্লব সাধন করলে আলিমরাও তৎক্ষণাৎ দেশব্যাপী জিহাদের ফাতওয়া জারি করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ফাতওয়াটি ছিল 'দারসাখিল' অঞ্চলের বুজুর্গ আলিম মাওলানা আবদুল গনির। তিনি সাওর বিপ্লবের মাত্র ১০ দিনের মাথায় জিহাদের ফাতওয়া দিয়েছিলেন। এ ফাতওয়ার পর মাওলানা হাক্কানির দলে মুজাহিদদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর অল্পদিনের মধ্যেই পাকতিয়া ও পাকতিকা প্রদেশে একজন ঝানু কমান্ডার হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। তখন কয়েকটি জেলা ও তহশিল-হেডকোয়ার্টার তাঁর দখলে চলে আসে। ওই সময় মাওলানা ইউনুস খালিস, প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ, প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি, গুলবুদিন হেকমতিয়ারসহ কতিপয় নেতা মিলে হিজবে ইসলামি নামক একটি জিহাদি জোট গঠন করেন। এই জোট গঠনে মাওলানা হাক্কানির অনন্য অবদান ছিল। পরবর্তী সব সংগঠনের মুজাহিদ নেতারা এই হিজবে ইসলামিতে যুক্ত ছিলেন। আরও কয়েকটি দল ওই জোটে যোগদানের পর এর নাম রাখা হয় 'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি'। কিন্তু কিছুদিন পর এই জোটও মতানৈক্যের শিকার হয়ে ভেঙে যায়। এ সময় মাওলানা খালিস পুরানো 'হিজবে ইসলামি' নামটি বহাল করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তখন জালালুদ্দিন হাক্কানিও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

এ হচ্ছে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের কথা। ওই বছরের ২৭ ডিসেম্বরে যখন রাশিয়া সরাসরি আফগানিস্তানে চলে আসে, তখন মাওলানা হাক্কানি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন। ততদিনে তিনি হাজার হাজার যোদ্ধাকে গেরিলা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি রুশবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করে দেন। আর এর মাধ্যমে দেশজুড়ে 'দ্বিতীয় ইমাম শামিল' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন মাওলানা।

রুশ-আফগানযুদ্ধের সবচেয়ে কঠিনতর আর বড় সংঘর্ষগুলো এই অঞ্চলেই ঘটে। আর এমন প্রতিটি যুদ্ধে এই দরবেশ মুজাহিদ তাঁর ইমানি শক্তি ও জিহাদি জজবার কল্যাণে পঙ্গপালসদৃশ রুশবাহিনীকে লজ্জাজনক পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকেন। এসব যুদ্ধের বিবরণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আসবে।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানিই প্রথম সামরিক কমান্ডার, যিনি আন্ডারগ্রাউন্ড সেনাঘাঁটি নির্মাণ করেন। সাওরের আন্ডারগ্রাউন্ড সেনাক্যাম্পটি মুজাহিদদের সবচেয়ে বড়

সেনাক্যাম্প হিসেবে সুখ্যাত ছিল। মাওলানা হাক্কানি রুশ বোমারু বিমানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে বড় বড় গুহাও তৈরি করেন। এখান থেকে বছরের পর বছর লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে চান। আফগানিস্তানের ধ্বংস হওয়া মাদরাসাসমূহের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ওয়াজিরিস্তানের সীমান্ত-এলাকা মিরানশাহে 'মামবাউল উলুম' নামে বড় একটি বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলেন তিনি। যেখানে ওয়াজিরিস্তান ছাড়াও আফগানিস্তানের ধ্বংস হওয়া প্রায় ৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্জন করছিল।

প্রফেসর গোলাম মুহাম্মাদ নিয়াজি

জহির শাহর শাসনামলের শেষ দিকে কলেজ-ভার্সিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইসলামি অনুভূতিসম্পন্ন মুসলিমরা কমিউনিজমের মোকাবিলার সক্রিয় হয়ে উঠছিলেন। এদের মধ্যে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনিয়াত অনুষদের উসতাজ প্রফেসর গোলাম মুহাম্মাদ নিয়াজি ছিলেন প্রথমসারিতে। কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিজমের জয়জয়কার চলছিল। ভার্সিটির কেন্দ্রীয় মসজিদকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল নৃত্যশালায়। এমতাবস্থায় প্রফেসর নিয়াজি 'ইসলামি জামাআত' এবং তাঁর ভার্সিটির শিষ্যরা 'নওজোয়ানানে ইসলাম' নামে একটি ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা করে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। আবদুর রাহিম নিয়াজি ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। এ ছাড়া ভার্সিটির আরও দুজন শিক্ষক—প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি ও প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ ওই ছাত্র-আন্দোলনকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যান।

দাউদ সরকারের যুগে ইসলামি নেতাদের ওপর ক্র্যাকডাউন শুরু হলে প্রফেসর নিয়াজি ও প্রফেসর সাইয়াফকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে নিয়াজিকে বন্দি অবস্থায় ফাঁসি আর দীর্ঘদিন পর সাইয়াফকে মুক্তি দেওয়া হয়। উত্তাল এই সময়ে প্রফেসর রাব্বানি নওজোয়ানানে ইসলামের এক সক্রিয় ছাত্রনেতা গুলবুদিন হেকমতিয়ার এবং কতিপয় সঙ্গীসহ হিজরত করে পেশোয়ার চলে আসেন। তাঁরা পেশোয়ার অবস্থানরত অন্যান্য মুজাহিদ নেতার সঙ্গে মিলে আফগানিস্তানে সশস্ত্র কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু পাকিস্তান দাউদের পাকিস্তানবিরোধী অবস্থানের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, তাই তখনকার পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ওই মুজাহিদ নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেন।

হেকমতিয়ার 'নওজোয়ানানে ইসলাম'-কে 'জমিয়তে ইসলামি' নাম দিয়ে আফগানিস্তানে কার্যক্রম শুরু করেন। পরে তিনি 'হিজবে ইসলামি' (হেকমতিয়ার গ্রুপ) নামে কাজ করেন। তবে মাওলানা ইউনুস খালিসের 'হিজবে ইসলামি' (খালিস গ্রুপ) আলাদাভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তখন বুরহানুদ্দিন রাব্বানি 'জমিয়তে ইসলামি' নামে ভিন্ন একটি দল গঠন করেন।

গুলবুদিন হেকমতিয়ার

আফগান জিহাদের সূত্রে বিশ্বজুড়ে যে কটি নাম সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদিন হেকমতিয়ার। তাঁর জন্ম ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পাখতুন গোত্র খরোটিতে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেন তিনি। জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন ইসলামপ্রিয় এবং বিপ্লবী চিন্তাচেতনার অধিকারী। ছিলেন আফগান ইসলামপ্রিয় ছাত্রদের সংগঠন 'নওজোয়ানানে ইসলাম'-এর প্রথমসারির একজন নেতা। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবী তৎপরতা চালানোর অপরাধে জেলে নীত হন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ খানের সরকার ধরপাকড় শুরু করলে হেকমতিয়ার আত্মগোপনে চলে যান। তখন তিনি মুসা খিল এলাকায় একটি মসজিদের ইমামতি করে সময় অতিবাহিত করছিলেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে হিজরত করে পাকিস্তানে চলে আসেন। কিছুদিন পর পেশোয়ারে 'হিজবে ইসলামি' নামে জিহাদি সংগঠনের ভিত্তি রাখেন।

এরপর দ্রুততম সময়ে এই সংগঠন পাক সরকারের সাহায্য নিয়ে আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সাবধানি আঙ্গিকে সীমিত পরিসরে জিহাদি তৎপরতা শুরু করে। সে হিসেবে হেকমতিয়ারকে সেই জিহাদি নেতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁরা সাওর বিপ্লবের আগে থেকেই আফগান সরকারগুলোর বিরোধিতায় নেমে পড়েছিলেন। এই পর্যায়ে তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিলেন। 'হিজবে ইসলামি'র কার্যক্রম জিহাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও ছিল। হেকমতিয়ার গণতন্ত্র ও নির্বাচনে বিশ্বাস করতেন। নাঙ্গাহার, কুনার, বাগলান ও কুন্দুজ ছিল তাঁর প্রধান ঘাঁটি। হেকমতিয়ার ব্যক্তিগতভাবে ময়দানের বীর না হলেও তিনি ছিলেন একজন ধীমান রাজনীতিবিদ। তাঁর ওপর ডজন ডজন কমান্ডারের পূর্ণ আস্থা ছিল। আফগান জিহাদ চলাকালে তিনি সাধারণত পাকিস্তানে অবস্থান করে তাঁর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি মিডিয়ায় অত্যন্ত জোরালোভাবে আফগানদের পক্ষে কাজ করছিলেন। কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রদের বড় একটি অংশ তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

'হিজবে ইসলামি' ছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলামমনস্ক তরুণদের দল, যারা আদর্শগতভাবে ছিল সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি, মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু ও জামাআতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদির দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। তারা আলিম ও ফকিহদের আনুগত্যের বাইরে থাকা পছন্দ করত। জামাআতে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। তাই জামাআতে ইসলামির কাছে মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে হেকমতিয়ারই ছিলেন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। হেকমতিয়ার উপমহাদেশের জামাআতে ইসলামির বাইরে আরববিশ্বের বিখ্যাত সংগঠন ইখওয়ানুল

মুসলিমিনের চিন্তাধারার সঙ্গেও সহমত পোষণ করতেন। তিনি ইরানি বিপ্লব দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। ইরানি বিপ্লবের শীর্ষসারির নেতাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ফিকহে হানাফির অনুসারী। স্মর্তব্য, 'হিজবে ইসলামি' নামের আরেকটি সংগঠন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল। ওই দল আদর্শিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে হেকমতিয়ারের দলের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত ছিল না। তারা আলিম ও ফকিহদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখত। তাদের আলোচনা মাওলানা ইউনুস খালিসের জীবনালোচনায় আলোচিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি

'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি'র প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি ছিলেন একজন সুফি, নির্ভিক মুজাহিদ ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তি। তাঁর জন্ম ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। প্রাথমিকসহ উচ্চতর দীনি শিক্ষা তিনি তাঁর পিতা ও আফগানিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের থেকে অর্জন করেন। এরপর শিক্ষাদান ও কাদিরিয়া সিলসিলা মোতাবিক আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানে জড়িয়ে পড়েন।

আফগান জিহাদ চলাকালে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন; কিন্তু তারপরও মুজাহিদদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আগে আগেই হাঁটতে থাকেন। আফগান জিহাদে যদিও মিডিয়ায় অন্যান্য দলের মতো খ্যাতি ছিল না, তথাপি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের জিহাদি রণক্ষেত্রগুলোতে 'হরকতে ইসলামি'-কে সবার অগ্রসারিতে গণ্য করা হতো।

গ্রামীণ জনপদগুলোই ছিল আফগান জিহাদের মূল ময়দান। আর সেসব জায়গায় মাওলানা ছিলেন অত্যন্ত সমীহজাগানিয়া আর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মাওলানার প্রতি অনুরক্তরা শরিয়তের নির্দেশাবলি অনুসরণের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। অন্য শব্দে বলতে গেলে তাঁরা ছিলেন কট্টর ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। তাঁদের নেতৃত্ব ছিলেন বিশুদ্ধ আকিদার আলিম ও সুফি বজুর্গরা। কাবুল, কান্দাহার, গজনি, লোগার, কুন্দুজ, বাগলান ছিল তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি

প্রফেসর বুরহানুদ্দিনের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশে। জাতিগতভাবে ছিলেন তাজিক। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে তিনি মিসরে গিয়ে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর দেশে ফিরে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেন। ধীরে ধীরে প্রফেসর হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেন। তিনি কাবুল ভার্সিটিতে ইসলামি আন্দোলনের

জন্মদাতা প্রফেসর গোলাম মুহাম্মাদ নিয়াজির বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। তখন থেকেই ছাত্রনেতা হেকমতিয়ারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

হেকমতিয়ারের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ বাধে দাউদবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার কর্মপন্থা নিয়ে। প্রফেসর রাব্বানি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষে; আর হেকমতিয়ার ছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে। প্রফেসর নিয়াজি জেলে যাওয়ার আগে রাব্বানিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। ফলে রাব্বানি নিজেকে বিপ্লবী আন্দোলনসমূহের বৈধ নেতা মনে করতেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল হেকমতিয়ারের সঙ্গে বিরোধের আরেকটি কারণ।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রফেসর রাব্বানি সৌদি আরব যান। সেখানে বাদশাহ ফায়সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে কমিউনিস্ট বিপ্লবের শঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করেন। দেশে ফিরে কিছুদিন পর 'জমিয়তে ইসলামি' নামে একটি দলের সূচনা করেন। রাব্বানি এই দলের প্রধান হন। তবে এই দলে আহমাদশাহ মাসউদকে প্রধান সামরিক কমান্ডার ও কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

অন্যান্য সংগঠনসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদির বাগডোর সাধারণত একজন অথবা কেন্দ্রীয় শুরাপরিষদের হাতে থাকত। তবে জমিয়তে ইসলামির দুর্বলতা ছিল—তাদের রাজনৈতিক বিষয়াদি রাব্বানির হাতে থাকলেও সামরিক বিষয়াদিতে সামরিক বিভাগ ছিল স্বাধীন। তারা রাজনৈতিক নেতার সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারত। এ পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে আহমাদশাহ মাসউদের নেতৃত্বে হাজার হাজার তাজিক, উজবেক এবং তুর্কমান মুজাহিদরা জমিয়তে ইসলামিতে যোগ দেওয়ার পরে। ফলে সামনে গিয়ে এই পরিস্থিতি অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরব দেশগুলোর সঙ্গে প্রফেসর রাব্বানির গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তিনি সেখান থেকে প্রচুর সাহায্য পেতে থাকেন।

আহমাদশাহ মাসউদ

আফগান জিহাদের সর্বাধিক খ্যাতিমান কমান্ডার ছিলেন তিনি। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জশিরের বাজরাক অঞ্চলের জাঙ্গালাক গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনিও ছিলেন জাতিগতভাবে তাজিক। তাঁর পূর্বপুরুষরা আফগান বাদশাহদের উত্তম সেনাপতি হিসেবে গণ্য হতেন। আহমাদশাহ মাসউদ যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই ছিলেন সামরিক ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন সেনাক্যাম্পে তিনি প্রথমিক শিক্ষার্জন করেন।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন ইন্সটিটিউট অব পলিটেকনিকে পড়াশোনা করছিলেন, তখন দাউদ খান ক্ষমতায় আসে। এ সময় আহমাদশাহ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-

আন্দোলন নওয়জোয়ানানে ইসলামের সিনিয়র নেতা হিসেবে সরকারি কোপানলের শিকার হন। ফলে জন্মস্থান পাঞ্জশিরে চলে আসেন। এরপর এখান থেকেই শুরু করেন কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলন।

তাঁর শিক্ষক প্রফেসর রাব্বানি 'জমিয়তে ইসলামি' প্রতিষ্ঠা করলে তিনি তাতে যোগ দেন। তবে তাঁর সিংহভাগ সময় পাঞ্জশিরে সামরিক কার্যক্রমে ব্যয় হতো। প্রফেসর রাব্বানিকে রাজনৈতিক ও মিডিয়াযুদ্ধের হিরো মনে করা হলেও জমিয়তে ইসলামির মুল সামরিক ব্যক্তি ছিলেন মাসউদ। মাসউদ ছিলেন ইতিহাসের প্রতি প্রচণ্ড অনুরক্ত। ইতিহাসের গভীর পাঠই তাঁকে যুদ্ধবিষয়ক চাতুর্য ও সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণে অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল।

ফরাসি ভাষা জানা থাকায় ওই যুদ্ধবাজ নেতা সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি মিডিয়াযুদ্ধেও অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেন। পশ্চিমা গণমাধ্যম বিশেষ করে ফরাসি গণমাধ্যম তাঁকে বিশেষভাবে হাইলাইট করত। ফলে খুব দ্রুততম সময়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন; আর তিনি পাঞ্জশিরের সিংহ হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়ে নেন। কমিউনিস্ট আর রুশবিরোধী যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা এবং জাতীয়তাবাদী দর্শনতাড়িত। তাই তাঁর কাছে যুদ্ধটি ইসলামি জিহাদের চেয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম হিসেবেই ছিল অগ্রগণ্য।

তাঁর পরবর্তী জীবনধারা থেকে অনুমিত হয়, তিনি ছিলেন অন্যান্য মুজাহিদ নেতা থেকে চিন্তাচেতনার দিক দিয়ে অনেকটা আলাদা পথের যাত্রী। তিনি আফগানিস্তানে কট্টর ইসলামি সরকারের পক্ষে ছিলেন না। সবসময় নিজেকে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী হিসেবে উপস্থাপনের মানসিকতা তাঁর মধ্যে উৎকটভাবে বিদ্যমান ছিল। মাসউদ এতটাই হুঁশিয়ার ছিলেন যে, পশ্চিমা মিডিয়াসহ রুশ প্রতিনিধি এমনকি কেজিবির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সময়ে-সুযোগে তাদের থেকে সহায়তা লাভ করতেন। আহমাদশাহ মাসউদ আফগান জিহাদ সফলের পর কয়েক বছর পরে মঞ্চে আসা তালেবান আন্দোলনের শেষ দিকে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর একটি প্রাণঘাতী আক্রমণের শিকার হয়ে মারা যান।

প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ

তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলের নিকটস্থ পাগমানে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনার পর জামিয়া আজহারে গিয়ে সেখান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হলে দীর্ঘদিন কারাগারে সহ্য করেন অকথ্য নির্যাতন। তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ শোনানো হতো; কিন্তু

হাফিজুল্লাহ আমিন—যে পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, সাইয়াফের খালাতো ভাই ছিল—বিধায় তার সুপারিশে তিনি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। পরে হিজরত করে পেশোয়ার চলে আসেন। ইসলামি দলগুলোর ভাঙা-গড়ার একপর্যায়ে তিনি ইত্তিহাদে ইসলামি নামে একটি দল গঠন করেন।

সাইয়াফ ছিলেন আরবি ভাষার একজন বাগ্মী বক্তা। তাই আরববিশ্বে তাঁর বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। উপসাগরীয় দেশসমূহ বিশেষ করে সৌদি আরব তাঁকে প্রচুর অর্থসাহায্য দিচ্ছিল।

পির আহমাদ গিলানি

পির আহমাদের পিতা বাগদাদ থেকে হিজরত করে কাবুলে এসেছিলেন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানির সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকায় তাদের পরিবার আফগানদের কাছে ছিল সীমাহীন শ্রদ্ধার পাত্র। শাহ আমানুল্লাহ খান পির সাহেবের পিতাকে নিজের কাছে রাখতেন। পির আহমাদ গিলানি 'মাহাজে মিল্লি' 'পেমানে ইত্তিহাদে ইসলামি' নামের সংগঠনে জিহাদে সক্রিয় থাকেন। জেনারেল আবদুর রাহমান ছিলেন এই দলের সেক্রেটারি আর কমান্ডার সুলায়মান গিলানি ছিলেন দলটির সামরিক কমান্ডার।

প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি ও খুদ্দামুল ফুরকান হবে

প্রফেসর সিবগাতুল্লাহও আফগানিস্তানের একটি আধ্যাত্মিক পরিবার থেকে উঠে আসেন। তাঁর পিতা শায়খ ইসমাইল মুজাদ্দিদি শুরুতেই কমিউনিজমবিরোধী আওয়াজ তুলেছিলেন। তখন ছিল বাদশাহ জহিরের যুগ। তাঁর প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান তখন দেশে সংস্কৃতি ও আধুনিকতার নামে নাস্তিক্যতার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছিল। মাওলানা শায়খ ইসমাইল মুজাদ্দিদি এই ঝড়ের মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গজনির নুরুল মাদারিসে 'খুদ্দামুল ফুরকান' নামক একটি সংগঠনের ভিত রাখেন। এই দল সভা-সমাবেশ এবং প্রতিবাদী বিক্ষোভের মাধ্যমে জহির শাহকে আফগান জনগণের অনুভূতির বার্তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিল। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে *নেদায়ে হক* নামে একটি পত্রিকাও তাঁরা বের করতেন। কিন্তু জহির শাহ ও দাউদ খানের কাছে এসব আওয়াজ তেমন মূল্য পায়নি।

জহির শাহর পর দাউদের যুগে সংগঠনটিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। তারাকির যুগে সাওর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরপরই খুদ্দামুল ফুরকানের নেতারা বিশেষ করে প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি ও মাওলানা আরসালান খান রাহমানি সারা দেশের ফকিহদের সঙ্গে যোগাযোগ করে

এই পরিস্থিতিতে জিহাদের হুকুম সম্পর্কে ফাতওয়া তলব করেন। সবাই ঐকমত্যের ভিত্তিতে জিহাদের আবশ্যিকতার ফাতওয়া দিয়ে দেন। ফাতওয়া পেয়েই খুদ্দামুল ফুরকানের কর্মীরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা গোপনে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। রাতের আঁধারে জনগণের সঙ্গে মিশতেন এবং তাদের হাতে জিহাদের বার্তা-সংবলিত 'শবনামা' (রাতের বার্তা) পৌঁছে দিতেন। ওই বার্তায় থাকত—'বর্তমান সরকার ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কাফির। এরা দীন ও ইমানের শত্রু। দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল আলিম এদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া দিয়েছেন।' আর তাই জনসাধারণ জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করেনি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। প্রথমে তারা সেসব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা শুরু করেন, যেগুলোতে কমিউনিজমের শিক্ষা দিয়ে যুবসমাজকে ধর্মদ্রোহী করে তোলা হচ্ছিল। একপর্যায়ে কমিউনিস্টরা ইসমাইল মুজাদ্দিদিকে গ্রেপ্তার করে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে শহিদ করে ফেলে। তাঁর শাহাদাতের পর সংগঠনটি ভাঙনের শিকার হয়। তখন নতুন করে জিহাদি সংগঠনগুলো উঠে আসতে শুরু করে। প্রফেসর মুজাদ্দিদি তখন 'নাজাতে মিল্লি' বা 'জাবহাতে আজাদি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। সামরিক দিক থেকে এই জামাআত দুর্বল হলেও মুজাদ্দিদির আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সূত্রে আফগান জনসাধারণের মধ্যে এর যথেষ্ট সম্মান ছিল। জিহাদি নেতারাও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

আরববিশ্বে মুজাদ্দিদি খুবই পরিচিত ছিলেন। তাই জিহাদের শেষ দিকে রাজনৈতিক পর্যায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে আসেন। ফলে তাঁকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়।

মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুর

মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুরকেও আফগান জিহাদের প্রথমসারির নেতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন দরবেশ গোছের আলিম এবং গেরিলাযুদ্ধে শত্রুর পিলে চমকানো একজন কমান্ডার। সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ এড়িয়ে অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন নাসরুল্লাহ মানসুর। এ কারণেই তিনি প্রথমসারির কমান্ডার এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার পরও মিডিয়ায় যতটুকু প্রচার পাওয়ার কথা ছিল, ততটুকু পাননি। তাঁর আসল নাম ছিল ফজলুর রাহমান; কিন্তু কীভাবে যেন নাসরুল্লাহ মানসুর নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর গোত্রের নাম ছিল সিহাক। তিনি পাকতিয়া প্রদেশের জারমাত এলাকায় বসবাস করতেন। গজনির প্রসিদ্ধ দীনি মাদরাসা 'জামিয়া ফারুকিয়া' থেকে উচ্চতর দীনি শিক্ষা সমাপন করেন।

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জহির শাহর যুগে আধুনিকতার লাগাম টেনে ধরতে শীর্ষ আলিমদের সমন্বয়ে 'খুদ্দামুল ফুরকান' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। মাওলানা ইসমাইল মুজাদ্দিদি এই দলের প্রধান সাব্যস্ত হন। নাসরুল্লাহ মানসুর ছিলেন ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে কেন্দ্রীয় নায়িবে আমির নিযুক্ত করা হয়। তখন ছিল জহির শাহর যুগ। ওই সময়ই তিনি জেল-জুলুমের শিকার হন।

তারাকির যুগে তিনি 'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি' নামের সম্মিলিত প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে কর্মতৎপর থাকেন। কিন্তু দ্রুতই দলটি ভাঙনের শিকার হয়। পৃথক হওয়া নেতারা প্রায় সবাই ভিন্ন ভিন্ন দল গড়ে নেন। আফগানিস্তানের আলিমসমাজ ওই জিহাদি নেতারাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালে 'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি'র দুই কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি ও মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুরের মধ্যে ওই ঐক্যেফ্রন্টে যোগদানের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়। নাসরুল্লাহ মানসুর ঐক্যফ্রন্টে যোগ দেওয়ার পক্ষে থাকলেও মাওলানা নবি মুহাম্মাদি এর বিরুদ্ধে ছিলেন। এমতাবস্থায় আন্দোলনকারী শুরা-সদস্যরা মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুরকে আমির নির্বাচন করে ঐক্যফ্রন্টে যোগদান করেন। আর এভাবেই 'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি' (নাসরুল্লাহ গ্রুপ) অস্থিত্বে আসে। আর মাওলানা নবি মুহাম্মাদি (মুহাম্মাদি গ্রুপ) নামে পৃথকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। নাসরুল্লাহ মানসুর বেশ কিছুদিন ঐক্যফ্রন্টের মুজাহিদদের নিয়ে জিহাদের মাঠে সক্রিয় কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু বহির্বিশ্বের সাহায্যের প্রশ্ন এবং নিরাপত্তাজনিত কারণ তাদের দলে পুনরায় ভাঙন নিয়ে আসে। এ দিকে মাওলানা নবি মুহাম্মাদি পুনরায় ওই ঐক্যজোটে যোগদান করেন।

শেষপর্যন্ত মাওলানা মানসুর তাঁর দল নিয়ে আলাদাভাবেই জিহাদি তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। পাকতিয়া প্রদেশের আশপাশে তাঁর দলের আধিপত্য ছিল খুবই অটুট। জিহাদের শেষ দিকে তিনি এক বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

শীর্ষস্থানীয় কজন কমান্ডার

মাওলানা আরসালান খান রাহমানি

এই বিখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডার পাকতিকা প্রদেশের ওরগুন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের নাম ছিল খালিক দাদ বাবা কুলি। জীবনের ১৭টি বছর দীনি শিক্ষার্জনে এবং ১৫ বছর অধ্যাপনায় কাটিয়ে দেওয়ার পর জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে তাফসির, হাদিসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে উসতাজুল আসাতিজা হিসেবে গণ্য করা হতো। তারাকির যুগেই তিনি মাওলানা শায়খ ইসমাইল মুজাদ্দিদির দল খুদ্দামুল ফুরকানে যোগ

দেন। তিনি ওই দলের গুরুত্বপূর্ণ ও কর্মতৎপর একজন দায়িত্বশীল ছিলেন।

খুদ্দামুল ফুরকান ভেঙে যাওয়ার পর মাওলানা আরসালান খান রাহমানি হরকতে ইনকিলাবে ইসলামিতে যোগ দেন। এরপর পার্টিগুলোর ভাঙাগড়ার পর্যায় শেষে তিনি প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফের দল ইত্তিহাদে ইসলামিতে যোগ দিয়ে জিহাদি কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন।

মাওলানার জন্মস্থান ওরগুনই ছিল তাঁর কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্র। তিনবার গ্রেপ্তার হলেও একবারও শত্রুরা তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। প্রতিবারই কোনো-না-কোনোভাবে পালিয়ে আসতে সমর্থ হন। রুশরা তাঁকে 'মানুষখেকো' নামে ডাকত এবং তাঁর নাম শুনলেই ভয়ে তারা থরথর করে কেঁপে উঠত।

কমান্ডার সাইদুর রাহমান

কমান্ডার সাইদুর রাহমানের জন্ম ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন হেকমতিয়ারের সমগোত্রীয়। পরে তাঁর দলের শীর্ষ কমান্ডার হয়ে ওঠেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করার সময় ছাত্র-আন্দোলন নওজোয়ানানে ইসলামে যুক্ত হন। তারাকির যুগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে কমিউনিস্ট আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে দেয়। তাঁকে যখন ফাঁসির কাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশ্য করে ইসলাম এবং দেশ ও জাতির ইজ্জতের দোহাই-সংবলিত হৃদয়কাড়া কিছু কথা শোনাতে থাকেন তিনি। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা আবেগপূর্ণ কথাগুলো ওদের অন্তরে দারুণ রেখাপাত করে, ফলে তারা তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। তিনি তখন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পারাচাতারের পথ ধরে পাকিস্তান এসে পৌঁছান।

এ পর্যায়ে তিনি হিজবে ইসলামি সংগঠনে যোগ দেন। তাঁর যোগ্যতাদৃষ্টে দ্রুতই তাঁকে লোগার, কুনার, গজনি ও ওয়ারদাক প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। একাধিকবার তিনি এমন অবরোধের ভেতর পড়েছিলেন, যখন সঙ্গীরা তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু দেখা যেত কীভাবে যেন অবরোধ ভেঙে তিনি পালিয়ে আসতেন। একবার এক অবরোধ ভেঙে পাশের মসজিদে উপস্থিত হলে দেখতে পান, সেখানে লোকজন তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করছে। যৌবনেই তাঁর চুল-দাড়ি পেকে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, এত সাথি ও মুজাহিদকে নিজ হাতে কবর দিয়েছি! তারপর কীভাবে এই চুল কালো থাকতে পারে?

মৌলবি জান মুহাম্মাদ

শুধু আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব আর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহেই নয়; বরং

উত্তরাঞ্চলেও শীর্ষ কমান্ডাররা কমিউনিস্ট ও সোভিয়েতবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই কমান্ডারদের মধ্যে মৌলবি জান মুহাম্মাদ ছিলেন সমুজ্জ্বল একটি নাম। আফগানিস্তানের একেবারে উত্তরে পৃথিবীর ছাদখ্যাত পামির মালভূমির সঙ্গে সংযুক্ত প্রদেশই ছিল তাঁর জিহাদি কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল। তিনি ছিলেন বাদাখশানের ফায়জাবাদের তহশিল ইয়াফতিলের অন্তর্গত ফজলখা গ্রামের অধিবাসী। জাতিতে ছিলেন তাজিক। তাখার ও বাগলানের প্রাচীন ধাঁচের দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। কাবুলের কিল্লা 'জাওয়াদ' ও বাদাখশানের 'খিরকায়ে মুবারক' মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। লাল বিপ্লব শুরু হলে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে যথারীতি জিহাদ শুরু করে দেন। হিজবে ইসলামি ইউনুস খালিস গ্রুপে সক্রিয় ছিলেন তিনি। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে কুহে গাজিয়ানে (পূর্বনাম কুহে জারওয়ান) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে শত্রুদের শক্তিশালী উকাব শাহিন ছাউনি দখল করে নেন। বাদাখশানের রাজপথে প্রতিপক্ষের কনভয়গুলো নিয়তই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতো। তাঁর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদরা রুশ-অধিকৃত মুসলিম রাজ্যসমূহে প্রবেশ করে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কমান্ডার আবদুল বাসির

আবদুল বাসিরও ছিলেন বাদাখশানের অধিবাসী। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফায়জাবাদে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে লাল বিপ্লবের বিরুদ্ধে শিক্ষক-ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করা শুরু করেন আবদুল বাসির। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ফায়জাবাদস্থ শত্রুদের হেডকোয়ার্টার দখল করে তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলেন। ওই বছর পেশোয়ার এসে বুরহানুদ্দিন রাব্বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর দলের খ্যাতিমান কমান্ডার হিসেবে পুনরায় উত্তর-আফগানিস্তানে গিয়ে জিহাদি তৎপতায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

মৌলবি দাওলাতুল্লাহ

তিনি বাদাখশান প্রদেশের দোরাজ সাবডিভিশনের অন্তর্গত আমু দরিয়ার তীরবর্তী জুয়ি গ্রামে বসবাস করতেন। তারাকির যুগেই নদীর পাড়ে 'মুআসকার দিলাওর শহিদ' নামে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখান থেকে আমু হয়ে চলাচলকারী রুশ-নৌযানগুলো টার্গেট করতেন। রুশদের অস্ত্রবাহী নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া ছিল তাঁদের সখের নেশা। তিনি রাশিয়ার ভেতরেও আক্রমণ পরিচালনা করতেন। রুশ-অধিকৃত মুসলিম রাজ্যসমূহে গ্রন্থ ও অস্ত্র সরবরাহের গুরুদায়িত্ব আনজাম দিতেন মৌলবি দাওলাতুল্লাহ।

মাওলানা নিজামুদ্দিন হাক্কানি

মাওলানার জন্ম ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি আফগানিস্তানে অর্জন করে উচ্চশিক্ষার জন্য পাকিস্তানের আকুড়া খটকের দারুল উলুম হাক্কানিয়াতে চলে আসেন। শিক্ষার্জন শেষে দীর্ঘ ১৭ বছর পাঠদানে রত থাকেন। তখন তিনি একাগ্রচিত্তে জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। জহির শাহর যুগে যখন এক কমিউনিস্ট জনসমাবেশে লেনিনের নামে দুরুদ পাঠ করে, তখন তিনি জনসমক্ষে চলে আসেন। ঘৃণ্য এই কাজের প্রতিবাদে রাজপথে বেরিয়ে আসেন আলিমসমাজ।

মাওলানা নিজামুদ্দিন হাক্কানিই ছিলেন ওই আন্দোলনের প্রাণশক্তি। তাঁরই প্রেরণায় ছয় মাস যাবৎ পাকতিয়ায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। কমিউনিস্টদের জ্বালাতন সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে সপরিবারে পাকিস্তান হিজরত করেন তিনি। পরিবার-পরিজনকে সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে নিজে দেশে ফিরে জিহাদে সক্রিয় হয়ে ওঠেন আবার। এ পর্যায়ে তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির ডান হাতে পরিণত হন। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর নায়িব হিসেবেই জিহাদে সক্রিয় থাকেন।

তারাকির সময়ে তিনি পাকতিয়া প্রদেশের 'মাজারি কেস' নামের বিখ্যাত যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তখন তাঁর ভাই আবদুস সালামকে জেলখানায় নির্যাতন করে শহিদ করা হয়। আরেক ভাই মাওলানা ফাতহুল্লাহ হাক্কানি, যিনি খ্যাতিমান গেরিলা কমান্ডার ছিলেন, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি বড় অপারেশন চলাকালে শহিদ হন। আফগানযুদ্ধে তাঁর পরিবারের প্রায় ১২ জনের মতো সদস্য প্রাণের নাজরানা দেন।

নোট : শুধু ভূমিকাস্বরূপ এই কতিপয় খ্যাতিমান ব্যক্তির আলোচনা করা হলো। নতুবা আফগান জিহাদে এত বেশি কমান্ডার নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাঁদের আলোচনা গ্রন্থটির কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাদ দেওয়া হচ্ছে।

আফগান জিহাদ ও শিয়া দলসমূহ

আফগানিস্তানে শিয়াদের জনগোষ্ঠীর হার প্রায় ১০%। এদের মধ্যে ইমামিয়া ও ইসমাইলিয়ারাও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সাওর বিপ্লবের পর লক্ষাধিক শিয়া ইরান চলে যায়। ফলে ইরানও রুশ আগ্রাসন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যৎ-আফগানিস্তানে শিয়াপ্রভাব ধরে রাখতে ইরানের শিয়া নেতারা এগিয়ে এলে ছোটখাটো কয়েকটি শিয়া দল অস্তিত্বে আসে। পরে এরা 'হিজবে ওয়াহদাত' নামে ঐক্যবদ্ধ হয়। আফগান জিহাদে শিয়া সশস্ত্র গ্রুপের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে ইরানের পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরকে রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করে। ইরান রুশ-বলয়ে থাকায় তারা কার্যত

ওই দলগুলোকে রুশবিরোধী অবস্থানে দাঁড় করাতে বিব্রত ছিল। তবে এই শিয়া সংগঠনগুলো সুন্নি সংগঠনসমূহের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছিল। রুশরা চলে যাওয়ার পর ইরান এদের ময়দানে নিয়ে আসে। তখন তারা এদেরকে সীমাহীন অস্ত্রসহায়তা দেয়। এ ছাড়া নতুন সরকারে তাদের কৃতিত্বের অধিক আসন দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এসব আলোচনা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে শুধু এটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, আফগান জিহাদের ভরা মৌসুম ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত চলমান ছিল, তখন কিন্তু ইরানপন্থি এই শিয়াদের কোনো কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি। মূল কাজ তাঁরাই পরিচালনা করে আসছিলেন, আমরা এতক্ষণ যাঁদের পরিচয় দিয়ে এসেছি।

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান কি কাহানি, হাকায়িক কি জুবানি,* ড. মুফাক্কির আহমাদ।

২. *আফগানিস্তান, এক কওম কা আলমিয়া,* আহমাদ শুজা পাশা।

৩. *উর্দু ডাইজেস্ট, জিহাদে আফগানিস্তান,* এপ্রিল ১৯৮৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যা।

৪. *তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান,* ড. এইচ বি খান।

২৬ তম অধ্যায়

আগুন, ইবরাহিমের সন্তান ও নমরুদ

১৯৮০ আফগান মুজাহিদদের প্রতিশোধের নেশা

ইতিহাস নাকি প্রত্যাবৃত্ত হয়। আফগান মুজাহিদরা মৌলবি ইউনুস খালিস, মৌলবি নবি মুহাম্মাদি, গুলবুদিন হেকমতিয়ার, আহমাদশাহ মাসউদ, আবদুর রব রাসুল সাইয়াফের মতো পোড়খাওয়া মুজাহিদ নেতাদের কমান্ডে একত্র হচ্ছিলেন। এই মুজাহিদ নেতারা দাউদ ও তারাকি যুগে জিহাদের মাঠ সমতল করে নিয়েছিলেন। প্রায় তিন বছর ধরে যুবকদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিলেন তাঁরা। আফগানরা জন্মগতভাবেই হয়ে থাকে কষ্টসহিষ্ণু ও কঠিনপ্রাণ। তাদের প্রত্যেকে কিছুটা হলেও অস্ত্রচালনা জেনে থাকে। তাই গেরিলা প্রশিক্ষণে তাদের বেশি সময় দিতে হয়নি। রুশ আগ্রাসনের সময় মুজাহিদ নেতাদের থেকে প্রশিক্ষণগ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তাঁরা পুরো আফগানিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য-আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে।

নেতাদের একতা

আফগান জিহাদের প্রারম্ভিক যুগে মুজাহিদ নেতাদের পরস্পরের সঙ্গে কার্যকর কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকায় রাশিয়ার লাল ভল্লুকদের মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে জনশক্তি মোটেও কম ছিল না। অভাব ছিল নিয়ম-শৃঙ্খলার। অভাব ছিল সেসব অত্যাধুনিক অস্ত্রের, যেসব অস্ত্র দিয়ে কমিউনিস্ট ও সোভিয়েতবাহিনী সজ্জিত ছিল। রুশদের হস্তক্ষেপের আগে মুজাহিদদের শিবিরে আঞ্চলিক ও জাতিগত দ্বন্দ্বও বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া তাঁদের কমান্ডাররা সাধারণত পরস্পর আস্থাশীলও ছিলেন না। বড় বড় নেতা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কাবোধ করছিলেন। তাই যেভাবে দ্রুতগতিতে মুজাহিদ সংগঠনগুলো গড়ে উঠত, কিছুদিন যেতে না-যেতে তেমনি দ্রুতগতিতে হারিয়েও যেত। এই অবস্থার কিঞ্চিত বিবরণ মুজাহিদ নেতাদের জীবনালোচনায়ও উঠে এসেছে।

এমতাবস্থায় মুজাহিদ নেতাদের সংগঠিত হওয়াই ছিল সময়ের সবচেয়ে বড় চাহিদা। অন্যথায় বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাঁদের কার্যকারী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মুজাহিদ নেতারাও দ্রুত ঐক্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সুতরাং রুশদের অনুপ্রবেশের মাত্র এক মাস পর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি কতিপয় জিহাদি সংগঠনের ঐক্য ঘটে। প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানিকে সুপ্রিম কাউন্সিল জোটের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আর অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রে সৌদি আরব ছিল সবার শীর্ষে। খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ খালিদ মুজাহিদ নেতাদের এই ঐক্যকে মোবারকবাদ জানিয়ে উপহারস্বরূপ তাঁদের জন্য ২৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেন।

শক্তিশালী প্রতিরোধ

এর পরপরই আফগানিস্তানে রুশবিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি মুজাহিদরা জালালাবাদ বিমানবন্দর ধ্বংস করে দেন। ১০ মার্চ রক্তাক্ত লড়াই শেষে মুজাহিদবাহিনী কাবুল-তুরখাম রাজপথ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। ওই যুদ্ধে শত শত রুশ সেনা মারা যায়। ১১ এপ্রিল মুজাহিদরা নাঙ্গাহার প্রদেশে প্রায় ১০০ রুশ সেনাকে হত্যা করেন। তবে রুশদের জবাবি বিমানহামলায় বেশ কজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। কাবুলের আশপাশও মুজাহিদদের গেরিলা কার্যক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ২৪ মে তাঁরা কাবুলের পার্শ্ববর্তী অস্ত্র ও গোলাবারুদের বড় একটি ডিপোতে আগুন লাগিয়ে তা ধ্বংস করে দেন। এদিকে কান্দাহারে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে মুজাহিদবাহিনী ৩০০ রুশ সেনাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। ৯ জুন হেরাতে কঠিন যুদ্ধ চলাকালে ৮৭৪ রুশ সেনা নিহত হয়। মুজাহিদদের বড় একটি দল গেরিলা তৎপরতা চালাতে কাবুলে ঢুকে পড়ে। তখন প্রথমবারের মতো রুশ অফিসাররা অনুভব করতে পারে—কাবুলে তাদের আধিপত্য তেমন একটা মজবুত নয়।

ওই গেরিলাদল কাবুলে পৌঁছার পরদিনই ১০ হাজার সোভিয়েত সেনা কাবুলে এসে শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করে। তারপরও কাবুল মুজাহিদদের ভয়ে কাঁপছিল। গ্রীষ্ম-মৌসুম শুরু হতেই পাগমান ও হেরাত কঠিন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। হেরাতে অবস্থিত কারমাল সরকারের প্রশাসন দুই মাসের মধ্যেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়। ওদিকে পাগমানও মুজাহিদদের কর্তৃত্বে চলে আসে। রাশিয়ার কাঠপুতুল কারমাল সরকার এ ঘটনায় এতটাই হতাশ ও দিশেহারা হয়ে ওঠে যে, সে ১৮ জুন আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। তাকে এই প্রয়াস থেকে বাঁচাতে গিয়ে এক নিরাপত্তারক্ষীসহ দুই সেনা আহত হয়।

আরও রুশ সেনা তলব

খোদ সোভিয়েত প্রশাসন মুজাহিদদের এই অস্বাভাবিক প্রতিরোধ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। জুলাইয়ে মুজাহিদদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে তারা ৬৫ হাজার সেনা-সংবলিত অতিরিক্ত ১৫ ডিভিশন সেনা আফগানিস্তানে ডেকে পাঠায়। এ ছাড়া আগস্টের শেষ দিকে অতিরিক্ত আরও ১৬ হাজার সেনা তলব করে। এভাবে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাসংখ্যা ১ লাখের মতো হয়ে যায়। অথচ কারমাল বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে রাখার গরজে বলে যাচ্ছিল—আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাত্র ১০ হাজার সেনা রয়েছে।

কারমাল নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই সে গ্রীষ্ম-মৌসুমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কনফারেন্সে যোগ দেয়নি। তার সেনারা তার সঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছিল। রুশবাহিনীর পাশব অত্যাচার আফগান জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছিল। একদিন রুশ সেনারা ছয় আফগান শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে তাদের সঙ্গে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। দৃশ্যটি রাইফেলধারী এক আফগান সেনা সহ্য করতে পারেনি। সে তখন গুলি চালিয়ে ওখানেই পশুপ্রকৃতির চার সেনাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। এরপর রুশ সেনাদের প্রতিশোধ থেকে মুক্তি পেতে নিজেই আত্মহত্যা করে।

৯ মার্চ ১৯৮০ সংবাদমাধ্যমে এই বিস্ফোরক সংবাদ বেরোয়, ইতিমধ্যে ৬০ হাজার আফগান সেনা মুজাহিদদের দলে যোগ দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে পাঞ্জশির উপত্যকায় হামলা চালানোকালে ১ হাজার আফগান সেনা দল ছেড়ে মুজাহিদ শিবিরে চলে আসে। ৬ অক্টোবর রুশ সেনারা দলত্যাগের প্রচেষ্টারত শতাধিক আফগান সেনাকে গুলি করে হত্যা করে। আফগান সেনাদের ছুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের যোগাযোগব্যবস্থা এবং চিঠি পাঠানোর ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে আফগান সেনাসংখ্যা কমতে কমতে মাত্র ৫০ হাজারে এসে টেকে।

রুশরা মধ্য-এশিয়ার হাজার হাজার মুসলিমকে আমেরিকা ও চীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধোঁকা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। এ ধরনের অধিকাংশ সেনার কাছে বাস্তবতা প্রকাশ পাওয়ামাত্রই তারা মুজাহিদদের শিবিরে চলে আসত। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাশিয়া মধ্য-এশিয়ার সকল মুসলিম সেনাকে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়।

আফগান মুজাহিদদের সহায়তা

রাশিয়াবিরোধী যুদ্ধের শুরুর ওই সময়ে মুজাহিদদের জন্য আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, খাদ্য, রসদ ও প্রয়োজনীয় খরচপাতির অভাব ছিল খুবই প্রকট। এ ছাড়া লাখ লাখ আফগান

সাধারণ জনতা হিজরত করে পাকিস্তান ও ইরানমুখী হচ্ছিল। পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোতে মুহাজিরসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০ লাখেরও বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর ভরণপোষণের জন্য বড় ধরনের সহায়তার প্রয়োজন ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তখন এদের জন্য সরকারিভাবে সাহায্যফান্ড গঠন করেন, যা খুবই উপকারী বিবেচিত হয়। ১১ মার্চ ১৯৮০ ফান্ড গঠিত হলে তাতে ২০ লাখ রুপি জমা পড়ে। নভেম্বরে এই সংখ্যা ২৬ কোটি রুপি ছাড়িয়ে যায়। মাজলুম আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ প্রাণখোলা সাহায্য-সহায়তা করে যায়। আরবরা ছিল এ ক্ষেত্রে শীর্ষে। সাইয়িদ হাসান নামের এক সৌদি ব্যবসায়ী একাই সাহায্যস্বরূপ ২০ লাখ আটার বস্তা পাঠিয়ে দেন।

রাশিয়া কর্তৃক পাকিস্তানকে হুমকি

পাকিস্তানের এ নীতিদৃষ্টে রাশিয়া প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরের শরুতে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের তার সমপদের মন্ত্রী আগা শাহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পরে জিয়াউল হক এ বিষয়টি প্রকাশ করেন, রাশিয়া আমাদের 'ঠিক করার' হুমকি দিচ্ছিল।

রাশিয়া সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও পাকিস্তানকে সতর্ক করে। এক বছরের মধ্যে ২০ দফা রুশ যুদ্ধবিমান পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। রাশিয়া মুজাহিদদের কাফেলাগুলোর নিরাপদে পাকিস্তান পৌঁছার পথ রুদ্ধ করতে পাক-আফগান সীমান্তে নির্বিচারে মাইনের জাল বিছাতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকে একদিকে আফগানসমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, অপরদিকে প্রায় সব রাজনৈতিক দল তাঁর বিরুদ্ধ-অবস্থানে ছিল। সাবেক শাসকদল পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর স্ত্রী বেগম নুসরাত ভুট্টো প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছিলেন, 'আমরা আফগান বিদ্রোহীদের আমাদের দেশে ঠাঁই নেওয়ার অনুমতি দেবো না।' ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল নুসরাত ভুট্টো প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আফগান-নীতির সমালোচনা করে বলেন, 'আমরা কাবুলে কারমালের সরকারকে সমর্থন করি।'

জেনারেল এসেম্বলিতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের ভাষণ

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর অবস্থানে অটল ছিলেন। তিনি ১ অক্টোবর ১৯৮০ সম্মিলিত জেনারেল এসেম্বলির বৈঠক ডেকে আফগানিস্তানের অরাজক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান প্রকাশপূর্বক বলেন, 'আফগানিস্তানের প্রতিরোধযুদ্ধ আত্মমর্যাদাশীল একটি জাতির স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। এই জাতি কখনো কোনো বহিরাগত শক্তির আধিপত্য মেনে নেয়নি।'

তিনি তাঁর ভাষণে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিঃশর্ত সেনাপ্রত্যাহার এবং আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

মস্কোয় অলিম্পিক বয়কট

আফগানিস্তানে রুশ হামলাকে বিশ্বজুড়ে সন্দেহ ও শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছিল। এই বাস্তবতা তখন সামনে চলে আসে, যখন ২৭টি দেশ মস্কোয় আয়োজিত অলিম্পিক গেমস বয়কটের ঘোষণা দেয়। দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, মরক্কো, বাহরাইন, সুদান, মালয়েশিয়ার মতো মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়াও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, হল্যান্ড, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড আর চিলিও ছিল। আগস্টের শুরুর দিকে যখন মস্কো অলিম্পিক গেমস শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন বয়কটকারী দেশের সংখ্যা ৬০-এ উন্নীত হয়। এই বয়কট গতিশীল করতে আমেরিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

বিশ্বপরিসরে আফগান মুজাহিদদের সাহায্যের আবেগ

সৌদি আরব আফগান মুজাহিদদের সহায়তার জন্য রিয়াদে একটি বিশেষ ফান্ড গঠন করে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে ওই ফান্ডে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি রিয়াল জমা হয়। বহির্বিশ্বে অবস্থানরত আফগান জনগণও বিশ্বজনমত তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তেহরানে অবস্থিত আফগান শিক্ষার্থীরা আফগান দূতাবাস দখল করে দেশমুক্তির জন্য যুদ্ধ চালানোর সংকল্প ব্যক্ত করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইতালির রাজধানী রোমে নির্বাসিত জীবনযাপনকারী আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জহির শাহ ফ্রান্সের একটি সংবাদমাধ্যমেকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে পাশ্চমাশক্তির কাছে আবেদন রাখেন, তারা যেন রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করেন। অপর এক বিবৃতিতে জহির শাহ বলেন, 'আফগানরা শুধু বেঁচে থাকার অধিকার চাইছে। বিশ্ববাসীর অন্তর যেন তাদের অসহায়ত্ব অনুভব করে।'

ভারতীয় মুসলিমরাও আফগানিস্তানে রুশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। খোদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি আফগানিস্তানের অরাজক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত কঠিন আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এর ফলে দুই পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পরার আশঙ্কা জন্ম নিয়েছে।' ভারতের বিখ্যাত আলিম সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহ. শাহ ফায়সাল এওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ আফগান মুহাজিরদের জন্য গঠিত ফান্ডে জমা দিয়ে দেন।

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে মক্কায় ৩৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের নেতা ও প্রতিনিধিদের এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই উপলক্ষ্যে তায়েফ থেকে মক্কা পর্যন্ত কার-এর দীর্ঘ

সারি দেখা যাচ্ছিল। সম্মেলনে শাহ খালিদ তাঁর স্মরণীয় ভাষণে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সামনে আবেদন রাখেন, তাঁরা যেন আল-কুদস ও আফগানিস্তান মুক্ত করতে একজোট হয়ে কাজ করেন।

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ও ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর কঠিন শীতমৌসুমেও রাশিয়াবিরোধী জিহাদ অব্যাহত থাকে। ২৯ অক্টোবর মুজাহিদরা এক যুদ্ধে কিউবার ২ জেনারেলসহ ১১৭ রুশ সেনাকে হত্যা করেন। দুদিন পর মুজাহিদরা জালালাবাদ বিমানবন্দরে হামলা চালিয়ে তিনটি ট্যাংক এবং দুটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেন।

আফগান সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস

রাশিয়া আফগানিস্তানের ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রাচীণ ইসলামি নিদর্শন ধ্বংস করে চলছিল। কতই-না দুঃখজনক ব্যাপার ছিল যে, রুশবাহিনী কাবুলে আসার মাত্র ১০ দিন পর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি গজনির ইসলামের বাহাদুর, জগৎখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গজনবি রাহ.-এর কবর ধ্বংস করে দেয়। এরপর মাত্র এক বছরের মধ্যে আফগানিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। শিক্ষাকারিকুলাম থেকে দীনিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস বাদ দিয়ে লেনিন ও মার্কসের জীবনবৃত্তান্ত এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করে। মেধাবি আফগান শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে মস্কোয় পাঠিয়ে দিতে থাকে। যারা যেতে অনাগ্রহী ছিল তাদের জোরপূর্বক পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে এদের মাইন্ড ওয়াশ করে কমিউনিজমের প্রচারক বানিয়ে নেওয়া হতো।

পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী আফগান শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন অফিসার শাহবাজ ওজিরজাইয়ের বর্ণনা মোতাবেক—আফগানিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুজাহিদদের দলে যোগ দিয়েছিল। আর রুশ সেনারা কমিউনিজমবিরোধী ছাত্র-শিক্ষক এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিদের একজন একজন করে টার্গেট করে হত্যা করছিল।

'ওয়াখান'-কে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তিকরণ

পাকিস্তান ও রাশিয়াকে পৃথককারী সরু করিডোর 'ওয়াখান' ভৌগোলিক দিক থেকে ছিল সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ। জায়গাটি একইসঙ্গে পাকিস্তান, চীন, মধ্য-এশিয়ার সোভিয়েত রাজ্যসমূহ এবং আফগানিস্তানের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ব্রিটিশরা সীমান্ত নির্ধারণের সময় ভূখণ্ডটিকে প্রথম প্রতিরক্ষা বেল্ট হিসেবে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে যায়, যাতে হিন্দুস্থান সীমান্ত সরাসরি রাশিয়ার সীমান্তের সঙ্গে মিলিত না হয়; আর রুশ আগ্রাসন থেকে নিরাপদ থাকে। ভারত-ভাগের পর এই ভূখণ্ড পাকিস্তানকে

রুশ হামলা থেকে নিরাপদ রাখার এবং পাক-চীন সীমান্ত কাছাকাছি হওয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠে। এখন যেহেতু রাশিয়া আফগানিস্তান বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থান সহ্য করতে পারছিল না, তাই তার সীমান্তকে সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে পাকিস্তানকে সর্বক্ষণ হুমকিতে রাখতে 'ওয়াখান' দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ড্রামামঞ্চ সাজাতে আফগানিস্তানের কাঠপুতুল প্রেসিডেন্ট কারমালকে মধ্য-অক্টোবরে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে কারমাল আফগানিস্তানকে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ 'ওয়াখান' ভূখণ্ডটি রাশিয়াকে উপহার দেওয়ার ঘোষণা করে।

এরপর ৫ নভেম্বর ১৯৮০ 'ওয়াখান' যথারীতি সোভিয়েতের অংশে পরিণত হয়। ফলে রাশিয়ার সীমান্ত পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে যায়। এখন রাশিয়া তাই যখন ইচ্ছা আফগানভূমি ব্যবহার না করেই সরাসরি পাকিস্তানে হামলার সুযোগ পেয়ে যায়। রাশিয়ার এই পদক্ষেপ ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের জন্য সরাসরি হুমকি। এ যেন ছিল 'আমরা তোমাকে ঠিক করে নেব' বাস্তবায়নের প্রথম দৃশ্য। রাশিয়ার এই পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তানসহ ওই এলাকায় প্রবল রুশভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রেজনেভের ভারত সফর

এর পাশাপাশি রাশিয়া তার বিশ্বস্ত বন্ধু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক অধিক ঝালিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে তার অবস্থানের সহায়কশক্তি বানানোর এবং পাকিস্তানকে চাপে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ নিজে ভারত সফর করে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সে ভারতে আসে। ব্রেজনেভ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে এই পর্যন্ত মানিয়ে নেয় যে, মিসেস গান্ধি ৯ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই হাস্যকর বিবৃতি দিতে বাধ্য হন—'আফগান সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চিক-চিৎকার রাশিয়াকে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশে বাধ্য করেছে।'

সোভিয়েত ও মার্কিন ব্লক

আফগানিস্তানে রুশ হামলার যুগে পুরো বিশ্ব রুশ-মার্কিন দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুই সুপার পাওয়ারই বিশ্বেজুড়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। রাশিয়া ছিল কমিউনিজমের প্রবক্তা এবং বিশ্বে নাস্তিক্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। মধ্য-এশিয়ায় তারা কমিউনিজমবাদ প্রতিষ্ঠায় বিশাল সফলতা অর্জন করে নিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার পর আফগানিস্তানকেও হজম করতে চাচ্ছিল। পক্ষান্তরে আমেরিকা ছিল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রবক্তা। বিশ্বজুড়ে তাদের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তির খুব প্রভাব ছিল।

বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ছিল মার্কিন ব্লকে, অনেকে ছিল রাশিয়ার ব্লকে। উপমহাদেশে পাকিস্তান ছিল মার্কিন ব্লকের সদস্য, ভারত ছিল রুশ ব্লকের। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ছিল রাশিয়ার পক্ষে, ইরাক ছিল আমেরিকার। সৌদি আরব, জর্দান ও বাহরাইন ছিল আমেরিকান, আর সিরিয়া ছিল রুশ ব্লকে।

আমেরিকার আশঙ্কা

রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সফল কূটনীতির দিক দিয়ে পরাশক্তি দুটোর মধ্যে তখন আমেরিকাকে কিছুটা অগ্রসর দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তার পরও রাশিয়ার মাত্রাহীন সামরিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শঙ্কিত দেখা যাচ্ছিল খোদ আমেরিকাকেও। তাই রুশবাহিনী আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করলে একে আমেরিকার স্বার্থের জন্য শঙ্কাজনক মনে করা হতে থাকে। কারণ, এশিয়ার যেসব দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্লকে, যারা ভবিষ্যতে তাদের কলোনির কাজ দিতে পারার সম্ভাবনা রাখত, এরা রুশ-ভয়ে আমেরিকার ব্লক ছেড়ে চলে গেলে আমেরিকা এশিয়া থেকে যেসব সুবিধা ভোগ করছিল, কেবল সেগুলোই হারাবে না; বরং বিশ্বমঞ্চে তারা চীন ও ব্রিটেনের মতো দ্বিতীয়সারির শক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। সুপার পাওয়ারের তকমা তখন শুধু রাশিয়ার জন্যই বরাদ্দ থেকে যাবে। এই অবস্থা আমেরিকার জন্য ছিল সত্যিই দুঃসহ।

ভিয়েতনামযুদ্ধের প্রতিশোধগ্রহণের সুযোগ

ইতিপূর্বে দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছিল। প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে নীচু করে দেখাতে অবলম্বন করে যাচ্ছিল বিস্ময়কর সব কৌশল। তখনো আমেরিকাকে পীড়া দিয়ে যাচ্ছিল ভিয়েতনামযুদ্ধের লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের দগদগে ঘা। ওই যুদ্ধে আমেরিকা ৫ লাখ সেনা মোতায়েন করেছিল। এদের পেছনে তাদের দৈনিক ব্যয় হচ্ছিল ৪০ মিলিয়ন ডলার। এত দুর্মূল্যের যুদ্ধে তারা শুধু রাশিয়ার হস্তক্ষেপের কারণে পরাজিত হয়েছিল। সব দিক থেকেই ভিয়েতনামিদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল রাশিয়া। এখন আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে সে আচরণই করতে চাচ্ছিল। তাই আমেরিকা কংগ্রেস এই ব্যাপারে সম্মত হয়—'মুজাহিদদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সার্বিক সহায়তা দিয়ে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে হবে।' এ লক্ষ্যে রাশিয়ার আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের সময় থেকে তারা এর কঠোর সমালোচনা করতে থাকে। তারা রুশবিরোধী শক্তিগুলোকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কাফেলায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের এই আওয়াজ অল্প হলেও মুজাহিদদের কাজে আসে। আমেরিকা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভবপ্রায় সব ধরনের অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকে। আমেরিকার কৌশল

অনুযায়ী মার্কিন মিডিয়াগুলো চিৎকার জুড়ে বিশ্ববাসীকে আফগানিস্তানে নির্যাতন চালানোর ঝলক দেখিয়ে যাচ্ছিল।

আমেরিকার দ্বিবিধ সংরক্ষণবাদী চিন্তা

তখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাগু রাজনীতিবিদরা মুজাহিদদের সরাসরি সাহায্যের সাহস দেখাতে পারছিল না। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, মুজাহিদরা যে রাশিয়ার মতো পরাশক্তিকে পানি খাওয়াতে পারবে, আমেরিকা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমেরিকার প্রবল ধারণা ছিল, রাশিয়া কয়েক মাসে মুজাহিদদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে আফগানিস্তানে তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নেবে। আমেরিকা কেবল কমিউনিজমবিরোধী আন্দোলনকে সহমর্মিতা জানানোর মাধ্যমে তার ভাবমূর্তি উঁচু করতে বিশ্বের সামনে রাশিয়ার চেহারা কদাকার করে দেখাতেই চাচ্ছিল। কিন্তু সে তাদের হয়ে এমন এক যুদ্ধে জড়াতে মোটেও প্রস্তুত ছিল না, তার দৃষ্টিতে যাদের পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপারমাত্র; যে যুদ্ধজয়ের পর রুশরা আমেরিকার প্রতি আরও বেশি মারমুখো হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, আফগানজাতির এই যুদ্ধ ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অথচ এটা ছিল আমেরিকার আদর্শিক চিন্তাচেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমেরিকা খামাখা কেন এমন এক শক্তিকে বিজয় এনে দেবে, যারা বিজয়ী হলে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে? আর পরাজিত হলে এ পরাজয় তাদেরই পরাজয় বলে গণ্য হবে।

এ কারণেই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা জেবিগ্নিউ ব্রজেনস্কি পাকিস্তান সফরকালে জিয়াউল হকের কাছে একেবারে সীমিত পরিমাণ সাহায্যের প্রস্তাব দিলে জিয়াউল হক তা 'মুখে মিলিয়ে যায় দানা' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ জিহাদের দ্বিতীয় বছর

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদদের রুশবিরোধী জিহাদ দ্বিতীয় বছরে পদর্পণ করলে তাদের কার্যক্রম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে থাকে। তারা 'ওয়াখান'-এ হামলা চালিয়ে ৯০০ রুশ সেনাকে হত্যা করে। মুজাহিদরা প্রাচীন ধারার যোদ্ধাদের মতো অশ্বারোহী হয়ে রুশবাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এক রুশ সেনা তার ডায়েরিতে লেখে,

> মুজাহিদদের অশ্বারোহীবাহিনী আমাদের একেবারে অসহায় ও হতাশ করে ছাড়ত। তারা আমাদের ট্যাংক ও তোপচালক-বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিত।

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রাশিয়া ১২৬টি ট্যাংক এবং হাজার হাজার সেনা নিয়ে পাঞ্জশির উপত্যকায় হামলা চালায়। আহমাদশাহ মাসউদ কয়েকদিনের ভয়ংকর যুদ্ধ

শেষে ওই বাহিনীকে পেছাতে বাধ্য করেন। মুজাহিদবাহিনী তখন কিছু এলাকায় শরয়ি আদালত প্রতিষ্ঠা করে। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ এমন এক আদালতে কতিপয় কমিউনিস্ট নেতাকে হাজির করা হয়। ওরা নারীদের সম্মানহানি করেছিল। অপরাধ প্রমাণিত হলে জনসম্মুখে পাথর ছুড়ে এদের হত্যা করা হয়।

আফগানবাহিনীর অবস্থা

আফগান সরকারি বাহিনীর ভাবমূর্তির চরম অধঃপতন ঘটে। প্রায় ৭০ শতাংশ সেনা সরকারি বাহিনী থেকে পালিয়ে মুজাহিদবাহিনীতে যোগ দেয়। অথবা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। সরকারি বাহিনীতে মাত্র ২৫ হাজারের মতো সেনা থেকে যায়, যারা বিশ্বাসে ছিল কট্টর কমিউস্টি; অথবা বিশেষ কারণে তাদের পক্ষে পালানো সম্ভব ছিল না। পালিয়ে আসা সেনারা সাধারণত তাদের রাইফেল এবং অনেক সময় ট্যাংক আর কামানও সঙ্গে করে নিয়ে আসত। জোরপূর্বক ভর্তি করা সেনাদের বয়স ২১ বছর থেকে নামিয়ে ২০ বছর করা হয়। কিন্তু তাতেও ন্যূনতম ফায়দা হয়নি। এই সেনাদের জন্য প্রশিক্ষণের নিয়মসিদ্ধ কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না। আনকোরা এই সেনারা মুজাহিদদের মুখোমুখি হলে ভয়ে তাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিত। এক পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে দেখা যায়, জবরদস্তিমূলকভাবে ভর্তিকৃত অধিকাংশ সেনা প্রথম যুদ্ধেই দল ছেড়ে মুজাহিদদের শিবিরে চলে আসত।

স্বাধীনতাকামী আফগানদের সহায়তার সিদ্ধান্ত হয় কখন

তবে দু-বছরের অব্যাহত লড়াইয়ের অসংখ্য দৃশ্য যখন শুধু আমেরিকার সামনে নয়; বরং পুরো বিশ্বের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে যে, আফগান মুজাহিদরা হচ্ছে একটি দুর্জয় বাহিনী; রাশিয়ার পক্ষে এদের রোখার সামর্থ্য নেই, তখন বাধ্য হয়েই আমেরিকা মুজাহিদদের ব্যাপারে তাদের আগের অবস্থানে পরিবর্তন আনে। তারা তখন ইতিবাচক চিন্তাভাবনা শুরু করে। এ ছাড়া ততদিনে আমেরিকার ক্ষমতার মঞ্চেও পরিবর্তন চলে এসেছিল। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ক্ষমতাসীন হন। বিগত প্রেসিডেন্টের তুলনায় তাকে মুজাহিদদের ব্যাপারে অনেকটা আগ্রহী দেখা যায়। কেননা, এখন আমেরিকানরা মুজাহিদদের সহায়তার মাধ্যমে রাশিয়া থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে অনেকটা আশাবাদী হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান নিজে পাকিস্তান সফর করেন এবং আফগান শরনার্থী-শিবিরে গিয়ে মুজাহিদদের সাহস জোগান।

মুজাহিদদের মতবিরোধিতার মাধ্যমে সুফল লাভ করা হয়

এ পর্যায়ে মুজাহিদ সংগঠনগুলো যথেষ্ট সাহায্য লাভ করছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে

তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন হামলা বাড়িয়ে তুললে ছয়দলীয় যে জোট গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে যায়। আমেরিকাও চাচ্ছিল না মুজাহিদরা সত্যিকারার্থে কর্মতৎপর হয়ে উঠুক। কারণ, মুজাহিদদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেওয়াই ছিল ভবিষ্যৎ-আফগানিস্তানে ইসলামি সরকার গঠিত না হওয়ার পূর্বশর্ত। মুজাহিদরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমেরিকার জন্য এদের সঙ্গে দরদাম দুরূহ হয়ে যাবে।

আমেরিকা আসলে তখন অনেক কিছু করতে পারত। তখন মুজাহিদরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে বহির্দেশীয় সহায়তা একটি সাধারণ ফান্ডে জমা হতো। ফলে প্রয়োজনে সকল দল সহায়তা নিতে পারত। কিন্তু ঐক্য ভেঙে পড়ায় প্রত্যেক নেতা আলাদা আলাদাভাবে সাহায্য গ্রহণ করছিলেন। তাই তাঁরা সাহায্য নিতে আমেরিকাসহ রুশবিরোধী অন্যান্য পশ্চিমাশক্তির কাছে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে উপযাচক হয়ে সম্পর্কোন্নয়নে বাধ্য হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থানই পরবর্তী সময়ে মুজাহিদদের আত্মত্যাগ সফল হওয়ার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন চলে আসে

মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র আর অর্থসাহায্য পাঠানো শুরু হলে বিস্ময়করভাবে পশ্চিমা মিডিয়ার দৃষ্টিকোণ বদলে যেতে থাকে। আগে মুজাহিদদের কার্যক্রমগুলো রঙিন ব্যানারে শিরোনাম পেলেও এখন তাদের বড় বড় সাফল্যের সংবাদ চিপায় পড়ে থাকছিল। গুরুত্বপূর্ণ অনেক খবর এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পশ্চিমা মিডিয়ার এই প্রতিক্রিয়া এশীয় মিডিয়ায়ও প্রতিফলিত হতে দেখা যেতে থাকে। এখানেও মুজাহিদদের সংবাদগুলোকে আগের মতো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না। অথচ আগের চেয়ে তখন রণক্ষেত্র ছিল খুব গরম এবং কার্যক্রমও ছিল বেশ গতিশীল। তবে সংবাদগুলোর দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল, আফগানযুদ্ধ যেন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নয়। এ নিয়ে পড়ে থাকা যেন সময় অপচয়ের নামান্তর।

পশ্চিমা মিডিয়া ওই সময় আরেকটি কাজ করে। তারা মুজাহিদ নেতাদের পশ্চিমাদের প্রতি নমনীয় ও কট্টর শিরোনামে দুভাগে বিভক্ত করে। এক পক্ষের নাম দেয় মধ্যপন্থি, আরেক পক্ষের নাম দেয় প্রতিক্রিয়াশীল। মধ্যপন্থিরা ছিলেন পশ্চিমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। যাঁরা ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান না, তাঁরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি, আহমাদশাহ মাসউদ এবং পির আহমাদ গিলানিকে প্রথম দলে ঠাঁই দেওয়া হয়। আর মাওলানা ইউনুস খালিস, মৌলবি নবি মুহাম্মাদি আর হেকমতিয়ারের মতো নেতাকে রাখা হয় দ্বিতীয় দলে।

পাকিস্তানি বিমান অপহরণ

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ২ মার্চ পিআইএর একটি বিমান অপহরণের মাধ্যমে আরেকবার পাকিস্তানকে চাপে ফেলার চেষ্টা করা হয়। অপহৃত বিমানটি কাবুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণকারীরা তাদের 'আজ জুল ফাকার' গ্রুপের সদস্য হিসেবে দাবি করে। তারা পণবন্দি যাত্রীদের জীবনের বিনিময়ে ১৯২ জন বন্দির মুক্তির দাবি জানায়। এরা নানারকম মামলায় পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দিজীবন কাটাচ্ছিল। কদিন পর অপহৃত বিমান দামেশকে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদল ও অপহরণকারীদের মধ্যে কয়েকদফা আলোচনার পর অবশেষে ৫৫ জনকে মুক্ত করে দামেশকে পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৫ মার্চ ওই ৫৫ জন বন্দির মুক্তির বিনিময়ে অপহৃত বিমানযাত্রীদের মুক্ত করে নেওয়া হয়।

এই অপহরণের পেছনে রুশ-আফগান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, দেখা যাচ্ছিল—কাবুল বিমানবন্দরে থাকাকালে কাবুলের সেনাবাহিনী অপহরণকারীদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছিল। এ ছাড়া অপহরণকারীরা দাবি করছিল—'পাকিস্তান যেন কারমাল সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।'

BMD সাঁজোয়া যান

আমেরিকা মুজাহিদদের সহায়তা করতে পারে, এই আশঙ্কায় রাশিয়া একটি নতুন মডেলের সাঁজোয়া যান তৈরি করে আফিগানিস্তানে কর্মরত তাদের বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। অস্ত্রটির মডেল ছিল B.M.D। এর উপর ৭২ মিলিমিটার কামান, তিনটি মেশিনগান ও অ্যান্টিট্যাংক মিসাইল মোতায়েন ছিল। সাঁজোয়া যানটি প্রথমে লোগার প্রদেশে ব্যবহার করা হয়। জয়গাটি মুজাহিদদের জন্য সুদৃঢ় ক্যাম্পের গুরুত্ব রাখত। এখানে মৌলবি নবি মুহাম্মাদির ঠিকানা ছিল। কাবুল থেকে দক্ষিণে যাতায়াতকারী প্রতিটি কনভয়ে এখানকার মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার হতো।

অবশেষে রুশরা B.M.D সাঁজোয়া যান দ্বারা লোগারে প্রদেশে হামলা চালায়। কয়েকদিন রক্তাক্ত যুদ্ধ চলতে থাকলেও মুজাহিদদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ফারাহ প্রদেশে মৌলবি নবি মুহাম্মাদির প্রচুর সেচ্ছাসেবী সেনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে ৫ হাজারের বড় একটি বাহিনী পাঠানো হয়। বিমানবাহিনী এদের কোর দিচ্ছিল। মৌলবি নবি মুহাম্মাদির সহকারী মৌলবি মুহাম্মাদশাহ মাত্র ১৫০০ সেনা নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে রুশবাহিনীর মোকাবিলা করেন। লাগাতার ১০ দিন সেখানে যুদ্ধ হয়। মুজাহিদবাহিনী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হলেও কদিন পর তারা আবার ওখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

পাঞ্জশিরে হামলা

রুশবাহিনী পাঞ্জশিরে থেমে থেমে কয়েক দফা হামলা চালায়। আহমাদশাহ মাসউদ কাবুলকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগকারী হাইওয়েসহ সালাং ট্যানেল অনিরাপদ করে তোলেন। রাশিয়া পাঞ্জশিরকে উপেক্ষা করতে পারছিল না। তাই সড়কপথ অনিরাপদ হয়ে উঠলে তারা পাঞ্জশির উপত্যকায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে ছত্রীসেনা নামায়। কিন্তু আহমাদশাহ ১০টি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত করে তাদের পালাতে বাধ্য করেন। তাদের দ্বিতীয় আক্রমণও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর আহমাদশাহ মাসউদ অগ্রাভিযান চালিয়ে বাগরাম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা রাশিয়ার ২২টি বিমান ধ্বংস করে তাদেরকে বড় রকমের একটি ধাক্কা দেন।

গজনি ও কাবুলে যুদ্ধ

গজনিতে কারি তাজ মুহাম্মাদ নামের এক মুজাহিদ একজন স্বাধীন কমান্ডারের ভূমিকায় জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অধীনে ২ হাজার মুজাহিদ কাবুল সরকারের ১৪ ডিভিশন সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। পরে সোভিয়েতের এক ব্রিগেড সেনাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে গজনির প্রতিরোধযুদ্ধ শিথিল হয়ে আসে।

কাবুলের পাশে মাওলানা ইউনুস খালিসের আবদুল হক নামের এক কমান্ডার ভয়াবহ অভিযান শুরু করেছিলেন। শীর্ষ কমিউনিস্ট নেতাদের জাহান্নামে পাঠাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনার ফাঁদে পড়ে তাদের সহকারীপ্রধানকেও অসহায়ের মতো প্রাণ দিতে হয়। ফলে কারমাল সরকার একপ্রকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। আবদুল হকের সঙ্গীরা কাবুল প্রশাসনকে অধিক সন্ত্রস্ত করে তুলতে কাবুলের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়। কাবুলের পার্শ্ববর্তী 'কুহে হাফি' ছিল মৌলবি শফিউল্লাহর কেন্দ্র। তিনি সেখান থেকে কাবুল-জালালাবাদ রাজপথ এবং সরকারি স্থাপনাগুলোকে নিশানা বানাচ্ছিলেন।

'মারসুল' ঘাঁটির লড়াই

উত্তর এলাকায় বলখের কমান্ডার জাবিহুল্লাহকে অত্যন্ত ভয়ানক ব্যক্তি হিসেবে মনে করা হতো। 'মারসুল' ঘাঁটি থেকে মাজার-ই-শরিফে তাঁর হামলা সোভিয়েত লাল ফৌজকে প্রায় বন্দিদশায় ফেলে দিলে জাবিহুল্লাহকে দমাতে তারা মারসুল ঘাঁটিতে বিমানহামলা শুরু করে। এক সপ্তাহ নাগাদ পাহাড়ে বোমাবৃষ্টি চালানো হয়। এরপর যখন তাদের বিশ্বাস জন্মে—এখানে এখন মুজাহিদদের নামগন্ধও নেই, তখন তারা উপত্যকায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু আত্মগোপনে থাকা মুজাহিদবাহিনী তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল। ফলে শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে সোভিয়েতবাহিনীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে

ওঠে। মারসুল ঘাঁটিতে প্রবেশ তো দূরের কথা, জীবন রক্ষাই দরুহ হয়ে পড়ে। অবশেষে বিমান রেসকিউ এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বাঘের বাচ্চা ও তার শিকার

১৯৮১ খিষ্টাব্দে মুজাহিদরা আমেরিকার অস্ত্রসহায়তা পেতে থাকে। অস্ত্র পাঠানোর রুট ছিল পাকিস্তান। প্রথমে তাদের হাতে ভূমিমাইন সরবরাহ করা হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে সরবরাহ করা হয় আরও নানা ধরনের অস্ত্র। মুজাহিদদের হাতে থাকা অস্ত্রগুলো শুধু আমেরিকা নির্মিত অস্ত্রই ছিল না; বরং রুশ নির্মিত অস্ত্রও ছিল। এগুলো ছিল গনিমতস্বরূপ অর্জিত অস্ত্রের বাইরে। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত একপর্যায়ে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি আমেরিকার ইশারায় তাদের অস্ত্রাগার থেকে রুশ নির্মিত অস্ত্রের বড় একটি চালান মুজাহিদদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুজাহিদরা এসব অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ কোত্থেকে অর্জন করতেন? পাকিস্তানকে বারকয়েক এ প্রশ্ন করা হয়। সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর ফজলে হক একবার এমন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাবে বলেছিলেন, 'মাছের বাচ্চাদের সাঁতার কাটা আর বাঘের বাচ্চাদের শিকার করা কে শেখায়?' এর সারাংশ ছিল অস্ত্রচালনার যোগ্যতা, মেধা ও প্রতিভা আফগানজাতির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের এ ব্যাপারে তেমন প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও রাশিয়া মনে করছিল, পাকিস্তান সীমান্ত-এলাকায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলে আফগান মুজাহিদদের অস্ত্রচালনায় দক্ষ করে গড়ে তুলছে। ভূ-কৌশলগত দিকটি বিবেচনায় নিলে রাশিয়ার এমন সন্দেহ পোষণ যথাযথই ছিল।

পাকিস্তানে আইএসআইয়ের তত্ত্বাবধানে ডজনের অধিক কিছু প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল এবং সেখান থেকে হাজার হাজার মুজাহিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তা এতটা গোপনে পরিচালিত হচ্ছিল যে, রাশিয়া কখনো তাদের ওপর এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়েরের মতো প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছিল—আমেরিকা নিজ খরচে মুজাহিদদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। কিন্তু মুজাহিদদের বক্তব্য ছিল; অস্ত্রের যাবতীয় ব্যয়ভার আরবের শায়খরা বহন করছিলেন। আমেরিকা প্রত্যেক চালান অস্ত্রের মূল্য তাদের কাছ থেকেই আদায় করছিল।

মুজাহিদরা মাইন ব্যবহার শুরু করেন

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম যে অস্ত্রসাহায্য এসে পৌঁছুয়, তা ছিল ভূমিমাইন। মুজাহিদরা তাৎক্ষণিক এর ব্যবহার শুরু করেন। রুশ কনভয়গুলোকে তখন আগের থেকে বেশি ক্ষতির শিকার করতে থাকেন। তাদের

চলাচলের পথ এবড়োখেবড়ো করার পাশাপাশি সেতুগুলো উড়িয়ে দিয়ে অগ্রযাত্রা অসম্ভব করে তুলতে থাকেন তাঁরা।

মে মাসে গ্রীষ্মকাল শুরু হতে না-হতেই মুজাহিদরা কঠিনতম হামলা শুরু করেন। ৭ মে তাঁরা জালালাবাদ বিমানবন্দরে একটি বিধ্বংসী হামলা চালিয়ে নয়টি রুশ বিমান এবং পাঁটি ট্যাংক ধ্বংস করেন। এ যুদ্ধে অসংখ্য রুশ-কমিউনিস্ট সেনা নিহত হয়। ওই সময় কান্দাহারেও একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে মুজাহিদরা রুশ-আফগান সেনাবাহিনীর ৭০০ সেনাকে হতাহত করেন। তবে রুশদের জবাবি বিমানহামলায় নিরপরাধ অনেক সাধারণ নাগরিক শাহাদাতবরণ করেন। মুজাহিদদের শক্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা সাময়িকভাবে বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিতেন।

প্রধানমন্ত্রী কুশতামান্দ

এ দিকে কারমাল সরকারের ব্যর্থতা পুরো বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই রুশ সরকার কারমালের বিকল্প খোঁজা শুরু করে। তবে কারমাল যেকোনো মূল্যে তাদের বিশ্বস্ততা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত প্রাথমিক পদক্ষেপস্বরূপ কারমালের অধিকার সীমিত করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্টারি বিষয়গুলো সামাল দিতে নতুন এক কাঠপুতুল দাঁড় করানো হয়। তার নাম ছিল 'সুলতান আলি কুশতামান্দ'। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন তাকে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। কারমাল ও কুশতামান্দ উভয়েই ছিল রুশদের কাঠপুতুল। মূল প্রতিপক্ষ ছিল রুশ ও মুজাহিদবাহিনী। তারাই ছিল পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি।

রাশিয়ার আণবিক বোমা বিস্ফোরণ

আফগান পরিস্থিতি বিশ্বময় রাশিয়ার ক্ষমতার যে দাপট ছিল, তা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তখন মস্কোর কমিউনিস্টরা ভাবছিল, কীভাবে তাদের দাপট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। এদিকে আমেরিকা তখন মুজাহিদদের সহায়তায় প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। রাশিয়ার জন্য তা ছিল সহ্যের বাইরে। মুজাহিদরা মাইন ব্যবহার শুরুর পর রাশিয়া ভূগর্ভে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমেরিকাসহ আফগান মুজাহিদদের সহায়তাকারীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা দেয়।

নাইট্রোজেন বোমা ব্যবহার

এর পাশাপাশি রুশ ভল্লুকরা নাইট্রোজেন বোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৭ মে মুজাহিদদের ঘাঁটিতে হালকা মাত্রার নাইট্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে ওখানে থাকা ১৮ জন

মুজাহিদ শহিদের দেহ পরিচয়-অযোগ্য বিকৃত হয়ে যায়। এই পরীক্ষার পর রাশিয়া ১১ আগস্ট ১৯৮১ প্রথমবারের মতো নাইট্রোজন বোমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যায়। রাশিয়ার এই পাশবিক ধ্বংস-তৎপরতাকে বিশ্ববাসী দুশ্চিন্তার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এমতাবস্থায় দুই পরাশক্তির মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা করতে থাকেন। রাশিয়ার পাল্লাই ভারী দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছিল, রাশিয়ার কাছে ৭৩ লাখ টনের মতো রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে। এই পরিমাণ ছিল আমেরিকার রাসায়নিক অস্ত্রের আট গুণ বেশি।

ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ

রাশিয়া তার ব্লককে শক্তিশালী করে তুলতে আগস্টের শেষ দিকে ভারতকে অত্যাধুনিক ২৫টি যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে। এগুলো ৬০ হাজার ফিট উপর দিয়ে ঘণ্টায় ৮০০ মাইল বেগে ওড়ার সক্ষমতা রাখত। খবরটি সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে রাখে। এ ছাড়া রাশিয়া আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্র অকেজো করার সক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। এ অবস্থায় নতুন ক্ষমতায় আসা প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান একদিকে যেমন রুশ মিসাইল কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করেন, তেমনি রাশিয়া ও ভারতের চাপ মোকাবিলার লক্ষ্যে পাকিস্তানকে এফ ১৬ বোমারু বিমান সরবরাহের অঙ্গীকার করেন। পারমাণবিক মিসাইলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রস্তাবটি রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে খোদ আমেরিকা পাকিস্তানকে এফ ১৬ সরবরাহের ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন ল-এর বেড়াজালে আটকা পড়ে। অথচ পাকিস্তানের জন্য তখন এই বিমান পাওয়া ছিল অপরিহার্য। কেননা, প্রতিসপ্তাহে রুশ-আফগান যুদ্ধবিমান পাকিস্তান সীমান্তে ঢুকে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর পাকিস্তান তা বন্ধ করতে হয়ে পড়েছিল অক্ষম।

পাকিস্তানের সমস্যাবলি

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তান থেকে ৬২ দফা পাক ভূ-সীমান্ত এবং ৩৫ বার আকাশ সীমান্ত লঙ্ঘন করা হয়। দিন দিন এর পরিমাণ বেড়েই চলছিল। শুধু নভেম্বরেই আফগান সীমান্তবাহিনী ২৩ দফা পাকিস্তানের সীমান্ত লঙ্ঘন করে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিবাদে কোনো কান দেওয়া হয়নি। ওই মাসে জেনারেল এসেম্বলিতে পাকিস্তান সরকার আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনাপ্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবটি বিপুলসংখ্যক ভোটে পাশ হয়। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্তানযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানের জন্য এক অনাহূত বিশাল বোঝা। কতিপয় সোর্স ও দেশের পক্ষ থেকে—

'আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জন্য প্রদেয় সাহায্য পাকিস্তান তার অর্থনীতি সবল করতে ব্যয় করছে' প্রচারণাটির আদৌ কোনো সত্যতা ছিল না। বাস্তবতা হচ্ছে, এই যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের লাভের বিষয়টি দূরে থাক, তার দুর্বল অর্থনীতির মাজা ভেঙে যাচ্ছিল।

আফগান মুজাহিদদের সাহায্যফাণ্ডে প্রদত্ত অর্থ দুর্নীতিবাজ কিছু অফিসার তাদের পকেটে ঢোকালেও এতে তাদের ব্যক্তিগত লাভ হচ্ছিল, পাকিস্তান সরকারের কোনো লাভ হচ্ছিল না। তা ছাড়া বহির্দেশীয় যেসব সাহায্য আসছিল, তা আফগান মুহাজিরদের জন্যই যথেষ্ট ছিল না। পাকিস্তানকে বাধ্য হয়ে তাদের নিজস্ব অর্থভান্ডার থেকে খরচ করতে হচ্ছিল। এর পরিমাণও একেবারে ছোট ছিল না। এটা বহির্দেশীয় সাহায্যের সমপরিমাণই ছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল পাকিস্তানের জন্য এক বিশাল পরীক্ষা। এর পেছনে কেবল ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধই কার্যকারী ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, আফগান জিহাদ ছিল পাকিস্তানের অস্তিত্বরক্ষার সঙ্গে অন্তর্ব্যাপ্ত। আর আফগান মুজাহিদবাহিনীর জন্য মুহাজিরদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাই পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই দায়িত্ব আদায় করে যায়। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে পাকিস্তানে আফগান মুহাজিরদের সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এরা একেবারে শূন্য অবস্থায় তাদের পেছনে ১০ লাখ আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়তম জন্মভূমির অসংখ্য ভাই-বেরাদরের লাশ পেছনে রেখে এখানে চলে এসেছিল।

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ : জহির শাহ, অলি খান ও বাচা খান

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আফগান মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয় প্রত্যক্ষ করে বিশ্ববাসীর বিশ্বাস জন্মে যায়—অচিরেই রাশিয়াকে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ-আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান সংহত করতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। আফগানিস্তানের সাবেক শাসক জহির শাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেন, তিনি আফগানিস্তানে পৌঁছে মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মুজাহিদরা তার এই বক্তব্যকে কুটিলতা হিসেবে গণ্য করে। মুজাহিদ নেতা আবদুর রব রাসুল সাইফ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন, 'জহির শাহ দেশে ফিরে এলে মুজাহিদরা তাকে হত্যা করবে।' এদিকে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ আবদুল অলি খান ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল কাবুলে বাবরাক কারমালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পাক-আফগান বিভেদ সমাধানের জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব রাখেন। আর তার পিতা সীমান্ত অঞ্চলের গান্ধি, খান আবদুল গাফফার খান ১৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে মুজাহিদ নেতাদের কাছে আবেদন রাখেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান; যাতে এই সংকট শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়।

জালিম ব্রেজনেভের পরপার যাত্রা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান চাচ্ছিলেন, যেকোনোভাই হোক রাশিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধে হুমকির পাশাপাশি আফগানিস্তানে তাদের আধিপত্য কীভাবে দূর করা যায়। রিগ্যান ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের কাছে এই শর্তে সমঝোতার প্রস্তাব দেন যে, রাশিয়া যেন আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নেয়; কিন্তু রাশিয়ার জবাব ছিল নেতিবাচক। ওই বছরের শেষ দিকে রাশিয়ায় ১৮ বছর শাসনকারী লিওনার্ড ব্রেজনেভ ৭৫ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমায়।

ব্রেজনেভ ছিল চরমপন্থি এক কমিউনিস্ট নেতা। সে আফগানিস্তানে লাখো মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেছে। এর দাগ চিরকাল তার আঁচলে লেগে থাকবে। ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর সোভিয়েত গোপন এজেন্সি কেজিবির নেতা ইউরি আন্দ্রোপভকে প্রথমে পার্টির সেক্রেটারি তারপর রাশিয়ার সুপ্রিম প্রেসিডেন্সি পদে বসানো হয়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে আন্দ্রোপভ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছিল না। তবে কার্যত ব্রেজনেভের স্থলেই ছিল।

আন্দ্রোপভের জুলুমবাজি

আন্দ্রোপভ তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের নীতিই অব্যাহত রাখে। সে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল এক ভাষণে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়—'রাশিয়া আফগানিস্তানের ব্যাপারে সম্পর্কহীন থাকতে পারে না।' সে রিগ্যান কর্তৃক অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। আন্দ্রোপভ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাশিয়ার সেনারা নতুনভাবে আফগান জনতার ওপর অথ্যাচার শুরু করে। রুশ বোমারু বিমানগুলো আরেকবার আফগান গ্রামসমূহে নির্বিচার বোমাবাজি শুরু করে। ফলে হাজার হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধ শহিদ হতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে।

এসব অত্যাচার সাধারণত পাকিস্তান সীমান্তসংলগ্ন আফগান প্রদেশসমূহেই বেশি হচ্ছিল। খুবসম্ভব রাশিয়া চেয়েছিল, সীমান্তসংলগ্ন ওইসব গ্রাম, যেগুলো সাধারণত মুজাহিদদের আশ্রয়ক্যাম্পের ভূমিকা পালন করতে পারে, সেগুলো পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলবে, যাতে মুজাহিদদের থাকা, আত্মগোপন করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়ার ধারা শেষ করে দেওয়া যায়।

রুশ গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো তখন বস্তি এলাকায় ভীতিজাগানিয়া উড্ডয়ন বাড়িয়ে তোলে। হেলিকপ্টারগুলো যেকোনো মুহূর্তে উদয় হয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিত। বিশেষ করে লোগার প্রদেশের অবস্থা ছিল বেশি শোচনীয়।

গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো সাধারণত পাহাড়ি ঘাঁটি ও গভীর উপত্যকা থেকে আচমকা উদয় হতো। স্থানীয় বাসিন্দারা গানশিপগুলোর আওয়াজ তখন টের পেত, যখন সেগুলো একেবারে কাছে এসে পড়ত। দৌড়ঝাঁপ করে মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বড়জোর মিনিটখানেক সময় পেত। এর মধ্যে যারা গর্ত কিংবা সুড়ঙ্গে লাফ দিতে পারত, কেবল তারাই রক্ষা পেত। বাকিরা মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত হয়ে যেত।

রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার

এই গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো কেমিক্যাল অস্ত্রও প্রয়োগ করত। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর (আন্দ্রোপভের ক্ষমতাসীন হওয়ার ১ মাস পর) একজায়গায় তাদের কেমিক্যাল অস্ত্রপ্রয়োগের ফলে ৮৪ জন শহিদ হন। এদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই ছিল বেশি। ফেরার হয়ে মুজাহিদদের দলে যোগ দেওয়া কিশলভ নামের এক রুশ সেনা রুশ লাল ফৌজের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি সত্যায়ন করেন। তিনি বলেন, ঘোরবন্দের এক অপারেশনে আমি নিজ চোখে রুশ সেনাদের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখেছি। রাসায়নিক বোমা যেখানে বিস্ফারিত হতো, সেখানকার মাটি লাল হয়ে যেত।

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদদের জিহাদি তৎপরতা

সোভিয়েতবাহিনীর জুলুম দিন দিন বাড়ছিল। কিন্তু শত জুলুম-নির্যাতন মুজাহিদদের মনোবল ভেঙে দিতে সক্ষম হয়নি। রুশদের পাশব নির্যাতন মুজাহিদদের জিহাদি জজবা বাড়িয়ে দিচ্ছিল কেবল। ১৯৮২-৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। নুরিস্তান থেকে রুশবাহিনীকে বিতাড়িত করে সেখানে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। মৌলবি আফজালকে ওই ইসলামি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে মুজাহিদদের ভাষ্যকার কমান্ডার ফারুক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, 'আফগানিস্তানের ৯৫ শতাংশ এলাকায় মুজাহিদদের আধিপত্য বিদ্যমান।'

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি কাবুলে সোভিয়েত লাল বাহিনীর ৬৫ তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। মুজাহিদরা এর দুদিন আগেই কাবুলের সরকারি বিল্ডিং ও সোভিয়েত লাল ফৌজের দপ্তরে এত বেশি রকেটবৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের জ্বালানির মজুত নিঃশেষ হয়ে যায়। রুশ ও কারমালবাহিনীর অনেক সেনাও নিহত হয়। মে মাসে গুরুত্বপূর্ণ বড় একটি ঘটনা ঘটে। কারমাল সরকারের একটি পুরো সেনা-ইউনিট ৯৭টি ট্যাংক নিয়ে মুজাহিদবাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দেয়। যদিও মুজাহিদরা তাৎক্ষণিক ট্যাংকগুলো দ্বারা কোনো উপকার হাসিল করতে পারছিলেন না; কিন্তু ঘটনাটি কারমাল সরকারের ভাবমূর্তি পুরোপুরি ধূলিসাৎ করতে যথেষ্ট ছিল।

ওই মৌসুমে মুজাহিদরা আমেরিকা থেকে ভারী অস্ত্র পেতে থাকেন। অস্ত্রগুলোর মধ্যে বিমানবিধ্বংসী কামানও ছিল। ইতিপূর্বে মুজাহিদরা রুশ বিমানের বিরুদ্ধে শুধু আমেরিকা নির্মিত 12-7MM মেশিনগানই ব্যবহার করে আসছিলেন, যা নিশ্চিতভাবেই রুশ বিমানের বিপক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বিমানবিধ্বংসী কামান এসে পৌঁছার পর মুজাহিদরা যথাযথভাবে শত্রুবিমানের মোকাবিলার যোগ্যতা অর্জন করেন। এসব অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহারপদ্ধতি শিখতে তাদের কিছুদিন ব্যয় করতে হয়। কিন্তু শিখে নিলে বিশ্ববাসী অবাককরা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকে।

জেনারেল এসম্বলিতে রাশিয়ার সেনাপ্রত্যাহারের রেজুলেশন

এদিকে ১৭ জুন ১৯৮৩ যথারীতি আন্দ্রোপভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের আসনে বসানো হয়। ফলে তার ওপর বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে সেনাপ্রত্যাহারের চাপ বাড়তে থাকে। খোদ তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভারতের ইন্দিরা গান্ধির সরকার সেনাপ্রত্যাহারের পরামর্শ দিচ্ছিল। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে চীন আফগান সমস্যা নিয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। মুসলিমবিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র দাবি করছিল, জাতিসংঘের আইন অনুযায়ী যেন আফগান সমস্যার সমাধান করা হয়। অবশেষে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে বিষয়টি জেনারেল এসেম্বলিতে উত্থাপন করা হয়। দুই মাস পর ২৫ নভেম্বর জেনারেল এসেম্বলি বিপুল ভোটে আফগানিস্তান থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি পাশ করে।

রাশিয়ার গোঁয়ারতুমি

কিন্তু রাশিয়া তখনো গোঁয়ারতুমি দেখিয়েই যাচ্ছিল। যদিও আফগানযুদ্ধ পরিচালনা করতে তাকে দৈনিক ৮ কোটি ডলার পরিমাণের বিপুল অর্থ গচ্ছা দিতে হচ্ছিল, তথাপি সর্বদা বিজয়ী থাকা লাল ভল্লুকদের জন্য অপমানজনক পরাজয় স্বীকার কঠিনই ছিল। সামরিক খাতের ব্যয়নির্বাহে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতেও তাদের অনীহা ছিল না। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে রাশিয়া যুদ্ধব্যয় জোগান দিতে তাদের সংরক্ষিত ভান্ডার থেকে ৬০ টন সোনা বিক্রি করে। ফলে বিশ্ববাজারে সোনার মূল্যপতন ঘটে। রাশিয়া এভাবে দাঁত কমাড়ানো অবস্থায় আফগানিস্তানকে বিরান করে চলছিল। আফগানকে সম্পূর্ণ উজাড় করতে নিত্যনতুন পরিকল্পনা চালিয়ে অপরিসীম অর্থ ব্যয় করছিল তারা। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে আমু দরিয়ায় একটি বড় সেতু নির্মাণ করে আফগানিস্তানে সেনা ও অস্ত্র পাঠানো সহজ করে।

রাশিয়ার উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবতা

রুশবাহিনীর হস্তক্ষেপের পর আফগানিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো

একেবারে ভেঙে পড়ে। কারিগর ও শ্রমজীবীশ্রেণির মানুষ দেশ ছেড়ে হিজরত করে পালিয়ে যাচ্ছিল। আফগানিস্তানের এই দুর্দশা রুশবাহিনীর জন্য একটি সমস্যার জন্ম দেয়। বিশেষ করে শক্তি ও যোগাযোগ-মাধ্যমের ঘাটতি তাদের সামরিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করে। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নেয়। কিছু অবকাঠামোগত কাজে হাত দেয়। কতিপয় বড় বড় শহরকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে মহাসড়কগুলো নতুনভাবে নির্মাণ করে। নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলে। হাসপাতাল নির্মাণ করে। ট্রাকচলাচল ও সোনা-ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি সহজসাধ্য করতে অগণিত ওয়ার্কশপ তৈরি করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি কয়েকটি সমাজবাদী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের এই নির্মাণখাতে আগ্রহ দেখায়। চেকোস্লোভাকিয়া পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা নতুনভাবে গড়ে তুলতে ঋণ দেয়। পূর্ব-জার্মানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্লান্ট বসায়। বুলগেরিয়ো ৮টি টেলিফোন এক্সেঞ্জ স্থাপন করে। রাশিয়া নির্মিত এসব সুযোগ-সুবিধা সেসব বড় শহরের বাসিন্দারাই উপভোগের সুযোগ পায়, যেসব শহরে তাদের লোকজন বসবাস করত। আফগান জনগণ এসব সুবিধা নামকাওয়াস্তে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছিল।

হেরোইন বা আফিম ব্যবসা

আফগানদের মূল সমস্যা যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়; বরং দিন দিন তা বাড়তেই থাকে। বেকারত্ব, বাস্তুচ্যুতি, ক্ষুধা, দারিদ্র—এসব তখন ভয়াল রূপ ধারণ করে রাষ্ট্রীয় সমস্যার জন্ম দিচ্ছিল। তাদের সময়ে হেরোয়িনের ব্যবহার বিশ্বজুড়ে আশঙ্কাজনকহারে পৌঁছে যায়। আফগান মুহাজিরদের মধ্যকার অপরাধীশ্রেণি ছাড়া দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিতশ্রেণিও জীবন-জীবিকার স্বার্থে হেরোইনব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর মাধমে মুহাজিরদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তানও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভয়ংকর এই মাদক দেশের কোনায় কোনায় পৌঁছে যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওই মাদকের বাজার গড়ে ওঠে। যেসব বাজারের কর্তারা প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। অপরাধীশ্রেণি এই ব্যবসার মাধ্যমে দ্রুত কোটিপতি হয়ে উঠতে থাকে। উঁচু পর্যায়ের অপরাধীশ্রেণি, আন্ডারওয়ার্ল্ডেরর ডন এবং দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা মাদকব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। যে পাকিস্তানে একসময় অতি নগণ্যসংখ্যক মানুষকে মাদকগ্রহণে দেখা যেত, এখন তাদের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক মানুষ হেরোইনখোর বনে যায়। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া বিষয়টিকে নিয়ে এ পর্যায়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে যে, বহির্বিশ্বে সফরকারী প্রতিটি পাকিস্তানি নাগরিককেই হেরোইনব্যবসায়ী হিসেবে সন্দেহে হেনস্তা করা হচ্ছিল।

ক্লাশিনকোভ কালচার

লুণ্ঠিত ও বেহালদশায় পতিত সাধারণ আফগানরা বেঁচে থাকতে হেরোইনব্যবসার পাশাপাশি আরও এক যে মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল, সেটি হচ্ছে অস্ত্রব্যবসা। এসব অস্ত্রের সিংহভাগই ছিল রাশিয়া নির্মিত। প্রয়োজন-অতিরিক্ত অস্ত্র বিক্রির জন্য পাক-আফগান সীমান্তে জমজমাট বাজার বসত। অপরাধীশ্রেণি সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো ক্লাশিনকোভ কালচার গড়ে ওঠে। রাজনীতি, সম্প্রদায়, ভাষা ও দলীয় লড়াইয়ে এসব অস্ত্রের দেদার ব্যবহার একেবারে মামুলি ব্যাপার হয়ে ওঠে।

রাশিয়ার নতুন কৌশল

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদদের ঐক্য ও ব্যবস্থাপনায় অসম্ভব-সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করতে দেখা যায়। তাঁদের ব্যক্তিগত বিরোধ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃশ্যপটের আড়ালে চলে যায়। অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা একে অন্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। সাতদলীয় ঐক্যজোট আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। জোটবদ্ধ কাজের সুফল এভাবে ধরা দেয়—বেশকিছু স্থানে মুজাহিদবাহিনী রুশদের অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে ওরগুন ও খোস্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে দীর্ঘদিন জিহাদ অব্যাহত ছিল। রুশদের জন্য রাজপথের নিরাপত্তা এবং তা দিয়ে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা মুজাহিদদের তীব্র হামলার শিকার হতে থাকে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য তারা রাজপথের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে। রাজপথের দুরাহা ও চৌমোহনাসহ গুরুত্বপূর্ণ স্পটে সুদৃঢ় বাংকার ও ফাঁড়ি তৈরি করে সেখানে বিপুলসংখ্যক সেনা মোতায়েন করে রাখে। কাবুল সরকারকে ১৫০০ ট্রাক সরবরাহ করা হয়, যাতে এগুলো বিধ্বস্ত গাড়ির শূন্যস্থান পূরণে ভূমিকা রাখে। প্রতিটি সেনা-কাফেলার যাতায়াতের সঙ্গে গানশিপ হেলিকপ্টারের প্রহরা বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এসব নিরাপত্তাব্যবস্থার ফাঁক গলিয়ে মুজাহিদরা নিয়তই রুশবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিমানহামলা বৃদ্ধি

রাশিয়া এ পর্যায়ে স্থলশক্তির পরিবর্তে বিমানশক্তির ব্যবহার অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। আগে বিমানশক্তি কেবল গ্রামাঞ্চলে হামলা চালাত; কিন্তু এ পর্যায়ে এসে তারা মুজাহিদদের ফাঁড়িগুলো খুঁজে খুঁজে সেখানে নির্বিচার গুলিবর্ষণ শুরু করে। কাবুলের উত্তর দিকে একটি রাজপথ মুজাহিদদের দখলে ছিল, রুশবাহিনী সেখানে অগণিত বিমানের সাহায্যে হামলা শুরু করে। বলা হয়ে থাকে, তারা এত বেশি বিমান ব্যবহার করছিল যে, সেখানকার আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। সেখানে এত বেশি বোমাবৃষ্টি করা

হয়, যার ফলে মুজাহিদদের ফাঁড়ি, কৃষিভূমি, গ্রাম ও সড়ক কিছুরই নামনিশানা বাকি থাকেনি। 'শাকার দুররা' ও 'আসতালিফ' জায়গা দুটি এমনভাবে ধ্বংস করা হয় যে, সেখানে একটি প্রাণীও বাকি ছিল না। সবকিছু মুহূর্তেই ধ্বসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়।

নির্লজ্জ জুলুমবাজি

আফগানিস্তানে রাশিয়ার এই রক্তের দাস্তান তখন সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করে। প্যারিস ও অসলোতে নির্লজ্জ এই মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিভীষিকাময় জুলুমবাজি নিয়ে কাজ চলতে থাকে। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত এক নিরপেক্ষ আদালতে আফগানিস্তান থেকে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বিভিন্ন শ্রেণিপেশার কিছু মানুষ তাদের দেখা বিভীষিকাময় ঘটনার সাক্ষ্য দেন। মুহাম্মাদ আইয়ুব নামের কাবুল পুলিশের উর্ধ্বতন এক অফিসার আদলতকে বলেন, 'আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এখন পুরোপুরিভাবে রুশদের দখলে। প্রতিটি কাজ ওদের ইচ্ছামতোই সম্পাদিত হচ্ছে।' ওই অফিসার বলেন, 'শুধু কাবুলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ই ১২ হাজারের অধিক মানুষকে নির্মমভাবে শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছে। অত্যাচারের পদ্ধতির মধ্যে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, ধারাবাহিক কদিন জাগ্রত রাখা, বন্দিদের ওপর কুকুর ছেড়ে দেওয়া, মাতা-পিতার চোখের সামনে তাদের সন্তানদের গুলির টার্গেট বানানো এবং নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।' তাঁর বক্তব্য ছিল— 'সোভিয়েতবাহিনী মানুষ শিকারের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ত। প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হতো। এর ফলে মানুষ যখন বাইরে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়মুখে পালানো শুরু করত, তখন এরা যথারীতি তাদের গুলির শিকার করত। শিকারিরা থাকত গানশিপ হেলিকপ্টারগুলোতে। তারা ভূমিঘেঁষা উড্ডয়নের মাধ্যমে পলায়নপর লোকগুলোকে গুলির শিকারে পরিণত করত।'

বিভিন্ন আফগান বাসিন্দা বলেন, একেবারে মামুলি সন্দেহে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। ইলেকট্রিক শক দেওয়া হতো। সেবন করানো হতো বিষাক্ত ওষুধ। একব্যক্তি বলেন, 'রুশরা আট বছর বয়সি এক শিশুর কাছ থেকে মুজাহিদদের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে তাদের সহায়তা করতে রাজি না হলে তার ওপর পেট্রোল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলে।' অন্যান্য সংস্থার রিপোর্টমতে, ১৯৮৩ পর্যন্ত সোভিয়েতবাহিনী আফগানিস্তানে ১০ লাখের মতো মানুষকে হত্যা করে। ১ লাখেরও বেশি মানুষ রাজনৈতিক অপরাধে সেখানকার জেলখানাগুলোতে পচে মরছিল। রুশরা মগজ ধোলাই করে কমিউনিস্ট বানাতে আফগানিস্তান থেকে ৭২ হাজার সেনাকে রাশিয়ায় নিয়ে যায়। ২৭ লাখ আফগানি পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে শরণার্থীর

জীবন কাটাচ্ছিল। এদের ভরণপোষণে দৈনিক খরচ করতে হচ্ছিল ১০ লাখ ডলার। আর এই খরচের অর্ধেকটা বহন করতে হচ্ছিল পাকিস্তানকে।

রাশিয়া পাকিস্তানকে তার এই মুসলিমপ্রীতির শাস্তি দিতে নিত্যনতুন ফন্দি আঁটছিল। তারা ২০০ পাকিস্তানি যুবককে মস্কোয় অন্তর্ঘাতী তৎপরতা চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল, যাতে এর মাধ্যমে পাকিস্তানের শান্তি ও স্থিতিশীলতা একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

আহমাদশাহ মাসউদ ও রুশবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি

এই পুরোটা বছর আগ্রাসী রুশরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল—বিখ্যাত মুজাহিদ নেতা আহমাদশাহ মাসউদ ও রুশবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হওয়ায় তার দিক থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। অন্যান্য মুজাহিদ নেতা এই চুক্তিকে আহমাদশাহর গাদ্দারি হিসেবে গণ্য করলেও তাঁর মতে এটি ছিল অপরিহার্য। তাঁর বক্তব্য ছিল, পাঞ্জশির উপত্যকা চার বছরের অব্যাহত যুদ্ধে একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছিল। কৃষিভূমি বিরান হয়ে পড়ছিল। বাহির থেকে মুজাহিদরা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারছিল না। শত্রুর সঙ্গে সাময়িকভাবে চুক্তির মাধ্যমে তিনি এলাকাটি পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি এই সুযোগে মুজাহিদদের সংঘটিত এবং নতুনভাবে আরও প্রশিক্ষিত করতে চাচ্ছিলেন।

সে যা-ই হোক, যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে রাশিয়াই বেশি উপকৃত হয়। কেননা, আমু দরিয়া থেকে কাবুলগামী রাজপথটি আহমাদশাহ মাসউদ-নিয়ন্ত্রিত এলাকা হয়েই অতিক্রম করছিল। এখানে জিহাদি তৎপরতা বন্ধ হওয়ার ফলে রাশিয়ার জন্য স্থলপথে সরাসরি কাবুলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সহজ হয়ে ওঠে।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

এই সফলতাকে রুশবাহিনী পরবর্তী বছর অধিক বিজয়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ওরগুনে মুজাহিদদের হাতে অবরুদ্ধ থাকা রুশ-আফগানবাহিনীর সেনারা এক কঠিন যুদ্ধের পর অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হয়। যুদ্ধে প্রায় ৬০০ মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন (সংখ্যাটি রুশ সংবাদমাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত)। মুজাহিদদের ক্ষতির বড় কারণ ছিল—এখানকার সর্বত্র জালের মতো ভূমিমাইন বিছিয়ে রাখা ছিল। এই বিজয়ের ফলে বাবরাক কারমালের সাহস কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এখন সে তার ভাষণগুলোতে অহংকারের সঙ্গে এসব বিজয়ের কথাও বলত। নিজের বাহিনীর সাহস বাড়াতে সেনাদের বেতন দ্বিগুণ করে। সে মুজাহিদদের হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু করে। পাকিস্তানকে ভীত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে হুমকিমূলক এক ভাষণে সে বলে, 'আমাদের কাছে এত বেশি অস্ত্র রয়েছে যে, আমরা

পাহাড় পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারি।' তখন আফগান বিমানগুলো খোলাখুলি পাকিস্তান সীমান্তে ঢুকে বোমা নিক্ষেপ করে চলছিল।

আফগান বিমানের পাকিস্তানে হামলা

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট যখন পাকিস্তানে স্বাধীনতাদিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছিল, তখন আফগান বিমান দুইবার পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে গ্রামাঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করে। এতে স্বাধীনতাদিবস উদ্‌যাপনকারীদের ১৩ জন মারা যায়। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪-এর মধ্যে মোট ৪১১ বার আফগান বিমান পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। কিন্তু পাকিস্তান মুসলিম প্রতিবেশী হিসেবে ধৈর্যের সঙ্গে এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করে যায়। এই ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর। ওই দিন আফগান বোমারু বিমান করমএজেন্সির একটি আলোকোজ্জ্বল বাজারে নির্বিচার বোমাহামলা চালিয়ে প্রায় ২০০ মানুষকে শহিদ করে। এ ছাড়া কোটি কোটি টাকা মূল্যের পণ্য নষ্ট করে। এই পাশব হামলায় শত শত দোকান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যায় অনেক বিল্ডিং।

আন্দ্রোপভের মৃত্যু এবং চেরনেনকোর ক্ষমতাগ্রহণ

ওই বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার মঞ্চে আরেকবার পরিবর্তন আসে। ব্রেজনেভের উত্তরসূরি আন্দ্রোপভ বেশিদিন ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করতে পারেনি। সে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি মারা যায়। তখন তার বয়স ছিল ৬৯ বছর। তার মৃত্যুর পর ১২ এপ্রিল চেরনেনকো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের আসনে সমাসীন হয়।

পাঞ্জশিরে সপ্তমবারের হামলা

এদিকে আহমাদশাহ মাসউদ এক বছরের যুদ্ধবিরতির চুক্তি শেষ হতেই সালাং রাজপথে হামলা চালিয়ে বসেন। রাশিয়ার শত অনুরোধের পরও মাসউদ যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি হননি। অবশেষে রাশিয়া ১৫ হাজারের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জশির অভিমুখে এগিয়ে আসে। এটি ছিল পাঞ্জশিরে সপ্তম বৃহত্তর হামলা।

রাশিয়ার T-U16 বোমারু বিমান পাঞ্জশিরে কার্পেট বোমা নিক্ষেপের লক্ষ্যে আকাশের বেশ উচ্চতায় উড্ডয়নরত ছিল। আর হেলিকপ্টারযোগে ছত্রীসেনারা সেখানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আকাশ থেকে নির্বিচার বোমা নিক্ষেপ শুরু হলে মুজাহিদরা পেছাতে বাধ্য হন। সোভিয়েতবাহিনীর কামানবাহী সাঁজোয়া যানগুলো সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাঞ্জশির উপত্যকার কয়েকটি জায়গায় তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের সংঘাত

বাধে। এতে উভয় বাহিনীর প্রচুর প্রাণহানির পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অবশেষে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে আহমাদশাহ মাসউদ পাহাড়ের গভীরে আশ্রয় নেন। সোভিয়েত ছত্রীবাহিনী 'আলি তঙ্গ' ও 'আন্দরাবে' লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকদিনের যুদ্ধ শেষে কাবুল রেডিয়ো আহমাদশাহর পুরোপুরি পরাজয় এবং সরকার কর্তৃক পাঞ্জশির উপত্যকা দখলের ঘোষণা দেয়। কারমাল দ্রুত পাঞ্জশির সফর করে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করে, এখানে মাসউদের ঘাঁটি চিরতরে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু মাসউদের বাহিনীর যাঁরা বস্তি-এলাকা ছেড়ে পাহাড় ও উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁরা তাঁদের তৎপরতা পূর্ববৎ চালিয়ে যায়।

রাশিয়ার আরও অভিযান

যেহেতু পাঞ্জশিরের এই যুদ্ধে রুশ ছত্রীবাহিনীর ভূমিকা ছিল খুব বেশি, এ জন্য পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ছত্রীসেনাদের ব্যবহার করা হতে থাকে। ওই বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সেনাকে আফগানিস্তানে নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়া রাশিয়া 'সোভিয়েত এয়ার এসল্ট ব্রিগেড' নামে একটি নতুন বাহিনী গঠন করে। ভয়ংকর ধরনের নির্দয় স্পেৎসনাজ বাহিনীও তখনই গঠন করা হয়। এরা মুজাহিদদের বেশে গ্রামে ঢুকে নির্বিচার হামলা করত; আর এর দায় মুজাহিদদের ওপর চালিয়ে দিত।

আহমাদশাহ মাসউদের তৎপরতার জবাব দেওয়ার লক্ষ্যে রাশিয়া আরেকবার বিমানহামলা শুরু করে। সেপ্টেম্বরে ইদুল আজহার দিন অষ্টমবারের মতো পাঞ্জশিরে আক্রমণ চালানো হয়। T-U16 বোমারু বিমানের ভয়ংকর বোমাবাজির ফলে সেখানকার ৩০০ ব্যক্তি শাহাদাতবরণ করেন। রাশিয়া বলে বেড়াচ্ছিল, এরা সবাই মুজাহিদবাহিনীর সদস্য। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য ছিল—এদের বেশিসংখ্যক ছিল সাধারণ নাগরিক।

নভেম্বরেও এভাবে নির্বিচার বেমাহামলার মাধ্যমে লোগার প্রদেশের ৪০০ সাধারণ নাগরিককে শহিদ করা হয়। বছরের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়ার ১২ হাজার সেনা আফগান সেনাদের সঙ্গে নিয়ে 'পারা চানার' ও কাবুলের মধ্যখানে অবস্থিত 'আলি খিল (হাজি)' ছাউনিটি অবরোধ করে রাখা মুজাহিদদের ওপর প্রচণ্ড বিমানহামলা চালায়। আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে মুজাহিদরা অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন। সোভিয়েত সরকার এই অভিযানকেও তাদের বড় এক সাফল্য হিসেবে আখ্যায়িত করে।

ময়দানে মুজাহিদদের নির্ভিক অপচল অবস্থান

রাশিয়ার এই সাফল্যগুলো মুজাহিদদের দুঃসাহস একটুও অবদমন করতে পারেনি। তাঁদের দুঃসাহস যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। তাঁরা জীবনবাজি রেখে ময়দানে

রুশবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যাচ্ছিলেন। এক উপত্যকায় পরাজিত মুজাহিদদের পরদিনই কোনো অঞ্চলে অসংখ্য রুশ সেনাকে যমালয়ে পাঠাতে দেখা যেত।

মূলত রাশিয়া আফগানিস্তান নামক কাদায় পড়ে ধসে যাচ্ছিল। যুদ্ধে দৈনিক ব্যয় হচ্ছিল ৮ কোটি ডলার। ফলে তাদের অর্থনীতি দ্রুত রসাতলে গড়িয়ে পড়ছিল। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দেই ৭০ হাজারের বেশি সাহায্যকারী সেনা ডেকে নেওয়া হয়। মাত্রাহীন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান বাড়িয়ে নেওয়া হয় এখানে। কিন্তু এতকিছুর পরও সাময়িক বিজয় ছাড়া বেশিকিছু অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর এক সংবাদ-রিপোর্টে জানা যায়, গত পাঁচ বছরে মুজাহিদদের হাতে ১০ হাজারের বেশি রুশ-আফগান সেনা মারা পড়েছে। আরেক সংবাদমতে, মুজাহিদদের হাতে রুশ ও কাবুল সরকারকে ৩৪ বিলিয়ন রুপির সমমান ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে।

বৈশ্বিক পর্যায়ে এসব সংবাদ রাশিয়ার ভাবমূর্তি ধসাতে যথেষ্ট ছিল। এদিকে আফগানিস্তানের শহিদদের সংখ্যা ছিল ১০ লাখ। আর তাদের ২৫ লাখ মানুষ সীমাহীন দারিদ্রে মানবেতর জীবনযাপন করছিল।

১৬ নভেম্বর ১৯৮৪ জেনারেল এসেম্বলির বৈঠকে আরেকবার আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনাপ্রত্যাহারের বিষয়টি বিপুল ভোটে পাশ হয়। এ সময় আমেরিকা মুজাহিদদের প্রতি সহায়তা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। মুজাহিদদের জন্য ১০ লাখ ডলার সাহায্যের প্রস্তাবে মনজুরি দেয় তারা।

গোত্রীয় মিলিশিয়া

রুশ ও কারমাল সরকারের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছিল। ফলে মুজাহিদদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে কারমাল সরকার কাবায়েলি আনুগত্য আদায়ে মনোযোগ দেয়। কাবায়েলিদের মধ্যেও পণ্য হওয়ার মতো মানুষের অভাব ছিল না। কারমাল এ ধরনের নেতা ও আফগানিস্তানের নিজস্ব সেনাদের সমন্বয়ে একটি নতুন মিলিশিয়াবাহনী গড়ে তোলার প্রতি জোর দেয়। ফলে গোত্রপতিদের কখনো কাবুল সরকারের পক্ষে, আবার কখনো মুজাহিদদের সঙ্গে মিলিত হতে দেখা যেত। ওই সময় কাবুলের পার্লামেন্ট-ভবনে তাদের আসা-যাওয়া খুব বেড়ে গিয়েছিল। অবশেষে একটি মিলিশিয়াবাহিনী তৈরি করা হয়।

ইসমত উল্লাহ মুসলিম নামের এক কমান্ডারকে ওই মিলিশিয়াবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। তারা মুজাহিদদের সরবরাহপথে আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নিত। সারুবির সর্দার 'হাসান খান কারুখিল' সরকারের সহযোগী হয়ে ওঠে। সে সারুবির বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং বিদ্যুতের খাম্বাগুলোর নিরাপত্তায় নিযুক্ত হয়। কারণ, সারুবির বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস

হয়ে গেলে কাবুলও অন্ধকারে ডুবে যেত। এই সরদাররা ছাড়াও জুমাখান নামের এক একরোখা নষ্টপ্রকৃতির কমান্ডারও তার অধীন ৫০০ যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে কারমালের ছাতার নিচে চলে যায়।

মুজাহিদদের হুমকি

জাতিদ্রোহী এসব সরদারের ব্যাপারে মুজাহিদদের বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। তাঁরা গাদ্দার সরদারদের কাছে বার্তা পাঠান ভালোয় ভালোয় সঠিক হয়ে যাও, অন্যথায় দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি বরণের জন্য তৈরি হও। সারুবির সরদার হাসান খানের জন্য মাওলানা ইউনুস খালিসের একটিমাত্র হুমকিই যথেষ্ট হয়ে যায়। তিনি শুধু এটুকু বলেছিলেন, 'বিরত থেকো নতুবা যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আমরা অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করে দেবো।' হাসান খান হুমকি পেয়ে এতটাই ভীত হয় যে, সে শুধু সারুবি নয়; আফগানিস্তান ছেড়ে পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নেয়। তবে জুমা খানের ওপর হুমকি কোনো কাজ দেয়নি। ফলে এক সংঘর্ষে তাকে হত্যা করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. *তারিখু আফগানিস্তান মিন কুবাইলিল ফাতহিল ইসলামি ইলা ওয়াকতিনাল মুআসির,* ফারুক হামিদ বদর।
২. *আফগানিস্তান এক কাওমি আলমিয়া,* আহমাদ শুজা পাশা।
৩. *তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান,* ড. এইচ বি খান।
৪. *উর্দু ডাইজেস্ট,* মার্চ ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ, জিহাদে আফগানিস্তান, এপ্রিল ১৯৮৯ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যা।
৫. *আফগানিস্তান এক কওমি আলমিয়া,* আহমাদ শুজা পাশা।
৬. *আল-মুসলিমুনা ফি আফগানিস্তান,* ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আহমাদ।
৭. *জিহাদে আফগানিস্তান আওর ফাতহে মুবিন,* মাওলানা মুশতাক আহমাদ আব্বাসি।
8. Encyclopaedia Britannica (Afganistan)

২৭ তম অধ্যায়

চূড়ান্ত যুদ্ধের কাল

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের অবস্থাসমূহ

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর সময়টিকে বিশ্বমঞ্চে সমঝোতার পথ সহজতর করার বছর হিসেবে দেখা যায়। ১০ জানুয়ারি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রহ্রাসের ব্যাপারে আলোচনা করতে সম্মত হয়। পরে জেনেভায় রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তখন আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাপ্রত্যাহার সম্পর্কে মতৈক্য হয়। জেনভায় পারমাণবিক অস্ত্র-সংক্রান্ত আলোচনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও উভয় সুপার পাওয়ার সম্মত হয়।

এদিকে কারমালও লয়া জিরগা ডেকে আফগান নেতাদের বিশ্বস্ততা অর্জনের নতুন প্রচেষ্টা শুরু করে। লয়া জিরগায় ১,৭৭৬ জন প্রতিনিধি অংশ নেয়। কিন্তু এটা ছিল কেবল একটি ভণিতামাত্র। এদিকে জিরগা চলছিল আর ওদিকে চিরিকার পাহাড়ি এলাকায় মুজাহিদবাহিনী রকেটবৃষ্টির মাধ্যমে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল। মোটকথা, পাখতুন জাতি ও কারমাল প্রশাসনের মধ্যে একটা সমঝোতার চেষ্টায় খাদের[২৭] সর্বোচ্চ নেতা ডা. নাজিবুল্লাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কেননা, সে নিজেও ছিল জাতিতে পাখতুন। তা ছাড়া পাখতুন গোত্রগুলোর নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল খুব ভালো।

মুজাহিদদের কার্যক্রম

তখন পাকতিয়া থেকে 'পারা চানার' পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকাটি ছিল মুজাহিদদের তৎপরতার মূল কেন্দ্র। এই উপত্যকার অবস্থান ছিল কাবুল থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরত্বে। তাই কাবুল সর্বক্ষণ মুজাহিদদের আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত থাকত। কাবুলে তখন ৬০ হাজার আফগান-সোভিয়েত যৌথবাহিনী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আদায় করে যাচ্ছিল। মুজাহিদরা কাবুলে প্রবেশ করতে না পারলেও তাদের রকেটবৃষ্টি আর

[২৭] কমিউনিস্ট প্রভাবিত আফগান গোয়েন্দা সংস্থা।

বোমাহামলা কাবুলে অবস্থানরত সোভিয়েতবাহিনীকে নাজেহাল করে রেখেছিল। ওই বছরও আমহাদশাহ মাসউদ সালাং-কাবুল রাজপথটি সোভিয়েতবাহিনীর জন্য বিপজ্জনক করে তোলেন। ফলে সোভিয়েতবাহিনী নবম দফা পাঞ্জশিরে হামলা চালায়। এই হামলার বুনিয়াদি কারণ ছিল—আহমাদশাহ মাসউদ পেশঘরে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নিয়েছিলেন। মুজাহিদবাহিনী 'পেশঘর' থেকে পাঁচজন কর্নেল, শতাধিক অফিসার এবং ৩৫০ জন্য সাধারণ সেনাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

এর জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুর বিমানহামলা শুরু হয়। তারা নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপ শুরু করে। হামলায় মুজাহিদদের তেমন কোনো ক্ষতি না হলেও ৩০ আফগানসহ অনেক সোভিয়েত বন্দি মারা যায়। রুশ-আফগান মিডিয়া তখন পালটা অপপ্রচার করে বলে বেড়ায়—মুজাহিদবাহিনী বন্দিদের নির্মমভাবে হত্যা করে যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে!

কিছুদিন পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বড় আকারের হামলা চালিয়ে পেশঘর পুনর্দখলে নিয়ে গেলেও তাদের বন্দিদের উদ্ধার করতে পারেনি।

হেরাতের রণক্ষেত্র

হেরাতে ইসমাইল খানের মুজাহিদরা সক্রিয় ছিল। তাঁরা ভূগর্ভস্থ এক সুড়ঙ্গ খনন করে রুশদের অধীন একটি দুর্জয় ফাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হয়। এরপর তাঁরা সেটির দখল নিয়ে বিশ্বকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়। তাঁরা রকেটের মাধ্যমে হেরাত বিমানবন্দরে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল। একদিন শিন্দান্দ বিমানবন্দর এক বিভীষিকাময় বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। পরে জানা যায়, ওই বিস্ফোরণে সেখানে থাকা ২০টি বিমান ধ্বংস হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে কখনো কোথাও আফগান-রুশ বিমানবাহিনী এত বিশাল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়নি।

অবরোধজাতীয় যুদ্ধ

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দেও মুজাহিদবাহিনী খোস্ত, তানি, জাজি ও ব্রিকোট অবরোধ অব্যাহত রাখে। ফলে রাশিয়ার জন্য ওই এলাকায় খাদ্য, রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। তারা মুজাহিদদের ওপর বেশ কয়েকটি বড় আক্রমণ পরিচালনা করে; কিন্তু আংশিক সফলতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এক রিপোর্টে জানা যায়, রাশিয়া আফগানিস্তানে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ২০ লাখ মাইন পুঁতে নিয়ে পুরো আফগানিস্তানে যেন মৃত্যুজাল বিছিয়ে রাখে; কিন্তু তারপরও অবরোধজাতীয় যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে একটি জায়গায় রুশরা কিছুটা সাফল্য

অর্জন করে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন লাল ফৌজ ব্রিকোটের অবরোধ ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। ফলে মুজাহিদরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পাহাড়ি এলাকার দিকে চলে যান। এই অপারেশন চলাকালে সোভিয়েতবাহিনী চারটি গ্রাম ভূপৃষ্ঠ থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলে। আর কমপক্ষে ২ হাজার স্থানীয় সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়।

মুজাহিদদের সাতদলীয় ঐক্য বহাল ছিল। পাকিস্তানের পেশোয়ারে ছিল ওই জোটের কেন্দ্রীয় দপ্তর। ওই বছর জাতিসংঘের বার্ষিক সমাবেশে জোটের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে লোক পাঠায়।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে কারমালকে পরাজিত ও ক্লান্ত একজন মানুষের মতো দেখা যেতে থাকে। সে তখন রুগ্ন অবস্থায় ছিল। এখন আর আগের মতো বিভিন্ন সমাবেশে অংশগ্রহণ করছিল না। এরপর সে যখন মস্কো সফর করে, তখন তাকে সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যা ইতিপূর্বে দেওয়া হতো। রাশিয়া তখন তাকে ছেঁড়া ত্যানা হিসেবে ছুড়ে ফেলতে চাচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন কারমালের বিকল্প খুঁজছিল। বিশ্বের পর্যবেক্ষকমহল তখন এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হসেবে গণ্য করে আসছিল সুলতান আলি কুশমাতান্দকে।

রুশদের মানবতাবিরোধী অত্যাচার

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দেও রাশিয়ার জুলুমবাজি অব্যাহত থাকে। সোভিয়েতবাহিনী ১৫ মে আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে হামলা চালিয়ে হাজারের মতো সাধারণ নাগরিককে শহিদ করে। একই সময় কান্দাহারে বোমাহামলা চালিয়ে ৭০ জন নাগরিককে শহিদ করে তারা। ওই বছর প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ শাহাদাতের সুরা পান করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট চেরনেনকো বেশিদিন ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করতে পারেনি। আন্দ্রোপভের মতো তার প্রেসিডেন্সির মেয়াদও ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। চেরনেনকোর পর মিখাইল গর্বাচেভ কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং রাশিয়ার শাসক হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণ করে। সে তার পূর্বসূরিদের তুলনায় নতুন পথ অনুসরণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনশীল অর্থনীতিই বলছিল—কমিউনিজমবাদের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। গর্বাচেভ তার শাসনপদ্ধতিতে ক্রমাগত পরিবর্তন এনে উদীয়মান সমস্যা মোকাবিলার প্রয়াস পাচ্ছিল। সে প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়নে বাক ও কলম-স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিলে সাংবাদিকরা

তাকে আফগানযুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন শুরু করে। কিন্তু সে তাদের প্রশান্তকর উত্তর দিতে না পারলে রুশ জনগণ দিন দিন এই ধারণাই পেতে থাকে যে, রাশিয়া কর্তৃক আফগানযুদ্ধ মূলত একটা বোকামি পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়।

গর্বাচেভ মূলত কমিউনিস্ট ছিল। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে কমিউনিজমবাদে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসার পক্ষে ছিল। বিগত সরকারগুলোর মতো তার সরকার সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষী ছিল না। খুবসম্ভব সিদ্ধান্তটি এই অবস্থা দেখে নিতে হচ্ছিল যে, বিগত সাত বছরের আফগানযুদ্ধে লাল ভল্লুকরা আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিল। গর্বাচেভ প্রথমে শরীরের ঘা শুকানোর পক্ষে ছিল। তাই তাৎক্ষণিকভাবে আফগানিস্তান থেকে সসম্মানে বেরিয়ে আসার কোনো পথ বের করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখার তীব্র প্রয়োজন ছিল তার। সুতরাং দেখা যায় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে এক ভাষণে গর্বাচেভ বলছিল, 'আমরা বহির্বিশ্বের দখলদারত্বহীন আফগান-বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা আফগানিস্তানের যেকোনো রাজনৈতিক সমাধানে প্রস্তুত আছি।'

আরেকবার জেনেভা সংলাপ

গর্বাচেভের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আফগানিস্তান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজছে। তবে খুবসম্ভব এ জন্য তাকে কঠিনসব শর্তের মুখোমুখি হতে হবে। রাশিয়া এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর আফগান বিষয়ে জেনেভায় সরাসরি আলোচনার জন্য ষষ্ঠবারের মতো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার আগে আমেরিকা আফগান বিষয় সমাধানের জন্য দায়িত্ব নেয়। তারপরও আফগান প্রতিনিধিদের কঠিন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক বিশাল পরিবর্তন আসে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এক সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করেন। ওই নির্বাচনের মাধ্যমে মুহাম্মাদ খান জুনেজো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনগুলোতে আফগান বিমানবাহিনী পাকিস্তানে অব্যাহত বিমানহামলা চালিয়ে যেতে থাকে। শুধু মে মাসের প্রথম দশকেই আফগান বিমান ৬০ দফা পাকিস্তান সীমান্তে আঘাত হানে। মুহাম্মাদ খান জুনেজো ক্ষমতাসীন হয়েই ঘোষণা দেন, 'ভবিষ্যতে কোনো আফগান বিমান পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করলে এর কঠিন জবাব দেওয়া হবে।'

রুশ যুদ্ধবিমান শিকার

সেপ্টেম্বরে পূর্ব-আফগানিস্তান কঠিন যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। খোস্তে ৩ হাজার কারমালি ও রাশিয়ান অবরুদ্ধ ছিল। তাদের চারপাশে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। মুজাহিদরা আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে রুশ বিমানগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। মুজাহিদবাহিনী ভূপাতিত করে চলছিল একের পর এক রুশ বিমান ও হেলিকপ্টার। ৮ সেপ্টেম্বর পাকতিয়ায় সাতটি রুশ হেলিকপ্টার ও বিমান ভূপাতিত করা হয়। পরদিন একটি যাত্রীবাহী বিমান মুজাহিদদের গোলার নিশানা হয়ে বিধ্বস্ত হয়। বিমানটি রাশিয়া ও আফগানিস্তানের অফিসার ও সেনা বহন করছিল। ওই আক্রমণে ৫২ জন নিহত হয়। এর পরদিন মুজাহিদবাহিনী পাকিস্তানের সীমান্তের কাছে দুটি রাশিয়ান বিমান ভূপাতিত করে।

সাওরের যুদ্ধ

ওই সময় হাজার হাজার রুশ-আফগান সেনা পূর্ব-আফগানিস্তানের সাওরে হামলা চালাচ্ছিল। সাওর ছিল মুজাহিদদের প্রধান একটি ঘাঁটি। সেখানে ছিল আন্ডারপা.০স নেটওয়ার্ক। ওসব আন্ডারপাসে বিদ্যুৎ ও জেনারেটরব্যবস্থা ছিল। পুরো আফগানিস্তানের মুজাহিদদের কাছে সরবরাহের অস্ত্র মজুত ছিল এখানেই। রুশ-আফগান যৌথবাহিনী সাওর দখলের প্রাণপাত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু মুজাহিদদের দুঃসাহস, ইমানি শক্তি, দৃঢ়তা ও শক্ত মনোবলের সামনে তারা এক পা-ও সামনে এগোতে পারেনি। অবশেষে পেছনে লাশের স্তূপ ফেলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ওই যুদ্ধ সম্পর্কে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির এই বিবৃতি গণমাধ্যমে প্রচার পায়—'বিগত সপ্তাহে আফগান ইতিহাসের কঠিনতম যুদ্ধের মোকাবিলা করা হয়েছে।'

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এক বছরের মধ্যেই ৭ হাজার ৯২০ জন রুশ-আফগান সেনাকে হত্যা করা হয়। রুশ-আফগান বিমানবাহিনীর ৪২টি যুদ্ধবিমান, ৬৪টি হেলিকপ্টার এবং ৮৩৭টি ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস করা হয়।

কারমালের বিদায়

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ শুরু হতেই আফগানিস্তানে কারমালের ক্ষমতার স্বাদ পূর্ণ হয়ে যায়। তখন সে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও উপস্থিত হচ্ছিল না। এমনকি ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত লয়া জিরগায়ও যায়নি। সেখানে শুধু তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। তবে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি ডা. নাজিবুল্লাহ সুদীর্ঘ ও আবেগপূর্ণ ভাষণ দেয়।

অবশেষে একদিন কাবুল বেতার থেকে ঘোষিত হয়, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে কারমাল প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। অব্যাহতিপত্র গৃহীত হয়েছে এবং তার স্থলে ডা. নাজিবকে পার্টিপ্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে।

কে এই ডা. নাজিবুল্লাহ

২৮ বছর বয়সি নাজিবুল্লাহ তার বেঢপ দেহকাঠামোর কারণে মানুষের কাছে ষাঁড় উপাধিতে খ্যাত ছিল। সে ছিল ভীষণ ধূর্ত, চৌকস আর অতিকথন-প্রিয়। ভাষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল খুবই দক্ষ। রাজনৈতিক চাতুর্য ছিল তার বাম হাতের খেলনার মতো। পাশাপাশি সে ছিল মাত্রাহীন হিংস্র ও নির্দয়। নাজিবুল্লাহ ছিল এক পাঠান ব্যাংক-কর্মকর্তার ছেলে। জন্ম ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকতিয়া প্রদেশে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ডাক্তারি পড়তে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তখন গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্য হয়। এরপর পূর্ণ আগ্রহের সঙ্গে কারমালের অধীনে পরচম পার্টির জন্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ডাক্তারি পাশের পর সে চিকিৎসা-পেশায় না জড়িয়ে রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বাগ্মিতা তাকে উন্নতির ধাপ মাড়াতে সহায়তা করে। খালক পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাকালে সে ইরানে আফগানিস্তানের কূটনীতিক পদে মনোনীত হয়। এরপর পূর্ব-ইউরোপে চলে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে খালক পার্টি বিলীন হয়ে যায়। তখন পরচম পার্টি তাদের নেতা কারমালকে নিয়ে ক্ষমতার মঞ্চে আবির্ভূত হলে নাজিবুল্লাহ ইউরোপ থেকে দেশে চলে আসে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সে আফগানিস্তানের গোয়েন্দাসংস্থা খাদের নেতৃত্ব পায়। এই সংস্থা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পাশব ঘটনার জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল। চার বছর পর ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সে পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল পদে আসীন হয়। পরে কারমালের অব্যাহতির পর আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে সমাসীন হয়।

নাজিবুল্লাহ সম্পর্কে এ বিষয়টি বহুল প্রচারিত যে, সে ছিল রাশিয়ার গোয়েন্দাসংস্থা কেজিবির এজেন্ট। তাই তার ওপর সোভিয়েত সরকারের আস্থা ছিল সীমাহীন। তারা যখন কারমালের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ে, সে-ই তাদের চোখের তারা হয়ে উঠতে থাকে। নাজিব ক্ষমতায় এসেই রাষ্ট্রের মেশিনারি কার্যকর করার প্রতি মনোযোগ দেয়। সে জোরজবরদস্তি আর প্রতারণার মাধ্যমে তা অর্জনের প্রয়াস পায়; অথচ এ পন্থাই হয়েছিল কারমালের পতনের মূল কারণ।

নাজিবুল্লাহর শাসনকাল

ক্ষমতাগ্রহণের পরেই সে দেশজুড়ে ঝোড়োসফরে বের হয়। বিভিন্ন গোত্রপতি ও নেতৃস্থানীয় লোকের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে। দেশকে সে নতুন কোনো রাজনৈতিক

সুকৃতি উপহার দিতে সক্ষম হয়নি। কেননা, সে তো ছিল মূলত এক কাঠপুতুল সরকারপ্রধান। তারপরও সে কারমালের রেখে রাওয়া বিপর্যস্ত প্রশাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেশের শাসনতান্ত্রিক অরাজকতা সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালায়।

প্রত্যেক ধোঁকাবাজ শাসকের মতো সে-ও ধর্মপ্রিয়তার ভান করে। নিজেকে সাচ্চা মুসলিম হিসেবে তুলে ধরার কসরত চালায়। ইসলামের ভালোবাসার আওয়াজ তোলে। মসজিদে জুমুআর নামাজে অংশ নিতে থাকে। কিন্তু এগুলো ছিল তার প্রতারণার অংশ। মূলত সে কারমালের মতোই নাস্তিকতা, নিপীড়িন আর হিংস্রতার পথের পথিক ছিল। খাদের নেতৃত্বে থাকাকালের অভিজ্ঞতা ছিল তার জন্য অতিরিক্ত পাওনা। সে তার বিরুদ্ধবাদীদের গোপনে পথ থেকে সরানোর প্রচেষ্টায় সামান্যতম ত্রুটি করেনি। সেনাবাহিনীতে ভর্তির ব্যাপারে পার্টির সদস্যদের উদাসীনতা দেখানোর কারণে সে তাদের কঠিন সমালোচনা করে এবং জোরপূর্বক ভর্তি কার্যক্রম চালানোর সংকল্প করে।

সাওরের দ্বিতীয় যুদ্ধ

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর সময়টি সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করে রাখে। বলা হচ্ছিল, এটি হচ্ছে মুজাহিদদের প্রধান ঘাঁটি। মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি এখান থেকে পুরো আফগানিস্তানে লড়াইরত মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এখানে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছিল। বিমানহামলার মোকাবিলায় সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল এখানে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ব্যর্থ হামলার পর সোভিয়েত ও আফগান যৌথবাহিনী পুরোপুরি প্রস্তুতিগ্রহণ শুরু করেছিল। প্রস্তুতি শেষে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মের শুরুর দিকে তারা এখানে ফের আক্রমণ চালিয়ে বসে। সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ১২ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী কয়েক সারিতে বিভক্ত হয়ে এগোতে থাকে। এই হামলা ঠিক তখন পরিচালিত হয়, যখন আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে জেনেভায় আরেকবার সংলাপ চলছিল। সোভিয়েতবাহিনী সাওরে সফল বিমানহামলার জন্য খোস্ত প্রদেশকে কেন্দ্র বানাতে চাচ্ছিল; কিন্তু মুজাহিদরা আগেই খোস্তের বিমানবন্দর অকেজো করে দিতে সেখানে গোলাবৃষ্টি শুরু করে।

এদিকে বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের সদস্যরাও সাওরের দিকে ছুটে আসছিলেন। মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির কমান্ডে তাঁরা পদে পদে শত্রুবাহিনীর লাশ ফেলে যাচ্ছিলেন। রুশবাহিনীর জন্য স্থলপথে এগোনো তাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে তারা ছত্রীসেনা নামানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মুজাহিদবাহিনী বিমানহামলা এবং ছত্রীসেনাদের আক্রমণ থামাতে না পারলেও স্থলপথে শত্রুর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সাওরের আশেপাশে পৌঁছাতে সোভিয়েতবাহিনীর পুরো দুই সপ্তাহ লেগে যায়। ইতিমধ্যে মুজাহিদরা তাদের

পুরো এক ব্যাটালিয়নকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তাদের ৫০০ সেনার মাত্র ৭০ জন কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। তারপরও যুদ্ধ পুরোদমে অব্যাহত থাকে। কয়েকদিন যাবৎ যুদ্ধ এমন তুমুলভাবে চলছিল যে, শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ী হবে তা অনুমান করা যাচ্ছিল না। অবশেষে ছত্রীসেনাদের সহায়তায় সোভিয়েতবাহিনী সাওরে ঢুকতে সমর্থ হয়।

রাশিয়ার দখলে সাওর

সাওরে উভয় পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ চলছিল। উভয় পক্ষের বিপুলসংখ্যক লোক যুদ্ধের খড়িতে পরিণত হচ্ছিল। খুবসম্ভব মুজাহিদরা তাদের পেছাতে বাধ্য করে দিতেন; কিন্তু ইতিমধ্যে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি বিমানহামলায় মারাত্মক আহত হয়ে পড়েন। ফলে গোপন পথে মুজাহিদরা এলাকাটি খালি করে দেওয়া জরুরি মনে করেন। হাক্কানিকে তখন পাকিস্তানে পৌঁছে দেওয়া হয়। আর মুজাহিদদের অধিকাংশ সদস্যও সফলভাবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে তাঁদের ২৫০ সদস্য শাহাদাতবরণ করেন। এভাবে ২৪ এপ্রিল সাওর রাশিয়ার দখলে চলে যায়। এখান থেকে বিপুল অস্ত্র বেরিয়ে আসে। আফগান সরকার ও রাশিয়া এই বিজয়কে তাদের যুদ্ধ-ইতিহাসের ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত করে। বলা হয়ে থাকে, সাওরে মুজাহিদবাহিনী এ জন্য আফগান ও রুশ বিমান আর ছত্রীসেনাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি যে, তাদের কাছে যেসব বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল, তা মাত্রাহীন ব্যবহারের কারণে সঠিকভাবে কাজ করার উপযোগী থাকেনি। সম্ভবত মুজাহিদদের জানা ছিল না, এই অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলোও অব্যাহত ব্যবহারের কারণে অকেজো হয়ে যেতে পারে। বিষয়টি তাদের জানা থাকলে তারা তোপগুলোকে বিরতি দিয়ে ব্যবহার করতেন, সেগুলো ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ দিতেন।

মোটকথা, রুশবাহিনী সাওর দখল করে নেয়। তবে এর দখল বেশিদিন ধরে রাখা তাদের কপালে ছিল না। মুজাহিদরা দ্রুত নিজেদের সংগঠিত করে পূর্ব-আফগানিস্তানে পুরো শক্তি নিয়ে রুশবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কাবুলে রুশ-ঘাঁটি বিধ্বস্ত

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট কমান্ডার আবদুল হক কাবুলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আচমকা শহরে হামলা চালিয়ে বসেন। তাঁর মুজাহিদরা সেখান থেকে MM 107 ও BM 12 মিসাইল দ্বারা আঘাত হানেন। তাঁদের টার্গেট ছিল কাবুলের অন্তর্গত সোভিয়েতবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি। মিসাইল বিস্ফারিত হলে সেখানে থাকা অস্ত্রগোদামে আগুন ধরে যায়। ফলে ভয়ংকর আওয়াজ তুলে সেখানকার মিসাইলগুলো

একের পর এক আকাশমুখো উত্থিত হতে থাকে। পুরো কাবুলে যেন বয়ে যেতে থাকে এক বিভীষিকাময় ভূমিকম্প। ভয়ংকর এ হামলায় হাজারের মতো রুশ ও আফগান সেনা নিহত হয়। রুশরা এই হামলার প্রতিশোধ নিতে মুজাহিদদের অকেজোপ্রায় রাওয়ালপিন্ডির ক্যাম্প ধ্বংস করে দেয়।

কারমালের শিক্ষণীয় পরিণতি

নাজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই কারমাল সাবেক প্রেসিডেন্ট দাউদ খান, নুর মুহাম্মাদ তারাকি ও হাফিজুল্লাহ আমিনের পরিণতি বরণ করে। তার সম্পর্কে তখন আফগানিস্তানে ব্যাপক গুজব প্রচারিত হতে থাকে। তবে গ্রহণযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে কারমাল অব্যাহতি নেওয়ার পরেই তাকে নিরাপত্তা হিফাজতে নিয়ে এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন থেকে তার কোনো খবর পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখানে একটি বিষয় সবার জানা দরকার যে, কারমাল ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপর প্রেসিডেন্ট-ভবন ফায়ারিংয়ের আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছিল। এদিকে ওই দিনই রুশ সেনারা কাবুলের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে তুলে নিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট-ভবনে কী ঘটেছিল? বিস্তারিত জানা না গেলেও কেবল এটুকু জানা যায়—কারমালের সৎভাইকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং সে লাপাত্তা হয়ে যায়।

কারমালের সঙ্গে এ আচরণ পরচম পার্টির সদস্যদের জন্য ছিল সহ্যের বাইরে। সুতরাং তারা নাজিবুল্লাহ ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কার্যক্রম শুরু করে। নাজিবুল্লাহ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জুনের শুরুর দিকে কারমালের সহযোগী দ্বারা গুলির নিশানা হয়। তবে আহত হলেও শেষপর্যন্ত সে প্রাণে বেঁচে যায়। ২৫ নভেম্বর সে আরেকবার প্রাণঘাতী আক্রমণের শিকার হয়। এ আক্রমণও কারমালের সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এবারও সে আহত হয় এবং শেষতক বেঁচে যায়। ডা. নাজিব নিজেই আগে কারমালের সহযোগীদের টার্গেট করেছিল। এ পর্যায়ে তাদের ওপর তার আক্রমণের মাত্রা বাড়তে থাকে। সুতরাং সে কারমালের পিতা জেনারেল হুসাইনকে গ্রেপ্তার করে এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেয়। পরে কারমালের সহযোগীদের একেজনকে টার্গেট করে হত্যার অভিযান শুরু করে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে জানা যায়, কারমালকে গোপন নিরাপত্তা হিফাজতে রেখে হত্যা করা হয়েছে। তবে কিছুদিন পর এই সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাকে মস্কোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে সে নাজিবের বিরুদ্ধে পরচম পার্টির তৎপরতার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যেতে থোকে। এরপর ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মস্কোয় মারা যায় কারমাল।

নতুন মোড়ে আফগান জিহাদ

নাজিবের ক্ষমতাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আফগান জিহাদ তীব্রতা ও চূড়ান্ত কার্যক্রমের এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। মুজাহিদদের সারিতে নতুন নীতি ও শৃঙ্খলা দেখা যেতে থাকে। এ পর্যায়ে তাঁদের আক্রমণগুলোতে এক অপূর্ব আবেগ পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ দলে দলে মুজাহিদদের সারিতে যোগ দিচ্ছিল। তখন সে-সকল লোকও মুজাহিদদের সাহায্য করছিল, যাদের অন্তরে তখনো রুশদের প্রতি কিছুটা সুধারণা বাকি ছিল। তারা যখন দেখতে পায়, সোভিয়েত রাশিয়া কারমালকে পর্যন্ত ক্ষমা না করে নাজিবের মতো এক রক্তখেকো নেকড়েকে ক্ষমতার মঞ্চে বসিয়ে নিয়েছে, তখন পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ে। তখন তাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়—আফগানিস্তানের উন্নতি কিংবা পুনর্নির্মাণ কোনোটাই রুশদের উদ্দেশ্য নয়; তারা শুধু এই দেশকে একটি মৃত্যুখাদ বানিয়ে রাখতে চায়।

নাজিব এক রক্তখেকো হিংস্র

এখন পর্যন্ত ক্ষমতার মঞ্চে আসা কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে নাজিবের চরিত্রই ছিল সর্বাধিক ঘৃণ্য ও হিংস্র। আগেই বলা হয়েছে, সে ছিল আফগানিস্তানের সর্বকালের কলঙ্ক গোপন এজেন্সি 'খাদ'-এর নেতা। রাশিয়ার কেজিবি ও ভারতের র-এর যৌথ ঔরস থেকে এই সংকর এজেন্সির জন্ম। ওই উভয় শক্তি নাজিবকে এই এজেন্সির নেতার আসনে বসানোর আগে তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে। প্রতিটি পরীক্ষায় নাজিব তার দেশের জনগণের রক্তে নিজ হাত রাঙিয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়। সে খাদের চেয়ারম্যানের আসনে বসে পুরো আফগানবাসীর জন্য এক মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

খাদের কল্পনাতীত কর্মকাণ্ড

খাদ আফগান জনগণের ওপর মানবতাবিরোধী যে নির্যাতন চালায়, তা বিস্তারিত লিখতে হলে কয়েক শত পৃষ্ঠার দরকার। এখানে তার কিঞ্চিত ঝলকটুকুই দেখুন :

- নাঙ্গাহারের 'হিশার শাকি' গ্রামের এক স্কুল-শিক্ষককে অপহরণ করে তার ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হয়। এরপর তাকে আহত অবস্থায় একটি ছোট্ট কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়। ঘরটি ছিল বিষাক্ত মাছি দ্বারা পূর্ণ। এসব মাছির দংশনে শিক্ষক দৃষ্টি ও শ্রবণক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তাঁকে এভাবে নির্যাতন করা হয়। এই শাস্তি শুধু এ অপরাধে দেওয়া হয়েছিল যে,

তিনি স্কুলে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতার ছেলেকে পাঠবিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন।

- ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ আগাকে ১১ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে অপহরণ করে এক বিষাক্ত ধোঁয়া-ভরা কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়। সে ঘরে বৈদ্যুতিক ছড়ি দ্বারা পেটানো হয় তাদের। চার শিক্ষার্থীকে জীবন্ত দাফন করা হয়। বাকিরা অত্যাচার সইতে না পেরে শাহাদাতবরণ করে। মুহাম্মাদ আগার বক্তব্যমতে, তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরফে চুবিয়ে রাখা হতো। প্রতিদিনি পাঁচবার ইলেক্ট্রিক ছড়ি দ্বারা পেটানো হতো। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ওই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- সাবেক সেনা ইসরারুদ্দিনের বক্তব্য হচ্ছে, তাকে মুজাহিদ সন্দেহে গ্রেপ্তার করে ১৮ মাস বর্ণনাতীত অত্যাচার করা হয়। রাতে কয়েকবার জাগিয়ে তোলা হতো। টেনে টেনে লোম উপড়ে ফেলা হতো। শরীরে ঢেলে দেওয়া হতো টগবগ করে ফুটতে থাকা পানি। ছাদ থেকে উলটোভাবে ঝুলিয়ে গলায় বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হতো। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সারা রাত বরফে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।
- লোগারের এক ফার্মাসিস্টকে গ্রেপ্তার করে ছোট্ট এক কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়। কক্ষটি ছিল পানিতে পরিপূর্ণ। খাদের এজেন্টরা প্লাস দিয়ে তার শরীরের লোম উপড়ে ফেলে। আর ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া এবং ইলেকিট্রিক ডান্ডা দিয়ে পেটানো তো ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার।



সাইয়িদের লোকহর্ষক দাস্তান

নাঙ্গাহার প্রদেশের রুনাত জেলার সাইয়িদ নামের এক স্কুল-শিক্ষককে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেপ্তার করে একটি খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়। পরে তাকে উলঙ্গ করে শরীরে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়া হয়। ফলে পুরো শরীরে বড় বড় ফোসকা পড়ে যায়। পরদিন ওই দগ্ধ শরীরে পুনরায় ফুটন্ত তেল ঢালা হয়। এ ছাড়াও তার ওপর এমনসব নির্মম নির্যাতন চালানো হতো যে, তিনি প্রায় বেহুঁশ হয়ে যেতেন। ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন ক্ষুধার্ত রাখা হতো। পানি চাইলে পান করতে দেওয়া হতো লবণ মেশানো তেতো পানি। এরপর তার কাছ থেকে জোরপূর্বক একটি কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। ওই কাগজে তার না করা অসংখ্য অপরাধের স্বীকারোক্তি ছিল। তিন বছর এ ধরনের অকথ্য নির্যাতনের পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতেবার গুলের কাহিনি

জালালাবাদের এক দোকানি ইতেবার গুল বলেন, 'খাদের এজেন্টরা আমার দোকানে অভিযান চালায়। কোনো অবৈধ জিনিস না পেলেও আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এরপর লাগাতার ১০ ঘণ্টা বরফের বিছানায় শুইয়ে রাখে। ফলে আমার পুরো শরীর অবশ হয়ে আসে। এরপর সেখান থেকে বের করে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। প্রতিটি শকে আমি কয়েক ফিট উপরে উঠে ধড়াম করে নিচে পড়ে যেতাম। এভাবে পুরো রাত বৈদ্যুতিক শক আর বৈদ্যুতিক ডান্ডার আঘাত খেতে খেতে অতিবাহিত হয়। প্রতিদিন এভাবে নির্মম নির্যাতন চলতে থাকে। প্রতিদিনই একটি গাড়ি আসত। গাড়ি দেখলেই বন্দিদের লোমকূপ কাটা দিয়ে উঠত। গাড়িটি এখান থেকে কিছুসংখ্যক বন্দিকে নিয়ে যেত। সেটি চলে যাওয়ার পর যারা এখানে থাকত, তারা ডুকরে ডুকরে কাঁদত। পরে জানতে পারি, এখান থেকে নেওয়া বন্দিদের থেকে দৈনিক পাঁচজনকে জীবন্ত দাফন করা হয়ে থাকে।

বৈদ্যুতিক শক এবং...

ফসিহ উল্লাহ কাবুল বিমানবন্দরে কাজ করতেন। তাকেও সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে খাদের নির্যাতনক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তদন্তকর্মকর্তা আমার কাছ থেকে প্রার্থিত উত্তর না পেলে একটি তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে আমার ডান ও বাম হাতের নখগুলো উপড়ে ফেলে। দৈনিক দুটি করে নখ ওপড়ানো হতো। নখ ওপড়ানোর পর আসে লোম ওপড়ানোর পালা। তারা প্লাস দিয়ে চেপে ধরে লোম উপড়ে নিত। ফলে আমার শরীরের কোথাও একটি লোমও বাকি থাকেনি। এরপর শুরু হয় দাঁত ওপড়ানোর পালা। তিন মাস ধরে বর্ণনাতাতীত কষ্ট দেওয়ার পর আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের দপ্তরে নিয়ে সুন্দর একটি গালিচায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এই গালিচার নিচে যে ইলেকট্রিক তারের জাল বিছানো ছিল, তা আমার জানা ছিল না। তারা একটি বটম চাপতেই গালিচা আমাকে ছাদের দিকে ছুড়ে মারে। আমি তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই। হুঁশ এলে নিজেকে একটি বিছানায় আবিষ্কার করি। বিছানাটিতেও ইলেকট্রিক তার জড়ানো ছিল। খাদের এজেন্ট বার বার বটম চেপে আমাকে ভয়ংকর শক দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবারই আমি বিছানা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মেঝেতে পড়েছিলাম।

এরপর আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিয়ে আসা হয়। মন্ত্রী আমাকে উলঙ্গ করে একটি দরজার মাঝামাঝি দাঁড় করায়। এমনভাবে দাঁড় করানো হয় যে, আমার বিশেষ অঙ্গ দরজার উভয় পাটের মধ্যখানে থাকে। এরপর হঠাৎ করে দরজাটি এত জোরে বন্ধ করা হয় যে, আমার বিশেষ অঙ্গটি একেবারে থেঁতলে যায়। আমি চিৎকার করি; কিন্তু তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তিন ঘণ্টা ওই বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকি। দরজা যখন

খোলা হয়, ততক্ষণে আমি চিরদিনের মতো পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলি। ১৫ দিনের দুঃসহ নির্যাতন আর দীর্ঘ এক মাসের নির্জন বন্দিদশার পর আমাকে ছয় বছর পর্যন্ত সাধারণ জেলখানায় ফেলে রাখা হয়।

নাজিববিরোধী আফগানদের আবেগ-উত্তেজনা

উল্লিখিত নির্যাতনের দাস্তান থেকেই অনুমান করা যায়, খাদ আর তার নেতা নাজিবুল্লাহ আফগান জনগণের মনে কোন ঘৃণার অবস্থান দখল করে রেখেছিল। এ জন্যই দেখা যায়, নাজিব ক্ষমতায় আসার পরপরই আফগান সাধারণ জনতার প্রতিশোধের নেশা অধিকতর তীব্রতর হয়ে ওঠে। মুজাহিদদের সারিতে সে-সকল লোকও অংশ নিচ্ছিল, যারা ব্যক্তি-আক্রোশ মেটাতে নাজিব সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে চাচ্ছিল। তখন আমু দরিয়ার তীর থেকে পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত যেন যুদ্ধের বান ডাকছিল। যুদ্ধের পরিসংখ্যানের গড় যা এতদিন ৩৫০ অভিযানের মধ্যে সীমিত ছিল, এ পর্যায়ে তা ৫০০ অভিযানে উন্নীত হয়।

মুজাহিদদের অস্ত্র

পাকিস্তানের পথ দিয়ে মুজাহিদদের হাতে দেদার অস্ত্র আসছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান মুজাহিদদের হাতে স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবার তার ফলাফল চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা যায়। মুজাহিদরা অতি দ্রুত স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র চালনা শিখে ফেলেন। বিমানবিধ্বংসী এই অস্ত্রের সবচেয়ে উত্তম দিকটি ছিল—এটি একজনেই কাঁধে বহন করে ব্যবহার করতে পারত। এর সেনসেটিভ ক্যামেরা ও ইনফ্রারেড সেন্সর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লক্ষ্য নির্ধারণ সহজ করে দেয়। মুজাহিদরা এই অস্ত্রের মাধ্যমে গড়ে ৬০/৭০ শতাংশ সঠিক নিশানা নির্ধারণে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে তাঁরা অসংখ্য শত্রুবিমান ও হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেন। মুজাহিদদের সঠিক নিশানা নির্ধারণের হার খোদ স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্রের নির্মাণ কোম্পানির কর্তাদের লক্ষভেদ ছাড়িয়ে যায়। তাদের দ্বিতীয় সফল অস্ত্র ছিল MB 12 কামান, যার রেঞ্জ ছিল আট থেকে নয় কিলোমিটার পর্যন্ত। এসব কামান ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মুজাহিদদের হাতে আসে।

৭ আরপিজি রকেট লাঞ্চার ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয়তম অস্ত্র—যা ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, ট্রাক, ফাঁড়ি, বিল্ডিং, পদাতিক শত্রুর সারিসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করে দিতে পারত। এ ছাড়া মুজাহিদ দলগুলোর কাছে নিম্নোক্ত অস্ত্রও ছিল :

- মর্টার তোপ : 60 MM. 82 MM. 107 MM.

- পুনর্ব্যবহারযোগ্য রাইফেল : 72 MM. 82 MM. 122 MM.
- অ্যান্টি-পার্সোনেল Anti-Personnel weapon ও অ্যান্টি ভেহিকল মাইন।
- স্যাম মিসাইল।
- ব্লু পাইপ মিসাইল।
- ভারী স্ট্রেনগান 12 MM.
- জিকভিক 14.5 MM, Z.KI

ব্যক্তিগত অস্ত্রের মধ্যে ক্লাশিনকোভ ও গরিওনভ সাব স্ট্রেনগানের ব্যবহার ছিল বেশি।

নাজিবের একতরফা যুদ্ধবিরতি

মুজাহিদদের ক্রমবর্ধমান হামলা ও নিজের অব্যাহত পরাজয়দৃষ্টে ভীত হয়ে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে নাজিব মুজাহিদদের কাছে আচমকা একতরফা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। তার আশা ছিল তাঁরা এর ইতিবাচক জবাব দেবেন। কিন্তু মুজাহিদ নেতারা একে নাজিবের একটি প্রতারণা আখ্যা দিয়ে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেন। এরপরও ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি নাজিব ছয় মাসের জন্য একতরফা যুদ্ধযুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়ে তার এই পদক্ষেপকে 'আশতি মিল্লি' তথা 'জাতীয় স্বার্থ' নাম দেয়। এর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট সরকারগুলোর সাবেক নীতি অনুযায়ী মুজাহিদদের 'আশরার' সম্বোধন না করে সে 'শোকাহত ভাই' নামে ডাকা শুরু করে।

মুজাহিদদের প্রতিক্রিয়া

মুজাহিদ নেতারা জানতেন নাজিবুল্লাহ আফগানিস্তানে কমিউনিজম এবং এর অনুসারীদের নিশ্চিত পতন দেখে নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যেই এসব করছে। তাই তাঁরা তার ধোঁকায় মোটেও প্রভাবিত হননি। ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৭ নাজিবুল্লাহর যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেওয়ার পরপরই মুজাহিদরা বড় ধরনের হামলা শুরু করেন। নাজিব তখন বার বার ঘোষণা দিচ্ছিল—মুজাহিদরা যদি যুদ্ধ বন্ধ না রাখে, তাহলে আগের চেয়ে অধিক রক্তপাত ঘটবে। কিন্তু তাঁরা এই ঘৃণ্য গৃধ্রের আওয়াজে কান দেওয়ার কোনোই গরজ অনুভব করেননি।

তুমুল যুদ্ধ

আসলে নাজিব ও রুশবাহিনী কথিত এই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে নিজেদের কিছুটা সামলে নিতে চাচ্ছিল। তাদের পরিকল্পনা এ থেকেই পরিষ্কার অনুমিত হয়, জাতীয় স্বার্থের

ঘোষণা দেওয়ার মাত্র ২১ দিনের মাথায় কাবুল থেকে আফগান ও রুশ যৌথবাহিনীর এক বিশাল কনভয় কান্দাহার অভিমুখে বের হয়। তারা কান্দাহারের আশপাশের দক্ষিণাঞ্চলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষ ও ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে কান্দাহার রক্তাক্ত যুদ্ধেকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ৩১ জানুয়ারি মুজাহিদরা এক প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে কান্দাহারের অস্ত্রডিপো ধ্বংস করে দেন। এতে ১১ সেনাও মারা যায়। ইতিমধ্যে কাবুল থেকে অগ্রসরমান কনভয়ও সেখানে এসে পৌঁছায়। মুজাহিদরা পূর্ণোদ্যমে তাদের মোকাবিলা করছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারির এক সংবাদে জানা যায়, সেখানে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধে ৫০ রুশ সেনার মৃত্যুর পাশাপাশি ১৫ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। শেষপর্যন্ত রুশদের হামলা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং ময়দান মুজাহিদদের হাতেই থেকে যায়। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, নামকাওয়াস্তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে ১ হাজার ৪০০ রুশ-আফগান সেনা নিহত হয়। সারকথা, নাজিবের যুদ্ধবিরতির নাটক একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুজাহিদদের ঝোড়ো আক্রমণ

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে মুজাহিদরা কান্দাহার বিমানবন্দরে এক কঠিন আক্রমণ চালান। হামলায় রুশদের ১৪টি বিমান ও হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়। এপ্রিলের শেষ দিকে নাজিব ঘোষণা দেয়, তার একতরফা যুদ্ধবিরতির মিশন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। তখন মুজাহিদরা উত্তর আর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতেও ঝোড়োগতির হামলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ৯ মে মুজাহিদবাহিনী হেরাতের দক্ষিণে চারটি সেনাফাঁড়ি দখল করেন। ১৯ মে বলখে দুটি বোমারুবিমানসহ একটি গোয়েন্দাবিমান ভূপাতিত করা হয়। ২১ জুলাই কাবুলের পাশেই ধ্বংস করা হয় তিনটি হেলিকপ্টার। জুনে আরগানদাব ও ড্যান্ড এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে থাকে। দীর্ঘ লড়াই শেষে মুজাহিদরা শত শত রুশ সেনাকে হত্যা করে শত্রুদের পেছাতে বাধ্য করেন। এদিকে গারদেজে লড়াইরত সেনাদের সহায়তায় কাবুল থেকে একটি সতেজ বাহিনী বেরিয়ে যায়। কিন্তু পথেই মুজাহিদবাহিনী তাদের আটকে দেয়। কঠিন লড়াই শেষে এই রেসকিউ বাহিনী পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এটি ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুনের ঘটনা। ২৭ জুন মুজাহিদরা নাঙ্গাহারে রুশদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফাঁড়ি দখল করেন। একই দিন লোগার প্রদেশে রুশবাহিনীর অবরোধ ভেঙে ফেলা হয়। ২৯ জুন হেরাতের একটি ঘাঁটি ধ্বংস করে সেখানে থাকা ১৫০ সেনাকে হত্যা করা হয়। একই দিন পাকতিয়া প্রদেশে অস্ত্রের বড় একটি ডিপো মুজাহিদদের হস্তগত হয়। ৩০ জুন তাঁরা ফারাহ প্রদেশে ৪৫ রুশ-আফগানা সেনাকে পরপারে পাঠিয়ে দেন। ওইদিন সংবাদ

আসে, উত্তরে বাদাখশানের 'শহরবুজুর্গ' নামের জনপদ রুশদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। একই দিন সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা প্রচারিত হয় যে, 'আমরা আফগানিস্তানে আমাদের আকাশশক্তি ধ্বংসের ঘটনা মোটেও আর সহ্য করব না।' তবে বিশ্ববাসী সোভিয়েত রাশিয়ার এই বক্তব্যকে তাদের পরাজয় হিসেবে গণ্য করে। এ যেন ছিল প্রকারান্তরে তাদের পরাজয়ের স্বীকৃতি।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জিহাদে অংশগ্রহণ

কয়েকদিনের এই সফল কার্যক্রম থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কত দ্রুত মুজাহিদবাহিনী ফাতহুম মুবিনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছিল। ইমানি শক্তি, নিষ্ঠা, দুঃসাহস, দৃঢ়তা আর মাতৃভূমি-প্রেম ছাড়াও মুজাহিদদের বিজয় ও সফলতার আরেক কারণ ছিল—তাদের প্রতি স্থানীয় অধিবাসী আর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ সমর্থন। শত শত জনপদ এমন ছিল, যেখানকার অধিবাসীরা পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে জিহাদে অংশ নিত। গেরিলাযুদ্ধের জন্য স্থানীয় জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থনকে প্রথম শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। মুজাহিদরা এই সমর্থন শতভাগই পাচ্ছিলেন। কেননা, এই যুদ্ধ ছিল আফগান জনতার যুদ্ধ।

মুজাহিদদের গোপন এজেন্ট

মুজাহিদরা শুধু মাঠ আর পাহাড়েই জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন না; বরং শহরেও তাঁদের গোয়েন্দাবাহিনী ছড়ানো-ছিটানো ছিল। তাঁদের নিজস্ব গোয়েন্দা-ব্যবস্থাপনা ছিল। এর মাধ্যমে তাঁরা শত্রুর উদ্দেশ্য জেনে যেতেন। তাদের গোয়েন্দারা ড্রাইভার, কাঠুরে, রাখাল, ভিখারি আর ফেরিওয়ালার বেশে গ্রাম থেকে কাবুলের সরকারি দপ্তর পর্যন্ত অবাধে বিচরণ করত। এঁদের মধ্যে কতিপয় গোয়েন্দা থাকত অত্যাধুনিক গোয়েন্দা-যন্ত্রাদি সজ্জিত। তাঁরা অত্যন্ত গোপন বার্তা হাতিয়ে নিয়ে নেতাদের কাছে পৌঁছে দিত।

রহমত খানের কাহিনি

রহমত খান ছিলেন অনুরূপ একজন মহান মর্দে মুজাহিদ, যিনি টানা আট বছর অন্ধ ভিখারির বেশে রুশ শিবিরে গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কাবুলের সেনা হেডকোয়ার্টারের সামনের সড়কে ভিক্ষা করতেন। তাঁর পকেটে অতি ক্ষুদ্রাকায় শক্তিশালী একটি গোয়েন্দা-ক্যামেরা থাকত। ক্যামেরাটি সেকেন্ডে ১২টি ছবি তুলতে সক্ষম ছিল। মুজাহিদদের জনাকয়েক কমান্ডার ছাড়া রহমত খানের মূল অবস্থা সম্পর্কে কেউ কিছুই জানত না। তাঁর সরবরাহকৃত তথ্য এবং ক্যামেরায় ধরা পড়া

জ্বলন্ত প্রমাণের মাধ্যমে তাঁরা জেনে যেত, কারা রুশবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কোন কোন গাদ্দার মুজাহিদদের সারিতে ঢুকে রুশদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। ফলে রুশদের ওই বিশ্বস্তজনদের চোখে চোখে রাখা হতো। এরপর অতিরিক্ত প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পর তাদের শেষ করে দেওয়া হতো।

বছর কয়েক পর এক রুশ অফিসার রহমত খানের ওপর সন্দিহান হয়ে ওঠে। সে তাঁর পিছু অনুসরণ করে কাবুলস্থ তাঁর গোপন আস্তানায় অভিযান চালায়। সেখানে এক মুজাহিদ সংগঠনের কতিপয় সদস্য ছিলেন। তাদের সবাইকে তখন শহিদ করা হয়। এরপর তল্লাশি চালালে এমন একটি ফাইল বের হয়, যে ফাইলে আফগানিস্তানের এমন আড়াই হাজার মানুষের তথ্য বেরিয়ে আসে, যারা কোনো-না-কোনোভাবে রুশদের জন্য কাজ করছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা ছিল, তারা কোন কোন রুশ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, সেসব ছবিও সংরক্ষিত ছিল। এরপর রহমত খানকে সেনা হেডকোয়ার্টারের সামনে ভিক্ষা করা অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়। অত্যাচারের সব পদ্ধতি ব্যবহারের পরও রুশরা তাঁর কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। অবশেষে তাঁকে শহিদ করা হয়।

মোটকথা, তারা আফগানিস্তানে মুজাহিদদের প্রাণোৎসর্গকারী এমন গোয়েন্দা-নেটওয়ার্ক শেষ করতে পারেনি, যাঁরা শত্রুর ভেতরে ঢুকে তাদের শিরা-কাটা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন কতিপয় গোয়েন্দার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি মুজাহিদরা তাখার প্রদেশে 'খাদ'-এর চার কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তাদের শরয়ি আদালতে তোলেন তাঁরা। তারপর অপরাধ প্রমাণিত হলে ফাঁসির মাধ্যমে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। গোয়েন্দারা এতই চৌকস ছিল যে, মন্ত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও পর্যন্ত তাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল না। মুজাহিদরা এমন বিশেষ লোকদেরই টার্গেট করতেন এবং প্রায় সবখানে তাঁরা সফল হতেন। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুন তাঁরা কান্দাহারের গভর্নরের ভাইকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন। ৭ জুন সংবাদপত্রে যখন প্রচার হয়—মুজাহিদরা পাকতিয়ার গভর্নরকে তার ছয় নিরাপত্তারক্ষীসহ হত্যা করেছে, তখন শত্রুশিবিরে যেন ভূমিকম্প বয়ে যায়।

নাজিবের পক্ষ থেকে মুজাহিদদের ক্ষমতায় অংশগ্রহণের আহ্বান

এদিকে নাজিব বিশ্ববাসীকে বোকা বানাতে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ আগস্ট পর্যন্ত তার একতরফা যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। সে তার ধারণামতে, নিজে 'শান্তিদূত' হওয়ার চেষ্টা চালায়; কিন্তু তার কোনো প্রয়াসই হালে পানি পাচ্ছিল না। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নাজিব আরেক চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। সে মুজাহিদদের ক্ষমতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। ঘোষণা করে, সে পররাষ্ট্র ও

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়া প্রেসিডেন্ট, ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীসহ ২৬টি মন্ত্রণালয় মুজাহিদদের জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আসলে তার ঠোঁট রাশিয়ার শেখানো কথাগুলোই উচ্চারণ করছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যেকোনোভাবেই হোক মাঠের পরাজয়ের লজ্জাজনক দৃশ্যগুলো যাতে আর বিশ্বময় ছড়িয়ে না পড়ে। পাশাপাশি মুজাহিদরা যেন ক্ষমতার গন্ধে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করে। কিন্তু মুজাহিদরা পরিণাম চিন্তা করে এই প্রস্তাবও নাকচ করে দেন। তাঁরা ঘোষণা দেন, আমরা রুশদের পুরোপুরি সেনাপ্রত্যাহার এবং কাঠপুতুল সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

নাজিব ও জালালুদ্দিন হাক্কানির মধ্যে চিঠি আদানপ্রদান

নাজিব সন্ধি আলোচনার ধোঁয়া তোলার পাশাপাশি আলদাভাবে চিঠি যোগাযোগের মাধ্যমে মুজাহিদ নেতাদের সহমর্মিতা আদায়ের চেষ্টা চালায়। সে মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির নামে নিম্নোক্ত চিঠি পাঠায়,

> *চলমান যুদ্ধে আমাদের ও আপনাদের পক্ষে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলমান মারা যাচ্ছে। পাখতুনদের পাশাপাশি আফগান গ্রামাঞ্চলের বিপুলসংখ্যক বাড়ি-ঘর মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। তাই দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা জন্য আমরা সন্ধির পথে হাঁটতে উদ্‌গ্রীব। 'আল্লাহর কাছে পানাই চাই' আমার বিপ্লবী সরকার কোনোভাবেই নাস্তিক্যবাদী সরকার নয়। তারা পবিত্র ইসলামকে মূল্যহীন কিংবা মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে না। সংবিধানের দ্বিতীয় দফামতে ইসলামকে দেশের ধর্ম হিসেবে সম্মান দেখানো সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সীমিতসংখ্যক সেনা দেশে এখনো মোতায়েন রয়েছে, তারা যখনই আমাদের মধ্যে সন্ধির সম্ভাবনা দেখবে, তখনই দেশ ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। সোভিয়েত সেনারা আফগানিস্তানে শুধু শুধু বৈদেশিক হস্তক্ষেপ রোধ করতে এসেছে, যাতে আফগানিস্তান দ্রুত একটি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। আমরা আপনাকে এবং আপনার ব্যক্তিগত অবস্থানকে যথাযথ মূল্যায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা সমৃদ্ধ, পবিত্র ও তাকওয়াবান একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের সুদৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছি।*

মাওলানা জালালুদ্দিন নিম্নোক্ত ভাষায় ওই চিঠির জবাব দেন,

> আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে নাস্তিক্যবাদ, কমিউনিজম, সোশালিজম এবং কুফরির পৃষ্ঠপোষক হয়ে আছেন। আপনার অপচেষ্টার ফলেই তো আফগানজাতি ও

মুজাহিদদের বড় একটি অংশ তাদের প্রাণের টুকরো সন্তান, ভাই-বন্ধু, মাতা-পিতা ও স্বজনদের হারিয়ে ফেলেছে। আপনার বরকতময় (!) হাতের কল্যাণে ১০ লাখ আফগান নাগরিক রুশদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হয়েছে। ৫০ লাখের বেশি মানুষ জন্মভূমি ছেড়ে ভিনদেশের আশ্রয়শিবিরগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা তো জানি, যে দিন এখানে রুশ লাল ফৌজের সহযোগী-সরকার তাদের আসন পাকাপাকি করে নিতে সফল হবে, কেবল তখনই তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তারা কি এ ছাড়া অন্য কিছু চায়? এখন তারা চরম অস্থির ও দুর্দশার জীবনযাপন করছে।

আমি অবাক হচ্ছি, একদিকে আপনি সোশালিজমের পথ অবলম্বন করে আছেন, অপরদিকে নামকাওয়াস্তে হলে সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কীভাবে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন? শুধু কি এই একটিমাত্র দফার মাধ্যমে রুশদের অত্যাচার, পাশব আচরণ ও হিংসাকে আড়াল করা সম্ভব? পাখতুনদের উদাহরণ তো হচ্ছে—সূর্যকে দুই হাত দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায় না। রুশরা কী জন্য আফগানিস্তানে এসেছে, এটা কোনো স্বপ্ন নয়; বরং জীবন্ত বাস্তবতা। বিগত আট বছর ধরে আপনার পূর্বসূরি ও কমিউনিস্ট গুরুদের সঙ্গে জীবনের দাস্তান কি আপনার স্মরণ হয় না? নুর মুহাম্মাদ তারাকিও তো জাতীয় স্বার্থের ঘোষণা দিয়েছিল। এরপর সে যখন তার পরিণতির শিকার হয়, তখন মঞ্চে আসা হাফিজুল্লাহ আমিনও সেই একই জিগির তোলার মধ্যে নিজের কল্যাণ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে-ও বেশিদিন সুযোগ পায়নি। খুব দ্রুতই তার প্রভুরা দারুল আমানের মেঝেতে তার গোশত, রক্ত আর হাড্ডি একাকার করে রাখে। এরপর কারমাল এসে সেই পুরানো গীত গাওয়ার পাশাপাশি লোকদেখানোর জন্য ধর্মীয় কিছু বিধান পালনের সুযোগ করে দেয়। মুক্ত করার ঘোষণা দেয় বন্দিদের। এরপর যেইমাত্র তাকে পুলচারখির জেলখানায় নিয়ে আসা হয়, তখনই আপনি আপনার পূর্বসূরিদের অনুকরণে তার সঙ্গে একই আচরণ করেছেন। এবার আপনার পালা। খুব দ্রুতই আপনাকেও আপনার প্রভুদের ইঙ্গিতে জেলখানায় পঁচতে থাকার অথবা লাঞ্ছনাকর মৃত্যু, যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে। আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই অতীতের সবকিছুর জন্য ভুল স্বীকার করে ইসলাম এবং দেশ ও জাতির খিদমত করতে চান, তাহলে আপনাকে নিম্নোক্ত শর্তগুলো মেনে নিতে হবে।

নিজেকে আফগান জনতা এবং ইসলামের পতাকাবাহীদের হাতে তুলে দিন। রুশবাহিনীকে নিঃশর্ত সেনাপ্রত্যাহারে বাধ্য করুন। আপনার পাশে থাকা মুরতাদ এবং কমিউনিজম দর্শনে বিশ্বাসীদের হত্যা করুন। খোস্ত, গারদেজ ও ওরগুনের

মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে কেন্দ্র বানিয়ে সেনা অভিযান বন্ধ রাখুন। আপনার পক্ষ থেকে যখন এসব প্রকাশ পাবে, তখনই কেবল আমরা আপনার সঙ্গে আলোচনার চিন্তা করতে পারি।

নাজিবুল্লাহ এমন দাঁতভাঙা উত্তরের আশা করছিল না। সে কিছুদিন চিন্তাভাবনার পর আরেকটি চিঠি লেখে। সে তাঁকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল যে, তাঁর সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং সে তাঁকে অনেক কিছু দিতে রাজি। যেহেতু কমিউনিস্টদের বিপ্লবী সরকার একসময় মাওলানা হাক্কানিকে হত্যার ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল, তাই নাজিবুল্লাহ বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্য চিঠির সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনামূলক লিখিত একটি বার্তা জুড়ে দেয়। ওই আলাদা চিঠিতে লেখা ছিল—মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি, পিতা ফাতেহ খান, সাকিন জুজান-এর হত্যার আদেশ রহিত করে তাকে ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। চিঠিটি লিখা হয়েছিল ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর। সেটিতে লেখা ছিল,

আমি আপনি ছাড়া কারও সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করিনি। আমি দেশ, ইসলাম এবং আত্মমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নামে ক্ষমালিপি পাঠালাম। এখন দেশে টগবগ করে ফুটতে থাকা আগুন নেভানো দরকার। এই লক্ষ্যে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা অপরিহার্য। আপনি যা কিছু চাইবেন, আমি তা দিতে রাজি। আমি আপনার ও জুজানের পাগড়িগুলোর অপমান করতে চাই না। আপনি যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বস্তিবোধ করেন, তাহলে আমার সাক্ষাতের আগে আপনার কাছে আমার অন্তত ২০ জন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে পণ হিসেবে রাখতেও রাজি আছি। আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটি সুন্দর সুরাহায় আসতে উৎসাহী। এরপরও যদি জুজানের অবস্থা খারাপের দিকে যায়, তাহলে কিন্তু এখানকার বিধবা ও ইয়াতিমদের দায় আমার কাঁধে নয়; বরং আপনার কাঁধেই বর্তাবে।

মাওলানা হাক্কানি এবারও ইমানি চমকসহ মুমিনসুলভ দৃঢ়তা দেখিয়ে নাজিবের এই চাতুর্যের জবাবে লেখেন,

আমার কাছে আপনার ক্ষমালিপি কানাকড়ির মূল্যও রাখে না। ইসলাম ও দেশের মোকাবিলায় এটি নিতান্তই মূল্যহীন একটি বিষয়। কেননা, ইসলামের পথে শাহাদাতই হচ্ছে আমার অভীপ্সা ও গৌরবের বিষয়। বুশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছত্রছায়ায় আমার জীবন যতই ক্ষমতায় পরিপুষ্ট আর জাগতিক সম্পদে

সমৃদ্ধ থাক, এটা আমার জন্য দুনিয়া ও পরকালের জীবনের অভিশাপের বেড়ি আর অসম্মান ছাড়া কিছুই নয়। আপনি লিখেছেন, 'এবার দেশে টগবগ করে ফুটতে থাকা আগুন ঠান্ডা হওয়া উচিত।' কথাটি খুবই চমকপ্রদ এবং এমনটা হওয়া জরুরিও বটে। কিন্তু আপনি কি জানেন না, রক্তের এই সয়লাবের উৎস রুশদের অত্যাচার-অনাচারের ঝিল থেকে। আপনি যদি কমিউনিজমবাদ নিঃশেষ করে ক্ষমতা দেখাতে পারেন, তাহলে দেখবেন রক্তের এই সয়লাব আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে।

আপনি লিখেছেন, 'আপনি জুজানের পাগড়িগুলোর অবমাননা চান না।' কিন্তু কতবার যে আপনি রুশ যুদ্ধবিমানের বোমা এবং ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলায় শত শত নিরপরাধ মাসুম শিশুসহ বিধবা ও ইয়াতিমদের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, তার হিসাব কি রেখেছেন? আপনি জুজানের পাগড়িগুলোকে এর চেয়ে কী আর সম্মান দিতে চান। জুজানের নারী-শিশুদের ইয়াতিম ও বিধবা করার দায়ভার তো আপনার কাঁধে চেপেই রয়েছে।

বন্দিদের সম্পর্কে আমি শুধু এটুকুই লিখতে পারি, আফগানিস্তানে ইসলামের নামে গ্রেপ্তার হওয়া প্রতিটি মুসলমান আমার ভাই। আপনি যদি শুধু জুজান ও পাকতিয়ার বন্দিদের প্রসঙ্গে কথা বলতে চান, তাহলে এদের মুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা যেমন আছে তেমনই থাকুক।



মাওলানা হাক্কানির এমন ইমনদীপ্ত জবাব নাজিবের ধূর্তামি ও কথার মারপ্যাঁচের ওপর পানি ঢেলে দেয়। সে আর মাওলানাকে কোনো চিঠি লেখার সাহস করেনি।

বিজয় কাছেই

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ বছরটি যতই শেষের পথ ধরে হাঁটছিল, মুজাহিদদের বিজয় ততই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদিন হেকমতিয়ার, আহমাদশাহ মাসউদ, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস, প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি, মৌলবি নবি মুহাম্মাদি, প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি, প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফসহ অন্যান্য মুজাহিদ নেতার বক্তব্যগুলো সংবাদপত্রের শিরোনাম হিসেবে শোভা ছড়াচ্ছিল। সাতদলীয় জোট দিন দিন প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মুজাহিদ নেতারা তখন বিজয়োত্তর সরকার গঠনকে কাছেই দেখতে পাচ্ছিলেন। হিজবে ইসলামির নেতা গুলবুদিন হেকমতিয়ার ঘোষণা দিচ্ছিলেন, শীঘ্রই আফগানিস্তানে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা হবে।

চূড়ান্ত ধাপে জেনেভা সংলাপ

মুজাহিদদের দৃঢ়তার ফল প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া জেনেভা সংলাপ এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছিল। বিগত পাঁচ বছর ধরে সেখানে আমেরিকা, রাশিয়া, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রাশিয়া এই বছর আফগানিস্তান থেকে সেনাপ্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। তবে পরিপূর্ণভাবে সেনাপ্রত্যাহারের জন্য তারা চার বছর সময় চায়। এ নিয়ে অন্যরা তেমন কথা না বললেও পাকিস্তান সরকার দ্রুত সেনাপ্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানাচ্ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার সেনা এখানে নিয়ে এসেছিল, একইভাবে তারা দুই সপ্তাহের মধ্যে সব সেনা প্রত্যাহারে সক্ষম।

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধের পরিসংখ্যান

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ তথা মাত্র এক বছরে মুজাহিদ বনাম রুশ-আফগানবাহিনীর মধ্যে ৪,৭৭৬টি যুদ্ধ ঘটে। রুশরা মুজাহিদদের ওপর হামলা করে ১৬৯২ বার। আর মুজাহিদরা করে ২,৯৮৩ বার। সেসব যুদ্ধে রাশিয়া হারায় ২৭২টি হেলিকপ্টার, ২৪৬টি যুদ্ধবিমান, মোট ৫১৮টি আকাশযান। স্মর্তব্য, ইতিপূর্বে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সর্বমোট বিধ্বস্ত বিমান ও হেলিকপ্টারের পরিমাণ ছিল ৬০০টির কাছাকাছি।

এ ছাড়া মুজাহিদদের হাতে ৩,৭৪৬ রুশ ও ৬,৫৭৩ আফগান সেনা নিহত হয়। এমন আরও ৭,৫৩৫ সেনা নিহত হয়, যারা রুশ নাকি আফগান তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। মোটামোটিভাবে ওই বছর তারা শত্রুর ১৮,০৫৭ সেনাকে পরপারের যাত্রী বানাতে সক্ষম হয়। আর মুজাহিদবাহনীর শহিদদের সংখ্যা ছিল ২,৮৫৭ জন। সংখ্যাটি ছিল শত্রুবাহিনীর এক ষষ্ঠাংশ। এর মাধ্যমেই মুজাহিদদের যুদ্ধদক্ষতা এবং তাঁদের দুঃসাহস ও বীরত্বের প্রমাণের পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্যের বিষয়টা নিশ্চিত করে থাকে।

পাকিস্তানে আফগান মুহাজির

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের পাথুরে পাহাড়গুলো সাম্রাজ্যবাদী লাল ফৌজকে পরাজয়ের গ্লানি বইতে দেখছিল। আর মুজাহিদরা আফগানিস্তানের আকাশে দেখতে পাচ্ছিলেন সুহবে উম্মিদের আলোকপ্রভা। কিন্তু ওদিকে পাকিস্তান এক নতুন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। রাশিয়ার এজেন্টরা খুব জোরেশোরেই প্রচার করে বেড়াচ্ছিল, পাকিস্তানের ওই নতুন সমস্যার জন্য আফগান মুহাজিররাই দায়ী। ৩০৬টি সুপ্রশস্ত

তাঁবুর বস্তি ছাড়াও পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ৩০ লাখেরও অধিক আফগান মুহাজির যেন পাকিস্তানের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবতা হচ্ছে, পাকিস্তানের জন্য কিছু সমস্যা অবশ্যই ওইসকল মুহাজির-দলের মাধ্যমে হচ্ছিল, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযথাই অনেক সমস্যার জন্য তাদের দায়ী করা হচ্ছিল।

আসলে মুহাজিরদের অবস্থা, সমস্যা, প্রয়োজন এবং তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট অস্থিরতা সর্বত্র একপ্রকার ছিল না। মুহাজিররা ছিলেন কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত। একপ্রকার ছিলেন সম্পদশালী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। এরা ছিলেন পারিবারিকভাবে জায়গিরদার, সরদার এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। এদের সংখ্যা মাত্র কয়েক শতের বেশি ছিল না। বহির্বিশ্বে এদের বিনিয়োগ ও যথেষ্ট ভূসম্পদ ছিল। এরা পাকিস্তানে কোটি কিনে আরামের জীবনযাপন করছিল। কিছুদিন পর এদের কিছুসংখ্যক ভারতে গিয়ে দিল্লি ও মোম্বাই শহরে বসবাস শুরু করে। অনেকে পশ্চিমা বিভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যায়। এদের বেশির ভাগই ছিল মডার্ন, লিবারেল ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা লালনকারী।

দ্বিতীয় শ্রেণি ছিল সরকারি চাকরিজীবী, অফিসার এবং শিক্ষিতসমাজ। এদের মধ্যে অনেকে ছিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, বিজ্ঞানী ইত্যাদি। এরা চলে যাওয়ায় আফগানিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি শাখা মারাত্মকভাবে সমস্যার মুখে পড়ে। এদের মধ্যে প্রগতিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, নাস্তিক্যবাদী এবং ইসলামপ্রিয় সবাই বিদ্যমান ছিল। পরিসংখ্যানের দিক থেকে এরাও উল্লেখযোগ্য কোনো সংখ্যা ছিল না।

তৃতীয় শ্রেণি ছিল সে-সকল মধ্যবিত্ত, যারা আফগানিস্তান থেকে তাদের সমুদয় পুঁজি গুটিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছিল। এদের অধিকাংশ ছিল ট্রান্সপোর্ট ও হোটেলব্যবসায় জড়িত। ট্রান্সপোর্টারদের কাছে তাদের মালবাহী গাড়ি ও ট্রাক বিদ্যমান ছিল। এগুলো তারা সড়কপথে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল, অথবা পাকিস্তানে এসে কিনেছিল। এরা পাকিস্তানের রাজপথে ভাড়ায় গাড়ি চালাত। হোটেলব্যবসায়ীরাও পাকিস্তানের রাজপথের আশেপাশে হোটেল বানিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল।

চতুর্থ শ্রেণি ছিল বেদুইন ও পশুপালকদের। এরা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার। এরা তাদের পশুপাল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এবং সংগত কারণেই ঘাস ও পানির খুঁজে জায়গা পরিবর্তন করে ফিরছিল। তারা কখনো একজায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারছিল না। তারা নিজেদের কায়িক শ্রম আর বীরত্বের জোরেই জীবন ধারণ করছিল। পাকিস্তানের জন্য কোনোই সমস্যা ছিল না এরা।

পঞ্চম প্রকার ছিল ওই সকল শহুরে ও গ্রাম্য লোক, যারা নিজেদের সবকিছু হারিয়ে

পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এরাই সাধারণত মুহাজিরক্যাম্পে বসবাস করত। পাকিস্তান সরকার নিজেদের অর্থভান্ডার এবং বহির্দেশীয় সাহায্য থেকে এদের ভরণপোষণের জিম্মাদারি আদায় করছিল। ৩০ লাখ মুহাজিরের মধ্যে এদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

রাষ্ট্রীয় অর্থভান্ডার এদের প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট নয় মনে করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক কাজকাম করে এদের নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং এদের অনেকেই ছোটখাটো কাজের নিমিত্তে করাচি, পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি এবং কোয়েটা শহরে যাতায়াত করত। এভাবে খিমার বস্তিগুলোতে রেশন সরবরাহে সরকারি অর্থভান্ডারের ওপর যে চাপ পড়ছিল, তা অনেকটা কমে আসে। তবে এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে মুহাজিরদের বেশে পাকিস্তানেরই একদল সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী গজিয়ে ওঠে। এরা জিয়াউল হকের সরকারসহ পাকিস্তানি জনগণের বিপুল ক্ষতিসাধন করে।

সন্ত্রাসবাদের কবলে পাকিস্তান

পাকিস্তানে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দেই শুরু হয়। তবে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়। কাবুল প্রশাসন এবং গোয়েন্দাসংস্থা 'খাদ' রুশ অফিসারদের সহায়তায় আফগানিস্তানে কয়েকটি প্রশিক্ষণ-ক্যাম্প তৈরি করে। সেখানে অসংখ্য প্রশিক্ষণার্থীকে নাশকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এরপর মুহাজিরবেশে সীমান্তের ওপারে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এদের সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা পুরো পাকিস্তানকে নাড়িয়ে দিচ্ছিল। তখন পাকিস্তানজুড়ে চলছিল একের পর এক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ : দুটি বোমা বিস্ফোরণে কোয়েটার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের লাইন ধ্বংস হয়ে যায়। কোয়েটা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরবর্তী আবদুল্লাহ কেল্লার নিকটবর্তী রেলওয়ে লাইন বোমাহামলার মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি : পেশোয়ারের এক জনাকীর্ণ বাজারে পারসেল বোমার বিস্ফোরণে তিন ব্যক্তি মারা যায়। আহত হয় ২৬ জন।

১৪ ফেব্রুয়ারি : বানুতে একটি যাত্রীবাহী বাস বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যায়। এক শিশুসহ তিন যাত্রী ঘটনাস্থলে মারা যায়। তিনজন ভয়ানক আহত হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি : পেশোয়ারের একটি স্কুলের সামনে সড়কে একটি ভয়ংকর বোমা বিস্ফারিত হয়। এতে পথিকসহ ১৩টি শিশু মারা যায়। আহত হয় ৫০ জন। ঘটনাটি

ছিল এতই বেদনাদায়ক যে, এর প্রতিবাদে পুরো পেশোয়ারবাসী রাজপথে নেমে আসে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কতিপয় চক্রান্তকারী তখন এটা প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে, এই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে মুজাহিদবাহিনী ও মুহাজিররা সম্পৃক্ত রয়েছে। অপর প্রোপাগান্ডা ছিল—এসব নাশকতা রাশিয়া করিয়ে যাচ্ছে। এর কারণে হচ্ছে, পাকিস্তান কেন মুহাজিরদের আশ্রয় দিচ্ছে, মুজাহিদদের সহায়তা দিচ্ছে। উভয় দিকের প্রোপাগান্ডায়ই যেন শেষপর্যন্ত মুহাজিরদেরই প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখানো হচ্ছিল। পাশাপাশি পাকিস্তান সরকারকেও দায়ী করা হচ্ছিল। তাই প্রতিবাদী জনতার প্রতিবাদ একসময় মুহাজির ও মুজাহিদদের দিকে মোড় নেয়।

২১ ফেব্রুয়ারি : উত্তেজিত জনতা পেশোয়ারে অবস্থিত একটি মুজাহিদ দলের দপ্তরে হামলা চালিয়ে বসে। যদি এখানে সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী মধ্যখানে এসে না দাঁড়াত, তাহলে নিশ্চয় খুনখারাবি হয়ে যেত।

১৪ মে : পেশোয়ারের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে পারসেল বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে চারজন মুসাফির মারা যাওয়ার পাশাপাশি ৪০ ব্যক্তি আহত হয়।

২ জুন : রাওয়ালপিন্ডির একটি মার্কেটে অনুরূপ এক বোমা বিস্ফোরণে ২৭ ব্যক্তি আহত হয়। এর পরদিন পেশোয়ারে এক বোমাহামলায় দুজন মারা যায় এবং চারজন মারাত্মকরকম আহত হয়।

৭ আগস্ট : পেশোয়ারের জিটি রোডে একটি দোকানে বোমা বিস্ফারিত হয়। ফলে দোকানে থাকা সবাই মারা যায়। আর দোকানঘরটি পরিণত হয় ভগ্নস্তূপে। এ ছাড়া আশেপাশে থাকা ৩৪ জন আহত হয়।

১১ আগস্ট : মারদান শহরে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ফলে মোট ১৮ জন মারা যায়।

৭ সেপ্টেম্বর : পেশোয়ারে আবারও বড় ধরনের এক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ১০ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি ছয়জন আহত হয়।

১২ সেপ্টেম্বর : পারাচানা এলাকায় মাইনবিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর : রাওয়ালপিন্ডির পিরদোহাই সেনাঘাঁটিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, এতে চারজন মারা যায় এবং ১২ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

করাচিও সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। ১৫ জুলাই সেখানকার এমপ্রেস মার্কেট ও বুহরি বাজারে চারটি ভয়ংকর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ৭২ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি ২৫০ লোক আহত হয়। শহরে যেন আগুন লেগে যায়। এখানে

আগে থেকেই মানুষ পাঠান মুহাজিরদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। এ ঘটনার ফলে সাধারণ জনতা পাঠান ও আফগানদের প্রতি অধিকতর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

ওজড়ি ক্যাম্পের হৃদয়বিদারক ঘটনা

মোটামুটিভাবে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ছোট-বড় ২৫৯টি নাশকতার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় মোট ২৬৪ জন প্রাণ হারায়। পাশাপাশি আহত হয় ১ হাজার ০৬৯ হতভাগা বনি আদম।

নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের এই ফিরিস্তি দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠক যেন এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সরকারের ওপর আপতিত চাপ কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারেন।

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে রাওয়ালপিন্ডিতে ১০ এপ্রিল ১৯৮৮। এখানকার জনবসতির মধ্যখানে অবস্থিত একটি প্রাচীন অস্ত্রডিপো আচমকা আগুণের শিখা উদ্‌গীরণ শুরু করে। ক্যাম্পে থাকা হাজার হাজার রকেট ও মিসাইলের গায়ে যেন ডানা গজিয়ে ওঠে। একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠতে থাকে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডি যমজ শহর। মনে হচ্ছিল যেন কোনো শত্রুবাহিনী হামলে পড়েছে। এই ঘটনায় ১০০-এর অধিক নাগরিক প্রাণ হারায়। আহত হয় প্রায় দেড় হাজার। চার-পাঁচটি বিল্ডিং পরিণত হয় সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংসস্তূপে। তখন ওই ওজড়ি ক্যাম্পটি আফগান মুজাহিদদের জন্য আমেরিকার দেওয়া তাজা অস্ত্রচালান দ্বারা পুরোপুরি ছিল। ঘটনার ফলে অধিকাংশ অস্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। পাক সেনাবাহিনী, অফিসার ও সাধারণ যুবশ্রেণি বিশেষ করে মেজর জেনারেল জাবিদ নাসির এ সময় সীমাহীন বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উজাড়ি ক্যাম্পের বাকি অস্ত্রগুলো বাইরে বের করে নিয়ে আসেন; যেগুলো একটু পরে বিস্ফারিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল।

যদিও এই আক্রমণের পেছনে কারা ছিল বা কাদের কালো হাত সক্রিয় ছিল, তা জানা সম্ভব হয়নি; তথাপি মনে করা হয় রাশিয়ান এজেন্ট, যারা বছরব্যাপী আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল, তারাই পাকিস্তানকে চরম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নিয়েছিল। এ ধারণাকে এ বিষয়টি অধিকতর শক্তি জোগাচ্ছিল যে, ওই সময় জেনেভায় চূড়ান্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ওই চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অব্যাহতভাবে। রাশিয়া পাকিস্তানের ডুরান্ড লাইনের প্রসঙ্গটি তুলে দ্বিতীয়বারের মতো ধমক দিচ্ছিল। খুবসম্ভব এই হামলার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হককে সোজা হয়ে যাওয়ার বার্তা পাঠানো হচ্ছিল।

নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল

মোটকথা, নাশকতামূলক এহেন মাঝাভাঙা আক্রমণের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়ার বড় উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আফগান মুজাহিদদের অস্থায়ী ঘাঁটিতে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তাঁদের সরবরাহপথ বিনষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হয়। আফগান মুহাজির ও পাকিস্তানি নাগরিকদের পরস্পর গলায় গলা মিলিয়ে মদিনার সেই আনসার-মুহাজিরদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার পথ রুদ্ধ করা যায়। পাকিস্তান সরকারকে যেন আফগান বিষয়ে তাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করা সম্ভব হয়।

আফগানিস্তান থেকে সেনাপ্রত্যাহারের আগে লাল ভল্লুকরা শেষ অস্ত্র হিসেবে এসব পাশব তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল। যদি এসব হামলার ফলে আফগান মুহাজির এবং আফগানিস্তান সম্পর্কে পাকিস্তানের সাধারণ জনতার চিন্তাচেতনা বদলে যেত, তাহলে অবশ্যই জিয়াউল হকের সরকারকেও তার আফগান-নীতিতে পরিবর্তন আনতে হতো। এমতাবস্থায় অবশ্যই পাকিস্তান সরকার মুজাহিদদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভরণপোষণ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হতো। তবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অনন্য দৃঢ়তা ও দুঃসাহসের সঙ্গে ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে যান। তিনি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি বাড়তে না দিয়ে মুজাহিদদের আগের মতোই সমর্থন ও সহযোগিতা জুগিয়ে যান।

গর্বাচেভের পরাজয় স্বীকার এবং সেনাপ্রত্যাহারের ঘোষণা

আফগান মুজাহিদদের অব্যাহত জিহাদ এবং পাকিস্তানের নিঃস্বার্থ সহযোগিতার ফল দাঁড়ায়—১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ শেষ হতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পরাজয় স্বীকার করে নেয়। এরপর তারা আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নিরাপদ পথ খোঁজা শুরু করে। হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ ঘোষণা দেয়, 'যদি ১৫ মার্চ ১৯৮৮ নাগাদ জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়, তাহলে ১৫ মে ১৯৮৮ নাগাদ রাশিয়া তার সকল সেনা প্রত্যাহার শুরু করে মোট ১৫ মাসে তা পূর্ণতায় পৌঁছাবে।' তার এই ঘোষণায় বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে যায়। এ যেন ছিল পরিষ্কার ভাষায় মুজাহিদদের কাছে পরাজয় ও আত্মসমর্পণের স্বীকারোক্তি।

ইসলাম নিয়ে বুশ-মার্কিনভীতি

সোভিয়েত ইউনিয়ন তো আফগানিস্তান থেকে পালিয়েই যাচ্ছিল; কিন্তু তারপরও আফগানিস্তানে একটি ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা পাক, তারা তা সহ্য করতে পারছিল না। কারণ, ইসলামি সরকার তাদের ওপর মৃত্যুভয়াল তরবারি হয়ে থাকবে বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এখান থেকে চলে যাওয়ার পরও এখানে

তাদের আদর্শবান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করার দরকার, করে যাবে। তারা মুজাহিদদের ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ হতে দেবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের প্রাণের শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ছিল সম্পূর্ণ একমত। আমেরিকা আগে কেবল এইটুকু চাচ্ছিল যে, এশীয় দেশগুলোতে যেন রাশিয়া প্রভাব বাড়াতে না পারে। আফগানিস্তানে সোভিয়েতবাহিনীর পরাজয় ও ধ্বংসের মাধ্যমে আমেরিকার এ ইচ্ছা পূর্ণতা পেয়ে যায়। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের জন্য আদৌ কোনো শঙ্কার কারণ ছিল না। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সামনে এক নতুন সংকট দেখা দেয়। তারা এতদিন যে মুজাহিদদের অস্ত্র সহায়তা দিয়ে আসছিল, এবার তাদের নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগছিল। কারণ, এঁরা তো ছিল আফগানিস্তানে একটি ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রুশ-মার্কিন আঁতাত

এখানে এসে আমরা ইতিহাসকে এক নতুন মোড়ের দিকে হাঁটতে দেখি। দেখতে পাই এখন দুই শত্রুশক্তি ইসলামবিরোধিতায় একই সমান্তরাল অবস্থানে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। যে জেনেভা সংলাপের মাধ্যমে রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, সেখানে আমেরিকার চিন্তাধারা ছিল রুশবাহিনী চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় যেন ইসলামপন্থিরা আসতে সক্ষম না হয়। কারণ, এই দুই পরাশক্তি ইসলামকে তাদের কাছে ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করছিল। কেননা, এই ইসলামের শক্তিই আফগানিস্তানের উন্মুক্ত প্রান্তর ও পাথুরে পাহাড়ে রুশবাহিনীকে শিক্ষণীয় পরাজয় উপহার দিয়েছিল।

আফগান জিহাদ মূলত কী ছিল

এখানে আরেকবার সেই বাস্তবতা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আফগান জিহাদ শুধু আফগানজাতির স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল বিশ্বের চতুর্প্রান্ত থেকে জড়ো হওয়া সুদৃঢ় ইমানের অধিকারী মুজাহিদবাহিনীর একটি বিশুদ্ধ ইসলামি জিহাদ—এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা সুবিশাল ভূখণ্ডের তাওহিদবাদী যুবকরা যেখানে তাদের জানমাল বিসর্জন দিচ্ছিল। কোটি কোটি মুসলিম জনতা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বুজুর্গরাও রাত-দিন যে জিহাদের সাফল্য কামনায় আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত দুআ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুজাহিদদের অসীম কুরবানির ফলেই আল্লাহর সাহায্য তাঁদের সঙ্গ দেয়। আর সোভিয়েত রাশিয়ার মতো বিশালকার ভূত তাদের অসীম শক্তি এবং সীমাহীন জাগতিক মাধ্যম দিয়েও অপমানজনক পরাজয় এড়াতে পারেনি।

এই জিহাদ শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তির মেরুদণ্ডই ভেঙে দেয়নি; বরং তাদের অর্থনীতির জানাজাও বের করে ফেলে। শুধু তা-ই নয়, তাদের বাতিল জীবনদর্শন আর কমিউনিজমের ভিতও কাঁপিয়ে তোলে; এর অন্তর্নিহিত নিঃসার অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করে দেয়।

আমেরিকার সংকল্প ও উদ্দেশ্য

এই জিহাদে যদিও আমেরিকা ও রুশবিরোধী শক্তিগুলো কিছুটা সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সে সহায়তা মানবিক তাড়না এবং একটি জাতির স্বাধীনতার সঙ্গী হওয়ার মানসকিতায় ছিল না। তাদের সাহায্যের পেছনে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের ধান্দা। পাশাপাশি ভৌগোলিক স্বার্থ রক্ষার নিজস্ব তাগিদ। আমেরিকা বিগত অনেক দিন থেকে যে নীতি অনুসরণ করে আসছিল তা হচ্ছে, তারা সরাসরি কোনো শক্তির সামনে না এসে ওই শক্তির বিরোধিতাকারীদের সামনে রেখে পেছন থেকে মজা লুটা এবং টার্গেটকৃত শক্তিকে তাদের মোকাবিলায় নীচ ও হীন করে দেখানো। আফগানিস্তানেও তারা এই নীতি ঠিক তখন অবলম্বন করে, যখন দেখতে পায় মুজাহিদদের ওপর অস্ত্রসহায়তার বিনিয়োগ তাদের জন্য সফলতা বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু যখন জিহাদের ফল কুড়ানোর মৌসুম এসে যায়, তখন আমেরিকা এটা মানতে পারেনি যে, মুজাহিদরা স্বাধীনভাবে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে তুলে নিক। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেই ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই আমেরিকা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তারা রুশবাহিনীকে ভবিষ্যতের শঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করে রেখেছিল। জেনেভা সংলাপের মাধ্যমে রুশ-মার্কিন তাদের ওই যৌথ স্বার্থটাই সংরক্ষণ করতে চাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল, যেভাবেই হোক আফগানিস্তানকে যেন শর্তযুক্ত স্বাধীনতায় উৎসাহী করে তোলা যায়, যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা কোনো আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে না পারে।

এই উভয় শক্তি জানত, ইসলামের অর্থনীতি তাদের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও জীবনঘনিষ্ঠ। ইসলামি অর্থনীতি ওই দুই অর্থনীতি থেকে অনেক বেশি সরল, স্বভাবজাত, পরীক্ষিত, জনদরদি এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিয়ামক। তাদের বিশ্বাস ছিল, বিশ্বে একমাত্র ইসলামি জীবনব্যবস্থাই তাদের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দর্শনের জন্য চ্যালেঞ্জ হওয়ার সামর্থ্য রাখে।

জেনেভা সংলাপে চক্রান্তের ধান্দা

সুতরাং ওই তাগুতিশক্তিদ্বয় তথা রুশ-মার্কিন তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের গরজে ইসলামি জীবনদর্শনের বিপরীতে তাদের জীবনদর্শনে নান্দনিকতার প্রলেপ লাগানো শুরু

করে। তারা কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়। এরপর জেনেভা সংলাপকে যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরের তোড়জোড় শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে, অগ্রাধিকার পায়; আর মুজাহিদদের ভূমিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে যায়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে যখন জেনেভা সংলাপ শুরু হয়, তখন কিন্তু জাতিসংঘ আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য চারটি মূলনীতি স্থির করে দেয় :

১. আফগানিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্ব, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ করতে হবে।

২. আফগানজাতিকে বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপমুক্ত নিজেদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক বিধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অধিকার দিতে হবে।

৩. আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশি সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. আফগান মুহাজিরদের জন্য নির্বিঘ্নে দেশে ফেরার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

নতুন এজেন্ডা

জেনেভা সংলাপ কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত ঢিমেতালে অগ্রসর হচ্ছিল; কিন্তু যখন আলোচনাটি একটি সিদ্ধান্তকর মোড়ে এসে উপনীত হয় তখন আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কাবুল সরকার ওই চার নীতি-সংক্রান্ত ফরমুলাটি বিকৃত করে নতুন এক ফরমুলা তৈরি করে। তারা চুক্তিতে এমন কিছু শর্তারোপ করে, যা মুজাহিদ, মুহাজির ও জিয়াউল হক সরকারের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। এসব শর্তের মধ্যে ছিল—পাকিস্তান আফগানিস্তানের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আলাদা অবস্থানে চলে যাবে। তারা মুজাহিদদের কোনো প্রকার সহায়তা দিতে পারবে না। কিন্তু রাশিয়া বা আমেরিকার ওপর কোনো ধরনের শর্তারোপ করা হচ্ছিল না; বরং আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছিল। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটি ছিল খোদ আফগান মুজাহিদদেরও এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা হচ্ছিল না।

ফরমুলা তৈরির পর তারা চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দিতে থাকে। সংলাপ চূড়ান্ত করতে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারিকে ডেটলাইন হিসেবে স্থির করা হয়। মার্কিন প্রতিনিধিরা বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিল যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপরই আফগানিস্তান স্বাধীনতা এবং নিজেদের শাসনপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে যাবে। রাশিয়া ও আমেরিকা এখানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। তবে রাশিয়ার জন্য কাবুল সরকারকে এবং আমেরিকাকে তাদের সহযোগীদের সহায়তা বন্ধ রাখার কোনো

শর্ত ওই চুক্তিতে রাখা হয়নি। এতেই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, চুক্তিটি ছিল একটি সুস্পষ্ট চালবাজি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম আমেরিকার এই চক্রান্তের পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে লেখেন, আমেরিকার চেষ্টা হচ্ছে, তারা জিহাদের ময়দান নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। যুদ্ধের লাগাম ইসলামপন্থিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ময়দান থেকে তাঁদের বের করে দেবে।[২৮]

এ পর্যায়ে আমেরিকা পাকিস্তানের মাধ্যমে ইসলামপন্থিদের হাতে সাহায্য বন্টনের তৎপরতায় মেতে ওঠে। এর বিপরীতে তারা সরাসরি সরকারবিরোধী আফগান মুজাহিদ দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। যে দল আমেরিকার স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে রাজি হতো, তাদের হাতে দেদার অস্ত্র তুলে দিত; আর যারা এর বিরোধিতা করত, তাদেরকে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ মুজাহিদরা আমেরিকাপন্থি ও আমেরিকাবিরোধী দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। আর এরই জের ধরে তাঁদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক লড়াই। এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার বড় ফায়দা ছিল—তাদের কাঠপুতুল নাজিবের সরকার তার পায়ের নিচে মাটি পেয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্রের আরেকটি দিক ছিল আফগানিস্তানকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে ফেলা, যাতে এখানে কখনো কোনো কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

জেনেভা সংলাপ নিয়ে হেকমতিয়ারের বিশ্লেষণ

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে জেনেভায় আফগানিস্তান বিষয়ক চূড়ান্ত সংলাপ-বৈঠক শুরু হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ খান জুনেজো চুক্তিনামায় স্বাক্ষরের জন্য আগ্রহী থাকলেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পরারাষ্ট্রবিষয়ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জায়েন নুরানিসহ আরও বেশ কজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এই চুক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ওই সময় ১২ এপ্রিল মুজাহিদ নেতা হেকমতিয়ার জেনেভা চুক্তির ওপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'রাশিয়া মুজাহিদদের হাতে পিষ্ট হয়ে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু তারা ওই বীরদের সঙ্গে সংলাপে রাজি নয়, যাঁরা তাদের লাঞ্ছনার পরাজয় উপহার দিয়েছে। তারা বরং সমস্যা সমাধানের জন্য পালিয়ে ওয়াশিংটনের দ্বারে গিয়ে ধরনা দিচ্ছে। তারা বোঝাতে চাচ্ছে, আফগানিস্তানে তারা মূলত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়ছে না; বরং লড়ছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। এভাবে তারা মিথ্যা আশ্বাসে নিজেদের প্রবোধ দিচ্ছে। নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতে চাচ্ছে, তারা মূলত এক সুপার পাওয়ারের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে ফিরে

[২৮] আয়াতুর রাহমান ফিল আফগান।

যাচ্ছে। অথচ পুরো বিশ্ব জানে, আফগানিস্তানে একটি মার্কিন সেনারও অস্তিত্ব নেই। এখানে যুদ্ধ করছে ইমানদীপ্ত মুজাহিদবাহিনী। অথচ জেনেভা সংলাপে মুজাহিদদের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এ ধরনের চুক্তি না আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, না আফগান মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনতে পারবে।'[২৯]

মুহাম্মাদ খান জুনেজো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফেলেন

মোটকথা, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৮ মুহাম্মাদ খান জুনেজো জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফেলেন। এভাবে নীতিগত দিক থেকে আফগানিস্তানে পাকিস্তান তার কৃতিত্ব ও কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং বিষয়টি রুশ-মার্কিন যৌথশক্তির করুণা-নির্ভর হয়ে যায়। ফলে মুজাহিদদের শক্তি ও তাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক—যিনি আফগানিস্তানের ক্ষমতায় পাকিস্তানবান্ধব একটি ইসলামি সরকারের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন—তাঁর লক্ষ্য অর্জনে অক্ষম হয়ে পড়েন। জুনেজোর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাগে-ক্ষোভে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব খান মন্ত্রীপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী জে এ সুলাহরি ঘটনাটির বিশ্লেষণে লেখেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আমরা ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার মানসিক দূরত্বের উপসাগর অভিমুখে ছুটে চলছি। দুর্ভাগ্যক্রমে ৮-১০ বছর আগে আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদরা দুই মুসলিম ভ্রাতৃরাষ্ট্রের মধ্যে যে দূরত্বের সম্পর্ক ঘুচিয়ে আমাদের পরস্পরকে কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তাতে পুনরায় দূরত্বের দেয়াল উঠে যাচ্ছে। আজকের এই জেনেভা চুক্তিকে আমি পাকিস্তানের কাশমির ও পূর্বপাকিস্তান হারানোর মতো দুঃখজনক বাস্তবতা গণ্য করছি।'[৩০]

মোটকথা, জেনেভা চুক্তির ফলে ১৫ মে ১৯৮৮ রুশবাহিনী আমু দরিয়ার ওপারে চলে যাওয়া শুরু করে। তবে যেতে যেতে রাশিয়া নাজিব সরকারের নিরাপত্তার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করে যায়। নাজিবের হাতে তারা এই পরিমাণ অস্ত্র রেখে যায়, যা একাধারে কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যথেষ্ট ছিল। রাশিয়ার অফিসার ও যুদ্ধ-উপদেষ্টারা তখনো নাজিবকে সাহায্যের জন্য তার পাশে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পাকিস্তান তখন আফগান সমস্যায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে ছিল ব্যর্থ।

জুনেজো সরকারের পদচ্যুতি

জেনেভা চুক্তি আফগানযুদ্ধে জীবনবাজি রাখা প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আশা-

[২৯] *সাওয়ায়ে ওয়াক্ত* : ১২ এপ্রিল ১৯৮৮।

[৩০] *মাসআলায়ে আফগানিস্তান* : ৫৪৭।

ভরসায় পানি ঢেলে দেয়। ফলে তিনি গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। সুতরাং তিনি এর মাত্র দেড় মাস পর তাঁর প্রেসিডেন্সি ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে জুনেজোর তাদের গাঁটরি গোল করতে বাধ্য করেন। সংসদ ভেঙে দেন তিনি। এই পদক্ষেপের ফলে তাঁর বিরোধীরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। তারা ভেতরে ভেতরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। জুন মাসে তিনি একটি শরয়ি ফরমান জারি করে পাকিস্তানে ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। ১৪ আগস্ট জাতিকে দেওয়া জীবনের শেষ ভাষণে ওই মর্দে মুমিন বলেন,

> লাখ লাখ আফগান মুসলমান রক্তসাগর পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। কেননা, তারা পাকিস্তানকে তাদের মাথাগুঁজার শেষ আশ্রয় মনে করছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এ সকল মুজাহিদের প্রতি আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে রইল সশ্রদ্ধ সালাম। আমাদের সরকার পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে, যাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়। ইসলাম এমন একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক, যা যেকোনো অঞ্চলের মানুষকে ভাই বানিয়ে দেয়। ইসলাম থাকবে জীবনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের হৃদয়বিদারক শাহাদাত

এই ভাষণের তিন দিন পর ১৭ আগস্ট ভাওয়ালপুরের বিমানবন্দর থেকে একটি বিমান তাঁকে নিয়ে আকাশে উড়াল দেয়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই বিমানটি আকাশে টুকরো টুকরো হয়ে ভূপাতিত হয়ে পড়ে। এভাবেই আফগান জিহাদের প্রথমসারিতে জিহাদরত ওই মহান মুজাহিদ পুরো মুসলিমবিশ্বকে কাঁদিয়ে শাহাদাতের মহান সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন। তাঁর জানাজায় অংশ নেওয়া ১৫-২০ লাখ জনতার ঢল কি এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল না যে, ওই মহান মর্দে মুমিন আমেরিকার উচ্ছিষ্টভোগী নন; বরং খাঁটি একজন মুজাহিদ ছিলেন? পাকিস্তানি জনগণ আফগান জিহাদ-সংক্রান্ত অবস্থানে সর্বান্তঃকরণে আস্থাশীল ছিল? প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শাহাদাতের নেপথ্যে চক্রান্তকারীদের মুখোশ আজও উন্মোচিত হয়নি। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এর জন্য দায়ী রাশিয়া ও আমেরিকা। জিয়াউল হকের সঙ্গে রাশিয়ার শত্রুতা তো ছিল প্রকাশ্য ব্যাপার। তবে আমেরিকাও আফগানিস্তান নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার জন্য তাঁকে সবচেয়ে বড় অন্তরায় মনে করত। তাই এখানে সিআইএর সংশ্লিষ্টতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হতে পারে এটি ছিল কেজিবি ও সিআইএর যৌথ প্রয়োজনার ফসল।

নতুন যুগে আফগান জিহাদ

জেনেভা চুক্তি এবং জিয়াউল হকের শাহাদাতের পর আফগান জিহাদ তার ইতিহাসের এক নতুন যুগে পদার্পণ করে। এ ছিল এমন এক যুগ, যেটি ছিল খুবই বেদনাদায়ক। কারণ, এর এক মোড়ে আফগান মুজাহিদদের নিজেদের মধ্যে লড়াইরত দেখা যাচ্ছিল। ভালোবাসা ও বিশ্বাসভঙ্গকারী মার্কিন এজেন্টগুলো মুজাহিদ শিবিরে সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাত্র কয়েক কদম দূরে দেখা যাওয়া মানজিলে মাকসুদকে ক্রমশ দূর থেকে দূরে দৃষ্টির অন্তরালে মিলিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছিল তখন। তবে মুজাহিদ নেতারা শহিদ জিয়াউল হকের প্রয়াণের শোক বুকে চাপা দিয়ে নিজেদের দুর্জয় সাহস অটুট রেখে সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকেন। তাঁরা তাঁদের কর্মতৎপরতা মোটেও ঢিলে হতে দেননি। সোভিয়েত রাশিয়াকে তাদের সোনাপ্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিলের কল্পনা করার অবকাশটুকুও দেননি। তাঁরা বিশ্ববাসীকে এ ধারণা নিতে দেননি যে, জেনেভা চুক্তির ফলে তাঁদের শক্তিতে ধাক্কা লেগেছে। ময়দানে আগের মতোই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা।

জেনারেল জিয়াউল হকের শাহাদাতের পর তাঁর সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ পিপলস পার্টির প্রধান বেনজির ভুট্টো নির্বাচনে জিতে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। এই পরিবর্তনকেও মুজাহিদরা তাঁদের পথের অন্তরায় হতে দেননি।

তথ্যসূত্র

১. *তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান*, ড. এইচ বি খান।

২. *আফগানিস্তান এক কাওমি আলমিয়া*, আহমাদ শুজা পাশা।

৩. *আয়াতুর রাহমান ফি আফগান*, শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম শহিদ রাহ.।

৪. *মাসিক সাদায়ে মুজাহিদ*, ১৯৮৮, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. *মাসিক আল-ইরশাদ*, ১৯৮৮, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. *সাপ্তাহিক তাকবির*, ১৯৮৮, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৭. *মাসিক আল-হক*, আকুড়া খটক, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৮. *উর্দু ডাইজেস্ট*, মার্চ ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ, জিহাদে আফগানিস্তান সংখ্যা; এপ্রিল ১৯৮৯ জিহাদে আফগানিস্তান সংখ্যা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ ও জুন ১৯৯২, শহিদে পাকিস্তান জিয়াউল হক সংখ্যা; আগস্ট ১৯৮৯, ১৯৯০ সংখ্যা।

২৮ তম অধ্যায়

লাল ভল্লুকের পরাজয় : নাজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মুজাহিদদের কাছে রুশ ও নাজিবুল্লাহর মধ্য কোনোই তফাত ছিল না। তাঁরা পূর্ণ সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে নাজিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। পূর্ব ও দক্ষিণ-আফগানিস্তানে তখন ভয়ংকর যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। মুজাহিদবাহিনী বিভিন্ন ফাঁড়ি, ঘাঁটি, ছাউনি ও দুর্গে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছিলেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-আফগানিস্তানের জনপদ স্পিনবুলদাক মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে তাঁদের জন্য কান্দাহার অভিমুখে অগ্রযাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

অপরদিকে ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁরা পাকতিকা প্রদেশের কেন্দ্রীয় ছাউনি জামাখোলা পোস্ট দখল করে নেন। ওই লড়াইয়ে ২২ জন মুজাহিদ আহত হওয়ার পাশাপাশি একজন শহিদ হন। পোস্ট থেকে ৫২ জন শত্রুকে জীবিত গ্রেপ্তার করা হয়। এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হরকতুল জিহাদ আল ইসলামির বিখ্যাত গেরিলা কমান্ডার খালিদ জুবায়ের। পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যেই শিরনা, ওরগুন ছাউনিসহ পুরো পাকতিকা তাঁদের হাতে চলে আসে।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি রুশদের আফগানিস্তান থেকে বিদায়

এসব লড়াই চলাকালেই নতুন বছর ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ হাজির হয়। ওই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল আফগান ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। এই চিরস্মরণীয় দিনেই আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান ভল্লুকদের সেনাপ্রত্যাহার সম্পন্ন হয়। তাদের শেষ সেনাটিও আফগানিস্তান ছেড়ে আমু দরিয়ার ওপারে চলে যায়। স্মর্তব্য, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জেনেভা চুক্তি কার্যকর করে নিজ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ ১৫ মাসের সময় চেয়ে নিয়েছিল। তবে চুক্তির মাত্র ৮ মাসের মধ্যেই গর্বাচেভ সব সেনা প্রত্যাহার করে।

এই দ্রুত প্রত্যাহারের পেছনে যদি মুজাহিদদের ভয় কার্যকর না হয়ে থাকে, তাহলে এখানে কী কারণ থাকতে পারে? এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের পর্যালোচনা করতে গিয়ে উর্দু ডাইজেস্টের সম্পাদক খ্যাতিমান সাংবাদিক জনাব আলতাফ হাসান কুরাইশি লেখেন,

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তান থেকে রুশবাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির ইতিহাসে অলৌকিক বড় একটি ঘটনা থেকে কোনো অংশেই ছোট নয়। স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদাবান, হিমালয়প্রমাণ দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদদের অচিন্তনীয় ইমানি শক্তি, সমুদ্রগভীর দেশপ্রেম এবং ঐতিহ্যবাহী অনুভূতি সমাজবাদী দর্শন, ধর্মদ্রোহী জীবনাচার এবং লাল বিপ্লবের ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদী রুশ শক্তিকে এমন লাঞ্ছনার পরাজয় উপহার দেয়, যে আঘাতের চোটে তাদের বুকভরা সাহস আর অস্ত্রের ভীতি দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যায়। তখন রুশদের এই তিক্ত সত্য স্বীকার করতে হয় যে, আফগানিস্তানে সেনা পাঠিয়ে তারা চরম ভুল করেছিল। ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় তারা এমন ভুল আর করতে যাবে না।[৩১]

জালালাবাদের আঙিনায় মুজাহিদবাহিনী

রুশবাহিনী বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই মুজাহিদবাহিনী দেশের বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর অভিমুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। বসন্তমৌসুমে তাঁরা জালালাবাদের কাছে পৌঁছায়। সামারখিল ছাউনি মুজাহিদবাহিনীর হতে চলে আসে। ছাউনিটি ছিল জালালাবাদের শক্তির মেরুদণ্ডতুল্য। মুজাহিদরা শহরটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। বিশ্বশক্তিসহ যেসব ষড়যন্ত্রকারী মুজাহিদদের মধ্যে সংঘাত বাধাতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা জালালাবাদকে অবরুদ্ধ দেখতে পেয়ে হাতাশায় মাথা আছড়াতে থাকে।

সোমনাথ পূজারিরা গজনবির দেশে

ভারত আফগানিস্তানে পাকিস্তানবান্ধব শক্তি ক্ষমতায় আসার ভয়ে আতঙ্কিত ছিল। সুতরাং ওই পর্যায়ে তারাও আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও রাশিয়ার সেবার লক্ষ্যে নাজিব সরকারকে পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করে যেতে থাকে। ভারতীয় গোয়েন্দাসংস্থা র-এর সঙ্গে নাজিবুল্লাহর ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ভারতীয় লবি তাকে তাদের পরম বন্ধু মনে করত। জালালাবাদকে মুজাহিদদের অবরোধের মুখে পতনের দ্বারপ্রান্তে দেখতে পেয়ে ভারত দ্রুত ভারী অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জামসহ ৬০০ সামরিক উপদেষ্টা এবং কয়েকটি যুদ্ধবিমান কাবুলে পাঠিয়ে দেয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুপ্তা ও মেজর জেনারেল মদন কুমার কাবুলে অবস্থিত কমিউনিস্ট সেনাদের নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস শুরু করে। পরবর্তী মাসে জালালাবাদ রক্ষার জন্য রাজধানী কাবুল থেকে দুই ডিভিশন, গারদেজ প্রদেশ থেকে দুই ব্রিগেড এবং হেরাত প্রদেশ থেকে এক ব্রিগেড সেনা জালালাবাদ শহরে পৌঁছায়।

[৩১] *দ্য ডাইজেস্ট* : মার্চ ১৯৮৯ সংখ্যা।

রুশ অস্ত্রের তরতাজা চালান

রাশিয়া তাদের সেনা ফিরিয়ে নিলেও নাজিব সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। তাই তারাও যথাসম্ভব তাকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। জালালাবাদযুদ্ধে রাশিয়ার অফিসার আর উপদেষ্টারাও অংশ নিয়েছিল। এ ছাড়া তারা নাজিবুল্লাহর সরকারকে গোপনে ৪০০ নতুন ট্যাংক এবং ২০টি ইউএস যুদ্ধবিমান উপহারস্বরূপ সরবরাহ করে। পাশাপাশি আরও ৩১টি যুদ্ধবিমান দেওয়ার অঙ্গীকার করে। এদিকে মুজাহিদবাহিনী জালালাবাদ ছাড়াও একদিক থেকে কাবুল অভিমুখেও এগিয়ে যাচ্ছিল। ১১ জুন তাঁরা কাবুল বিমানবন্দরে রকেট দ্বারা জোরদার হামলা চালায়। মুজাহিদদের বক্তব্য ছিল—তাঁরা কাবুল প্রশাসনের তিনটি প্রতিরক্ষা লাইনের দুটি তছনছ করে দিতে পেরেছেন। এখন তাঁরা শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছেন।

মহল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় নাজিবুল্লাহ

পরবর্তী দিনগুলোতে কাবুলে রকেটবৃষ্টি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, নাজিবুল্লাহর জন্য প্রেসিডেন্ট-ভবনে অবস্থান আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। সে তখন সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে অবস্থান শুরু করে। এদিকে রাশিয়া তার প্রিয় পালকপুত্রের সাহায্যে অনবরত অস্ত্রসাহায্য পাঠাচ্ছিল। একপর্যায়ে তারা ২০০ ট্যাংক, অস্ত্রবোঝাই ছয়টি ট্রাক এবং কয়েকটি ছোট সেনাদল কাবুলে পাঠিয়ে দেয়।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের অবস্থা : ২০০ জেলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

অবশ্য মুজাহিদরা তিন বছর পর কাবুল দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আশার বিপরীতে জালালাবাদ বিজয় বিলম্বিত হয়ে পড়েছিল। তবে এর অন্যতম কারণ ছিল—মুজাহিদরা ওই কেন্দ্রীয় শহরগুলো দখলের আগে আফগানিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে নিজেদের আধিপত্য সুদৃঢ় করে তুলতে চাচ্ছিলেন। তারা তাদের পুরো শক্তি জালালাবাদ ও কাবুলে নিবদ্ধ না করে; বরং দেশব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। রুশ সেনাপ্রত্যাহারের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে দেশের ২০০ জেলা, তহশিল এবং কয়েকটি প্রাদেশিক রাজধানী তারা দখল করে নেন। ১০ জুন মাজার-ই-শরিফে অবস্থিত একটি গোলাবারুদের ডিপোকে টার্গেট করে। ওই আক্রমণের ফলে ৭ হাজার ৪০০ টন গোলাবারুদ এবং নানা প্রকার অস্ত্রসহ ১৭০টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। ২৫ জুন ১৯৮৯ মুজাহিদরা কাবুলের উত্তর দিকে হুসাইন কোট নামের ঘাঁটিটি দখল করে নেন। ২৭ জুন কাবুলের সাবডিভিশন 'বাচা কোট' তাদের দখলে চলে আসে।

ইয়াসির আরাফাতের কাবুল সফর

ওই সময় ফিলিস্তিন স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা ইয়াসির আরাফাত কাবুল সফরে আসেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সরকার ও মুজাহিদদের মধ্যে সমঝোতার একটি ব্যবস্থা করা। কিন্তু মুজাহিদরা তাঁর ফরমুলাগ্রহণে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন। এর অন্যতম কারণ ছিল, ইয়াসির আরাফাত আফগানিস্তানের মাত্র ১৫ শতাংশ ভূমির ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী নাজিবুল্লাহর শাসনব্যবস্থাকে আফগানিস্তানের বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন। অথচ ৮৫ শতাংশ আফগানিস্তান অধিকারে থাকা মুজাহিদদের অস্থায়ী সরকারকে তিনি আফগানিস্তানের মূল প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন না। মুজাহিদবাহিনী আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল, যতক্ষণ তাদের অস্থায়ী সরকারকে আফগানিস্তানের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা না হবে, ততক্ষণ তারা কারও সঙ্গে সংলাপে যাবে না।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, জালিমরা তাদের চোখের সামনে 'বিচারদিবস' ঘনিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছিল। ১৬ লাখ আফগানির রক্ত নিয়ে হোলিখেলারত কমিউনিস্টদের প্রতাপের সূর্য দিনকে দিন অস্তাচলে হারিয়ে যাচ্ছিল। আর অন্যদিকে মুজাহিদদের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল, যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ। মুজাহিদদের অস্থায়ী সরকার একদিন এমন এক ঘোষণা জারি করে, যা শুনে পুরো বিশ্বের তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত জাতিগুলো হতচকিত হয়ে ওঠে। তাদের সরকার ঘোষণা দেয়,

> আমরা সে-সকল আফগানির জন্য সাধারণক্ষমা ঘোষণা করছি, যারা শত্রুর ধোঁকায় পড়ে তাদের সঙ্গ দিয়েছে। এ ধরনের মানুষের অবগতির জন্য আমাদের ঘোষণা হচ্ছে, আপনারা অস্ত্র সমর্পণ করে নিন। আমরা নাজিবুল্লাহ সরকারের সমর্থন প্রত্যাহারকারী সকল শ্রেণির আফগান নাগরিকের জন্য তাদের প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার দিচ্ছি।

ইসলামি নৈতিকতার সুমহান শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ঘোষণা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করে তোলে। এতৎসঙ্গে তা মুজাহিদদের বিরোধী শিবিরে ভূমিকম্প জাগিয়ে দেয়। ঘোষণা জারি হওয়ার পরপরই দেখা যায় প্রতিটি প্রদেশ থেকে সেনারা পালিয়ে এসে মুজাহিদদের শিবিরে যোগ দিচ্ছে। বেশ কজন পাইলটও তাদের কাছে থাকা হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। এমনকি

পাকিস্তানে নিযুক্ত আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল ওয়াকিল বাহরামান্দও তাঁদের অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেন।

নাজিবুল্লাহর পক্ষ থেকে সন্ধির প্রচেষ্টা

নাজিব প্রশাসনের সঙ্গে মুজাহিদদের যুদ্ধ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। বাধ্য হয়ে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে সে মুজাহিদদের সন্ধির আহ্বান জানায়। আহ্বানটি ছিল কয়েকটি প্রস্তাব-সংবলিত। তবে মুজাহিদরা তা প্রথ্যাখ্যান করে দেন। মুজাহিদ-সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর সাইয়াফ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, 'ডা. নাজিবুল্লাহর সামনে মাত্র একটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে; আর সেটি হচ্ছে, তিনি যেন নিজেকে তার সঙ্গীসাথিসহ আমাদের হাতে তুলে দেন।'

খোস্তে যুদ্ধ

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে খোস্তে আরেকবার যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। দুই সপ্তাহব্যাপী চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ২ হাজারের মতো কমিউস্টি সেনা মারা যওয়ার পাশাপাশি প্রায় ৫০০ সেনা গ্রেপ্তার হয়। সেপ্টেম্বরেও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। তাতে উভয় পক্ষে প্রাণহানির ঘটনা ছিল খুবই ভয়াবহ। স্মর্তব্য, পূর্ব-আফগানিস্তানের অধিকাংশ যুদ্ধে পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠনগুলো অগ্রবর্তী সেনাদলের ভূমিকা পালন করে থাকত। এদের মধ্যে আল জিহাদুল ইসলামি ও হারকাতুল মুজাহিদিনের মুজাহিদদের অবস্থান ছিল অবিস্মরণীয়।

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের শাহাদাত

মুজাহিদদের জন্য ওই বছর সবচেয়ে বেশি বেদনাবিধুর ঘটনা ছিল শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের শাহাদাত। শায়খ ছিলেন আরব মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় নেতা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামি জিহাদের প্রাণপুরুষ। আফগান জিহাদের ইতিহাসে তাঁর নাম সোনালি অক্ষরে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। শায়খ আজ্জাম ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। হিংস্র ইয়াহুদিদের তাণ্ডব এবং ব্রিটেনের ষড়যন্ত্র সাধারণ ফিলিস্তিনিদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছিল। তখন চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ফিলিস্তিনিরা তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। অবৈধ ইসরাইল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর শায়খ একেবারে বাল্যবয়সেই মুজাহিদদের সারিতে ঢুকে ইসরাইল ও ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এরপর অবস্থা খারাপ হতে থাকলে অন্যান্য মুজাহিদের সঙ্গে পূর্ব-জর্দানে চলে আসেন। জর্দান থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর দামেশকের আশ-শরিয়া কলেজ থেকে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর আম্মানের একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৯

খ্রিষ্টাব্দে তিনি আম্মান ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এই পর্যায়ে শায়খ আরেকবার ফিলিস্তিনি জনগণের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে ইসরাইলবিরোধী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে কয়েক বছর গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যান। ওই সময় ফিলিস্তিন মুক্তি-সংগ্রামের ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কঠিন প্রতিবাদ জানান। তিনি ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বোঝাবার প্রয়াস পান, তিনি যেন আন্দোলনটি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর না রেখে বৈশ্বিক ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধটিকে মুক্তি-সংগ্রামের পরিবর্তে বৈশ্বিক জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইয়াসির আরাফাত রাশিয়া দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি তাঁর আবেদন কানে তোলেননি। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে হতাশ শায়খ রাহ. আবারও অধ্যাপনায় জড়িয়ে যান। ওই সময় তিনি জামিয়াতুল আজহার থেকে উসুলে ফিকহের ওপর ডক্টরেট সনদ অর্জন করেন। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জর্দানের শরিয়া কলেজের শিক্ষকতার দায়িত্ব আদায় করে যান। তখন তাঁর প্রজ্ঞার প্রশংসা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবে সম্মত হয়ে শায়খ আজ্জাম ইসলামাবাদে চলে আসেন।

তিনি শুরু থেকেই মানসিকভাবে ছিলেন আফগান জিহাদের উৎসাহী সমর্থক। পাকিস্তানে অবস্থান করে নিজেকে আফগান মুজাহিদদের ঘনিষ্ঠ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। তখন তাঁর জিহাদি জজবা অধিকতর চাঙা হয়ে ওঠে। ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে আফগানিস্তানের পথ ধরেন এবং নিজেকে পুরোপরিভাবে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। আরব যুবকদের জিহাদে উদ্দীপ্ত করতে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম জায়গায় জায়গায় ভাষণ দিয়ে বেড়াতে থাকেন। ফলে লাখ লাখ যুবক তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে থাকে। এ ছাড়া তিনি অত্যন্ত আবেগি ভাষায় প্রচারচিঠি এবং প্রবন্ধ লিখে যেতে থাকেন। তাঁর রচনা *আয়াতুর রাহমান ফি জিহাদি আফগান* আরববিশ্বে ইসলামি জিহাদের এক নতুন বান ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর ভাষণ ও লেখা হাজার হাজার আরব যুবককে আফগানিস্তানের পাহাড়িভূমিতে ডেকে এনে রুশবাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাঁর দেখাদেশি শত শত আরব শায়খ জিহাদের পক্ষে তাঁদের মুখ খুলতে থাকেন। আফগানিস্তানে লড়াইরত আরব মুজাহিদরা তাঁরই নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তারা তাঁর ভাষণ ও লেখা থেকে আত্মার খোরাক সংগ্রহ করছিল।

তিনি ইসলামি জিহাদ পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে *আল-জিহাদ* নামক একটি মাসিকী প্রকাশ শুরু করেন।

২৪ নভেম্বর ১৯৮৯ তাঁর ১৮ বছর বয়সি ছেলে মুহাম্মাদ এবং ৭ বছর বয়সি ছেলে

ইবরাহিমকে নিয়ে পেশোয়ার ইউনিভার্সিটি টাউনের জামে মসজিদে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন। পথে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসী বোমাহামলা চালিয়ে তাঁর গাড়ি উড়িয়ে দেয়। ফলে শায়খ তাঁর দুই ছেলেসহ ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের শরাব পান করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শায়খের শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানে জিহাদের গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে তিনি যে যুবকদের অন্তরে জিহাদের আগুন ধরিয়ে গিয়েছিলেন, যাদের অন্তরে ইমানের উত্তাপ এনে দিয়েছিলেন, তারা শুধু আফগানিস্তান নয়; বরং পুরো বিশ্বের মাজলুম মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য দৃঢ়পদ হয়ে যান।

শায়খ তামিম আদনানির ইনতিকাল

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবরও ছিল আফগান ইতিহাসের আরেক বেদনাবিধুর দিন। এই দিনে তাদেরকে শায়খ তামিম আদনানি রাহ.-এর চিরবিদায়ের শোক সহ্য করতে হয়। শায়খ রাহ. ছিলেন প্রত্যেক আরব মুজাহিদের প্রাণপ্রিয় নেতা এবং শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ.-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের বায়তুল মাকদিসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শায়খ আদনানি মিসর থেকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর সৌদি আরবের একটি উচ্চপদে চাকরি শুরু করেন। তিনি মাসিক ২৪ হাজার রিয়াল বেতন পেতেন; কিন্তু আফগানযুদ্ধ শুরু হলে নিজেকে ওই আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ওয়াকফ করে দেন। এতৎসঙ্গে মুজাহিদদের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করে মাঝেমধ্যে আফগানিস্তানে এসে মুজাহিদ নেতাদের হাতে সেগুলো তুলে দিতেন।

তাঁর জিহাদি জীবনের সিংহভাগ সময় আরববিশ্বে জিহাদের শিঙায় ফুৎকার দেওয়ার কাজে অতিবাহিত হয়। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে চলে আসেন। এখানে এসে শায়খ আদনানি শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদের দায়িত্ব আদায় করে যেতে থাকেন। তিনি মুজাহিদদের সঙ্গে অগ্রসারির ফাঁড়িগুলোর যুদ্ধে অংশ নিতেন। অসমসাহসী এই বীর মর্দে মুজাহিদ অনেকসময় একাই রাতে মুজাহিদদের প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন।

তাঁর চোখভরা স্বপ্ন ছিল আফগানিস্তানে একটি ইসলামি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাবে, যে রাষ্ট্রের মুজাহিদবাহিনী পায়ে পায়ে এগিয়ে একসময় পবিত্র মাসজিদুল আকসাকে ইয়াহুদিদের দখলমুক্ত করেব। শায়খ আদনানি আরবি ও ইংরেজি ভাষায় একজন বাগ্মী বক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বব্যাপী এ বিষয়ে অর্থবহ ভাষণ দিয়ে বেড়াতেন। এতটাই দুঃসাহসী ছিলেন যে, একবার এক যুদ্ধে মুজাহিদরা শত্রুদের ঘেরাওয়ে পড়ে গেলে তাঁরা

ওয়ারলেসযোগে নেতাদের কাছে সহায়তা চেয়ে পাঠান। জবাবে কেন্দ্র থেকে একটি দল মুজাহিদদের সহায়তায় এগিয়ে যায়। শায়খ তামিম তখন অসুস্থ ও দুর্বল থাকার পরও সাহায্যকারী দলে অংশ নেন। প্রফেসর সাইয়াফ তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি জবাবে বলেন, আমাকে যদি পা টেনে টেনেও সামনের ঘাঁটিতে আঘাত হানতে যেতে হয়, তবু আমি যাবই। আমার ভাষণ শুনে জীবনবাজি রাখা যুবকরা শত্রুর ঘেরাওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে; আর আমি এখানে বসে থাকব, এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? সুতরাং শায়খ সামনের ঘাঁটিতে চলে যান এবং শত্রুর ভয়ংকর গোলাবৃষ্টির মধ্যেও জিহাদ চালিয়ে যেতে যুবকদের উদ্দীপ্ত করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ মুজাহিদদের বিজয় দান করেন। তিনি বৈশ্বিক ইসলামি জিহাদের জন্য প্রায় সময় বিভিন্ন দেশে সফরে থাকতেন। মহান এই মুজাহিদ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থানরত মুসলিমদের এক জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পর হার্ট অ্যাটাক করে ইনতিকাল করেন।

দ্রষ্টব্য : আফগান জিহাদে আরব মুজাহিদদের ইমানদীপ্ত দাস্তানের চাহিদা হচ্ছে, তা নিয়ে শত শত পৃষ্ঠায় আবেগদীপ্ত শব্দের সাহায্যে ফুলের বাগান সাজানো হোক। তবে তা বর্ণনা করতে গেলে আমাদের এই ইতিহাসগ্রন্থের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে; অথচ আমরা ইতিহাসটি সংক্ষেপে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। তাই বিষয়টিকে যথাস্থানে রেখেই আমরা আফগান মুজাহিদদের প্রসঙ্গ নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের জিহাদের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ শেষ হলে ওই এক বছরে সংক্ষিপ্ত মেয়াদে আফগান মুজাহিদদের ঝুলি নিম্নোক্ত সাফল্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই এক বছরে ২৭ হাজার ৭১৩ শত্রু মারা পড়ে। আহত হয় ২২ হাজার ৫১০ জন। বন্দি হয় ৫ হাজার ৪০৪ জন। আর মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হয় ১২ হাজার ২১৭ আফগান সরকারি সেনা। বিধ্বস্ত হয় নাজিব সরকারের ৫৬৮ বিমান, ১ হাজার ৬০০ ট্যাংক, ৪ হাজার ৫০০ গাড়ি এবং ১ হাজার ২০০ ভারী অস্ত্র। মুজাহিদরা গনিমতস্বরূপ লাভ করেন ২৮টি ট্যাংক, ১৬৬টি গাড়ি, ৪৮৩ ভারী অস্ত্র এবং ১৬ হাজার হালকা অস্ত্র।

কমিউনিজমের জানাজা

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাঞ্ছনার পরাজয় বিশ্বের কমিউনিস্ট সম্প্রদায়কে লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে দেয়। বিভিন্ন দেশে কমিউনিজমের ভিত নড়ে উঠতে থাকে। সর্বত্র কমিউনিস্টরা পরাজিত হয়ে পেছাতে থাকে। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক নেতাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি

দেশ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে অব্যাহতি নেয়। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর সত্য হলো, বুলগেরিয়ায় মুসলিমদের কেড়ে নেওয়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব-জার্মানিকে বিশ্ব-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে সুদৃঢ় রাষ্ট্র মনে করা হতো। কিন্তু বার্লিন প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট সরকারেরও পতন ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টির এক ইমার্জেন্সি মিটিংয়ের পর পলিটব্যুরো ও সরকার সংস্কার-সংশ্লিষ্ট আপনাপন পদ থেকে অব্যাহতি নেয়। শুধু তা-ই নয়; বরং পার্টিপ্রধানসহ প্রধানমন্ত্রী এবং ১৫ শীর্ষ নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। কেননা, প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, তারা কমিউনিজমের নামে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে দেশের সম্পদ নিজেদের ব্যক্তিগত একাউন্টে ঢুকিয়ে নিচ্ছিল।

চেকোশ্লাভাকিয়ায়ও একই বিপ্লব সাধিত হয়। সেখানে আটজন শীর্ষ নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে পোল্যান্ডেও কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়। আজারবাইজানের মুসলিমরাও স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু করেন। তারা রাজধানী বাকুর লেনিন স্কয়ারের নাম পরিবর্তন করে স্বাধীনতা স্কয়ার নাম দেন। সশস্ত্র যুবকরা রুশদের ফাঁড়িগুলো ধ্বংস করা শুরু করেন। আর রাশিয়ার অধীন লিথুনিয়া তো পুরুদস্তুর স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসে। তারপর গর্বাচেভ যখন সেখানকার অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি সফরে যায়, তখন সেখানে তাকে একজন বিদেশি সরকারপ্রধানের মতো প্রটোকল দেওয়া হয়।

মধ্য-এশিয়ায় জাগরণের ঢেউ

সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত মধ্য-এশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর অবস্থাও ছিল আশাব্যঞ্জক। সেখানকার নিপীড়ন-শেকলের কড়াগুলো একটা একটা করে ভেঙে পড়ছিল। সুদীর্ঘ ১৭ বছর ধরে নিজের ও তিন প্রজন্মের ইমান গোপন করে রাখা মুসলিম জনসাধারণ খুব দ্রুতই তাদের ইমানের জানান দিয়ে মাঠে চলে আসতে থাকে। ওই রাজ্যসমূহের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও এক নতুন আঙ্গিকে সামনে আসতে থাকে। বলা হয়, তখন প্রতিটি কমিউনিস্ট সদস্যের এক পকেটে থাকত পার্টির সদস্যকার্ড; আর অপর পকেটে থাকত কুরআনুল করিমের পকেটসাইজ কপি। উজবেকিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নাস্তিক্যবাদ অনুষদ'-এর প্রফেসর রজমিটভ—যে ইতিপূর্বে একজন অফিসারের মর্যাদা পেত—যে গলিপথ দিয়ে হাঁটত, সে পথের চারদিক থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসতে শোনা যেত; 'এই দেখো বেদীন যাচ্ছে।' কোথাও যদি হোঁচট খেয়ে পড়তেন, লোকজন সমস্বরে বলে উঠত 'যা, গিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার কর।'

রুশ অর্থনীতিতে ধস

রাশিয়ার অর্থনীতিতে এতটাই ধস নেমেছিল যে, মস্কোকে তখন দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের অধীন অঞ্চল বেচার চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ তো জাপান সরকারকে এই প্রস্তাব পর্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিল যে, জাপান সরকার যদি রাশিয়ার পতনশীল অর্থনীতিকে নির্ভরতা জোগানোর লক্ষ্যে এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চারটি দ্বীপের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রাশিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৃষিপ্রধান দেশ গণ্য করা হয়; কিন্তু আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর বহির্বিশ্ব থেকে খাদ্য আমদানিতে তারা বাধ্য হয়। কেননা, দেশে খাদ্যসংকট এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, রেশনের রুটি সংগ্রহের জন্য তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। একসময় রাশিয়ান মুদ্রা রুবল যেখানে ডলারের সঙ্গে টেক্কা দিত, এখন সেই রুবলের এতটাই দরপতন ঘটে যে, পাকিস্তানি ১ রুপিতে ২০০ রুবল পাওয়া যেত।

অন্যান্য অঞ্চলে আফগান জিহাদের প্রভাব

এমতাবস্থায় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে গর্বাচেভ এক বিস্ময়কর ভাষণ দেয়। ওই ভাষণে সে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, সোভিয়েত পার্লামেন্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত যেসব প্রজাতন্ত্র রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে এই আইন পাশ করতে যাচ্ছে যে, তারা যদি ইউনিয়নব্যবস্থার অধীনে থাকতে না চায়, তাহলে তাদের পৃথক হওয়ার অধিকার দেওয়া হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের এই ভাষণ থেকেই অনুমিত হয়ে যায় যে, শীঘ্রই ইউনিয়নব্যবস্থা টুকরো টুকরো হতে যাচ্ছে এবং আরেকবার মধ্য-এশিয়ায় ইসলামি দীপ জ্বলে ওঠার অপেক্ষা করছে। মোটকথা, রাশিয়ার লজ্জাজনক পরজয়ের পরই পুরো মধ্য-এশিয়ায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ঊর্মিমুখর হয়ে উঠতে থাকে।

উত্তর-আফগানিস্তানের গেরিলা কমান্ডাররা আগেও মাঝেমধ্যে আমু দরিয়া পাড়ি দিয়ে অপারেশন চালাতেন। কিন্তু এখন শুধু যে ওই কর্মযজ্ঞ গতিশীলই হয় তা-ই নয়; বরং আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত সেখানকার মুজাহিদরা তাঁদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে নিজেদের রাজ্যকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করে। এদের মধ্যে তাজিক মুজাহিদ দলগুলো ছিল অগ্রসারিতে। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে কেজিবি তাদের এক রিপোর্টে মস্কোকে এই মর্মে সাবধান করে দেয় যে, আফগান জিহাদের প্রভাব পুরো মধ্য-এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, মধ্য-এশীয় মুসলিম জনপদের মানুষের আমু দরিয়ার ওপারের আফগান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে

শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই আফগান জিহাদের এই দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য : ঐক্যের নতুন প্রয়াস

তখন আফগানিস্তানে মুজাহিদদের নাজিববিরোধী কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হচ্ছিল। বিশেষ করে খোস্ত প্রদেশ জিহাদের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠছিল। মুজাহিদদের অস্থায়ী সরকার তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। শরিয়া আদালতে যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছিল বিচারকাজ। কিন্তু এর পাশাপাশি আগামী দিনের সরকার গঠন, ক্ষমতায় অংশ পাওয়া এবং ক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি বিষয় মুজাহিদদের ক্রমশ বিক্ষিপ্ত করে ফেলছিল। এমতাবস্থায় তাঁদের পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার বিশ্বশক্তির ষড়যন্ত্রও সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফলে দিন দিন জিহাদি সংগঠনগুলোর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। আর এ কারণেই তাদের বিজয়ের ধারাও অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে নাজিবুল্লাহর সরকার নিজেকে অনেকটা সামলে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

মুজাহিদদের এই দ্বন্দ্বের মধ্যে হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির মধ্যকার দ্বন্দ্বই ছিল সবার সামনে। দল দুটি আফগান জিহাদের সবচেয়ে বড় দুটি দল হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের জুনে মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে বড় ধরনের একটি পরামর্শ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। আফগান জিহাদের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মুজাহিদ দলগুলোর নেতারা একত্রে এক জায়গায় বসেন। এই পরামর্শের উদ্দেশ্য ছিল, মুজাহিদদের সারিতে মতবিরোধ প্রসারের জন্য কর্মরত কমিউনিস্ট এজেন্টদের তৎপরতা রোধের উপায় নির্ধারণ। এ ছাড়া বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার গোত্রীয় বিরোধ মেটানো এবং কমান্ডারদের মধ্যকার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নিরসনের পাশাপাশি মুজাহিদ সংগঠনসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা নেওয়া। মুজাহিদ নেতারা উপলব্ধি করতে পারছিলেন, কাবুল বিজয় করতে সবাইকে একই কমান্ডের অধীনে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই লক্ষ্যে কমান্ডার আহমাদশাহ মাসউদ ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের পর এই সফরই ছিল তাঁর প্রথম পাকিস্তান সফর। তিনি চাতরালে অনুষ্ঠিত আফগান কমান্ডারদের শুরায় অংশ নেন। সেখানে মাসউদ প্রেসকে বলেন, কমান্ডার গুলবুদিন হেকমতিয়ারের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকের পর তাঁদের মধ্যে পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে, নির্বাচনের মাধ্যমে যে দল যে এলাকায় সংগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, তারা সে এলাকা শাসন করবে!

তখন পাকিস্তানেও নির্বাচন চলছিল। কেননা, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এসেম্বেলি বাতিলের মাধ্যমে

প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সরকার খতম করে দেন। বেনজির ভুট্টোর ওপর অভিযোগ ছিল, তিনি দেশের স্বার্থরক্ষা এবং জনগণের আস্থা ধরে রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে নতুন নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনে ইসলামিক সংগঠনগুলো আই জে আই (ইসলামিক জামহুরি ইত্তিহাদ)-এর নামে মিয়া নাওয়াজ শরিফের নেতৃত্বে লিবারেল রাজনীতিবিদদের মোকাবিলায় জোটবদ্ধ হয় এবং নির্বাচনের বিজয়ী হয়ে মিয়া নাওয়াজ শরিফ ক্ষমতাসীন হন। যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের একজন ভক্ত ছিলেন, তাই আফগানিস্তানের ব্যাপারে তিনি উত্তম কৃতিত্ব দেখাবেন বলেই আশা করা হচ্ছিল।

জহির শাহর ব্যর্থ ঘুঁটি

এদিকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে আমেরিকা ও রাশিয়া এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, নাজিবুল্লাহর সরকারকে হটিয়ে আরেকবার জহির শাহকে আফগানিস্তানের কাঠপুতুল সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হোক। তাদের আশা ছিল, এভাবে মুজাহিদদের অস্থায়ী সরকারকে সর্বজনীন এক স্থিতিশীল সরকারে রূপান্তরিত হওয়া থেকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে। কিন্তু তাদের এই ফরমুলা বাস্তবতার নাগাল পায়নি। মুজাহিদরাসহ আফগানিস্তানের প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষ এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধের কার্যবিবরণী

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধের সাধারণ রিপোর্ট ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আনুমানিক হিসাব নিম্নরূপ :

নাজিবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের ২,১৮৫ সেনার প্রাণহানি ঘটে, আহত হয় ২,৯১০, গ্রেপ্তার হয় মোট ৫৮২ সেনা। মুজাহিদদের দলে যোগদানকারী সেনাসংখ্যা ছিল ৮,২১৮ জন। বিধ্বস্ত হয় ৭৭টি বিমান, ১৪টি হেলিকপ্টার ২০৩ ট্যাংক এবং ১২১ সাঁজোয়া যান। এ ছাড়া গনিমতস্বরূপ পাওয়া যায় ৩২টি ট্যাংক এবং ৬৪টি সাঁজোয়া যান। মুজাহিদদের মধ্যে শহিদের সংখ্যা ছিল ৭৯০ জন। গাজির সংখ্যা ছিল ৯০০ জন। মোটামুটি হিসাবে ওই বছর মুজাহিদদের কর্মতৎপরতা ছিল বিগত বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা গতিহীন। এর অন্যতম কারণ ছিল, মুজাহিদ দলগুলোর মধ্যকার বিরোধ এবং নেতাদের অধিকতর রাজনীতি-ঘনিষ্ঠতা। একইভাবে বিগত বছরগুলোর মতো এ পর্যায়ে মুজাহিদবাহিনী আগের মতো বহির্বিশ্ব থেকে প্রকাশ্যে অস্ত্রসহযোগিতাও পাচ্ছিল না।

উপসাগরীয় যুদ্ধের লেলিহান শিখা

আফগানিস্তানে ইসলামি জিহাদের ফলে বিশ্বে এক সুবিশাল পরিবর্তন আসে। কাশ্মিরে

আধিপত্যবাদী ভারতের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের স্বাধীনতা-আন্দোলন বেশ গতিশীল হয়ে ওঠে। কাশমিরি মুজাহিদরা দাবিদাওয়া-সংবলিত নিরর্থক মিটিং-মিছিলের পথ পরিহার করে আফগান মুজাহিদদের মতো গেরিলাযুদ্ধের পথ বেছে নেন। তাঁদের সে আন্দোলন দিন দিন গতি পাচ্ছিল। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহে স্বাধীনতার ঢেউ জেগে উঠছিল প্রবলভাবে। মধ্য-এশীয় রাজ্যগুলোতে গড়ে উঠছিল রুশবিরোধী সশস্ত্র সংগঠন।

যেহেতু আমেরিকা পৃথিবীর যে-কোথাও ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি মনে করছিল; আর আফগানযুদ্ধের সাফল্যের ফলে বিশ্বের দিকে দিকে জেগে ওঠা মুজাহিদদের উত্থান ছিল তার জন্য সহ্যের বাইরে, তাই এমন সব ভূখণ্ডের জন্য সে আগে থেকেই এক ঘৃণ্য পরিকল্পনা করে রাখে। পরিকল্পনাটিকে এক অর্থে 'বিশ্বের সুপার পাওয়ার হওয়া' নামে অভিহিত করা যায়। পরবর্তীকালে একেই 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' নামে নামকরণ করা হয়। আমেরিকার জন্য তখন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো বাধাও ছিল না। কেননা, রাশিয়া তার সামন থেকে আড়ালে চলে যাচ্ছিল। রাশিয়ার পেছনে সরার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমবিশ্বের ওপর আমেরিকার আধিপত্যযুগের সূচনা হয়। সুতরাং আমেরিকার এই পরিকল্পনার প্রথম রূপ উপসাগরীয় যুদ্ধের আকারে প্রকাশ পায়।

আমেরিকা ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে গোপনে ইরাককে কুয়েতের সঙ্গে তাদের চলে আসা পুরানো বিরোধের জের ধরে হামলার জন্য প্ররোচিত করে। প্ররোচিত ইরাক এক রাতেই কুয়েত দখল করে নেয়; কিন্তু রাতারাতি ভোল পালটে নেয় আমেরিকা। তারা ইরাককে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সামনে ফ্রাঙ্কেস্টাইন হিসেবে তুলে ধরে। তাদের নিয়ে গঠন করে ইরাকবিরোধী জোট। আমেরিকা তাদের আশ্বাস দেয়, সে তার আধুনিক অস্ত্রবলে ইরাককে পরাজিত করে দেবে, তবে যুদ্ধের ব্যয়ভার আরব রাষ্টগুলোকেই বহন করতে হবে। এ ছাড়া আমেরিকা তাদেরকে আরও কিছু শর্ত গিলিয়ে নেয়।

ইরাকের কুয়েত দখলের তিন মাস পরে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসহ সৌদি আরবে এসে উপনীত হয়। এখানে তারা সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ইরাকে হামলা শুরু করে। আমেরিকা ও তার জোটবাহিনী দৈনিক প্রায় আড়াই হাজার হামলা চালিয়ে বাগদাদসহ ইরাকের সমৃদ্ধ শহরগুলোকে কংক্রিটের স্তূপ বানিয়ে তোলে। ফলে ইরাককে হার মেনে কুয়েত থেকে সেনাপ্রত্যাহার করার পাশাপাশি কিছু কঠিন শর্তও হজম করতে হয়।

এই যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী রাষ্ট্র ইরাকের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি একেবারে ভেঙে পড়ে। অপরদিকে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি তৈরিতে

সক্ষম হয়। আমেরিকাকে এভাবে ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দেওয়া ছিল আরবদের জন্য চরম এক বোকামি। ফলে আমেরিকা এতদঞ্চলে তার সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃতির সুযোগ পেয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়; পুরো মুসলিমবিশ্বের নিরাপত্তা শঙ্কায় পড়ে যায়। উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার ঘাঁটি তৈরি তাদের সুদীর্ঘ সামরিক পরিকল্পনার একটি অংশ, যে পরিকল্পনায় কেবল আরব রাষ্ট্রগুলোকে নত করাই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এশীয় অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোকেও বিশেষ করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানকে বশীভূত করা উদ্দেশ্য ছিল।

খোস্ত বিজয়

এদিকে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কমিউনিস্টবিরোধী আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে মুজাহিদরা খোস্তে চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে বসেন। সীমাহীন আত্মত্যাগ আর দীর্ঘ এক মাসের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার পর তাঁরা প্রথমে খোস্তের ছাউনিতে, এরপর শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। খোস্ত ছাউনির পতন কমিউনিস্টদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। খোস্তে পরাজয়ের ফলে নাজিব সরকার দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করে। খোস্ত বিজয়কে আফগান জিহাদের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় গণ্য করা হয়। এই যুদ্ধে কয়েকটি মুজাহিদ দলের শত শত জানবাজ যোদ্ধা অংশ নেন। তবে হারকাতুল মুজাহিদ ও হারকাতুল জিহাদিল ইসলামির বীরযোদ্ধারাই ছিলেন ফ্রন্টলাইনে। তাঁরা তাঁদের পুরো শক্তি ওই যুদ্ধে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। মুজাহিদরা ওই যুদ্ধে মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির সরবরাহকৃত ট্যাংকও ব্যবহার করেন। মাওলানা হাক্কানির সহোদর কমান্ডার খলিল একটি ট্যাংক পরিচালনা করছিলেন।

যুদ্ধের শুরুর দিকে মুজাহিদদের কঠিন পরিস্থিতি পার করতে হয়। তাঁদের পানাহারসামগ্রী ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। দুটি ট্যাংক বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সর্বোপরি বিখ্যাত কমান্ডার মোল্লা কান্দাহারির শাহাদাত তাঁদের অগ্রযাত্রাকে প্রায় থামিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মুজাহিদবাহিনী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ফলে শেষপর্যন্ত বিজয় তাঁদের পায়েই চুমু খায়। মুজাহিদরা বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ ও প্রতিশোধের পরিবর্তে সাধারণ ক্ষমার পাশাপাশি দয়া ও নম্রতামূলক আচরণ করে সবার মন জয় করেন। শত্রুদের হত্যা না করে শুধু বন্দি করেন।

মাওলানা হাক্কানি সবসময় জিহাদি পোশাক পরা থাকতেন। কিন্তু শহর বিজয়ের পর তিনি সাদা পোশাক পরে শহরে প্রবেশ করেন। সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন তিনি। পেছনের কেন্দ্রে থাকা শত শত মুজাহিদ আবেগদীপ্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করেন। গনিমত হিসেবে শহরের বিমানবন্দরে পড়ে থাকে প্রতিপক্ষের অনেক

বিমানসহ অন্যান্য সামগ্রী। মুজাহিদবাহিনী তখন সেসব বিমানে বসে আনন্দ উপভোগ করে। শহর বিজয়ের পরপর সেখানকার ১০-১২টি সামরিক পোস্ট, যা বিগত দশক ধরে দুর্জয় গণ্য হয়ে আসছিল, সেগুলোও কোনো প্রতিরোধ বা রক্তক্ষয় ছাড়াই মুজাহিদদের হাতে চলে আসে। এই মহাবিজয় তথা ফাতহুম মুবিনের পর পাকিস্তানের বেশ কজন শীর্ষস্থানীয় আলিম আফগানিস্তান সফর করেন। তাঁদের মধ্যে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা ফজলুর রাহমানও ছিলেন। মুজাহিদরা ঘোষণা দেয়, খোস্ত বিজয় হবে পুরো আফগানিস্তান বিজয়ের দরজাস্বরূপ।

খোস্ত বিজয় একদিকে যেমন ছিল অপার আনন্দের, তেমনি এ বিজয় ছিল সীমাহীন বিষাদমাখা। কারণ, ওই যুদ্ধে সময়ের অনেক শ্রেষ্ঠ বীর-বাহাদুরকে জীবনের নাজরানা পেশ করতে হয়েছিল। বড় বড় অনেক কমান্ডারকে শাহাদাতের শরাব পান করে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে যেতে হয়। শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একটি নাম ছিল নুরুল ইসলাম বাবর। এই মর্দে মুজাহিদ মূলত ছিলেন ভারতীয় একজন পপ তারকা। আল্লাহ তাঁকে হিদায়াতে ধন্য করলে নিজ দেশের অন্ধকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আফগানিস্তান জিহাদের আলোকোজ্জ্বল পথে বেরিয়ে আসেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ পথে অটল থেকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। নুরুল ইসলাম বাবরের জিহাদি সংগীতগুলো আজও মুসলিম যুবকদের বুকে ইমান ও জিহাদের বান ডেকে নিয়ে আসে।

মুজাহিদদের আরও সাফল্য

খোস্ত বিজয়ের পর মুজাহিদরা না থেমে হেরাত, কাবুল ও গজনি অভিমুখে ঝড়ের বেগে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। ইতিমধ্যে গারদেজ অবরোধের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। ফারিয়াবের জেলা কায়সারও জয় করে নিয়েছিলেন তাঁরা। ওই লড়াইয়ে শত্রুর ১২৫ সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি ৩৫০ সেনা গ্রেপ্তার হয়। হাজার হাজার ক্লাশিনকোভসহ ১২টি ট্যাংকও গনিমতে পাওয়া যায়। মে মাসের দ্বিতীয় দশকে তাখার প্রদেশে ৫ হাজার কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ কাজটি করা হয় আহমাদশাহ মাসউদের তত্ত্বাবধানে। তাখারের তিনটি জেলা মুজাহিদরা দখল করে নেন। ২৮ মে তাঁরা কঠিন অবরোধ আর যুদ্ধ শেষে কান্দাহারে পৌঁছাতে সমর্থ হন। কমিউনিস্ট সেনারা তখন পালিয়ে যায়। মুজাহিদরা কান্দাহার বিমানবন্দর অকেজো করে দেন।

গারদেজযুদ্ধ

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের পুরো গ্রীষ্মকালই যুদ্ধের আগুনে তেতে থাকে। মুজাহিদ দলসমূহের সম্মিলিত বাহিনী গারদেজ অবরোধ করে রাখে। কমিউনিস্টরা তখন তাদের সামনে

মৃত্যুকে খেলা করতে দেখতে পাচ্ছিল। শীতকালেও একই অবস্থা অব্যাহত থাকে। ১৯৯১ খ্রিষ্টব্দের ডিসেম্বরে মুজাহিদবাহিনী কাবুল থেকে গারদেজগামী মহাসড়ক দখল করে কমিউনিস্টদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দেয়। এদিকে খোদ কমিউনিস্টদের মধ্যেও তখন দেখা দেয় ভাঙন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যকার বিরোধ রক্তাক্ত কর্মকাণ্ডের দিকে মোড় নেয়। ফলে ডিসেম্বরের শেষ দিকে গারদেজ ছাউনিতে নাজিববাহিনীর দুই দলের এক সংঘর্ষে ৭০ জন সেনা মারা পড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভগ্নস্তূপ থেকে জেগে ওঠা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রবল দুর্দশার শিকার ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু সোভিয়েত ইউনিয়ন। সব প্রজাতন্ত্র একে একে স্বাধীন হয়ে যায়। বিশ্ব তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে—মধ্য-এশীয় মুসলিম রাজ্যগুলো ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দিয়ে বসছে। খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ মানুষও প্রকাশ্যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। মস্কোয় উত্তেজিত জনতার মিছিল কমিউনিজমের স্থপতি কার্ল মার্কসের ভাস্করে কালি লেপে দেয়। আরেকদল উগ্র যুবক হাতুড়ি পিটিয়ে মূর্তিটির চেহারা বিকৃত করে ফেলে। এ ছাড়া কমিউনিজমের আরেক প্রতিষ্ঠাতা লেলিনের মূর্তি ক্রেন দিয়ে ভূপাতিত করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামো। গর্বাচেভ প্রাণপাত প্রয়াসের পরও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন রোধ করতে পারেনি। এমনকি নিজের আসনটাও ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তাকে ইউনিয়নব্যবস্থার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অব্যাহতি নিতে হয়। আর তার বিদায়ের পরপরই মি. বরিস ইয়েলৎসিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে বসে পড়ে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্লানিকর পরাজয় আর উপসাগরীয় যুদ্ধজয়ের পর আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে মোড়লি এক সমাজব্যবস্থার মডেল তুলে ধরে। এর অধীনে সে নিজেকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে নিজের জন্য যেকোনো পদক্ষেপগ্রহণ বৈধ করে নেয়। কিন্তু অবাক-করা বিষয় হলেও এই পরিকল্পনার অধীনে রাশিয়াকে আমেরিকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে দেখা যায়। এ ছাড়া ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপানসহ বিভিন্ন বিশ্বশক্তি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আমেরিকাকে পুরোপুরি সঙ্গ দেয়। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য ছিল তিনটি :

১. আফগানিস্তানসহ বিশ্বের কোথাও যেন মৌলবাদী মুসলিমশক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে না পারে।

২. মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের মোকাবিলায় ইসরাইলের সামরিক শক্তি এতটা উন্নীত করতে হবে, যাতে ইসরাইলের শক্তির সামনে আরবরা নত থাকতে বাধ্য হয়।

৩. বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় শক্তিকে সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধাবিয়ে রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর মস্কোয় রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল, যেসব রাষ্ট্র আমেরিকার মোড়লিপনা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাদেরকে যেন ওইসব মুসলিম রাষ্ট্রকে এবং মুসলিম মুজাহিদদের সাহায্য প্রদান বন্ধ করতে বাধ্য করা যায়। এর ফল দাঁড়ায়—১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রকেও মুজাহিদদের সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দিতে দেখা যায়। এসব রাষ্ট্রের কাতারে পাকিস্তান আর সৌদি আরবও ছিল।

আমেরিকার ভয় ছিল, যদি আফগানিস্তানে ইসলামি শক্তি ক্ষমতায় এসে যায়, তাহলে মধ্য-এশিয়ার যেসব দেশে কমিউনিজম দৃঢ় ভিত গড়ে উঠেছে, সেসব প্রজাতন্ত্রেও ইসলামি বিপ্লবের জোয়ার জেগে উঠবে। এ জন্য আমেরিকা ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা মুজাহিদদের এমন এক জগাখিচুড়ি মার্কা সরকার গঠনের জন্য চাপ দিতে থাকে, যে সরকারে মৌলবাদী মুসলিমদের অংশগ্রহণ থাকবে একেবারে সীমিত। পাশাপাশি তারা নাজিব সরকারকেও সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল, যাতে মুজাহিদদের চাপে রেখে আফগানিস্তানে তাদের ফরমুলার অনুকূলে তথাকথিত শান্তিবাদী একটি সরকার গঠন সম্ভব হয়। খোদ নাজিবুল্লাহ ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে বলেছিল, 'আমার সরকারই এ অঞ্চলে উত্তমভাবে আমেরিকা ও ইসরাইলের স্বার্থরক্ষা করতে পারে।'

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের তাৎক্ষণিক ফলাফল তখন প্রকাশ পায়, যখন আলজেরিয়ার সাধারণ নির্বাচনে ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট ২০২ আসন পেয়ে বিজয়ী হয় এবং তাদের প্রতিপক্ষ ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি মাত্র ১৭টি আসন পেয়ে সেনাবাহিনী মার্শাল ডেকে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেয়। আলজেরিয়ার এ ঘটনা প্রমাণ করছিল, আমেরিকা আফগানিস্তানেও মুজাহিদদের সরকার প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না। এটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা কোনো নীতির ধারও ধারবে না।

পাখতুন, উজবেক ও তাজিক ফিতনা

নাজিবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্বশক্তি

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎকে এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার ঘৃণ্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে থাকে। এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা ছিল, আফগানিস্তাকে ভাষা ও জাতিগত দিক দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা। সিদ্ধান্ত হয়, ইসলাম ও কমিউনিজমবিরোধী এই যুদ্ধকে পশতু ও অপশতুভাষীদের মধ্যকার যুদ্ধের রূপ দিতে হবে। রূপ দিতে হবে পাখতুন বনাম তাজিক-উজবেক-তুর্কমানযুদ্ধে। এটা করা গেলে জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য পেছনে পড়ে যাবে। তখন শক্তিমান আফগানজাতি তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্থহীন এই যুদ্ধের পেছনে ধ্বংস করে অথর্ব হয়ে থাকবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাবেক কমিউনিস্ট পার্টি পরচমের নেতা কারমালকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলা হয়। কারণ, তার দলে ছিল প্রচুর তাজিক-উজবেক আর ফারসিভাষী লোক। এদের সিংহভাগই উত্তর-আফগানিস্তানে বসবাস করত। এরা কারমালের ইশারায় উত্তরাঞ্চলে নাজিবুল্লাহর কর্তৃত্বের বাইরে স্থানীয় সরকার গঠন করে। তারা নাজিবসহ পাখতুন জাতিগোষ্ঠী ও পশতুভাষীদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রোপাগান্ডা শুরু করে।

ইতিমধ্যে মুজাহিদবাহিনী খোস্ত জয় করে নিলে নাজিবের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলীয় কমিউনিস্ট জেনারেলদের স্বায়ত্তশাসন আরও মজবুত হয়ে ওঠে। তারা পাখতুন অপাখতুন দ্বন্দ্ব চাঙা করতে এই প্রোপাগান্ডা ছড়াতে থাকে যে, খোস্ত বিজয়ের পর মুজাহিদরা অপাখতুন পারসি, উজবেক এবং কমিউনিস্টদের গণহত্যার শিকার বানালেও পাখতুন কমিউনিস্টদের ক্ষমা করে দিয়েছে! আসলে মুজাহিদ হোক কিংবা কমিউনিস্ট, তারা আফগানিস্তান থেকে অপাখতুনদের নির্মূল করে এখানে একটি পাখতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়!

কারমালের ইঙ্গিতে কাজ সম্পাদনকারীদের একজন ছিল উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিমান কমান্ডার জেনারেল রাশিদ দোস্তাম। জুজযান ছিল তার প্রধান কেন্দ্র। একরোখা উগ্রবাদী এই জেনারেলের অধীনে ছিল হাজার হাজার যুদ্ধবাজ সেনা। তার কাছে মিসাইল ও যুদ্ধবিমানের মতো অত্যাধুনিক অস্ত্রও ছিল। তার ভাই মজিদ দোস্তামও ছিল বড় মাপের এক কমান্ডার। তার মিলিশিয়া বাহিনীর নাম ছিল গুলাম জিম মিলিশিয়া।

ওই সময় উত্তরাঞ্চলের হায়রাতান সীমান্তে নিয়োজিত জেনারেল মুমিন—যে মানসিকভাবে ছিল কারমালের মতাদর্শী—নাজিবের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। সে চোরাচালান ও লুটতরাজের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ কামিয়ে নিয়েছিল। তাশখন্দে গড়ে তুলেছিল বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টে। জেনারেল মুমিন পাখতুন কমান্ডারদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। নাজিবুল্লাহর কিছু নির্দেশও প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করত। এ ছাড়া কাবুলে অবস্থানরত নাজিব সরকারের আরেক বড় কমান্ডার নবি আজমিও তলে তলে কারমালের পেছনে কাজ করছিল। নাজিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে সে ছিল সক্রিয়। এ ছাড়া

নাজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল ওয়াকিল এবং জেনারেল আসলাম ওয়াতান ইয়ারও কাবুলে নাজিববিরোধী প্রাসাদষড়যন্ত্রের বুনিয়াদি কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল।

ভাষাগত দ্বন্দ্বের ফাঁদে কতিপয় মুজাহিদ নেতা

এ পর্যন্ত তো পরিস্থিতি মুজাহিদদের অনুকূলেই ছিল; কমিউনিস্টরা পাখতুন অপাখতুন-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে এক দল অপর দলের প্রাণের শত্রু হয়ে উঠছিল। যদি মুজাহিদ নেতারা এই সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিশেষ করে ক্ষমতার লোভ থেকে ঊর্ধ্বে থাকতেন, ঐক্য, কৌশল আর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাজ করতেন, তাহলে সুযোগটি কাজে লাগিয়ে পুরো আফগানিস্তানকে কমিউনিস্টদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকের স্বার্থপরতা, ক্ষমতা ও জাগতিক সম্মানের খায়েশ এবং পারস্পরিক আস্থার অভাব কমিউনিস্টদের জন্য আমেরিকা ও রাশিয়ার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। মুজাহিদদের প্রথম মূর্খতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন আহমাদশাহ মাসউদ উত্তর-আফগানিস্তানের জিহাদি দলগুলোর জোট শুরায়ে নাজারের চেয়ারম্যান হয়ে উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণে থাকা নাজিবের বিদ্রোহী কমান্ডারদের সঙ্গে ঐকমত্যে এসে মৈত্রীচুক্তি করেন। এদিকে গুলবুদিন হেকমতিয়ারও নাজিবের বিশ্বস্ত কমান্ডার জেনারেল রাফি ও শাহ নাওয়াজ তানায়ির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ গড়ে তোলেন।

যদি আমরা ওই দুই বড় কমান্ডারের এহেন কাজের প্রতি সুধারণা পোষণ করে একে তাঁদের কমিউনিস্টদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চাই, তথাপি বিশ্ববাসী দেখতে পাচ্ছিল—অবস্থা কিন্তু ভিন্নদিকে মোড় নিচ্ছিল। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এ সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন, তা কার্যকর ও সফল হচ্ছিল না। গুলবুদিন হেকমতিয়ার জেনারেল শাহ নাওয়াজকে সাহায্য করে নাজিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর এ প্রয়াস সুফল বয়ে আনেনি; বরং উত্তরাঞ্চলে তাঁর এই সুন্দর প্রয়াসকেও পাখতুনদের অপাখতুনদের মোকাবিলায় চক্রান্ত হিসেবেই গণ্য করা হয়।

মাসউদের সাহায্যকারী

তখন মাসউদের সঙ্গে রাশিদ দোস্তামসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট কমান্ডারের ভাষার ভিত্তিতে ঐক্য জোরদার হচ্ছিল। কাবুল সরকারের বড় এক কমান্ডার আসিফ দিলাওয়ারও মাসউদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। কেননা, সে-ও ছিল বংশগতভাবে একজন তাজিক কমান্ডার। তখন উত্তরাঞ্চলীয় জোটে আরেক নতুন শক্তির সংযোগ ঘটে। সেটি ছিল বাগলান প্রদেশের বিখ্যাত ইসমাইলি শিয়া নেতা সাইয়িদ কায়ান ইসমাইলির দৌহিত্র মানসুর নাদিরির ওই জোটে যোগদান। সে ছিল আমেরিকায় শিক্ষালাভকারী

ভোগবাদী এক মদখোর নেতা। আমেরিকা তাকে উত্তম ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। তারা তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যায়। লক্ষণীয় যে, মানসুর নাদিরির দাদা সাইয়িদ কায়ান রুশবিরোধী যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছিল। এবার আমেরিকা তারই দৌহিত্রকে তার স্থলে ব্যবহার করছিল। মোটকথা, এই বিভিন্ন চিন্তাধারার অধিকারী শক্তিগুলো কেবল আফগানিস্তানে পাখতুনবিরোধী অবস্থানে একমত হয়ে জোটবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। আর এদের মধ্যকার বিখ্যাত জিহাদি নেতা আহমাদশাহ মাসউদ একজন মুসলমান ও তাজিক জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকেন।

এভাবে জোটবদ্ধ হওয়ার পর উত্তরাঞ্চলীয় জোট নাজিব সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তাখার ও পারওয়ান প্রদেশ দুটি আহমাদশাহ মাসউদের হাতে তুলে দেয়। এই জোটের ওপর নির্ভর করেই তিনি দোস্তামের মিলিশিয়া আর শিয়াদের হিজবে ওয়াহদাতের সহায়তায় উত্তরাঞ্চলের শক্তিশালী শহর বলখ দখল করে নেন। শহরটি বিজয়ের পর সেখানে যে লুটতরাজ চালানো হয়, তাতে জনগণের চোখ খুলে যায়। মানুষ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে, জমিয়তে ইসলামি যতই দাবি করুক, আসলে কমিউনিস্টদের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এর আগে আহমাদশাহ মাসউদ জোরগলায় বলে বেড়াচ্ছিলেন, জমিয়তে ইসলামি যখন ইচ্ছা কমিউনিস্টদের মেরে পালাতে বাধ্য করবে।

লিবারেল আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে আরেকবার বিশ্বশক্তিগুলো আফগানিস্তানে জহির শাহকে ডেকে এনে ক্ষমতার মঞ্চে বসানোর জোর তৎপরতা চালায়। কিন্তু অধিকাংশ মুজাহিদ নেতার প্রত্যাখ্যানের ফলে এবারও সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

বিজয় ও পরাজয়ের সময়টি একমাত্র আল্লাহই জানেন

হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির মধ্যে ভাষাগত এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মুজাহিদদের শক্তি অনেকটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে কাবুল বিজয় ক্রমান্বয়ে দূর থেকে আরও দূরে চলে যেতে থাকে। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে খোস্তবিজেতা মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি করাচি সফর করেন। তিনি সেখানে এক ভাষণে বলেন, 'আমাদের জিহাদ কোনো ব্যক্তি বা নামের বিরুদ্ধে শুরু হয়নি; বরং বাতিল শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতেই শুরু হয়েছিল। বাতিলের শক্তি যতক্ষণ-না নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে।' তিনি কাবুল বিজয়ে বিলম্ব হওয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক সন্দেহ দূর করতে গিয়ে বলেন, 'মানুষ বলছে কাবুল এখনো বিজিত হচ্ছে না কেন? কিন্তু এটি একটি অর্থহীন প্রশ্ন। এই জিহাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের কত কত এলাকা

বিজিত হয়েছে। কত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বাধীন হয়েছে। খোদ নবি কারিম ﷺ কত বছর পর মক্কা জয় করেছিলেন? বিজয় ও পরাজয়ের সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন।'

এর অল্পকদিন পরই কাবুল বিজয়ের চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে পুরো বিশ্বের জন্য হা করে তাকিয়ে ছাড়া অন্য কিছু করার ছিল না।

কাবুল অবরোধ

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে আহমাদশাহ মাসউদ, হেকমতিয়ার, রাশিদ দোস্তামসহ অন্য কমান্ডাররাও কাবুলের চারপাশে আপনাপন বাহিনী মোতায়েন শুরু করেন। নাজিব সরকারের পক্ষ থেকে আহমাদশাহ মাসউদকে ৪০ লাখ ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে তিনি তাঁর বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নেন। কিন্তু তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে হিজবে ইসলামি নাজিবকে মুজাহিদদের হাতে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ডেট লাইন দেয়। তারা তাকে হুমকি দিয়ে রাখে, নির্ধারিত সময় পেরোনোর পর মুজাহিদরা শক্তির জোরে কাবুল দখলের তৎপরতা শুরু করে দেবে।

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান কি কাহানি হাকায়িক কি জুবানি*, ড. মুফাক্কির আহমাদ।

২. *মাসিক সাদায়ে মুজাহিদ*, ১৯৮৮, ১৯৮৯,১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. *মাসিক আল-ইরশাদ*, ১৯৮৮, ১৯৮৯,১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. *সাপ্তাহিক তাকবির*, ১৯৮৮, ১৯৮৯,১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. *উর্দু ডাইজেস্ট*, মার্চ ১৯৮৯, জিহাদে আফগানিস্তান সংখ্যা; এপ্রিল ১৯৮৯, জিহাদে আফগানিস্তান সংখ্যা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯০—জুন ১৯৯২।

২৯ তম অধ্যায়

কাবুল বিজয় : মুজাহিদদের সরকার এবং গৃহযুদ্ধ

সরকারগঠন নিয়ে মুজাহিদদের মতবিরোধ

এপ্রিলে কাবুল অবরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ওই সময়ই জিহাদি দলগুলোর বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। বিষয়টা ছিল সত্যিই হতাশার। কারণ, রক্তগঙ্গা পেরিয়ে কাবুলের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দলগুলো তখনো পরবর্তী সরকার গঠনের ফরমুলায় একমত হতে পারছিল না। সব দলেরই ছিল আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। গুলবুদিন হেকমতিয়ার ও বুরহানুদ্দিন রাব্বানি সরকার গঠনের জন্য নির্বাচনকেই একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। তবে ব্যবধান ছিল—হেকমতিয়ার ছিলেন তাৎক্ষণিক নির্বাচনের পক্ষে; আর রাব্বানি ছিলেন কিছুটা অপেক্ষার পক্ষে। এই দুই কমান্ডার ছাড়া অন্য কমান্ডারদের মধ্যে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি, পির আহমাদ গিলানি এবং মাওলানা নবি মুহাম্মাদ এসব ঝামেলায় না গিয়ে বাদশাহ জহির শাহকে আফগানিস্তানে ডেকে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের অভিমত ছিল, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য মোতাবিক লয়া জিরগা অনুষ্ঠান এবং জহির শাহকেই ক্ষমতার মসনদে বসানো এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। সুতরাং সম্ভাব্য কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাকিস্তানের পেশোয়ারে মুজাহিদ দলগুলোর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যা একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রফেসর সাইয়াফ এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্দিক কাঞ্জু এবং আইএসআই-প্রধান জেনারেল জাবিদ নাসিরও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদও মুজাহিদ দলগুলোকে সুন্দরভাবে বিষয়টি সমাধানের জন্য একটি চিঠির মাধ্যমে বার্তা পাঠান।

গুলবুদিন হেকমতিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ না দিয়ে আফগানিস্তান চলে যান। তাঁর আশঙ্কা ছিল—আহমাদশাহ মাসউদ গুলমজাম মিলিশিয়া আর শিয়াদের নিয়ে কাবুল দখলের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অথচ মুজাহিদ দলগুলো এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, সরকার গঠনের পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্যে আসার পরই কেবল কাবুলে

প্রবেশ করা হবে। নতুবা পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের দিকে মোড় নিতে পারে। সরকারগঠন সম্পর্কে হেকমতিয়ারের অভিমত ছিল, এই মুহূর্তেই ৩৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হোক। এরা এক বছর পর্যন্ত শাসনকাজ চালাবে, এরপর সাধারণ নির্বাচন দেবে।

নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার

মোটকথা, হেকমতিয়ারের মর্জির বিরুদ্ধে ২৪ এপ্রিল ১৯৯২ মুজাহিদ দলগুলোর নেতাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় :

১. প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি (যিনি ছিলেন আফগান জিহাদের একজন বুজুর্গ নেতা) দুই মাসের জন্য কাবুলে অস্থায়ী সরকারপ্রধান হবেন।

২. দুই মাস পর জমিয়তে ইসলামির নেতা প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি দুই বছর যাবৎ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৩. প্রধানমন্ত্রী হবেন গুলবুদিন হেকমতিয়ার।

৪. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন ইত্তিহাদে ইসলামির প্রধান উসতাজ প্রফেসর আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ। শিক্ষামন্ত্রী হবেন মাওলানা ইউনুস খালিস। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন মাহাজে মিল্লির নেতা পির আহমাদ গিলানি।

৫. প্রতিরক্ষামন্ত্রলায়ের দায়িত্ব থাকবে আহমাদশাহ মাসউদের হাতে।

৬. বিচারবিভাগের প্রধান হিসেবে থাকবেন ইনকিলাবে ইসলামির নেতা মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি।

৭. আর তিনটি মন্ত্রণালয় দেওয়া হবে দেশের শিয়া সম্প্রদায়কে।

এই চুক্তিতে সব দল ঐকমত্যে এলেও গুলবুদিন হেকমতিয়ার তা প্রত্যাখান করে নিজ করমূলায় অটল থাকেন। হেকমতিয়ার নিজে কাবুলের পাশে তাঁর ঘাঁটিসমূহে পৌঁছে যান, যাতে শহর দখলের কার্যক্রম নিজে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারেন। শিয়া দলগুলো শুরু থেকেই বৈঠক বয়কট করেছিল। কেননা, তারা দাবি জানিয়ে আসছিল, সরকারে তাদের ২৫% অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

শিয়া ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে মাসউদের ঐক্যচেষ্টা

আফগান সমাজব্যবস্থায় এবং সামরিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শিয়া দলসমূহের তেমন কোনো গুরুত্ব না থাকলেও এই সুযোগে তারা আফগান রাজনীতিতে তাদের প্রাপ্য

অধিকারের চেয়ে যতটা সম্ভব বেশি আদায় করার চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ছোট ছোট কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত হিজবে ওয়াহদাত ছিল তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্লাটফর্ম। কারিম খলিলি ছিলেন ওই জোটের প্রধান। যেহেতু ইরান ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক, এ জন্য খলিলিকে তখন ইরান ও পেশোয়ারে বার বার আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়। পরে তাদের আরেক নেতা আয়াতুল্লাহ মুহসিনি দল থেকে বেরিয়ে আলাদা জোট গঠন করে। এই দল পেশোয়ার চুক্তি নাকচ করে দেয়, যে চুক্তিতে সিবাগতুল্লাহ মুজাদ্দিদিকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করার এবং শিয়াদের তিনটি মন্ত্রণালয় দেওয়া প্রস্তাব পাশ হয়। ইরানের ধর্মীয় নেতা খোমেনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়, 'আফগান সরকারে শিয়াদের মাত্র তিনটি মন্ত্রণালয় দেওয়ার সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট নই। শিয়াদের তাদের পূর্ণ অধিকার দিতে হবে।'

আহমাদশাহ মাসউদ তখন তাঁর স্বভাবজাত বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে শিয়া দলগুলোকে নিজের পাশে টেনে নেওয়ার পাশাপাশি কমান্ডার রাশিদ দোস্তামের মিলিশিয়াবাহিনীসহ কমিউনিস্টদের আস্থাও অর্জন করেন। মূলত তিনি আফগানিস্তানের বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আফগানিস্তানে পাখতুন ও তাজিক সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সংখ্যাগুরু পাখতুনদের বিপরীতে তাঁর এই স্বপ্ন ছিল দিবাস্বপ্নের মতোই। কারণ, তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হেকমতিয়ারের অবস্থান ছিল খুব শক্ত ভিত্তির ওপর। তাঁর কাছে ওই শক্তির মোকাবিলা তখনই সম্ভব ছিল, যদি শিয়া ও কমিউনিস্টরা তাঁকে সহায়তা করে। তিনি আগে থেকেই উত্তরাঞ্চলীয় জিহাদি দলগুলোর জোট 'শুরায়ে নাজার'-এর নেতার আসন দখল করে নিয়েছিলেন। এবার শুরায়ে নাজারের সঙ্গে গুলমজাম মিলিশিয়াবাহিনী যোগ দিলে বড় একটি শক্তি সামনে চলে আসে, যারা ইচ্ছা করলে কাবুল দখল করে নিজেদের মর্জিমতো সরকার গঠন করতে পারে।

নাজিব কেন কাবুল থেকে পালায়নি

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদরা কাবুল অবরোধ করলে নাজিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। এই সময় জেনারেল আজিমিসহ আরও কতিপয় কমিউনিস্ট অফিসার নাজিবকে এই ধোঁকাপূর্ণ পরামর্শ দেয় যে, আপনি রাশিদ দোস্তামের মিলিশিয়াবাহিনীকে কাবুলের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ডেকে পাঠান। সে এই পরামর্শ মেনে নিলে রাশিদ দোস্তাম ১১টি বিমানে করে সশস্ত্র বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কাবুল বিমানবন্দরে নামে। তারা ওখানে নেমেই বিমানবন্দরের রেডিয়ো-টিভি স্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা দখল করে নেয়। এরপর নাজিব জেনারেল আজিমির চাপে তার পদ থেকে অব্যাহতি নেয়। পরে সে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাইরের কোনো দেশে যেতে বিমানবন্দর অভিমুখে রওনা হয়। কিন্তু পথে কমিউনিস্টদের কমান্ডার আবদুর রাজ্জাক পরিকল্পনা অনুযায়ী

তাকে ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে সে এক লুণ্ঠিত মুসাফিরের মতোই জাতিসংঘের দপ্তরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মূলত আল্লাহর কুদরতই হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের এই হন্তারককে পালানোর সুযোগ দেয়নি। ওই জালিমের দুঃশাসন আফগানিস্তানের বুক ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। সে ওই সত্যপন্থি মুমিনদের হাতে তার পাপের সাজা ভোগ করার অপেক্ষায় ছিল, যারা তখনো অস্তিত্বে আসেনি।

মাসউদ কেন দোস্তামের মিলিশিয়াদের কাবুলে ডাকেন

নাজিবের পদত্যাগের পর সরকারের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জেনারেল নবি আজিমিসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট কমান্ডার কাবুল নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। মাসউদ চাচ্ছিলেন, তিনি উত্তরাঞ্চলীয় কমিউনিস্ট জোটের ওপর বিজয়ী থাকার পাশাপাশি মুজাহিদ নেতাদের মধ্যেও সবার থেকে এগিয়ে থাকবেন। প্রথম উদ্দেশ্য অর্জনের একমাত্র পথ ছিল বলখ ও মাজার-ই-শরিফে জমিয়তে ইসলামির একক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জরুরি ছিল কাবুল পুরোপুরিভাবে নিজের দখলে রাখা।

চতুর মাসউদ এক ঢিলে দুই শিকার করতে চাচ্ছিলেন। কাবুল বিজয়ের জন্য তিনি দোস্তামকে তার বেশির ভাগ সেনা নিয়ে আসার আহ্বান জানান, যাতে উত্তরাঞ্চলে তার প্রতিরোধশক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি বলখ ও মাজার-ই-শরিফে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অপরদিকে কাবুলে জমিয়তে ইসলামির সহযোগী কমিউনিস্টরা আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে, যা ছিল প্রকারান্তরে মাসউদেরই বিজয়। ফলে হিজবে ইসলামির বিরুদ্ধে তাঁর তেমন সেনা ব্যবহারের প্রয়োজন বাকি থাকেনি। কেননা, কাবুলে হিজবে ইসলামির মোকাবিলার জন্য তখন কমিউনিস্টরাই ছিল যথেষ্ট।

তখনকার দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল, মাসউদ সত্যিই সফল হতে যাচ্ছেন; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এসব সফলতা মূলত তাঁকে মূল রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাজনীতির দাবা আর সামরিক কৌশলের এই খেলায় তিনি এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে, একসময় জিহাদ ও ইসলামপ্রতিষ্ঠার মতো মূল উদ্দেশ্যগুলো তাঁর কাছে শতাব্দীপ্রাচীন পুরানো উপাখ্যানে পরিণত হতে থাকে। এদিকে জমিয়তে ইসলামি কমিউনিস্টদের ওপর বিজয়ী হওয়ার চিন্তা বুমেরাং হওয়ায় ফিরে আসে। তারা কমিউনিস্টদের ব্যবহার করবে দূরে থাক, নিজেরাই কমিউনিস্টদের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। দোস্তামের মিলিশিয়াবাহিনীকে কাবুলে ডেকে নেওয়া ছিল মূলত কমিউনিস্টদের ওই চালবাজির সফল বাস্তবায়ন, যার পেছনে আমেরিকা ও রাশিয়া ঘুঁটি চালিয়ে আসছিল। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকের ১৩টি দিন ছিল আফগানিস্তানের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই আমরা সে দিনগুলোর রিপোর্ট ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

কাবুল দখলের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা

১৮ এপ্রিল পেশোয়ারের গভর্নর-হাউসে মুজাহিদ কমান্ডারদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিয়া নাওয়াজ শরিফও উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সমাবেশটি কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত হয়। গুলবুদিন হেকমতিয়ার সমাবেশ চলাকালেই পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তান চলে আসেন। কেননা, তিনি খবর পেয়েছিলেন ইরানের এক বিপ্লবী কমান্ডার শিয়া দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জাবিল প্রদেশে ঢুকে পড়েছে। তারা শিন্দান্দ বিমানবন্দর দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। মূলত এসব কার্যক্রম আমেরিকা ও অন্যান্য বিশ্বশক্তির ইশারায় হচ্ছিল। এই শক্তিগুলো ইরানের মাধ্যমে আফগানিস্তানে মুজাহিদ দলগুলোর সমান্তরাল একটি শক্তি গঠনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে আফগানিস্তানে অশান্তি ও অনিঃশেষ গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

হেকমতিয়ার আফগানিস্তান পৌঁছার একদিন আগেই হিজবে ইসলামি কাবুলের চারপাশে বিদ্যমান তাদের শক্তিশালী ফাঁড়িসমূহ থেকে বেরিয়ে শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত খায়বারখানা পাহাড় দখল করে নেয়। এ পর্যায়ে তাদের বাহিনী প্রতিরক্ষাদপ্তর দারুল আমানের মাত্র ১০ কিলোমিটার নিকটবর্তী এসে পৌঁছায়। সেখান থেকেই তারা শহরে মিসাইল নিক্ষেপ শুরু করে।

এদিকে হিজবে ইসলামির মোকাবিলার জন্য রাশিদ দোস্তাম ও কমিউনিস্ট জেনারেল আবদুল মুমিনের দল ঐক্যবদ্ধ হয়। কমিউনিস্ট জেনারেল আসিফ দিলাওর, জেনারেল বাবা জান এবং জেনারেল নবি আজমিও ওই সময় হিজবে ইসলামির মোকাবিলায় সক্রিয় ছিল। মাসউদ কাবুলে তাঁর দখল সুদৃঢ় করতে বিমানযোগে কিছু সেনা বাগরাম বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেন। শহর দখলের এই চেষ্টার মধ্যে কতিপয় মুজাহিদ কমান্ডার এখানে আক্রমণরত মুজাহিদ দলগুলোর প্রধানদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন, তাঁরা যেন কাবুলে আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন। কেননা, এসব আক্রমণ হচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর-চুক্তির বিপরীত। কিন্তু তাঁদের এ আওয়াজ মরুভূমির কান্নার মতোই নিস্ফল প্রমাণিত হয়।

২০ এপ্রিল সোমবার নাজিবুল্লাহর শাসন থেকে পুলচারখি জেলখানা মুক্ত করা হয়। সেখানে থাকা ৪ হাজার বন্দি মুক্তি পায়। সাওর বিপ্লবের[৩২] পর এই জেলখানায় রুশ ও কমিউনিস্টদের হাতে মুসলিমদের ওপর বর্ণাতীত নির্যাতনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হয়।

[৩২] ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭-২৮ এপ্রিল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান (পিডিপিএ) কর্তৃক রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ দাউদ খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিপ্লবকে সাওর বিপ্লব বলা হয়। — *অনুবাদক।*

ওই দিন হেকমতিয়ার কাবুলের বাইরে তার সেনাক্যাম্প থেকে হিজবে ইসলামির রেডিয়ো 'পয়ামে আজাদি' থেকে এই ঘোষণা দেন যে, কাবুল থেকে যদি সশস্ত্র কমিউনিস্টরা চলে যায় এবং অন্য কোনো শক্তি ছাড়া শহরের কর্তৃত্ব মুজাহিদদের হাতে সমর্পণে রাজি থাকে, তাহলে তারাও শহরের অবরোধ উঠিয়ে নিতে রাজি। এরপর দুয়েক দিনের মধ্যেই জানা যায়, মাসউদ পশ্চিমাবিশ্বসহ আমেরিকার আস্থা অর্জন করেছেন; আর পশ্চিমারা একটি মুজাহিদ দলকে সহায়তা এবং অপর দলের বিরোধিতা করে আফগানিস্তানের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়। ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে, তারা মাসউদের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে এক ব্যাপক গণভিত্তির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ২২ এপ্রিল বুধবার মাসউদ ওয়ারলেসযোগে প্রায় ৪০ মিনিট গুলবুদ্দিনের সঙ্গে আলাপ করেন। মাসউদ তাঁকে বলেন, তিনি যেন কাবুলে মিসাইলহামলা বন্ধ করে দেন; কিন্তু হেকমতিয়ার তাঁর এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। জবাবে মাসউদও জানিয়ে দেন, তিনি শক্তির মাধ্যমেই কাবুলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে বাধ্য হবেন।

জালালাবাদ বিজয়

২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবারের সোনালি ভোর মুজাহিদ নেতাদের জন্য জালালাবাদ বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে হাজির হয়। মুজাহিদরা দীর্ঘ তিন বছর ধরে শহরটি অবরোধ করে রেখেছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে অসংখ্যবার সেখানকার প্রতিরোধশক্তির সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধেছে। এতে অনেক বড় বড় মুজাহিদ তাদের প্রাণোৎসর্গ করেছেন। দুই বছর আগে একবার মুজাহিদবাহিনীকে সেখান থেকে পিছিয়েও আসতে হয়। তখন নাজিবুল্লাহর সরকার জালালাবাদকে এক অপরাজেয় শহর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু মুজাহিদবাহিনী প্রস্তুতি সেরে নিয়ে পুনরায় শহরটি অবরোধ করে। তারপর ক্রমাগত এক বছর অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে শহরটি পদানত করতে সমর্থ হয়। কাবুল বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগেই শহরটি তাঁদের হাতে বিজিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যায়

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল শুক্রবার পেশোয়ারে মুজাহিদ নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিসহ সৌদি বাদশাহর প্রতিনিধি শাহজাদা তুর্কি আল ফায়সাল একযোগে ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যে চুক্তিতে বলা হয়—জনাব প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদিকে দুই মাসের জন্য আফগানিস্তানের অস্থায়ী সরকারের প্রধান করা হবে; কিন্তু হিজবে ইসলামি এবারও ওই চুক্তিতে অংশ নেয়নি।

সমাবেশ শেষে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি সকল মুজাহিদ সংগঠনের কাছে আবেদন রাখেন, তারা যেন নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুগত থাকেন। এরপর তিনি ৫০ সদস্যের ক্যাবনেট সদস্যসহ রাজধানী কাবুলে যাওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু মুজাহিদ দলগুলো পেশোয়ারে সিদ্ধান্ত হওয়া চুক্তির কোনো পরোয়া না করে নিজেদের ইচ্ছামতো কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। ২৪ এপ্রিল—যে দিন পেশোয়ারে অস্থায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সে দিনই দোস্তামের মিলিশিয়াবাহিনী কাবুল বিমানবন্দর দখল করে নেয়। পরদিন ছিল কাবুল বিজয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ওই দিন জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে কাবুলের কে কতটুকু দখল করতে পারে, এর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সে দিন জমিয়তে ইসলামি কমিউনিস্টদের নিয়ে; আর হিজবে ইসলামি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে শহরের বেশকিছু অংশ দখল করে নেয়।

কাবুল বিজয়

আহমাদশাহ মাসউদ ও দোস্তামরা আগেই বাগরামসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো দখল করে নিয়েছিল। ২৫ এপ্রিল তারা খাজা রুশ বিমানবন্দর, রেডিয়ো স্টেশন, টিভি স্টেশন এবং প্রতিরক্ষাদপ্তরও (দারুল আমান) নিজেদের দখলে নেয়। এদিকে হিজবে ইসলামির বাহিনীও শহরে ঢুকে পড়ে। তারা প্রেসিডেন্ট-ভবনসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণাল এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ও স্থাপনা দখল করে নেয়। ওই দিন বেলা ৩টা থেকে ৪টার দিকে পুরো শহর জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির কর্তৃত্বে চলে আসে। বিকেলের দিকেই বিশ্বমিডিয়া এ সংবাদটি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছিল। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া গাঁটরি গোল করার পর এবার তাদের পা-চাটা নাজিব সরকারকেও তার গাঁটরি গোল করতে হলো। এ সংবাদ শুনে পাকিস্তানসহ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশের ইমানদীপ্ত জনতা আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করেন এবং নফল নামাজ পড়েন। এ পর্যায়ে রুশ ও কমিউনিস্টবিরোধী মুজাহিদদের দীর্ঘ ১৪ বছরের জিহাদের তরী সাফল্যের তীরে এসে নোঙর করে।

বাহ্যত এই বিজয়কালে মুজাহিদ দলগুলোকে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দেখা গেলেও কাবুল বিজয়কালে তারা ছিল সমান্তরাল ও শান্ত অবস্থানে। কাবুল দখলকালে যেমন রক্তপাত হয়নি, তেমনি হয়নি ধ্বংসযজ্ঞও। জনগণকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিয়ে আসা হয়। মোটকথা, কাবুল দখল ছিল খুনখারাবি ও হাঙ্গামামুক্ত। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহব্যবস্থা যথারীতি অক্ষুণ্ন থাকে। রুশদের কাঠপুতুল নাজিব সরকারের পতনের পরপরই আফগানিস্তানের বিজয়ের এই ঐতিহাসিক দিন অস্তমিত হয়ে যায়।

জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে দ্বন্দ্ব

কাবুলের বিজয়ে জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির ভূমিকাই ছিল সবার চেয়ে বেশি। দল দুটির নেতাদ্বয় আফগান জিহাদে সুদীর্ঘ ১৪ বছর সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে যে প্রশংসিত ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং বিশ্বজুড়ে যে শ্রদ্ধার আসন তৈরি করে নিয়েছিলেন, কতই-না ভালো হতো, যদি ওই ক্রান্তিকালেও তাঁরা আত্মত্যাগের সমুজ্জ্বল উদাহরণ রাখতে পারতেন। কিন্তু আফসোস, তা হয়নি। দীর্ঘ ১৪ বছরের অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে আফগানজাতিসহ পুরো উম্মাহ যে সুখ অনুভব করছিল, আহমাদশাহ মাসউদ ও হেকমতিয়ারের দ্বন্দ্বের কারণে তা ক্রমশ বিষাদে রূপ নিতে থাকে।

গুলবুদিন হেকমতিয়ার—যিনি আগে থেকেই মুজাদ্দিদির নেতৃত্ব এবং সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের কারণে চুক্তি থেকে সরে পড়েছিলেন, তিনি তখনো তার অবস্থানে ছিলেন ভীষণ কট্টর। তিনি কাবুল দখল সমাপ্তির পরই ঘোষণা দিয়ে দেন, কাবুল দখলের পর পেশোয়ার চুক্তির আর কোনো বৈধতা থাকতে পারে না! তিনি এ হুমকিও দেন—সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি কাবুল আসতে চাইলে আমরা তাঁর বিমান গুলি করে ভূপাতিত করব। এর পরপরই হেকমতিয়ার ওয়ারলেসযোগে কমিউনিস্ট জেনারেলদের জানিয়ে দেন—তারা নিজেরাই যেন নিজেদেরকে হিজবে ইসলামির হাতে তুলে দেয়। এমন করলে তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করা হবে; অন্যথায় পালিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত হলে তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হবে না।

হেকমতিয়ারের এই কঠিন মনোভাব তাঁকে অনেক মুজাহিদ নেতার সহমর্মিতা থেকে বঞ্চিত করে। মাসউদ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি তখনই পেশোয়ারে থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি হেকমতিয়ারের অবস্থানের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে চান? জবাব আসে—রাজধানী এখন আপনার নিয়ন্ত্রণে, আপনি যা ইচ্ছ তা-ই করতে পারেন।

বেদনাদায়ক গৃহযুদ্ধের শুরু

হিজবে ইসলামির সঙ্গে জমিয়তে ইসলামির যুদ্ধ

ফসোস! কাবুল বিজয় সমাপ্তির মাত্র ১৪ ঘণ্টার মধ্যেই জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে যথারীতি সংঘাত শুরু হয়ে যায়। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল 'ওজির আকবর খান' এলাকা উভয় বাহিনীর মধ্যকার রণক্ষেত্র হয়ে থাকে। হিজবে ইসলামি ঘোষণা দেয়, 'দোস্তাম মিলিশিয়াদের নিয়ে কাবুল থেকে বেরিয়ে না গেলে হিজবে

ইসলামি কাবুলে আক্রমণ শুরু করবে।' মাসউদ এই হুমকির জবাবে বলেন, 'হিজবে ইসলামি হামলা চালালে আমরা তাদের ঘাঁটি তছনছ করে দেবো।'

২৭ এপ্রিলও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। 'খাজা রুশ' আর 'বাগরাম' বিমানবন্দর দুটি ছিল জমিয়তে ইসলামি ও রাশিদ দোস্তামের নিয়ন্ত্রণে। এখান থেকে কমিউনিস্টযোদ্ধারা হিজবে ইসলামির বিভিন্ন ঘাঁটিতে বিমানহামলা শুরু করে। এদিকে স্থলযুদ্ধে মাসউদের বাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। তারা প্রেসিডেন্ট-ভবন এলাকা থেকে হিজবে ইসলামির বাহিনীকে পিছিয়ে দিয়ে শহরের বিশাল এলাকার দখল নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তখন শহরের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। বিগত ১৪ বছরের যুদ্ধকালেও ওই এলাকা কখনো যুদ্ধকবলিত হয়নি। তাই ওই এলাকার জনগণের কাছে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ অচেনা। সুতরাং বালা হিসার ও অন্যান্য মহল্লার হাজার হাজার লোক শহর ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যে যেদিকে পারে, পালাতে থাকে। একদিকে তুমুল যুদ্ধ চলছিল, অপরদিকে বিশ্বের খ্যাতিমান আলিম, স্কলার আর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা উভয় পক্ষকে যুদ্ধবিরতির আকুল আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছিলেন। সৌদি আরব থেকে শায়খ মাহমুদ সাওয়াফ, মিসর থেকে ড. ইউসুফ কারজাবি, শাম থেকে শায়খ আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ তাৎক্ষণিকভাবে বার্তা পাঠিয়ে মুজাহিদ নেতাদের কাছে আবেদন রাখেন, তাঁরা যেন যুদ্ধ বাদ দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান খোঁজেন।

হিজবে ইসলামির দাবি

২৭ এপ্রিল দিনটি অতিবাহিত হতে হতে হিজবে ইসলামির শক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে আসে। সুতরাং তারা যুদ্ধবিরতির ডাকে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে বলে, উভয় বাহিনীকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের দখল ছেড়ে দিতে হবে। হিজবে ইসলামি গুলবুদিন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী, বুরহানুদ্দিন রাব্বানিকে প্রেসিডেন্ট বানানোর এবং কাবুল থেকে দোস্তামের মিলিশিয়াদের বের করে দিতে পীড়াপীড়ি অব্যাহত রাখে। যদিও এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, অস্থায়ীভাবে মুজাদ্দিদি দুই মাসের জন্য কাবুল সরকারের প্রধান থাকবেন, এরপর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি দুই বছরের জন্য প্রসিডেন্ট হবেন; কিন্তু হেকমতিয়ার মুজাদ্দিদির অস্থায়ী সরকারপ্রধান থাকার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছিলেন না। কেননা, তাঁর সন্দেহ ছিল মুজাদ্দিদির দলের দুর্বলতার কারণে তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। তাঁকে সবসময় জমিয়তে ইসলামির করুণার পাত্র হয়েই থাকতে হবে।

মুজাহিদদের যুদ্ধে জড়ানোর ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

কাবুল বিজয়ের পর মুজাহিদ দলগুলোর মতবিরোধ তুঙ্গে উঠতে উঠতে একপর্যায়ে

দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করে। পাঠক নিশ্চয় এই অবস্থা শুনে বেদনাহত হওয়ার পাশাপাশি বিস্মিত হয়ে থাকবেন; কিন্তু পর্দার আড়ালের বিষয়টি জেনে নিলে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বশক্তিগুলো স্থানীয় শক্তিদের ব্যবহার করে আফগানিস্তানে এক অনিঃশেষ যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরির জন্য অনেক আগে থেকেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই বিশ্বশক্তি বলতে আমেরিকা আর রাশিয়াই ছিল শীর্ষে। আর এতদঞ্চলের ইরান ও ভারত এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিল। এই জঘন্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট জেনারেলদের কামলা হিসেবে খাটানো হচ্ছিল। ওই জেনারেলদের সিংহভাগই ছিল তাজিক ও উজবেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একসময় এরা ছিল কারমালের পরচম পর্টির সদস্য।

হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, খোদ মুজাহিদ নেতা আহমাদশাহ মাসউদ এবং হেকমতিয়ারও তাদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েন! মাসউদ নিজেকে বাদশাহর অবস্থানে দেখতে চাচ্ছিলেন। তিনি উত্তরাঞ্চলের মুজাহিদ দলসমূহের জোট শুরায়ে নাজার আর কমিউনিস্টদের বাকি শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভাবছিলেন, তিনি বোধহয় কমিউনিস্ট নেতাদের নিজ স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। একইভাবে হেকমতিয়ার কমিউনিস্ট জেনারেল শাহ নাওয়াজ আর জেনারেল রাফিকে দলে টেনে নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। অথচ বাস্তবে কমিউনিস্টরাই তাদের উভয়কে নিয়ে খেলছিল। তারাই মুজাহিদ নেতাদ্বয়কে দাবার ঘুঁটির মতো পরিচালনা করছিল।

ক্ষমতার মঞ্চে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি তাঁর দলবলসহ পেশোয়ার থেকে কাবুলে এসে পৌঁছান। তিনি ট্রাকযোগে এই সফর করেন। শহরের কেন্দ্রীয় এলাকা ছিল তখন জমিয়তে ইসলামির নিয়ন্ত্রণে। তাই মুজাদ্দিদির জন্য তেমন আশঙ্কার কিছু ছিল না। তিনি শান্তভাবেই কাবুল রেজিমের (Regime) পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল ওয়াকিল থেকে সরকারের দায়িত্ব বুঝে নেন। এরপর এক কনফারেন্সকে সম্বোধন করে রাখা বক্তব্যে বলেন, 'এবার আমাদের সামনে প্রিয় মাতৃভূমি পূনর্গঠনের সময় উপস্থিত। নাজিবকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না। এ দায়িত্ব জনসাধারণের।' এরপর তিনি হেকমতিয়ারের সামালোচনা করে বলেন, 'হেকমতিয়ার যদি হামলা বন্ধ না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে শরয়ি আদালতে মামলা চালানো হবে।'

ওই দিন তুরস্ক, সৌদি আরব, ইরানসহ বিভিন্ন মুসলিমরাষ্ট্র সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদিকে ক্ষমতাগ্রহণের জন্য ধন্যবাদবার্তা পাঠায়। অনেক দিন পর আফগানিস্তানে এই দৃশ্য সামনে আসে যে, বিশুদ্ধ আকিদার কেউ ক্ষমতার মঞ্চে শোভা ছড়াচ্ছিলেন। বৃদ্ধবয়সি

সফেদ দাড়িওয়ালা প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন একজন দীনদার, বুজুর্গ ও সুফিমনস্ক ব্যক্তি। আফগানিস্তানে নকশবন্দি সিলসিলার প্রবর্তনে তাঁর পরিবারের বিশাল ভূমিকা ছিল। তাঁর পিতা শায়খ ইসমাইল মুজাদ্দিদি বাদশাহ জহির শাহর যুগে কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধের অগ্রসেনা ছিলেন। এই প্রয়াস চালাতে গিয়েই তিনি শহিদ হন।

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি বলতেন, 'আমরা তখন থেকে এ দেশে জিহাদ চালিয়ে আসছিলাম, যখন মুজাহিদদের বর্তমান প্রজন্মের আত্মপ্রকাশও ঘটেনি।'

মুজাদ্দিদির ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে হেকমতিয়ারের কোনোই অভিযোগ ছিল না। তাঁর বিরোধিতার একমাত্র কারণ ছিল—মুজাদ্দিদির দল দুর্বল বিধায় কমিউনিস্টরা সহজেই তাঁকে দুর্বল করে ফেলার আশঙ্কা প্রবল। সত্যিই কিছুদিন পর পরিস্থিতি হেকমতিয়ারের সন্দেহকে পুরোপুরি সত্যে পরিণত করে। তবে মুজাদ্দিদিকে নির্বাচনকারী মুজাহিদ নেতাদের বক্তব্য ছিল—এই ক্রান্তিকালে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংখ্যালগিষ্ঠ পার্টির নেতাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে আমরা বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, কাবুলে মৌলবাদী সরকারের পরিবর্তে এক সর্বজনগ্রাহ্য আধুনিকতাবাদী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এভাবে আমরা অসহনীয় বহির্দেশীয় চাপ থেকে নিরাপদ থাকতে পারব। সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদিকে এ জন্যও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির রাজনীতিবিদ বলা হয় যে, তিনি ওই সময় দাবি করছিলেন, দেশের বর্তমান অবস্থাকে সামাল দিতে জহির শাহকে আফগানিস্তানে ডেকে আনা হোক।

কাবুলে মিয়া নাওয়াজ শরিফ

২৯ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিয়া নাওয়াজ শরিফ এবং সৌদি বাদশাহ ফাহাদের বিশেষ প্রতিনিধি শাহজাদ তুর্কি আল ফায়সাল কাবুলে পৌঁছে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদিকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। মিয়া নাওয়াজ শরিফ আফগানিস্তানের অস্থায়ী সরকারপ্রধানের হাতে আড়াই মিলিয়ন রুপির সাহায্য-চেকও হস্তান্তর করেন। ওই দিন কাবুলের বিভিন্ন অংশে জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে সংঘাত চলছিল। জমিয়তে ইসলামি ও দোস্তামের মিলিশিয়ারা মিলে হিজবে ইসলামিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এলাকা থেকে পেছাতে বাধ্য করে। আর ওদিকে মিয়া নাওয়াজ শরিফ আফগানিস্তান ত্যাগের কয়েক মুহূর্ত পরেই অজ্ঞাতনামা এক দল কাবুল বিমানবন্দরকে মিসাইলের লক্ষ্যবস্তু বানায়।

কাবুলের করুণ অবস্থা

কাবুল বিজয় হয়ে গিয়েছিল। মসনদে ছিল মুজাহিদদের দ্বারা গঠিত সরকার; কিন্তু

শহরের অবস্থা কেমন ছিল? তখন সেখানকার বিদ্যুৎ, পানি ও যোগাযোগব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরভবনগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে চলছিল। খাদ্য-পানীয়ের তীব্র সংকট চলছিল। একবেলার খাদ্যমূল্য ৫৫ ডলার পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। আফগান কারেন্সির এতই দরপতন ঘটেছিল যে, মানুষ থলে ভরতি মুদ্রা নিয়ে কোনোমতে মাত্র এক দিনের রেশন সংগ্রহ করতে পারছিল। এদিকে হিজবে ইসলামির সঙ্গে যুদ্ধ ছিল অব্যাহত। শিয়াদের জোট আর কমিউনিস্টরা মুজাহিদদের এই দুর্বল সরকারকে ধাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল পুরোপুরিভাবে।

মোটকথা, প্রফেসর মুজাদ্দিদির সরকার ছিল অগণিত সমস্যার সম্মুখীন। এমতাবস্থায় মুজাদ্দিদি মুসলিমবিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন এই চরম সংকটকালে তাঁর সঙ্গ দেন এবং আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে অংশ নেন। তবে সুখের বিষয় এটাই ছিল যে, মুসলিমবিশ্বসহ পুরো বিশ্ব এমনকি আমেরিকা আর রাশিয়াও মুজাহিদদের সরকারকে স্বীকৃতি জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এ থেকেও এটা প্রকাশ পায়—তাদের কাছেও নতুন সরকার মৌলবাদী কোনো সরকার ছিল না।

নাজিবকে ক্ষমা ঘোষণা

১ মে শুক্রবার সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি হাজার হাজার নিরপরাধ আফগান জনতার হন্তারক ডা. নজিবুল্লাকে ক্ষমা ঘোষণা করে মানুষকে চমকে দেন। কারণ, অল্প কদিন আগে দেওয়া বক্তব্যে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা নাজিবুল্লাহকে ক্ষমা করতে পারি না। তাকে ক্ষমা করা না-করা আফগান জনগণের অধিকার।' কিন্তু কদিন যেতে না-যেতে জনগণের কোনো দবি ছাড়াই তিনি নিজে থেকে তাকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে নিজেই নিজের দাবির বিপরীতে চলে যান।

মনে হচ্ছিল, মুজাদ্দিদি কাবুলে নিযুক্ত কমিউনিস্ট জেনারেল এবং তাদের বাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। নাজিবুল্লাহকে ক্ষমা ঘোষণার জন্য অবশ্যই এই কমিউনিস্ট জেনারেলদের প্রচণ্ড চাপ ছিল। নতুবা কোনো মুজাহিদ দল কিংবা আফগান জনগণ মানবাকৃতির এই হিংস্র পশুর ক্ষমার পক্ষে ছিল না, যে হিংস্রটি অগণিত নারী, শিশু ও বুজুর্গকে বর্ণনাতীত অত্যাচার করে হত্যা করেছিল।

হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির লড়াই

দিন বয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু কাবুলে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। শহরের আশপাশে থাকা হিজবে ইসলামির ঘাঁটি থেকে অনবরত কাবুলে রকেটবৃষ্টি হচ্ছিল।

ফলে এ যুদ্ধ কাবুলের বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইনকিলাবে ইসলামির দুই শাখার দুই নেতা মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মদি ও মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুর আরেকবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। কেননা, অন্যান্য প্রদেশ দখলের জন্য প্রস্তুত হিজবে ইসলামির মোকাবিলার জন্য তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছিল অস্তিত্ব রক্ষার দাবি। অবশেষে ৩ মে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে লড়াই বেধে যায়। ওই দিনের যুদ্ধে ৫০ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত হিজবে ইসলামির দাপট ছিল বেশি। তারা হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি থেকে লাঘমান প্রদেশ ছিনিয়ে নেয়।

পাকিস্তানের সাহায্য-তৎপরতা

পাকিস্তান তখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে আফগান সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কাবুলের দুর্ভিক্ষাবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৫০ হাজার টন গম দেওয়ার অঙ্গীকার করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৭০ ট্রাক গম নিয়ে সাহায্যবহর কাবুল পৌঁছায়। পাকিস্তান সরকার ৩০ লাখ আফগান মুহাজিরকে আফগানিস্তানে পাঠানোর পরিকল্পনা শুরু করে। তারা মুহাজিরদের দেশে ফেরত যেতে উদ্‌বুদ্ধ করতে ঘোষণা দেয়, 'যারা এখান থেকে আফগানিস্তানে ফিরে যাবে, তাদের প্রত্যেককে ৩০ হাজার রুপি এবং ৩০ বস্তা গম দেওয়া হবে!'

শহরে কার কার আধিপত্য ছিল

কাবুল বিজয়ের এক সপ্তাহ পরও সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। তখনকার অবস্থা ছিল—কাবুলের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব থেকে শহরের কেন্দ্রীয় এলাকার প্রায় পুরোটাই ছিল জমিয়তে ইসলামি ও রাশিদ দোস্তামের মিলিশিয়াদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বাহিনীকেই তখন সরকারি বাহিনী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছিল। হিজবে ইসলামির মূল শক্তি তখন দক্ষিণে চার আসিয়াবে এবং পূর্বে সারুবিতে সংরক্ষিত ছিল। মাওলানা ইউনুস খালিসের কর্মকর্তাদের বড় একটি অংশও তখন সারুবিতে অবস্থান করছিল। আর শহরের পশ্চিমাংশে শিয়াদের জোট হিজবে ওয়াহদাত ঘাঁটি স্থাপন করে অবস্থান করছিল।

উসতাজ আবদুর রব রাসুল সাইয়াফের ইত্তিহাদে ইসলামি পাগমানে মোর্চাবন্দি অবস্থায় ছিল। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে হিজবে ওয়াহদাতের সঙ্গে তাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটি কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। অবশেষে ৯ মে তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এদিকে কাবুলে মুজাহিদবাহিনীর চেয়ে দোস্তামের মিলিশিয়াদের সংখ্যার

উপস্থিতি ছিল বেশি। মুজাহিদ সরকারের নিজস্ব বাহিনীর পক্ষে এদেরকে কাবুল-ছাড়া করার ক্ষমতা ছিল না। বলতে গেলে তাদের সরকার এদের অনুগ্রহের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এ কারণেই এক সাংবাদিক যখন প্রফেসর মুজাদ্দিদিকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনারা হিজবে ইসলামির হামলা থেকে কীভাবে কাবুলের নিরাপত্তাবিধান করবেন?' তখন তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'ভাই রাশিদ দোস্তাম আমাদের সাহায্য করবেন।'

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির আপস-মীমাংসার প্রচেষ্টা

হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির মধ্যেও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে হিজবে ইসলামি 'টাপ্পা নাদির খান' এলাকা জয় করে। এদিকে জমিয়তে ইসলামির নেতা বুরহানুদ্দিন রব্বানি পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তানে এসে উপনীত হন। তিনি লোগারে হেকমতিয়ারের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে প্রয়াস চালিয়ে যান। এ সময় বিখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানিও ২০০ মুজাহিদ নেতা নিয়ে হেকমতিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে একটি যৌক্তিক ফরমুলা তৈরি করেন। মাওলানা হাক্কানির ফরমুলা রাব্বানি অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিলেও মাসউদ এদিক-ওদিক করছিলেন। মূলত ততক্ষণে তিনি বাগলানের ইসমাইলি মিলিশিয়াদের ৩ হাজার যোদ্ধার সাহায্য পেয়ে গিয়েছিলেন। এদের কমান্ডার ছিল মানসুর নাদেরি। তার নেতৃত্বেই ইসমাইলি মিলিশিয়ার বিমানে করে কাবুলে এসে পৌঁছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জায়গা দখল করে ফেলে। এভাবে কাবুলে মাসউদের সহযোগীদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় তাঁর জন্য কোনো শান্তির ফরমুলা মেনে নেওয়া ছিল অর্থহীন।

মুজাদ্দিদির ওপর প্রাণঘাতী হামলা

প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদি মাসউদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে শঙ্কা অনুভব করছিলেন। বাস্তবতা হচ্ছে, সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি ছিলেন নামমাত্র শাসক। তাঁর দুর্বলতার অবস্থা ছিল—তিনি নিজেই কাবুলে নিরাপদ ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর জন্য স্থিরকৃত মেয়াদ বাড়িয়ে নেবেন; কিন্তু বাহ্যত এটা আদৌ সম্ভব ছিল না। মাসউদ ও দোস্তাম চাইলে যেকোনো সময় তাঁকে পদচ্যুত করতে পারত। এ অবস্থার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদি মে মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তান সফর করেন। যাতে নিজ অবস্থান কিছুটা সুদৃঢ় করতে পারেন। পাকিস্তান সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরিফ মুজাদ্দিদির প্রতি দরদি ছিলেন। তাই তাঁকে সেখানে খুব সম্মানের সঙ্গেই বরণ করা হয়।

এই সফর নিয়ে এক পর্যালোচনায় সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদির ডেপুটি মাওলানা নাসরুল্লাহ মনসুর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মুজাদ্দিদির পাকিস্তান সফর উপলক্ষ্যে পাক সরকার

যে গুরুত্ব দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায় এবং যে বিশাল প্রটোকল দেয়, তা দেখে আমাদের সাহস অনেকখানি বেড়ে যায়। আমরা অনেকটা সাহস ফিরে পাই।'

কিন্তু ৮ মে যেইমাত্র প্রফেসর মুজাদ্দিদির বিমান পেশোয়ার থেকে কাবুল বিমানবন্দরে গিয়ে নামে, অমনি সেখানে তুমুল মিসাইলবৃষ্টি শুরু হয়। তিনি যে বিমানে আরোহী ছিলেন, মিসাইলের আঘাতে এর অগ্রবর্তী অংশ একেবারে ছাই হয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। সাধারণত মনে করা হচ্ছিল, এই আক্রমণের নেপথ্যে রয়েছে অস্থায়ী সরকারব্যবস্থার কট্টর বিরোধী হিজবে ইসলামি। কিন্তু সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি এ ব্যাপারে কাউকে দায়ী করা থেকে নীরব থাকেন। সরকার থেকে সরে আসার পর তিনি প্রকাশ করেন, 'এ ছিল তাঁরই পক্ষের লোক তথা মাসউদ ও দোস্তামের যৌথ চক্রান্ত।'

জিয়াউল হক-চুক্তি

কাবুল বিজয়ের নয়নজুড়ানো দৃশ্য একসময় মুজাহিদদের জন্য এক বিষাদময় দৃশ্যে পরিণত হয়ে ওঠে। ইরানসমর্থিত মিলিশিয়ার হস্তক্ষেপ, বিশ্বশক্তিগুলোর গোপন চক্রান্ত কাবুলে ইসলামি সরকার এবং প্রকৃতার্থের শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে মুসলিমবিশ্বের আশায় পানি ঢেলে দেয়। এমতাবস্থায় সৌদি বাদশাহ ফাহাদ সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর আগ্রহ দেখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিয়া নাওয়াজ শরিফও আরেকবার কাবুলে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেন। তিনি আফগান জিহাদে ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য অমর হয়ে থাকা প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের ছেলে ইজাজুল হককে প্রতিনিধি বানিয়ে কাবুলে পাঠান। বাদশাহ ফাহাদের প্রতিনিধি হিসেবে শাহজাদা নায়িফ ইবনু সুলতানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা মুজাহিদদের 'মুসালাহাতি কমিশনের' (আপস-কমিটি) চেয়ারম্যান মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির সঙ্গে মিলে মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে ঐক্য গড়তে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন।

২৫ মে কাবুলের দক্ষিণে হিজবে ইসলামির হেডকোয়ার্টারে হেকমতিয়ার ও মাসউদ একত্র হন। আফগান জিহাদের সুদীর্ঘ ১৪ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো দুই নেতা পরস্পর একে অন্যকে দেখছিলেন এবং সামনাসামনি বসে কথা বলছিলেন। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকে। শেষপর্যন্ত সন্ধিচুক্তি তৈরি হয়। এই চুক্তিকে জিয়াউল হক-চুক্তি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। চুক্তিনামায় লেখা হয়, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাপ্রত্যাহারের পর তাদের কাঠপুতুল নাজিব সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে আফগান জিহাদ তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। তাই এখন আর যুদ্ধ চলতে পারে না। এখন সব ধরনের বিবাদ আলোচনার টেবিলে সমাধান করা দরকার। আফগানিস্তানকে একটি বিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

অস্থায়ী সরকারের মেয়াদ বাড়ানো হবে না; বরং ছয় মাসের মধ্যেই নির্বাচন দেওয়া হবে। উত্তরাঞ্চল থেকে আগত মিলিশিয়াবাহিনী একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় এখান থেকে চলে যাবে। আর রাজধানীর নিরাপত্তা স্থানীয় কমান্ডাররাই সামলাবেন।

ক্ষমতা দীর্ঘায়িতকরণে মুজাদ্দিদির আগ্রহ

এই চুক্তির পর কাবুলের পরিস্থিতি কিছুদিন শান্ত থাকে এবং শহরের সৌন্দর্য ফিরে আসতে থাকে। ২৮ জুন ১৯৯২ সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদির প্রেসিডেন্ট পদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে পেশোয়ার চুক্তি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদির জন্য বুরহানুদ্দিন রাব্বানির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই মুজাদ্দিদি এমনসব বিবৃতি দেওয়া শুরু করেন, যার ফলে মনে হচ্ছিল তিনি দায়িত্ব ছাড়তে নারাজ; তিনি ওই দায়িত্বে আরও অনেক দিন থাকতে চান। অবস্থাটি ছিল মাসউদের জন্য সংকটের ঝুঁইরে। মাসউদের কথা ছিল, তাঁকে নির্ধারিত সময়েই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অথচ তিনি বলছিলেন, মানুষের চাহিদা হচ্ছে আমি যেন আরও দু-বছর ক্ষমতায় থাকি। এর ফলে মাসউদ এবং প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদির মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

সিবগাতুল্লাহ এটা ভেবে খুবই দুঃখ পাচ্ছিলেন, যে মাসউদ ও রাব্বানি এতদিন তাঁকে হেকমতিয়ারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন, এখন তাঁরাই তাঁকে ক্ষতাচ্যুত করতে হেকমতিয়ারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। সুতরাং তিনিও মানসিকভাবে জমিয়তে ইসলামি থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। এখন তাঁর জন্য নতুন সহযোগী দেখে নেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে আফগানিস্তানের অবস্থা অস্থিতিশীল করে রাখতে পশ্চিমাদের কাছে হিজবে ওয়াহদাত ও দোস্তামের মিলিশিয়াবাহিনী নামে এমন দুটি সহায়ক শক্তি ছিল, যারা যথাসময়ে বন্ধুত্ব প্রত্যাহার করে পূর্ণ শত্রুতায় নেমে পড়তে এবং নিত্যনতুন ট্রাজেডির জন্ম দিতে ছিল ওস্তাদ। এই কুচক্রীরা মাসউদকে মুজাদ্দিদি থেকে দূরে সরে পড়তে দেখে মুজাদ্দিদির ঘনিষ্ঠ হওয়া শুরু করে দেয়; আর তিনিও এদের কল্যাণে নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হওয়ার স্বপ্নজাল বুনতে থাকেন। এই সুযোগে হিজবে ওয়াহদাত ও রাশিদ দোস্তামের মিলিশিয়ারা ক্ষমতায় তাদের বড় আকারের অংশগ্রহণ দেখতে থাকে।

যেহেতু এই পরিস্থিতি ছিল পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতিকূলে, তাই এ ক্ষেত্রে পাক সরকার মুজাদ্দিদিকে কোনো সহায়তা করেনি। হরকতে ইনকিলাবির নেতা মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি এবং মাহাজে ইসলামির নেতা পির সাইয়িদ আহমাদ গিলানিও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেননি। আবার উত্তেজনাময় অবস্থা সামাল দিতে প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি নিজে আফগান নেতাদের বড় একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে

পাকিস্তান সফর করেন। ১৩ জুন ১৯৯২ তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তান সরকার প্রতিনিধিদলের দাবির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়, পেশোয়ার চুক্তির ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদিকে নির্ধারিত সময়ে প্রফেসর রাব্বানির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। পাকিস্তান সরকারের দেওয়া এই সুস্পষ্ট বিবৃতির পর প্রফেসর মুজাদ্দিদির জন্য হিজবে ওয়াহদাত ও দোস্তামের সঙ্গে মিলে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা অনেকটা দুরূহ হয়ে ওঠে।

মোটকথা, প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদির যদি সামান্যতম গ্রহণযোগ্যতা থেকে থাকে, তাহলে সেটা পাকিস্তানের সমর্থনের কারণে। পাকিস্তান যেহেতু আফগানিস্তানে পাকবান্ধব একজনকে সরকারে দেখতে চাচ্ছিল, এ জন্যই মুজাদ্দিদিকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে আসছিল। সুতরাং পাকিস্তান যখন তাঁর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, তখন তাঁকেও সঙ্গীহীন মুসাফিরের মতো দেখা যেতে থাকে। লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান কর্তৃক মুজাদ্দিদির দুর্বল সরকারকে সহায়তা দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমেরিকার ইশারাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, তাঁর সরকার ছিল ঠিক অনুরূপ, যেমন সরকার আমেরিকা কাবুলের মসনদে দেখতে চেয়েছিল। অর্থাৎ, জগাখিচুড়ি মার্কা একটি দুর্বল সরকার, যে নিজ সিদ্ধান্ত নিতেও থাকে অন্যের মুখাপেক্ষী। নিজ ক্ষমতার একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে মুজাদ্দিদির মরিয়া চেষ্টা ছিল, তিনি কোনোমতে হিজবে ইসলামির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করে তুলবেন। ফলে হেকমতিয়ারকে তিনি তখন 'আমার ভাই' বলে সম্বোধন করেন এবং আফগান জিহাদে তাঁর কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর ফলে হেকমতিয়ারের অবস্থান মজবুত হলেও তাঁর অবস্থান যে তলানিতে ছিল, সে তলানিতেই থেকে যায়।

মুজাদ্দিদির ভুল সিদ্ধান্ত

তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ততম শাসনামলে এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন, যা মুজাহিদ নেতাদের তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে। যেমন :

১. পাখতুন জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের সন্তুষ্ট করতে নরঘাতক নাজিবকে ক্ষমার ঘোষণা।

২. ওয়াতান পার্টির সহায়তালাভের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট জেনারেল আসিফ দিলাওয়ারকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দেওয়া। স্মর্তব্য, এর পেছনে কিন্তু মূলত মাসউদের হাতই সক্রিয় ছিল। যদিও সিদ্ধান্তটি প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদির কলম দ্বারাই রচিত হয়।

৩. রশিদ দোস্তাম, তার কমিউনিস্ট জেনারেলদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান।

৪. এই বিবৃতি প্রদান যে, আফগান জনগণ আমাকে আরও দুই বছর ক্ষমতায় থাকতে পীড়াপীড়ি করছে।

সে যা-ই হোক, সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদির ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর ওই কার্যক্রম ও বিবৃতিগুলোই মুজাহিদ নেতাদের তাঁর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে, যাঁরা তখনো আফগানিস্তানে বড় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিলেন, আফগান জিহাদে যাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি

অবশেষে দুই মাস পুরা হতেই ২৮ জুন ১৯৯২ মুজাদ্দিদি নীরবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁর জায়গায় প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রাব্বানি চার মাসের জন্য নতুন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল চার মাসের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রফেসর রাব্বানি ক্ষমতাগ্রহণের পর আশা করা হচ্ছিল, আফগানিস্তানের শান্তির স্বপ্নবৃক্ষ এবার হয়তো ডালপালা ছড়িয়ে জনগণকে ছায়া দেবে—বিশেষ করে মুজাদ্দিদি যখন কোনো সংঘাত না বাধিয়েই ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেন; আর জমিয়ত ও হিজবে ইসলামির মধ্যে জিয়াউল হক-চুক্তি অনুযায়ী সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। এবার কমিউনিস্টদের কাবুলছাড়া করার ব্যাপারটিও তেমন কঠিন থাকেনি। তবে এর জন্য শর্ত ছিল মুজাহিদরা এখনকার মতো ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।

হিজবে ইসলামি ও মিলিশিয়াদের যুদ্ধ

বিশ্ববাসী হিজবে ইসলামির কী পরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে তা তখন টের পায়, যখন ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে চার আসিয়াবের হিজবে ইসলামির হেডকোয়ার্টার থেকে দোস্তামের মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এর কারণ ছিল, দোস্তামের মিলিশিয়ারা সময় সময় হিজবে ইসলামির বিভিন্ন আস্তানায় বোমা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদের এই ঔদ্ধত্যের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া ছিল অপরিহার্য। মিলিশিয়া ও হিজবে ইসলামির মধ্যকার যুদ্ধটি আসাদ সাম্বালা নামে প্রসিদ্ধি। যুদ্ধে দোস্তামবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। সুতরাং কমিউনিস্টরা অনুধাবন করে, যতদিন হিজবে ইসলামি ও মাসউদের সম্পর্ক ঠিক আছে, ততদিন তাদের কোনো ডাল গলবার নয়। তাই মুজাহিদদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্টের জন্য ষড়যন্ত্রের গোপন হাতটি আরেকবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। একটা নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ওই পরিকল্পনায় মুজাহিদ দলগুলোকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা চালানো সম্পন্ন করা হয়। ইতিপূর্বে তারা মাসউদ ও রাব্বানিকে নিয়ে

হিজবে ইসলামির সঙ্গে রণক্ষেত্র গড়ে তোলেছিল। এবার তারা পাশার দান উলটে এক এক করে হেকমতিয়ারের পাশে জড়ো হওয়া শুরু করে, যাতে তাঁকে শক্তিমান একজন নেতা হওয়ার অনুভূতি দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে আবারও জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যে সংঘাতের বাজার গরম করা যায়।

হেকমতিয়ারের পাশে আবদুল আলি মাজারি

গোপন এ সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে শিয়াদের জোট হিজবে ওয়াহদাতের নেতা আবদুল আলি মাজারিই প্রথম এগিয়ে আসে। সে শুরায়ে নাজার থেকে বেরিয়ে হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলামির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। নতুন শক্তি সংযোজনের ফলে হিজবে ইসলামির ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এই নতুন জোট হিজবে ইসলামিকে তাদের চলা সরল পথ থেকে হটানোর এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি।

হিজবে ওয়াহদাতের সশস্ত্র হাজারা জনগোষ্ঠী—কাবুলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তারা ইরান থেকে অবাধে কারেন্সি ও অস্ত্রসহায়তা পাচ্ছিল। দলটির নেতা আবদুল আলি মাজারি, কারিম খলিলি ও আয়াতুল্লাহ মুহসিনির মধ্যে কিছু মতানৈক্য থাকলেও তারা সবাই নবগঠিত সরকারে তাদের জাতির অংশগ্রহণ বেশি থাক, এ ব্যাপারে ছিল একমত। ইরান সরকার হিজবে ওয়াহদাতের পাশাপাশি রাশিদ দোস্তামের মিলিশিয়াবাহিনীকেও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। *সাপ্তাহিক তাকবিরের* ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুনের সংখ্যাটি এই বাস্তবতা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে যে, ইরান মাত্র কিছুদিন আগে রাশিদ দোস্তামের সহায়তায় একটি ট্রেইলরভরা আফগান কারেন্সি সরবরাহ করেছে।

দোস্তামের মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট রাব্বানির ভীতি

প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানিও তাঁর শাসনামলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদি সরকারের মতোই দুর্বল এবং কার্যত অসহায় প্রতীয়মান হন। হেকমতিয়ার ও মাসউদের মধ্যে হওয়া জিয়াউল হক-চুক্তির আলোকে দোস্তামের বাহিনীকে নিরস্ত্র করে কাবুল থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হয়েছিল। কিন্তু দোস্তামের মিলিশিয়ারা কাবুলে এমন সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করে যে, তাদের কাবুলছাড়া করা অতটা সহজ থাকেনি আর।

দোস্তাম প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়, 'তার সেনাদের কাবুল থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হলে সে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবে।' তার এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে মুজাদ্দিদি তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ

নিতে পারেননি, তেমনই অবস্থা দাঁড়ায় প্রফেসর বুরহানুদ্দিনের জন্যও। অথচ তাঁর জন্য এতটা ভীত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কেননা, তাঁর পেছনে ছিল বিচক্ষণ যুদ্ধবাজ নেতা মাসউদের পৃষ্ঠপোষকতা।

এ থেকেই অনুমান করা যায়, অবস্থা ক্রমশ অবনতিশীল করার পেছনে ভেতর ও বাইরের শক্তি সক্রিয় ছিল। এদের কেউ কেউ গোপনে আর কেউ কেউ প্রকাশ্যে কমিউনিস্টদের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে যাচ্ছিল। *সাপ্তাহিক তাকবির* তার ওই সংখ্যায় এক রিপোর্টে এ কথা প্রকাশ করে যে, দোস্তাম উত্তর-আফগানিস্তানে উজবেক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার ফরমুলা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ব্রিটেন আর ইরানও জড়িত রয়েছে। মোটকথা, দোস্তাম এভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকি দিয়ে রাব্বানি সরকারকে দুর্বল রেখে কাবুলে তার রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রফেসর রাব্বানি তাঁর অধিকার বাস্তবায়িত করতে ছিলেন অক্ষম। কাবুলে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার বাজার আগের মতোই গরম ছিল। জায়গায় জায়গায় যথারীতি খোলা ছিল মদের বার আর ক্লাব। সরকারি দপ্তরগুলোতেও ছিল উলঙ্গপনার জয়জয়কার। মডার্ন নারীরা আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের কাজ। সরকারের শীর্ষ পদ থেকে একেবারে নিচের পদ পর্যন্ত ছিল নাস্তিক আর ধর্মদ্রোহীদের দাপাদাপি। ইসলামি শাসনব্যবস্থার দূরতম নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন।

হিজবে ইসলামি ও কমিউনিস্টদের ঐক্য

গুলবুদিন হেকমতিয়ারের সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তাঁকে সরকার পরিচালনায় কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। এমনকি তিনি কাবুলে প্রবেশেরও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তাঁর এই দুঃখবোধ আবদুল আলি মাজারি এবং কমিউনিস্ট জেনারেলদের অজানা ছিল না। সুতরাং তারা ওই জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালতে কসুর করেনি। এদিকে দোস্তামও মুজাহিদ দলগুলোর একটিকে অপরটির প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টায় ত্রুটি করছিল না। মাজারির মতো সে-ও নিজেকে মাসউদের পরিবর্তে হেকমতিয়ারের প্রতি নমনীয় দেখানোর প্রয়াস পায়। হেকমতিয়ারের আস্থা অর্জনের সে হিজবে ইসলামির ক্লাচি কেন্দ্রে এসে সরাসরি তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। সে তার সঙ্গে করে একজন মৌলবিকে নিয়ে এসেছিল। আলোচনা শুরুর আগে ধূর্ত কমিউনিস্ট নেতা দোস্তাম ওই মৌলবিকে দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করায়। এর মাধ্যমে সে হেকমতিয়ারকে বোঝানোর চেষ্টা করে, সে মূলত কমিউনিস্ট নয়; সাচ্চা মুসলমান। আলোচনায় সে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসও দেয়।

মোটকথা, এই সাক্ষাতের মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী দুটি কট্টর শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক

স্বার্থে ঐক্য সংঘটিত হয়ে যায়। হেকমতিয়ার আর দোস্তামকে ইতিপূর্বে আফগানযুদ্ধের দলগুলোর মধ্যে দুই মেরুর দুই দল হিসেবে মনে করা হতো। কাবুল বিজয়ের পর হেকমতিয়ার কর্তৃক মুজাদ্দিদির সরকারকে না মানার একমাত্র কারণ ছিল, সরকারে দোস্তামের অংশগ্রহণ। দোস্তাম মুজাদ্দিদি সরকারের সহযোগী ছিল বিধায় হেকমতিয়ার ওই সরকারকে ইসলামি সরকার বলতে ছিলেন নারাজ। তাঁর বড় দাবিই ছিল, আগে দোস্তামকে নিরস্ত্র করে কাবুল থেকে বের করে দেওয়া হোক; কেবল ওই অবস্থায়ই তিনি মুজাদ্দিদি সরকারকে সমর্থন দিতে পারেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আজ হেকমতিয়ারকে তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। আর দোস্তামের সহযোগিতা পেয়ে তাঁকে উচ্ছ্বসিতও দেখা যাচ্ছিল। হায়রে ক্ষমতার খেলা! এভাবেই যুগে যুগে উম্মাহর সোনালি স্বপ্ন হতাশার চাদরে মোড়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট রাব্বানির ভারত সফর

প্রফেসর মুজাদ্দিদির মতো বুরহানুদ্দিক রাব্বানিকেও ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার খায়েশ পেয়ে বসে। সুতরাং তিনি সেসব বহির্শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন, যারা আগে থেকেই আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যারা কাবুলে ইসলামি কোনো সরকারের অস্তিত্ব দেখার পক্ষে ছিল না। ওই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক দিক দিয়ে ভারত ছিল এগিয়ে। প্রেসিডেন্ট রাব্বানি ভারত সরকারের আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যেই সেখানে সফর করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়া যাওয়া উপলক্ষ্যে পাঁচ ঘণ্টার জন্য ভারতে যাত্রাবিরতি নেন। সেখানে ভারত সরকারসহ তার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাব্বানি। সংক্ষিপ্ত ওই সাক্ষাতেই তিনি ভারত সরকারের বন্ধুতে পরিণত হয়ে ওঠেন। এরপর ভারত সরকার সবসময় তাঁকে সহযোগিতা দিয়ে যেতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ বৃদ্ধি

চুক্তি অনুযায়ী ২৮ অক্টোবর ১৯৯২ রাব্বানি সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু তিনি একটা বাহানার আশ্রয় নিয়ে তাঁর সরকারের মেয়াদ আরও দুই মাস বাড়িয়ে নেন। বাহানাটি ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী শুরার বৈঠক অনুষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। এই বাধা দূর করতে মুজাহিদ নেতারা শুরার বৈঠক অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু করেন। কিন্তু বৈঠকের পরিবেশ তৈরি হওয়া শুরু হতেই মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছতে থাকে। পির গিলানি ও মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি রাব্বানির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে

দেন। মাওলানা ইউনুস খালিস তখন নবি মুহাম্মাদির পক্ষ নেন। এভাবে পেশোয়ার চুক্তির মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত গঠিত নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে রাব্বানির বাড়ানো দুই মাস সময়ও শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল, যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর ও নির্বাচন করা নিয়ে টালবাহানা শুরু করে দেন। তা ছাড়া নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরও ক্ষমতার চেয়ার ছাড়তে রাজি হননি। ওয়াদা ভঙ্গের কারণে গুলবুদিন হেকমতিয়ার নিজেই যেন আপাদমস্তক প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন। তিনি তখন রাব্বানির ওপর ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ বাড়াতে থাকেন।

জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির যুদ্ধ

এদিকে প্রেসিডেন্ট রাব্বানি ও তাঁর ডানবাহুখ্যাত আহমাদশাহ মাসউদ নির্বাচনের দাবি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের বড় দুঃখ ছিল, তাঁদের সবচেয়ে বড় বন্ধু আবদুল আলি মাজারি তাঁদের দল ছেড়ে হেকমতিয়ারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অবশেষে আরেকবার তাঁরা ময়দানে শক্তিপরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চালান। রাব্বানি-সরকারের পক্ষ থেকেই প্রথমে সূচনা ঘটানো হয় যুদ্ধের। তারা কাবুলের পূর্ব দিকে অবস্থিত হিজবে ইসলামির ঘাঁটিগুলোতে আচমকা হামলা চালান। যুদ্ধের শুরুর দিন শুরায়ে নাজারের জেনারেল বাবাজানের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পরদিন হিজবে ইসলামির যোদ্ধারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে ছিনিয়ে নেওয়া এলাকাগুলো পুনর্দখল করে। এমনকি চেহেল সাতুন এলাকাও দখল করে নেয় তারা।

সন্ধি ও সাফাইয়ের চেষ্টা : ইসলামাবাদ চুক্তি

আফগানিস্তানে আরেকবার রক্তপাতের কালো অধ্যায় সূচিত হওয়া ছিল পাকিস্তানসহ পুরো মুসিলিমবিশ্বের জন্য ভীষণ পীড়া ও অস্বস্তিকর। সুতরাং আরেকবার নতুন আঙ্গিকে যুদ্ধবন্ধের প্রয়াসের লক্ষ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ ইবনু আবদুল আজিজ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরিফ, আইএসআইয়ের প্রধান জেনারেল হামিদ গুল এবং জামাআতে ইসলামির আমির কাজি হুসাইন আহমাদ ছিলেন প্রথমসারিতে। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ ইসলামাবাদে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবারও যথারীতি মূল প্রতিপক্ষ ছিল হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামি। ব্যবধান এতটুকু—অন্যবার জমিয়তে ইসলামি শক্তিশালী থাকলেও এবার হিজবে ইসলামিকে দেখা যাচ্ছিল শক্তিশালী অবস্থানে। এই চুক্তিতে হেকমতিয়ারকে আফগানিস্তানের অধিকারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি

দেওয়া হয়, যিনি তাঁর ইচ্ছামতো মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন। তবে রাব্বানি অনেক চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে চুক্তির দফায় এটুকু পরিবর্তন নিয়ে আসেন, মন্ত্রিসভা গঠনে প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য মুজাহিদ নেতার পরামর্শ নিতে হবে।

এই পরিবর্তনের ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস পায়নি। কেননা, তাঁকে পরামর্শের ওপর কাজ করতে বাধ্য করা হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী রাব্বানির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়ানো হলেও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে তাঁর ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পায়। তবে কার্যত রাব্বানি আর মাসউদই সব কর্তৃত্বের মালিক ছিলেন। কেননা, তাঁদের জোটের সামরিকশক্তি ছিল বেশি। তা ছাড়া প্রফেসর সাইয়াফ, মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি এবং মাওলানা ইউনুস খালিসও বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে ছিলেন রাব্বানির পক্ষে।

যেহেতু মুজাহিদ নেতাদের বার বার অঙ্গীকারভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সন্ধির প্রচেষ্টাকারীরা ছিলেন অতিষ্ঠ, তাই এবারকার প্রতিজ্ঞাটি সুদৃঢ় করাতে তা হারামাইন শরিফাইনে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। অঙ্গীকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুজাহিদ নেতারা বাদশাহ ফাহাদ ইবনু আবদুল আজিজের আমন্ত্রণে ৮ মার্চ ১৯৯৩ পবিত্র হিজাজে যান। তাঁরা উমরা আদায়ের সৌভাগ্যলাভের পর ওই পবিত্র ভূমিতে এই মর্মে শপথ করেন যে, সর্বাবস্থায় তাঁরা অঙ্গীকার রক্ষা করে চলবেন।

জালালাবাদ সংলাপ

আফগান জনগণ আশা করছিল, এবার বোধহয় দীর্ঘ দুঃখজীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে; কিন্তু হায়রে ক্ষমতা! ক্ষমতার লোভ মক্কা-মদিনার মতো পবিত্রভূমিতে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ থেকে মুজাহিদ নেতাদের বাঁচাতে পারেনি। ইসলামাবাদ চুক্তি এবং মক্কা-মদিনায় কৃত অঙ্গীকারনামাও রক্তের সয়লাবে ভেসে যাতে থাকে। ওই অঙ্গীকারনামা লেখার কালি শুকানোর আগেই মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের পরিবেশ ছায়াপাত করতে দেখা যায়। কারণ, প্রেসিডেন্ট রাব্বানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হেকমতিয়ার যে অধিকার পাওয়ার কথা ছিল, তা প্রশান্ত মনে মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর অধিকার হ্রাস করে প্রেসিডেন্টের অধিকার বাড়িয়ে নেবেন। যখন এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন পুনরায় হত্যাযজ্ঞের আশঙ্কা উঁকি দিতে শুরু করে। সুতরাং সরকারগঠনের সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে যেতে জালালাবাদে এক সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানকার সাবেক আফগান বাদশাহদের সুরমামহলে আরেকবার জিহাদি দলগুলোর নয়জন নেতা সামনাসামনি বসেন। বৈঠকে প্রফেসর রাব্বানি, মাওলানা ইউনুস খালিস, গুলবুদিন হেকমতিয়ার, মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি, পির সাইয়িদ আহমাদ গিলানি, উসতাজ আবদুর রব রাসুল সাইয়াফসহ সকল

শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলছিল কয়েকদিনব্যাপী; কিন্তু সরকারগঠনের প্রশ্নে তাঁরা ঐকমত্যে যেতে ব্যর্থ হন। এর বড় কারণ ছিল, তাঁদের মধ্যে তখন কাউকে শালিস নিযুক্ত করা হয়নি।

জনগণ চাতকপাখির মতো জালালাবাদ সংলাপের দিকে তাকিয়ে বসা ছিল। অস্থির-ব্যাকুল হৃদয়ে তারা আলোচনার ফলাফলের জন্য ছিল অপেক্ষায়। দেখতে চাচ্ছিল, শেষপর্যন্ত রাজনীতির উট কোন দিকে পাশ ফেরায়। এ সময়ে দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে, আচমকা কাবুলের পশ্চিম প্রান্তে হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। ধূর্ত মাসউদের বাহিনী কাপিসা ও পারওয়ানে হেকমতিয়ারের অবস্থানে অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে প্রদেশ দুটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এরপর এগোতে এগোতে হিজবে ইসলামির শক্ত ঘাঁটি সারুবি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হিজবে ইসলামি এর প্রতিক্রিয়ায় কাবুলে নিযুক্ত জেনারেল বাবাজান ও জেনারেল মুমিনের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করে। এই যুদ্ধের পেছনে বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আলোচনারত নেতাদের কাছে নিজেদের শক্তির জানান দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এর মাধ্যমে আলোচনা পুরোপুরি ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে।

খুবসম্ভব বৈঠকটি নিষ্ফলভাবেই শেষ হয়ে যেত; কিন্তু হঠাৎ খোঁড়া দুই হাজারা ব্যক্তি রাজপ্রাসাদটি ঘেরাও করে ফেলে। এঁরা ছিল জিহাদে আহত দুই মুজাহিদ। আফগান জিহাদে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান অঙ্গ হারিয়ে আজকের এই জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে তাঁরা এই ঘোষণা দেয় যে, মুজাহিদ নেতারা এখান থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বেরোতে পারবেন না! তাঁদের হুমকি দারুণ কাজ করে। পরে দেশের ইতিহাসের সুদীর্ঘ ২১ দিনব্যাপী বৈঠক শেষে নেতারা নতুন সরকার গঠনের বিস্তারিত চুক্তিতে উপনীত হন। ওই বৈঠকে আরেকবার হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী এবং বুরহানুদ্দিন রাব্বানিকে প্রেসিডেন্ট মেনে নেওয়া হয়।

রাব্বানি আশা করছিলেন, ওই বৈঠকে মাওলানা ইউনুস খালিস, উসতাজ সাইয়াফ এবং অন্যান্য নেতাকে আস্থায় এনে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি; বরং ক্ষমতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। আসলে বিষয়টি ছিল সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য খুবই উপযোগী সিদ্ধান্ত। তারপরও রাব্বানি ওই বৈঠকের মাধ্যমে যে উপকার লাভ করেন, সেটা ছোট কোনো বিষয় ছিল না। কেননা, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আবার তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। মোটকথা, জালালাবাদ চুক্তির পর পরিবেশ অনেকটা শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। বার বার হতাশ আফগান জনগণ আরেকবার শান্তির স্বপ্নজাল বুনতে শুরু করে। তারা ভাবতে থাকে, এবার হয়তো তারা শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।

পাকিস্তানে নতুন সরকার

ইতিমধ্যে ১৮ জুলাই ১৯৯৩ পাক প্রধানমন্ত্রী মিয়া নাওয়াজ শরিফের সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে আসে। বলখশের মাজারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে নতুন নির্বাচন আয়োজন করে। নির্বাচনে বেনজির ভুট্টো ক্ষমতার মসনদে চলে আসেন। আফগানিস্তান বিষয়ে তাঁর পলেসিও মিয়া নাওয়াজ শরিফ থেকে ভিন্ন ছিল না। অর্থাৎ, প্রতিবেশীকে গুরুত্ব দিয়ে আফগানিস্তানে পাকিস্তানবান্ধব সরকার গঠন হোক, এটাই ছিল তাঁর প্রধান চাওয়া। তবে এর সঙ্গে মিয়া নাওয়াজ শরিফের মতো তিনিও আমেরিকার ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে লক্ষ রাখছিলেন।

জালালাবাদ চুক্তির পর

চুক্তির পর সরকারগঠনের প্রশ্ন আসতেই মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে দোস্তামকে ক্ষমতায় ভাগ দেওয়ার প্রশ্নে আরেকবার ভিন্নমত দেখা দেয়। 'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামি' এবং 'ইত্তেহাদে ইসলামি' কোনো অবস্থায়ই কাবুলের ক্ষমতায় দোস্তামের অংশগ্রহণ সহ্য করতে পারছিল না। রাব্বানি সরকারের 'জমিয়তে ইসলামি' তখন এ ব্যাপারে অর্থবোধক নীরবতা পালন করে যাচ্ছিল। তবে দোস্তামকে সরকারে অংশপ্রদানের সোচ্চার দাবি জানিয়ে যাচ্ছিল হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলামি। সাবেক প্রেসিডেন্ট মুজাদ্দিদিও তাঁদের দাবির সমর্থক ছিলেন। অবশেষে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত শর্তে তাকে সরকারে অংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১. দোস্তামের গুলমজাম মিলিশিয়াবাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে সব অস্ত্র সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।

২. কাবুল খালি করে দিতে হবে।

৩. দোস্তামের পক্ষ থেকে দুজন মুজাহিদ নেতাকে সরকারে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হবে।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর কাবুলে সরকারগঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। জনগণও অতীতের দুঃখ ভুলে সুখের নিশ্বাস ফেলা শুরু করে। হতাশ জাতি পুনরায় আশায় বুক বাধে, এবার হয়তো তারা স্থিতিশীল একটি সরকার পাবে।

বহির্শক্তির সঙ্গে হেকমতিয়ারের যোগাযোগ

উচিত তো ছিল এবার জমিয়তে ইসলামি ও হিজবে ইসলামির মধ্যকার দ্বন্দ্ব চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছাইচাপা আগুন তখনো ধকধক করে

জ্বলছিল। অন্যদিকে যুদ্ধের আগুনে ইন্ধনদাতা শক্তিগুলো যথারীতি বাতাস দিতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছিল, আবার যেকোনো মুহূর্তে আফগান নেতারা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

'জালালাবাদ সংলাপ' চলাকালে মাসউদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী পারওয়ান ও কাপিসায় আক্রমণ চালিয়ে হিজবে ইসলামির কেন্দ্রগুলো দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু সংলাপের পরও তারা ওইসব এলাকার দখল ছেড়ে দেয়নি। অবস্থাটি ছিল হেকমতিয়ারের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট লবি ও পশ্চিমাশক্তি হেকমতিয়ারকে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে অবিভাজ্য আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসানোর স্বপ্ন দেখিয়ে আসছিল।

হেকমতিয়ার ইতিমধ্যে আবদুল আলি মাজারি ও রাশিদ দোস্তামের সহায়তার আশ্বাস পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর নতুন পথে হাঁটা শুরু করেন। নিজে ইরান সফর করে সেখানকার প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির সহায়তালাভে সমর্থ হন। এরপর তাঁর প্রতিনিধিরা তাশকন্দে দোস্তামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে একে অন্যের সহযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে হিজবে ইসলামি, হিজবে ওয়াহদাত, গুলমজাম মিলিশিয়া ও ইরান প্রায় একাত্ম হয়ে যায়।

নতুন জোট 'রাবেতা কাউন্সিল'

এই দলগুলোর মধ্যে একতা সৃষ্টি হলেও তাদের জন্য পাকিস্তানের আস্থা ও সহায়তা অর্জন ছিল অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে চারসুদ্দার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে হেকমতিয়ারের জামাতা হুমায়ুন জারির এবং দোস্তামের প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল ফাওজি অংশ নেন। বৈঠকে জামাআতে ইসলামির আমির কাজি হুসাইন আহমাদ এবং আজমল খটকও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে হিজবে ইসলামি, হিজবে ওয়াহদাত এবং রাশিদ দোস্তামের জোটকে 'রাবেতা কাউন্সিল' নামে যথারীতি নতুন একটি জোট হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। বৈঠকে আফগানিস্তানে নতুন একটি সরকার গঠনের রূপরেখাও তৈরি করা হয়। হেকমতিয়ারের এই 'একলা চলো' নীতি আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদ নেতাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। উসতাজ সাইয়াফ, মাওলানা ইউনুস খালিস, মৌলবি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদি এবং পির আহমাদ গিলানি যদিও প্রেসিডেন্ট রাব্বানির ওপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না; কিন্তু হেকমতিয়ারকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একাত্ম হতে দেখে তাঁরা রাব্বানিকে সমর্থন দেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ মনে করেন। এদিকে গুলবুদিন এবার জালালাবাদ সংলাপকে উহ্য রেখে প্রকাশ্যেই দাবি জানাচ্ছিলেন, এবার প্রেসিডেন্ট রাব্বানিকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি নিতে হবে; কিন্তু রাব্বানি তাঁর দাবিকে সামান্য কানাকড়ির মূল্য দিতেও রাজি ছিলেন না।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ১ জানুয়ারি রক্তাক্ত যুদ্ধ

অবশেষে নিজের শক্তি সম্পর্কে পুরো ধারণা অর্জনের পর গুলবুদ্দিন ও তাঁর জোট কাবুল দখলের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে ফেলে। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ বরফশীতল রাতের শেষ প্রহরে 'রাবেতা কাউন্সিল' জোটের তিন পার্টি আচমকা একযোগে কাবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিজবে ইসলামি চার আসিয়াব থেকে এগিয়ে বালা হিসারের ঢালুভূমি 'পুলমাহমুদ' থেকে কাবুলের ওপর অবিরাম গোলাবৃষ্টি শুরু করে। এদিকে নাদিরখানে থাকা গুলমজাম মিলিশিয়াবাহিনী এগোতে এগোতে একেবারে হিজবে ইসলামির বাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়। আর দক্ষিণ দিক থেকে আবদুল আলি মাজারি হামলা চালিয়ে এগোতে থাকে। ফলে খুব দ্রুতই কাবুল বিমানবন্দর, রেডিয়ো স্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু স্থাপনা দখল করে নেয় তারা। তখন কাউন্সিলের তিন নেতা হেকমতিয়ার, দোস্তাম ও আবদুল আলি মাজারি পাকিস্তান সরকারকে অবহিত করেন, তাঁরা কাবুল দখল করে নিয়েছেন এবং রাব্বানি কাবুল ছেড়ে পালিয়ে গেছেন; কিন্তু রাবেতা কাউন্সিলের এই সংবাদ ভুল প্রমাণিত হয়। কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাসউদ ওই দিন পুরোদস্তুর প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে বাহিনী তিনটিকে শহর থেকে বিতাড়িত করে দেন। আর বিকেলের দিকে তাঁরা বিমানবন্দরের দখলও ফিরিয়ে নেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধ শত শত নাগরিকও মারা যায়। এভাবে আফগানিস্তানে সামরিক শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিবেশ এতটাই বিষিয়ে ওঠে যে, মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ে।

দেশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পুরোটাই এভাবে গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণে যাওয়া অর্থহীন। সারকথা, এই অব্যাহত গৃহযুদ্ধ দেশকে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দেয়।

এক রিপোর্টমতে, দেশ তখন নিম্নোক্তভাবে নয় টুকরোয় বিভক্ত হয় :

১. কাবুল ও এর শাসনাধীন উত্তর এলাকা : এতে চারিকার পাঞ্জশির, বাদাখশান এবং তাখার অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই এলাকাগুলো ছিল প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানি, আহমাদশাহ মাসউদ ও তাজিক নেতাদের দখলে। ভারত আর রাশিয়া ছিল তাদের সহযোগী। পাকিস্তানের কতিপয় জিহাদি দল এবং মাদরাসার ছাত্রদের আস্থা তখনো তাঁদের ওপরই ছিল বিধায় তাঁরাও ছিল এই জোটের সহযোগী।

২. পূর্ব-আফগানিস্তানের নাঙ্গাহার, দক্ষিণের কাপিসা, কাবুলের পার্শ্ববর্তী এলাকা, লোগার, ওয়ারদাক, চার আসিয়াব এবং সারুবি ছিল হেকমতিয়ার ও তাঁর জোটের দখলে। তাঁরাও পাকিস্তানের কিছুসংখ্যক দলের বিশেষ করে জামাআতে ইসলামির সহযোগিতা পাচ্ছিলেন।

৩. উত্তর-আফগানিস্তান : বলখ, মাজার-ই-শরিফ, জুজযান, ফারিয়াব ও কুন্দুজ—এখানে ছিল উজবেক বংশোদ্ভূত নেতা রাশিদ দোস্তামের রাজত্ব। তারা রাশিয়ার পাশাপাশি ইরানেরও সহায়তা পাচ্ছিল।

৪. উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান : এখানকার হেরাত, বাদগিস, ফারাহ ও নিমরোজে ছিল ফারসিভাষী তোরোন ইসমাইল খানের রাজত্ব। ইরান ছিল ইসমাইলের বড় পৃষ্ঠপোষক।

৫. খোস্ত ও এর নিকটবর্তী পাকিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন এলাকা : এখানকার আধিপত্য ছিল মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির হাতে, যিনি পুরোপুরি ইসলামি শরিয়া মোতাবিক শাসনকাজ পরিচালনা করছিলেন।

৬. বামিয়ান : এলাকাটি ছিল হাজারা সম্প্রদায়ের সংগঠন হিজবে ওয়াহদাতের আধিপত্যে। এরাও ইরান থেকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল।

৭. কায়ান গিরিপথ ও পুলখুমরি : এখানে ছিল আগাখানি নেতা মানসুর নাদিরির আধিপত্য। সে-ও ইরানের পূর্ণ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল।

৮. পূর্ব-আফিগানিস্তানের কুনার (আসাদাবাদ) প্রদেশ : শুরু থেকেই এলাকাটি ছিল মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সোভিয়েত ইউনিয়নবিরোধী যুদ্ধে এখানকার আলিমসমাজের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। এখানকার আহলে হাদিসের জামিলুর রাহমান নামের এক বুজুর্গ আলিমকে জিহাদের প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। রাশিয়া তাদের ১২ বছরের আগ্রাসনযুগে কখনো এ এলাকায় পা জমাতে পারেনি।

কাবুলে হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির অনিঃশেষ যুদ্ধের ধারাবাহিকতা দেখতে পেয়ে এখানকার আলিমরা একটি স্বাধীন সরকার গঠন করেন। এর প্রধান ছিলেন মাওলানা খলিলুর রাহমান। এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীন ছিল বিধায় হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামি উভয়ের চোখেই এরা ছিল বিদ্রোহীর অবস্থানে। কয়েক বছর পর অত্যন্ত গোপনে মাওলানা জামিলুর রাহমানকে হত্যা করা হয়। তাঁর সহযোগীরা এর জন্য হিজবে ইসলামিকে দায়ী করছিল। তাঁদের এই সরকার ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

৯. দক্ষিণ-আফগানিস্তান : এখানে ডজনখানেক কমান্ডার যার যার সুবিধামতো অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করছিলেন।

এসব এলাকায় কিছু জায়গা বাদ দিয়ে সর্বত্রই চলছিল ধ্বংস আর হত্যার রাজত্ব। কাবুলে হিজবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির মধ্যকার লড়াই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিদিনই হিজবে ইসলামির ঘাঁটি থেকে কাবুলে রকেট ছোড়া হচ্ছিল। এই গৃহযুদ্ধের ফলে ৬৩ হাজার মানুষ মৃত্যুর খোরাকে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র

১. *আফগানিস্তান কি কাহানি হাকায়িক কি জুবানি*, ড. মুফাক্কির আহমাদ।

২. *মাসিক সাদায়ে মুজাহিদ*, ১৯৯২, ১৯৯৩,১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. *মাসিক আল-ইরশাদ*, ১৯৯২, ১৯৯৩,১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

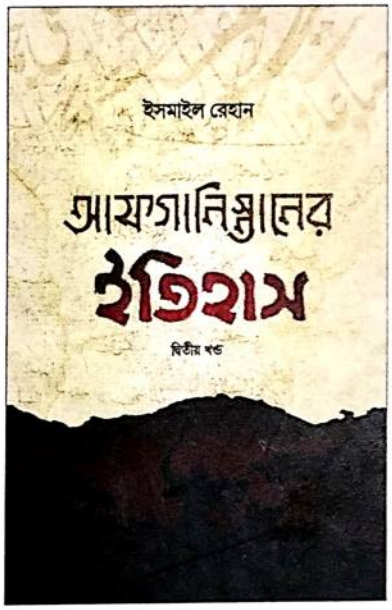
৪. *সাপ্তাহিক তাকবির*, ১৯৯২, ১৯৯৩,১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. *উর্দু ডাইজেস্ট*, জুন ১৯৯২।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

Kalantor Prokashoni

978-984-96590-4-4



Afganistaner Etihas 2nd
by **Ismail Rehan**
Kalantor Prokashoni
Price : ৳ ৬০০ US $ 25, UK £ 20
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
fb.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

লেখক পরিচিতি

হাফিজ মাওলানা ইসমাইল রেহান। পিতার নাম আবদুল আজিজ। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্থায়ী নিবাস ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে আটক জেলার হাসান আবদাল এলাকায় খালিক দার গ্রামে। পিতার কর্মস্থলের কারণে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাণিজ্যিক রাজধানী করাচিতে।

পারিবারিকভাবে দীনি পরিবেশে লালিতপালিত হন। মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর হঠাৎ করেই জেনারেল শিক্ষা ছেড়ে ধাবিত হন দীনি শিক্ষায়। ভর্তি হন দারুল উলুম করাচিতে। মাত্র তিন বছরে কুরআনুল কারিম হিফজ সম্পন্ন করেন। এ সময়ে শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানির ইসলাহি মজলিসগুলোতে নিয়মিত বসতেন।

হিফজুল কুরআন সমাপ্ত করে ভর্তি হন বাহাদুরাবাদের জামিয়া মাহাদুল খলিল আল ইসলামিতে। এখান থেকেই ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাকমিল ফিল হাদিস সমাপন করেন। তবে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে আবারও বেফাকুল মাদারিসে তাকমিল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এ সময় বিখ্যাত গবেষক আল্লামা আবদুর রাশিদ নুমানির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের এ পর্যায়ে রপ্ত করেন গবেষণার নানামুখী শিল্প ও কৌশল। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বি. এ. (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এটি ছিল একটি প্রাইভেট প্রোগ্রাম। এ সময় ইসলামের ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক একটি থিসিস লেখেন। এরপর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে করাচির উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় (FUUAST) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেফাক থেকে তাকমিলের পরপরই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আরবি ব্যাকরণ থেকে শুরু করে ফিকহ, বালাগাত, হাদিস, তাফসির ও ইসলামি ইতিহাস বিষয়ে পাঠদান করেছেন। তবে গবেষণায় পুরোদস্তুর ব্যস্ত থাকলেও পাঠদানের সঙ্গে এখনো নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। (*বাকি অংশ তৃতীয় খণ্ডে*)